প্রকৃতির লীলা-নিকেতন।

সবুজ উদ্ভিদ্ আমাদের পরম সুহৃদ।
[ইউ. এস্. আই. এস্-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

(ক) দু'মাস ধরে শুধু জই-চূর্ণের মাড় (Oatmeal gruel) খেয়ে (ভিটামিন-এ-র অভাবে) শিশুটি জেরোপথ্যাল্‌মিয়া-রোগে আক্রান্ত হয়। ফলে বাঁ চোখটি একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। দুধ এবং কডলিভার অয়েল খেতে দেওয়ায়, তার ডান চোখটি রক্ষা করা সম্ভব হয়। (Bloch)

(খ) স্কার্ভি (Scurvy)-রোগে আক্রান্ত মানুষের মাড়ি (Gum)। ছবিতে ঠোঁটের ও মাড়ির ক্ষত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ভিটামিন-সি-র অভাবে এই রোগ হয়ে থাকে। [WHO কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন।]

(গ) পেলাগ্রা (Pellagra) নামক চর্ম-রোগে আক্রান্ত শিশু। ভিটামিন-বি-(মিশ্র) (বিশেষভাবে, ভিটামিন-বি-২ এবং নিকোটিন্যামাইড)-এর অভাবে এই রোগ হয়ে থাকে। (Hansen)

(ঘ) রিকেট্‌স (Rickets) রোগে আক্রান্ত শিশু। দুই পায়ের বক্রতা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। ভিটামিন-ডি-এর অভাবে এই রোগ হয়ে থাকে। (Hansen)

জীবের ক্রমবিকাশ

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা ৯

ভিটামিন—বি-১-এর অভাব-জনিত রোগ
(Polyneuritis)
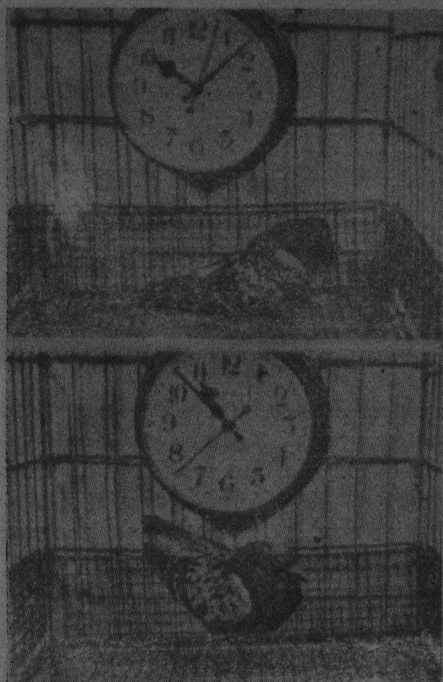
(ঙ) সকাল ১০·০৮। শুধু কলে-ছাঁটা চাল খাওয়ার ফল—ক্রমাগত স্নায়বিক আক্ষেপ (Continuous rolling convulsions)। (Polyneuritis)

সকাল ১০·২৪। ০·১ মি লি. স্যালাইন-মাধ্যমে ১·৫ মিলিগ্রাম ভিটামিন-বি-১ এবং ০·৪৫ মিলিগ্রাম গ্লুকোজ ইন্‌জেক্‌শন্ দেওয়া হ'ল।

সকাল ১০·৫২। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলো, এবং পায়রাটি উঠে দাঁড়ালো। (Peters)

[অধ্যাপক ডাঃ প্রদীপ কুমার রাহার সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

প্রকাশক : শ্রীমৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ
৭৭/১, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
ফ্ল্যাট নং ২, কলিকাতা—৩৭

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৬০

মুদ্রাকর : শ্রীসমীর বসু
হরিহর প্রেস
৯৩/২, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা—৯

(ক) দৈত্যাকার মানুষ। বয়স মাত্র ২১, কিন্তু উচ্চতা ৭ ফুট ৬ ইঞ্চি, বৃদ্ধি তখনও অব্যাহত।

(খ) দক্ষিণ আফ্রিকার পিগ্‌মি বা বামন, গড় উচ্চতা মাত্র সাড়ে চার ফুট। একজন শ্বেতাঙ্গের তুলনায় সে কত বেঁটে, তা ছবি দেখলেই আন্দাজ করা যাবে।

(গ) মেদ-বাহুল্য—ছেলেটির বয়স মাত্র ১১ বছর।

(ঘ) গলগণ্ড (Goitre), সেই সঙ্গে সদা-বিস্ফারিত-নেত্র (Exophthalmos)।

[অধ্যাপক ডাঃ প্রদীপ কুমার রাহার সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

ময়ূর এবং ময়ূরী—ময়ূরীর লেজ হয় সাধারণ পাখির মতো, কিন্তু ময়ূরের লেজের উপর থেকে গজায় অতিরিক্ত কতকগুলি রঙিন পুচ্ছ। আনন্দ হ'লে, ময়ূর লেজের ঐ পুচ্ছ-পালকগুলি উপরদিকে তুলে মেলে দেয় এবং ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে। পেখমধরা ময়ূরের সৌন্দর্যের কোন তুলনা নেই।

গোত্র—ফীজ্যান্ট (Family—Pheasant),

নাম—পাবো ক্রিস্‌টাটুস্‌ (*Pavo cristatus*)।

চিত্র ৪৬। বংশগতি অনুযায়ী অর্জিত ধর্মের উপর নির্ভর ক'রে, এবং সেই সঙ্গে দেহ-নিঃসৃত নানাপ্রকার হরমোনের প্রভাবে, প্রাণিদেহে যৌবন-লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, যৌবন সমাগমে, প্রধানতঃ পুং-হরমোন টেষ্টোষ্টেরোন-এর প্রভাবে, লেগহর্ন মোরগের ঝুঁটি, শ্বেতপুচ্ছ-হরিণের শিং, সিংহের কেশর প্রভৃতি বিকশিত হয়ে থাকে।

ভূমিকা

একদা মরিশাস দ্বীপে প্রচুর ডোডো-পাখি বিচরণ ক'রত। নিরীহ এই পাখি ছিল পায়রার স্বগোত্র। ইউরোপের নাবিকরা সেখানে পদার্পণ ক'রে দেখল, এই পাখির মাংস খুব সুস্বাদু। এরা উড়তে পারত না, তাই সহজেই ধরা পড়তো। এমনি ক'রে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই শেষ পাখিটিও নিহত হ'ল। সেই থেকে ইংরেজীতে একটি ফ্রেজ (Phrase) বা শব্দসমষ্টি প্রচলিত হ'ল,—"Dead as the dodo." আধুনিক সভ্যতা নিয়ে যতই গর্ব করি না কেন, আমরা কি একটি ডোডো-পাখি সৃষ্টি করতে পারবো ?

বিজ্ঞানীর হিসেবে, ১৯৪০ সালেও ভারতে মোট বাঘের সংখ্যা ছিল প্রায় ত্রিশ হাজার, কিন্তু ১৯৬৯ সালে এই সংখ্যা নেমে আসে মাত্র আড়াই হাজারে। প্রাচীন-কালে ভারতের অনেক অরণ্যেই সিংহ বাস ক'রত, কিন্তু এখন গুটি কয়েক কোন প্রকারে টিকে আছে শুধু গির অরণ্যে। তেমনি সামান্য কয়েকটি গণ্ডারের দেখা মেলে শুধু জলদাপাড়া এবং কাজিরাঙ্গার অভয়ারণ্যে। প্রাচীন সাহিত্যে এমন অনেক পাখির বর্ণনা আছে, যেগুলি এখন আর চোখেই পড়েনা।

তাই অনেকেরই জিজ্ঞাসা,—বাঘ, সিংহ, গণ্ডার, হাতি, তিমি প্রভৃতি প্রাণীগুলিও কি একে একে এই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ? বাস্তবিক এইসব প্রাণী এবং এইরকম আরও শত শত প্রাণী একেবারে লুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় প্রহর গুণছে।

বর্তমানে এর জন্যে অনেকাংশে দায়ী কিন্তু মানুষ নিজেই। সত্যি, প্রাকৃতিক পরিবেশের স্বাভাবিকতায় কি নিদারুণ হস্তক্ষেপ করছে মানুষ, প্রতিনিয়ত ! সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ক্রমাগত বন কেটে বসত গড়ে তুলছে, যেখানে-সেখানে ড্যাম বা জলাধার নির্মাণ করছে, গজদন্ত, শিং, মাংস, ব্লাবার (Blubber=তিমির চর্বি), চামড়া, ফার (Fur) প্রভৃতির লোভে নির্বিচারে প্রাণী হত্যা করছে, চাষবাসের জন্যে অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার ক'রে কীট-পতঙ্গ ধ্বংস করছে, আর যেখানে-সেখানে কল-কারখানা স্থাপন ক'রে মাটি, জল ও বাতাসকে ক্রমাগত কলুষিত করছে। এসবের কুফল হয়তো তখনই বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু এর ফল হচ্ছে সুদূরপ্রসারী।

চিত্র ৬৬। কয়েক প্রকার সাদা ফুল—1. রজনীগন্ধা, 2. বেল, 3. গন্ধরাজ, 4. টগর, 5. শ্বেত-কাঞ্চন, 6. ফুরুস। [আলোকচিত্র-শিল্পী—ডাঃ প্রদীপ কুমার সাহা]

সুমিষ্ট গন্ধে আকৃষ্ট হ'য়ে কীট-পতঙ্গ বীজ উৎপাদনের সাহায্য করে। এজন্য দিনের বেলা যে-সব ফুল ফোটে, সে-সব প্রায়ই হয় উজ্জ্বল বর্ণের ; যেমন—গোলাপ, গাঁদা,

প্রকৃতির ভারসাম্য যেন এক সূক্ষ্ম সুতোয় ঝুলছে। একটু এদিক-ওদিক হলেই সর্বনাশ! তখন এমন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় যাতে মানুষের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে।

একথা এখন সকলেই স্বীকার করেন যে, প্রকৃতির ভৌত পরিবেশ, উদ্ভিদ্ এবং প্রাণী পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। সেজন্য প্রাকৃতিক পরিবেশ, উদ্ভিদ্ এবং প্রাণী সংরক্ষণে আমাদের আরও বেশী ক'রে উদ্যোগী হওয়া দরকার।

সম্প্রতি কলকাতার একটি অনুষ্ঠানে বিখ্যাত পক্ষিতত্ত্ববিদ্ ডঃ সেলিম আলি সাবধান-বাণী উচ্চারণ ক'রে বলেছেন,—কেরলের জল-বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হ'লে, বিখ্যাত 'সায়লাণ্ট ভ্যালি' বা নীরব উপত্যকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল চিরকালের মতো জলপ্লাবিত হয়ে যাবে। এর ফলে সেখানে একটি বিরাট এলাকার গাছপালা, কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখি সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। কী সাংঘাতিক কথা!

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, গুজরাটের কান্দলা বন্দরের নির্মাণ প্রকল্পের ফলশ্রুতি হিসাবে ভীত ও সন্ত্রস্ত ফ্লেমিঙ্গো বা কানঠুটিয়া পাখির বিরাট উপনিবেশ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

আরও একটি সমস্যার দিকে ডঃ আলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গত কয়েক বছরে ইঁদুর, কাঠবিড়ালী, খরগোস প্রভৃতি রোডেণ্টদের (Rodents), বা তীক্ষ্ণদন্ত-প্রাণীদের, সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে। এরা মাটি খুঁড়ে মরুভূমিকে বাড়িয়ে তোলায় সাহায্য করছে। হাজার হাজার মন ধান, গম এবং আরও নানারকম ফসল খেয়ে নষ্ট করছে। এদের সংখ্যা এতো বাড়লো কেন? আগে প্রিডেটররা (Predators), অর্থাৎ শিকারী প্রাণীরা (যেমন—প্যাচা, বাজ-পাখি, ঈগল প্রভৃতি), এদের অনেক খেয়ে ফেলতো। কিন্তু এখন ঐসব পাখির সংখ্যা অনেক কমে গেছে। কারণ, ওরা তো গৃহস্থের শত্রু, হাঁস-মুরগি ধরে নিয়ে যায়। তাই ওদের অনেককে গুলি ক'রে মারা হয়েছে। শুধু তাই নয়, লোকালয়ের কাছাকাছি যে সব অরণ্যে ওরা বাস ক'রত, সেগুলি আমরা কেটে সাফ ক'রে দিয়েছি। ওরা থাকবে কোথায়?

সম্প্রতি একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,—একজোড়া মেঠো ইঁদুরের সকল সন্তান-সন্ততি যদি অবাধে বংশ-বিস্তার করার সুযোগ পেত, তাহ'লে এক বছরের মধ্যেই তাদের সংখ্যা দাঁড়াত প্রায় দশ লক্ষ। আর এই বিরাট ইঁদুর-বাহিনীর জন্যে

রঙীন চিত্র—III

কয়েক প্রকার রঙীন ফুল—

1. গোলাপ
2. ডালিয়া
3. সূর্যমুখী
4. অ্যাস্‌টার।

খাদ্যের প্রয়োজন হ'ত প্রায় বারো লক্ষ টন! এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে ঐসব শিকারী পাখিরও কত প্রয়োজন!

এই প্রসঙ্গে 'Sportsmen's Organizations'-এর একটি বুলেটিনে বলা হয়েছে—"There is more in the predator-prey relationship than meets the eye. Dame Nature fitted them for their role and she is a wise old Dame and knows what she is doing. Don't forget that you, Mr. Man, are the greatest predator of them all, and a wanton destroyer if ever there was one."

বাঘ, সিংহ, কুমীর প্রভৃতি শিকারী প্রাণীর (Predators) বেলায়ও এই উক্তি সমভাবে প্রযোজ্য।

ভারতে যে বাঘের সংখ্যা এতো হ্রাস পেয়েছে তার একটি বড় কারণ হ'ল, বাঘের চামড়া বিদেশের বাজারে অনেক বেশী দামে বিকোয়। আর একটি কারণ, অরণ্যে বাঘের খাদ্য-প্রাণীর একান্ত অভাব। নিতান্ত ক্ষুধার তাড়নায়ই বাঘ লোকালয়ে এসে হানা দেয়, গরু-বাছুর নিয়ে পালায়। আর এজন্যই তারা অনেক সময় মানুষের শিকার হয়।

একজন প্রখ্যাত শিকারী তাঁর শিকারী-জীবনের স্মৃতি-কথায় সুন্দরবনের কুমীরের কথাও লিখেছেন। শীতকালে সুন্দরবনের চড়ায় অনেক কুমীরের রোদ পোহাবার দৃশ্য তিনি দেখেছেন। প্রাণিজীবনের একটি চমৎকার উপভোগ্যের দৃশ্য! কুমীরের চামড়াও খুব চড়া দামে বিক্রি হয়। তাই তাদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে। ফলে, সুন্দরবনের কুমীরের সংখ্যা এতো হ্রাস পেয়েছে যে, কুমীরের রোদ পোহাবার দৃশ্য এখন আর চোখে পড়ে না বললেই চলে।

হাতির সংখ্যাও এখন অনেক কমে গেছে। হাতির বাসস্থান হ'ল নিবিড় অরণ্য। বিজ্ঞানীরা বলেন, অরণ্যে হাতি থাকলে বুঝতে হবে যে, সেই অরণ্যের প্রাকৃতিক পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রয়েছে। দুঃখের বিষয়, নির্বিচারে বন-জঙ্গল কেটে সাফ করা হচ্ছে। হাতিরা আর আগের মতো খাবার পাচ্ছে না। তাই তারা মাঝে মাঝে লোকালয়ে এসে হানা দিচ্ছে, ঘরবাড়ি ভেঙে তছনছ করছে, খেতের ফসল খেয়ে ফেলছে। ক্ষতির পরিমাণ তো নিতান্ত কম নয়! তাই হিংসায় উন্মত্ত মানুষ ঐসব হাতিকে হত্যার সঙ্কল্প নিয়ে হন্যে হয়ে ঘুরছে। এর ফলে হাতির সংখ্যা দিনে দিনে কমছে। হয়তো আরও কমবে।

রঙীন চিত্র—IV. কয়েক প্রকার রঙীন ফুল—
1. জবা, 2. ঝুমকো, 3. বেগনিয়া, 4. পর্টুলেকা,
5. অপরাজিতা, 6. মর্নিং গ্লোরি।
[শিল্পী—শ্রীমৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ]

এই পরিপ্রেক্ষিতেই বন এবং বন্য প্রাণী সংরক্ষণের কথা বিশেষভাবে চিন্তনীয়। সংরক্ষকের প্রধান চিন্তার বিষয়, বনের বিশেষ বিশেষ গাছপালা এবং পশু-পাখিকে সমূহ বিলুপ্তির সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করা।

কিন্তু অনেকেই হয়তো বলবেন, হিংস্র শিকারী প্রাণীদের, অর্থাৎ প্রিডেটরদের, রক্ষা করার দরকার কি? এরা তো মানুষের চির-শত্রু। এদের তো মেরে ফেলাই উচিত। তাদের সব সময় মনে রাখা দরকার যে, বন্য প্রাণী সংরক্ষণের পরিকল্পনা নিম্ন-লিখিত চারটি স্তম্ভের (বা, নীতির) উপরে দাঁড়িয়ে আছে :—

১। **নৈতিক (Ethical)**—আমাদের সামনে দু'টি পথই খোলা আছে—একটি প্রজাতি (Species)-কে আমরা সমূলে বিনাশ করতে পারি, নয়তো সমূহ বিনাশ থেকে তাদের রক্ষা করতে পারি। কোন্ পথ আমরা বেছে নেব ?

২। **সৌন্দর্য বিজ্ঞান সম্মত (Aesthetic)**—প্রাকৃতিক পরিবেশে বন্য প্রাণী দেখে অপার আনন্দ উপভোগ করা যায়। বাস্তবিক, অরণ্যের পটভূমিতে একটি মুক্ত স্বাধীন বাঘ, সিংহ, হাতি বা গণ্ডার দেখার যে আনন্দ তার কোনো তুলনা নেই। এরূপ দৃশ্য যেমন সুন্দর, তেমনি রোমাঞ্চকর!

এমন একটি দৃশ্যের ভারি সুন্দর এক বর্ণনা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন,—"আরও একবার বাঘ এসেছিল শিলাইদহের জঙ্গলে। আমরা দুই ভাই যাত্রা করলুম তার খোঁজে হাতির পিঠে চড়ে। আখের খেত থেকে পট্ পট্ করে আখ উপড়িয়ে চিবোতে চিবোতে পিঠে ভূমিকম্প লাগিয়ে চলল হাতি, ভারিক্কি চালে। সামনে এসে পড়ল বন।······ঢুকে পড়ল হাতি ঘন জঙ্গলের মধ্যে। এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল।····· হঠাৎ বাঘটা ঝোপের ভিতর থেকে দিল এক লাফ। যেন মেঘের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা বজ্রওয়ালা ঝড়ের ঝাপটা। আমাদের বিড়াল কুকুর শেয়াল-দেখা নজর, এযে ঘাড়ে-গর্দানে একটা একরাশ মুরদ, অথচ তার ভার নেই যেন। খোলা মাঠের ভিতর দিয়ে দুপুর বেলার রৌদ্রে চলল সে দৌড়ে। কী সুন্দর সহজ চলনের বেগ! মাঠে ফসল ছিল না। ছুটন্ত বাঘকে ভরপুর করে দেখবার জায়গা এই বটে, সেই রৌদ্রঢালা হলদে রঙের প্রকাণ্ড মাঠ।"

বাস্তবিক, এমন দৃশ্য যিনি একবার দেখেছেন, তিনি কি তা কখনও ভুলতে পারেন! রবীন্দ্রনাথও ভুলতে পারেননি, ছেলেবেলার সেই স্মৃতি।

এবিষয়ে কারও মনে কোন রকম সন্দেহ থাকলে, তিনি একটু লক্ষ্য ক'রে

যেতে শেষে ডিম্বকের ছিদ্রের (Micropyle) ভিতর দিয়ে ভ্রূণস্থলীর মধ্যে প্রবেশ করে। এখানে এসে নলের অগ্রভাগ ফেটে যায় এবং মুখ্য পুং-জনন-কোষ এসে মুখ্য স্ত্রী-জনন-কোষের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে ভ্রূণে (Embryo) পরিণত হয়। এরই

চিত্র ৭২। আমগাছের জীবন-চক্র—1. আমের আঁঠি (বীজ), 2. আমের চারা, 3. আমগাছ, 4. আমের মঞ্জরী, 5. কাঁচা আম, 6. পাকা আম।

দেখবেন, বন্য প্রাণী সংক্রান্ত টেলিভিশনের বা সিনেমার প্রোগ্রাম ছোট-বড় সকলের কাছেই কত জনপ্রিয়! আর সেগুলি কত দর্শক আকর্ষণ করে!

৩। **বৈজ্ঞানিক (Scientific)**—জীববিদ্যা অনুশীলনে, বন এবং বন্য প্রাণীই হ'ল সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান। ব্যাপক অনুসন্ধানের আগেই এদের বিনষ্ট হতে দেওয়ার মতো মূর্খতা আর কিছুই নেই।

৪। **অর্থনৈতিক (Economic)**—প্রতিটি অভয়ারণ্যেরই এক বিশেষ আকর্ষণ আছে। একটু সচেষ্ট হ'লেই সে সব জায়গায় অনেক পর্যটক আকর্ষণ করা যায়, এবং তাতে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হয়।

শুধু তাই নয়, মাংস, চামড়া বা ফার আহরণের উদ্দেশ্যে উদ্‌বৃত্ত পশু-পাখিগুলিকে অনায়াসে ছাঁটাই ক'রে ফেলা যায়। তবে সে সময় লক্ষ্য রাখা দরকার, যাতে প্রকৃতির ভারসাম্য কোন প্রকারে বিনষ্ট না হয়। সবকিছু সুপরিকল্পিতভাবে করতে পারলে, চাহিদা অনুযায়ী, মাংস, চামড়া কিংবা ফার সরবরাহ করার কোন সমস্যাই আর থাকবে না। উপরন্তু সমগ্র পরিকল্পনাটি লাভজনক হয়ে উঠবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সোভিয়েত রাশিয়ার সিল্‌ভার ফক্সের ফার (Fur) অত্যন্ত মূল্যবান। শিকারীরা সাইবেরিয়ার জঙ্গলে গিয়ে তাদের শিকার ক'রে নিয়ে আসত। এমনি ক'রে তাদের বংশ লোপ পেতে বসেছিল। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা নানা রকম গবেষণা ক'রে মানুষের পরিবেশে তাদের পোষ মানালেন। খামারে তাদের বংশ-বিস্তারের ব্যবস্থা হ'ল। ফলে, ফারের ব্যবসা ফুলে-ফেঁপে উঠল। সিল্‌ভার ফক্সের বেলায় যা সম্ভব হয়েছে, অন্য প্রাণীদের বেলায় তা সম্ভব হবে না কেন?

তবে এখানে আর একটি বিষয়ের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার। অভয়ারণ্যে সংরক্ষিত হিংস্র প্রাণীরা যাতে নিরীহ গ্রামবাসীদের জীবন বিপন্ন করতে না পারে, সেদিকেও সতত সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। বাঘ, সিংহ, কুমীর প্রভৃতি প্রাণীর হিংস্রাচার নিরস্ত্র অসহায় গ্রামবাসীদের যথেচ্ছ নিধন করবে, এরূপ কোন অবস্থার কথা ভাবাও যায় না। ইকোলজি (Ecology) বা বাস্তব্য-বিদ্যার তাত্ত্বিক স্নেহ শুধু বাঘ, সিংহ, কুমীর প্রভৃতি প্রাণী সম্পর্কে প্রযুক্ত হলেই চলবে না। এরূপ পরিকল্পনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে, অভয়ারণ্যের নিকটবর্তী গ্রামবাসীদের এবং গৃহপালিত পশু-পাখিদের প্রাণও সৃষ্টির পারিবেশিক সম্বন্ধের যোগ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন প্রাণ নয়। সুতরাং, তাদের জীবনের নিরাপত্তার কথাও সর্বাগ্রে বিবেচ্য। এবিষয়ে যথোচিত সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে কিনা

চিত্র ৯৪। নানাপ্রকার পোষা পায়রা (Pigeons)। এদের মধ্যে প্রবল পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু উল্লেখ্য যে, একই বুনো পায়রা থেকে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে এদের উদ্ভব হয়েছে।

[1. Rock-dove (The origin of domesticated species), 2. Common dovecote pigeon, 3. Fantail, 4. Jacobin, 5. B'ue Pouter, 6. Trumpeter, 7. Black carrier, 8. African owl, 9. Blue turbit.

তা অবশ্যই দেখতে হবে। নতুবা এরূপ পরিকল্পনা জনসাধারণের সমর্থন কখনই পাবেনা।

ভরসার কথা এই যে, বন্য প্রাণী সংরক্ষণের ব্যাপারে এখন অনেকেই অধিকতর আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এইটুকুই তো যথেষ্ট নয়। এজন্য সুষ্ঠু ও ব্যাপক পরিকল্পনার প্রয়োজন। প্রথমেই একটি বিরাট এলাকা নিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে গাছপালা, ঝোপঝাড়, লতাগুল্ম লাগিয়ে এমন কৃত্রিম অরণ্যের সৃষ্টি করতে হবে, যা হুবহু প্রাকৃতিক অরণ্যের মতো না হলেও তার কাছাকাছি যেন হয়। তা'হলে প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় থাকবে, এবং পশু-পাখি কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি সব পরস্পরের উপর নির্ভর ক'রে সেখানে বেঁচে থাকার সুযোগ পাবে। খাদ্য-খাদক সম্পর্কের কথা বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে, কারও যাতে খাদ্যাভাব না হয়। তারপর দেখতে হবে, কোন্ প্রাণীর উপরে পরিবেশের প্রভাব কি রকম হচ্ছে। তাদের সংখ্যা বাড়ছে না কমছে, না অপরিবর্তিত থাকছে, আশেপাশের জনজীবনের উপরে তার কিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, সে-সব দেখার জন্যে অবিরাম গবেষণা চালাতে হবে। আর তারই উপরে নির্ভর ক'রে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন বা পরিবর্ধন অবশ্যই করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বিশেষভাবে বিবেচ্য। স্বল্প-বেতনভুক অশিক্ষিত বা স্বল্প-শিক্ষিত কর্মচারীদের উপরে এইসব অভয়ারণ্য পাহারা দেওয়ার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকলে চলেনা। কারণ, একটি বন্য প্রাণীর বিনিময়ে কয়েক হাজার টাকা পাওয়ার প্রলোভন জয় করা যার-তার পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্যে দরকার হবে উপযুক্ত ভাবে শিক্ষিত এমন সব কর্মী, যারা বন্য প্রাণী সংরক্ষণের গুরু-দায়িত্বকে গ্রহণ করবেন জীবনের এক মহান ব্রত হিসেবে,—যাদের কখনও উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করা যাবেনা, আর যাদের জ্ঞাতসারে কখনই বন্য প্রাণী সংহার করা সম্ভবপর হবেনা।

চোরা শিকারী অবৈধ সংহার-ক্রিয়া গোপনে সেরে যাতে পালাতে না পারে, সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। আর অপরাধী ধরা পড়লে, তার যাতে কঠোর সাজা হয়, তা-ও সকলকে দেখতে হবে। এজন্যে প্রয়োজন হ'লে আইনের শাসন আরও কঠোর করতে হবে। তবেই এই পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হবে, নতুবা নয়।

আমরা প্রকৃতির সন্তান। দেশের প্রতিটি নাগরিক যাতে প্রতিটি গাছপালা ও পশু-পাখি সম্পর্কে আরও মমতা অনুভব করেন এবং তাদের জীবন রক্ষা করার বিষয়ে আরও যত্নবান হন, এটাকে তার একটা নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করেন, সেটাও

চিত্র ৯৫। উচ্চ ফলনশীল সংকর-ধান।　　চিত্র ৯৬। উচ্চ-ফলনশীল সংকর-গম।

[ইউ. এস. আই. এস-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

চিত্র ৯৭
উন্নত মানের
সংকর-ভুট্টা

আমাদের দেখতে হবে। এর একমাত্র উপায় হ'ল, এ বিষয়ে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া, এবং জীব-বিজ্ঞান সম্পর্কে সকলকে আরও আগ্রহী ক'রে তোলা।

এদেশের নাগরিকদের এসব বিষয়ে সচেতন করার উদ্দেশ্য নিয়ে বর্তমান গ্রন্থটি রচনার কাজ শুরু করেছিলাম আজ থেকে প্রায় পনেরো বছর আগে। কিন্তু নানা কারণে লেখার কাজ বেশী দূর এগোয়নি। ইতিমধ্যে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীসমরজিৎ কর মহাশয়ের কয়েকটি রচনা পাঠ ক'রে এবিষয়ে আবার নতুন ক'রে ভাবতে শুরু করি, এবং পুনরায় একাজে প্রবৃত্ত হই। অনেকদিনের কঠোর পরিশ্রমের ফলে অবশেষে একাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হ'ল। এজন্য শ্রীকর ধন্যবাদার্হ। তবে আমার একান্ত দুর্ভাগ্য এই যে, উপযুক্ত প্রকাশকের সন্ধান পাওয়া আরও কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। তার কারণ, এরকম একটি বইয়ের এতো আর্থিক দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতে সকলেই দ্বিধাগ্রস্ত। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানির স্বত্বাধিকারী শ্রীঅরুণ পুরকায়স্থ মহাশয়ের সহযোগিতায় এতদিন পরে আমার পক্ষে পুস্তকটি প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল। এজন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এই বইয়ে আছে—বর্তমান জীব-জগতের সঙ্গে পরিচয়, জীবমণ্ডল, জৈবনিক প্রক্রিয়াসমূহ, ভিটামিন, হরমোন, প্রজননবিদ্যা, অভিব্যক্তিবাদ, জীবের ক্রমবিকাশ, অভিযোজন, মানুষের উদ্ভব প্রভৃতি বিষয়ে সর্বাধুনিক তথ্য ও তত্ত্বসমূহ। জীব-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে গবেষণার এই অতিদ্রুত-অগ্রসর যুগে, যে-সব কথা না জানলে যুগ থেকে পিছিয়ে পড়তে হয়, যে-সব কথা জানতে হ'লে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয় এবং অনেক পুঁথিপত্র ঘাঁটতে হয়, সে-সবই পরিবেশিত হয়েছে এই গ্রন্থে, অত্যন্ত সহজ ও সরল ভাষায়। আলোচনা সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে অজস্র চিত্র সংযোজিত হয়েছে—হাফ্‌টোন এবং রেখাচিত্র আছে প্রায় চারশ', তদুপরি বহুবর্ণ আর্ট-প্লেট নয়টি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এই পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ রচনাই ইতিপূর্বে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

লোকরঞ্জক বিজ্ঞানের এই গ্রন্থখানি পাঠ ক'রে বাংলাদেশের পাঠক-পাঠিকারা যদি কিছুমাত্র অনুপ্রাণিত হন, জীব-জগৎ সম্পর্কে আরও কৌতূহলী হয়ে ওঠেন এবং বন ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণের ব্যাপারে কিছুটা মনোযোগী হন, এটাকে তাদের এক নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করেন, তাহ'লেই বুঝবো যে, আমার এই শ্রম সার্থক হয়েছে। জীব-বিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী যে এই বই পড়ে যথেষ্ট উপকৃত হবে, সে-বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

চিত্র ৯৮। উন্নত মানের পেঁপে গাছ। [ইউ. এস্. আই. এস-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

চিত্র ৯৯। ভাল জাতের মেরিনো ভেড়া। [ইউ. এস্. আই. এস-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

এই গ্রন্থ রচনাকালে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক বন্ধুবর ডাঃ কালীময় ভট্টাচার্য। আরও যে-সব সহকর্মীর অকুণ্ঠ সাহায্য লাভে ধন্য হয়েছি, তাঁদের মধ্যে ডঃ (শ্রীমতী) ছবি বিশ্বাস, শ্রীতপেন্দ্রনাথ সেন এবং শ্রীসর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের সকলকেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কতকগুলি মূল্যবান আলোকচিত্র তুলে দিয়েছেন ঐ কলেজেরই অধ্যাপক ডাঃ প্রদীপ কুমার রাহা। এজন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য চিত্র পেয়েছি ইউনাইটেড স্টেট্স ইন্ফরমেশন সার্ভিস (United States Information Service) সংক্ষেপে ইউ. এস্. আই. এস.-এর সৌজন্যে। এজন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই সুযোগে স্টেট্সম্যান পত্রিকার কর্তৃপক্ষের কাছেও আমার ঋণ স্বীকার করছি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, প্রয়োজনের তাগিদে অনেকগুলি ছবি আমি নিজেই এঁকে নিয়েছি।

এই পুস্তক প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে এবং ব্লক প্রস্তুতির ব্যাপারে আন্তরিকভাবে সাহায্য করেছেন শ্রীসমীর বসু, শ্রীভোলানাথ রায় এবং শ্রীনিলয় মুখোপাধ্যায়। এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। পরিশেষে জানাই যে, এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাঠ ক'রে, প্রুফ সংশোধন ক'রে, এবং আরও নানাভাবে সাহায্য করেছে আমার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান শৈবাল কুমার গুহ। ওর সাহায্য না পেলে, আমার পক্ষে একাজ সম্পন্ন করা আরও কঠিন হ'ত।

চিত্র ১০০। ভাল জাতের ষাঁড়। সুপ্রজননের উদ্দেশ্যে সুইজারল্যাণ্ড থেকে আমদানী করা হয়েছে।
[ইউ. এস্. আই. এস্-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

প্রাণী সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে সাফল্যও অর্জন করেছেন। এর ফলে নানা অভিনব জাতের সংকর (Hybrid) উদ্ভিদ্, পশু ও পাখি আমরা পেয়েছি। এর নাম সঙ্করণ (Hybridization)।

প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলির নিপুণ নির্বাচন, বা বাছাই ক'রে নেওয়ার পদ্ধতি, কৃষিকাজে এখনও ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। মানুষ একদিকে যেমন বাঞ্ছনীয় পরিবর্তনগুলি বজায় রেখে পোক্ত করার চেষ্টা করে, অপরদিকে তেমনি অবাঞ্ছনীয় পরিবর্তনগুলির অপসারণে প্রয়াসী হয়। প্রজনবিদ্যার সুষ্ঠু প্রয়োগের ফলে এইভাবে পাওয়া যায় নতুন নতুন প্রজাতি, যেগুলি সবদিক দিয়েই আমাদের কাম্য। যেমন, মার্কিন উদ্যান-বিদ্যা বিশারদ লুথার বুরবাঙ্ক (১৮৪৯—১৯২৬) জেলিবৎ শাঁস-বিশিষ্ট আঁঠিহীন ফল উৎপন্ন করতে সক্ষম হন। শুধু তাই নয়, নানাপ্রকার

সূচীপত্র

চিত্র ১২৪। হংস-চঞ্চু ডাইনোসর (Duck-billed Dinosaur)-এর জীবাশ্ম। প্রাগৈতিহাসিক যুগে এরা এই পৃথিবীতে বিচরণ ক'রত।
[অ্যামেরিকান মিউজিয়াম অব ন্যাচার‍্যাল হিষ্টরিতে সংরক্ষিত।]

সংরক্ষিত হয়ে রয়েছে স্লেট বা কাদা-পাথরের স্তরে। এসবের মধ্যে জীবদেহের কোনো অংশ নেই, একথা সত্যি, তবুও এদের ফসিল বা জীবাশ্ম বলা হয়।

পঞ্চম পর্ব ঃ অভিব্যক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ

ষষ্ঠ পর্ব ঃ জীবের ক্রমবিকাশ

রঙীন চিত্র ঃ

চিত্র ১:৫। ব্রন্টোসরাস (Brontosaurus)-এর জীবাশ্ম। অতীতের অতিকায় ডাইনোসরদের অন্যতম হ'ল ব্রন্টোসরাস। এর নাকের ডগা থেকে লেজের প্রান্ত পর্যন্ত মাপ হ'ত প্রায় ৮০ ফুট। মানুষের একটি কঙ্কালের সঙ্গে তুলনা ক'রে দেখানো হয়েছে, এটি কত বড়! এরা প্রধানতঃ জলা জায়গায় বাস ক'রত এবং সেখানকার গাছপাতা আহার ক'রত। আজ অবধি এরূপ কোনো প্রাণীর জীবাশ্ম যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে পাওয়া যায়নি।
[অ্যামেরিকান মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিষ্টরিতে সংরক্ষিত।]

চিত্র ১৩৬। উটপাখি—এর ডানা এতো ছোট যে, নেই বললেই চলে।

চিত্র ১৩৭। কিউই পাাখ—এর ডানা এতো অপুষ্ট যে দেখাই যায় না, পালকের নীচে ঢাকা থাকে।

চিত্র ১৩৮। কয়েকটি প্রাণীর সম্মুখের এবং পশ্চাতের প্রত্যঙ্গ (অস্থি) তুলনা ক'রে দেখানো হয়েছে। [উপরে—সম্মুখের প্রত্যঙ্গ, নীচে—পশ্চাতের প্রত্যঙ্গ।] [W= wrist=কব্জি, A=ankle=গোড়ালি।] 1. মানুষ, 2. সিংহ, 3. নেকড়ে বাঘ, 4. হাঁস, 5. শকুন, 6. বাদুড়, 7. কুমীর, 8. তিমি, 9. সীল, 10. হালিবাট মাছ।
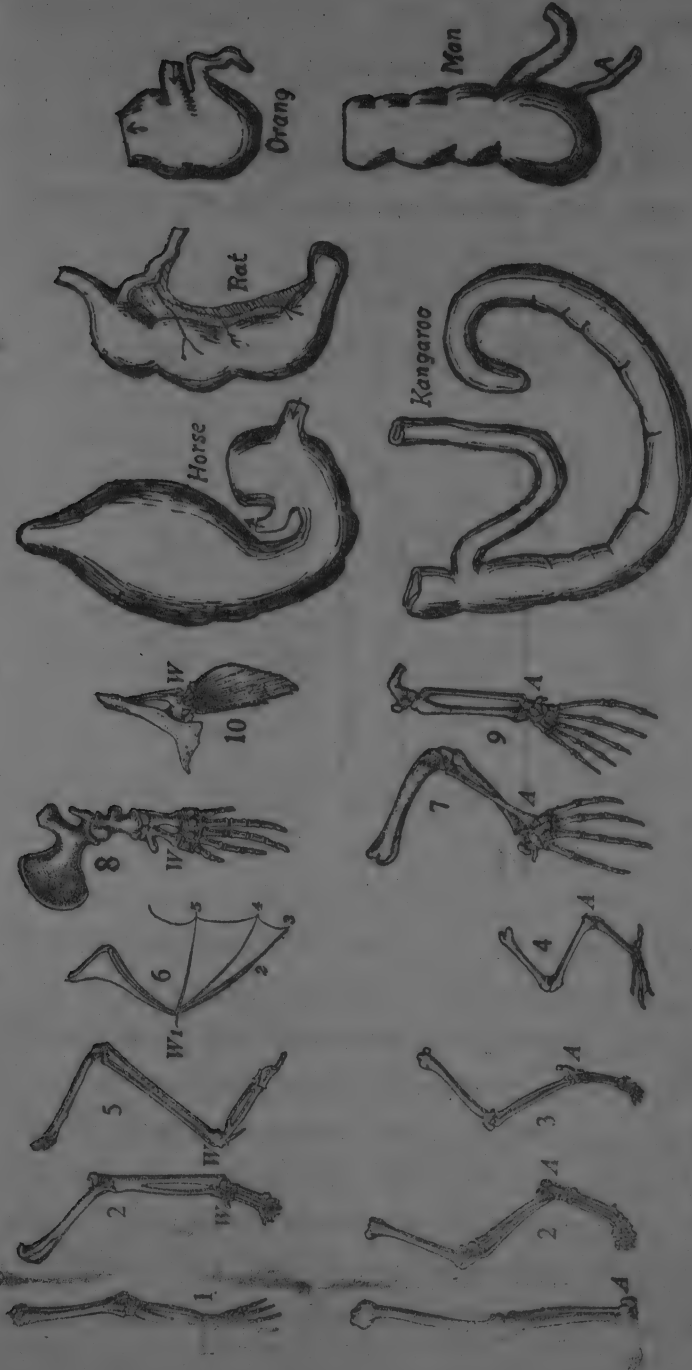
চিত্র ১৩৯। মানুষের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অন্ত্রের সংযোগ-স্থলে আছে নিষ্ক্রিয় 'অ্যাপেন্‌ডিক্স' (Appendix), আর অন্যান্য তৃণভোজী প্রাণীর দেহে রয়েছে সক্রিয় 'সিকাম্‌' (Cæcum)।

প্রথম পর্ব

উপক্রমণিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বর্তমান জীব-জগতের সঙ্গে পরিচয়

মহাকাশে অগণিত তারকা, তার মাঝে একটি হ'ল আমাদের চির পরিচিত সূর্য। আর সূর্যকে কেন্দ্র ক'রে তার চারিদিকে অবিরাম আবর্তিত হচ্ছে কয়েকটি গ্রহ। পৃথিবীও একটি গ্রহ। কিন্তু সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা, অসংখ্য জীবজন্তু আর পাখিতে ভরা, এমন সুন্দর গ্রহ আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। সুদূর মহাকাশের প্রত্যন্ত প্রদেশে অন্য কোন নক্ষত্রলোকে কি আছে, তা আমাদের জানা নেই। তবে সৌরজগতের অন্য কোন গ্রহে পৃথিবীর মতো কোন গাছপালা বা জীবজন্তু থাকবার সম্ভাবনা যে নেই, এবিষয়ে বিজ্ঞানীরা এখন প্রায় নিশ্চিত। এজন্য হপ্‌কিন্‌স বলেছেন,—The advent of life is the most improbable and the most significant event in the history of the universe.

আমেরিকার জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি ফিলিপ হ্যাণ্ডলার আন্দাজ করেছেন যে, এই পৃথিবীতে অন্ততঃ পঞ্চাশ লক্ষ থেকে এক কোটি রকমের উদ্ভিদ্ ও প্রাণী আছে। এতো রকম উদ্ভিদ্ আর প্রাণীর দেহ-গঠন আর তাদের দেহের ভিতরের যন্ত্রপাতির কার্যকলাপ সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা খুবই কঠিন। তাই তাদের শ্রেণীবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা বিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করেছেন অনেক দিন আগে থেকেই।

চিত্র ১৪৪। আফ্রিকার সিংহ।

চিত্র ১৪৫। আফ্রিকার গণ্ডার।
[শিল্পী—শ্রীতরুণ গুহ]

সুইডিশ বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস (Carolus Linnæus) ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৩৫ বছর বয়সে আপ্‌সালা বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদ্‌বিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সেখানকার 'বোটানিক্যাল গার্ডেন' (Botanical Garden) বা উদ্ভিদ্‌-উদ্যান দেখাশোনার দায়িত্বও তাঁকেই নিতে হয়।

এই সময় তিনি অনেক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, এবং সেগুলির মধ্যে দিয়ে তিনিই সর্বপ্রথম সমগ্র উদ্ভিদ্ ও প্রাণী-জগৎকে শ্রেণীবিভক্ত ক'রে সুসংবদ্ধ ভাবে পর্যালোচনা করার এক নতুন পদ্ধতি প্রচলন করেন। এরই উপর ভিত্তি ক'রে পরবর্তীকালের বিজ্ঞানীরা একাজ আরও সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদন করেছেন। অবশ্য কেবলমাত্র পুংকেশর এবং গর্ভপত্রের সংখ্যার উপর নির্ভর ক'রে উদ্ভিদ্-জগৎকে শ্রেণীবিভক্ত করার যে প্রস্তাব তিনি করেন, তা ছিল খুবই কৃত্রিম, এবং সঙ্গত কারণেই পরবর্তীকালে তা পরিত্যক্ত হয়। তবুও তিনিই সর্বপ্রথম উদ্ভিদ্ ও প্রাণি-সমূহের শ্রেণী-বিন্যাসের প্রধান প্রধান নীতিগুলি নির্ধারণের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

চিত্র ১। ক্যারোলাস লিনিয়াস

প্রকৃতপক্ষে তিনিই সর্বপ্রথম গণ (Genus) ও প্রজাতি (Species), বর্গ (Order) ও গোত্র (Family) প্রভৃতির সংজ্ঞা দেন। তাছাড়া তিনিই সর্বপ্রথম দ্বিপদ-বিশিষ্ট নামমালা (Binomial system of Nomenclature) প্রবর্তন ক'রে জীবন-বিজ্ঞানের আলোচনা আরও সুস্পষ্ট এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য ক'রে তোলেন।†

সাধারণতঃ দু'টি ল্যাটিন শব্দের সাহায্যে একটি উদ্ভিদের বা প্রাণীর নামকরণ হয়ে থাকে। প্রথমটি দ্বারা গণ (Genus) এবং দ্বিতীয়টি দ্বারা প্রজাতি (Species) বুঝানো হয়, যেমন—বটগাছের নাম *Ficus benghalensis*, আবার কুনো ব্যাঙের

† লিনিয়াসের বিখ্যাত গ্রন্থ "সিষ্টেমা নাটুরী' (Systema Naturæ) সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে। তবে ১৭৫৮ সালে এর দশম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পরে তিনি বিজ্ঞান-জগতে স্বীকৃতি লাভ করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে সেণ্টপিটার্সবুর্গের রাজকীয় বিজ্ঞান আকাদমী উদ্ভিদের যৌনতা সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য একটি পুরস্কার ঘোষণা করেন। "উদ্ভিদের যৌনতা সম্পর্কে আলোচনা" প্রবন্ধটির জন্যে লিনিয়াস এই পুরস্কারে সম্মানিত হন।

চিত্র ১৪৬। ভারতীয় সিংহ।
[ইউ. এস্. আই. এস-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

চিত্র ১৪৭। -ভারতীয় গণ্ডার।
[আলোকচিত্র-শিল্পী— ডাঃ প্রদীপ কুমার রাহা।]

নাম *Bufo melanosticus*, ইত্যাদি। এই দ্বিপদ নাম সর্বদা বাঁকা অক্ষরে (*Italics*) লেখা হয়ে থাকে।

লিনিয়াস প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে বিজ্ঞানীরা এখন সব রকম উদ্ভিদ্ ও প্রাণীকে মোটামুটি ভাবে শ্রেণীবিভক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। এর ফলে জীববিদ্যার চর্চা এখন আগের চেয়ে অনেক সহজসাধ্য হয়েছে। এই শ্রেণীবিভাগ কিভাবে করা হয়েছে তাই এখন বুঝিয়ে বলছি।

ধরা যাক, ছোট্ট একটি ছেলে তার বাবার হাত ধ'রে বেড়াতে বেরিয়েছে। তার কৌতূহল সীমাহীন। সে যা-কিছু দেখছে, সে বিষয়েই প্রশ্ন করছে। এটা কী? এটা একটা গাছ। ওটা কী? ওটা একটা কুকুর। এদিকে এটা কী? এটা একটা বিড়াল। ওটা কী? ওটা একটা পাখি—ইত্যাদি।

চিত্র ২। নানাপ্রকার গৃহপালিত কুকুর—1. ব্লাড-হাউণ্ড (**Blood-hound**), 2. গ্রে-হাউণ্ড (**Grey-hound**), 3. বুল-ডগ (**Bull-dog**), 4. ফক্স-হাউণ্ড (**Fox-hound**), 5. ককার (**Cocker**), 6. মাস্টিফ (**Mastiff**), 7. কোলী (**Collie**), 8. শীপ-ডগ (**Sheep-dog**), 9. বুল্-টেরিয়ার (**Bull-terrier**), 10. আল্‌সেশিয়ান (**Alsatian**)।

তারপর দুই আমেরিকা পশ্চিম দিকে সরে গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়, আর পূর্ব এবং পশ্চিম-গোলার্ধের মধ্যে রচিত হয় বিরাট অ্যাটলান্টিক বেসিন। এদিকে আফ্রিকা উপরদিকে সরে যায়, ভারত ছুটে গিয়ে এশিয়ার নিম্নভাগে ধাক্কা মারে, অস্ট্রেলিয়া অ্যান্টার্কটিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বর্তমান অবস্থানে সরে আসে, আর সেই সঙ্গে নিউগিনিকে আরও উপরে ঠেলে দেয়।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, আজ যেখানে হিমালয় পর্বতমালা অবস্থিত, সেখানে একদিন টেথিস (Tethys) মহাসাগরের জলতরঙ্গ উচ্ছলিত হ'ত। পূর্বদিকে পূর্ব

চিত্র ১৪৮। আফ্রিকার হাতি।

কিন্তু এই ছেলেটি যখন বড় হবে, তখন সে বুঝবে যে, শুধু গাছ বলাই যথেষ্ট নয়। প্রথমে বলতে হবে, সপুষ্পক দ্বি-বীজপত্রী উদ্ভিদ্; তারপর বলতে হবে আম গাছ। তার জ্ঞান যখন আরও বাড়বে, তখন সে বুঝবে যে, বিভিন্ন আমগাছের মধ্যেও পার্থক্য আছে, যেমন—বোম্বাই, ল্যাংড়া, ফজলি, ইত্যাদি। তেমনি শুধু কুকুর বললেই চলবে না, কারণ কুকুর নানা প্রকার (Varieties), যেমন—ব্লাড-হাউণ্ড, গ্রে-হাউণ্ড, বুল্-ডগ, ফক্স-হাউণ্ড, স্প্যানিয়েল ইত্যাদি। এদের মধ্যে সাদৃশ্য যেমন আছে, বৈসাদৃশ্যও তেমনি আছে। এইসব বিচার ক'রেই উদ্ভিদ্ বা প্রাণীকে নানাভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা হয়।

এইরূপ শ্রেণী-বিন্যাসের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ দু'টি—(১) এর ফলে জ্ঞানার্জন আরও সহজ ও সুবিধাজনক হয়, এবং (২) উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর শ্রেণী-বিন্যাস এমনভাবে করা যায় যে, অভিব্যক্তির ফলে ধাপে ধাপে প্রাচীন সরলতম উদ্ভিদ্ বা প্রাণী থেকে অতি জটিল ও উন্নত ধরনের উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর উদ্ভব কিভাবে ঘটেছে, সে-বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হয়।

বিজ্ঞানীদের কাছে শ্রেণীবিভাগের একক (unit) হ'ল **প্রজাতি** (species)। প্রজাতি বলতে সাধারণতঃ এমন এক গোষ্ঠীর জীব (উদ্ভিদ্ বা প্রাণী) বোঝায়, যারা স্বাভাবিকভাবে পরস্পর যৌন-পদ্ধতিতে বংশ-বিস্তার করতে সক্ষম, কিন্তু যারা সাধারণতঃ অন্য প্রজাতির কোনো জীবের (উদ্ভিদের বা প্রাণীর) সঙ্গে যৌন-জননে অক্ষম। একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত সকল জীবের মধ্যে অনেকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য (common characteristics) লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সকল দেশের সবরকম আমগাছ একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। তেমনি সমস্ত বটগাছ, সমস্ত অশ্বত্থগাছ, সমস্ত ডুমুরগাছ প্রভৃতি নিয়ে পৃথক্ পৃথক্ প্রজাতি গড়ে উঠেছে। আবার প্রাণীদের মধ্যে সমস্ত কুকুর, সমস্ত বাঘ, সমস্ত সিংহ, সমস্ত বিড়াল প্রভৃতি এক-একটি পৃথক্ প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। তেমনি পৃথিবীর সকল দেশের সব মানুষ একই প্রজাতির অন্তর্গত। বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা অনুযায়ী, প্রজনন-বিচ্ছিন্ন একই আকৃতির এবং প্রকৃতির জীব-গোষ্ঠীকে এক-একটি প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[†]

আবার কতকগুলি প্রজাতির মধ্যে যখন বিশেষ রকমের সাদৃশ্য দেখা যায়, তখন তাদের নিয়ে এক-একটি **গণ** (Genus) গঠন করা হয়। যেমন, বট (*Ficus*

[†] উল্লেখ্য যে, একই প্রজাতিভুক্ত সকল জীবের কোষে ক্রোমোসোমগুলির আকৃতি, প্রকৃতি এবং সংখ্যা একই রকম থাকে, যদিও তাদের রাসায়নিক গঠনে কিছু অদল-বদল হওয়া বিচিত্র নয়।

চিত্র ১৫৮। পুরুষ ধাত্রী-ব্যাঙ।

চিত্র ১৫৯। বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই মুরগি ডানা মেলে দেয়, আর বাচ্চারা দৌড়ে এসে তার নীচে আশ্রয় নেয়।

চিত্র ১৬০। পেঙ্গুইন পাখি বাস করে বরফের দেশে। সদ্যোজাত বাচ্চার পক্ষে সেখানকার তীব্র শীত উপেক্ষা ক'রে বেঁচে থাকা কঠিন। তাই সে সব সময় মায়ের পায়ের পাতার উপরে ভর ক'রে বসে থাকে। এইভাবে মা তাকে রক্ষা করে এবং প্রয়োজন মত আহার যুগিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখে।

benghalensis), অশ্বত্থ (*Ficus religiosa*), ডুমুর (*Ficus cariça*) প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ প্রজাতির উদ্ভিদ, কিন্তু এদের পুষ্প-বিন্যাসে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে, তাই এদের একই গণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ; যেমন—ফিকাস্ (*Ficus*)। তেমনি বাঘ (*Panthera tigris*) ও সিংহ (*Panthera leo*) বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী হলেও, এদের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকায়, এদের একই গণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ; যেমন—প্যান্থেরা (*Panthera*)।

অনুরূপভাবে, কতকগুলি বিভিন্ন গণের অন্তর্গত জীবের (উদ্ভিদের বা প্রাণীর) মধ্যে যখন বিশেষ রকমের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, তখন তাদের নিয়ে একটি **গোত্র** (Family) গঠন করা হয়। যেমন, সরিষা ও মূলা যথাক্রমে ব্র্যাসিকা (*Brassica*) ও র‍্যাফানুস (*Raphanus*) নামক দু'টি পৃথক্ গণের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু এদের ফুলের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকায়, এদের একই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ; যেমন—ক্রুসিফেরী (Cruciferæ)। অনুরূপভাবে, বাঘ ও সিংহ এক গণের (*Panthera*) আর বিড়াল অন্য গণের (*Felis*) প্রাণী, কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে সাদৃশ্য থাকায় এদের একই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ; যেমন—ফেলিডী (Felidæ)।
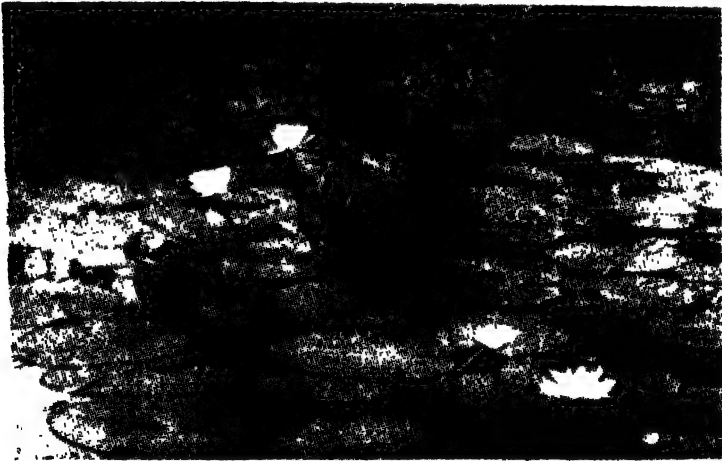
চিত্র ৩। শ্বেতোৎপল (বা কুমুদ, বা শালুক)—নিম্ফিয়া অ্যালবা *(Nymphæa alba)*
[আলোকচিত্র-শিল্পী—শ্রীবিধীন ভট্টাচার্য]

একইভাবে সাদৃশ্যযুক্ত গোত্রগুলিকে একই বর্গের (Order), অনুরূপ বর্গগুলিকে একই শ্রেণীর (Class) এবং অনুরূপ শ্রেণীগুলিকে একই পর্বের (Phylum) অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

চিত্র ১৬১। টি-টি পাখি (Tit—small lark-like bird) তার বাচ্চাদের রাক্ষুসে খিদে মেটাবার জন্যে সারাদিন প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে।

চিত্র ১৬২। ম'-পেলিক্যান তার ঠোঁটের থলির মধ্যে ক'রে মাছ নিয়ে বাসায় ফিরছে, ক্ষুধার্ত বাচ্চাদের খাওয়াবে ব'লে।

একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ফেলিডী (Felidæ) গোত্রের অন্তর্গত প্রাণীদের (যেমন—বাঘ, সিংহ, বিড়াল ইত্যাদি) মুখের গড়ন অনেকটা বিড়ালের মতো (গোলাকার), পায়ে ধারালো নখর আছে, কিন্তু সেই নখর ইচ্ছামত থাবার মধ্যে গুটিয়ে নিতে পারে, তাছাড়া থাবা গদির মতো ব'লে এরা নিঃশব্দে চলাফেরা করতে পারে। অপরদিকে ক্যানিডী (Canidæ) গোত্রের অন্তর্গত প্রাণীদের (যেমন—কুকুর, শিয়াল, নেকড়ে, ইত্যাদি) মুখের গড়ন অনেকটা কুকুরের মতো (লম্বাটে), পায়ে ধারালো নখর আছে, কিন্তু তা থাবার মধ্যে গুটিয়ে নিতে পারে না। কিন্তু এদের সকলকেই একই বর্গের (Order) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, এর নাম 'কারনিভোরা' (Carnivora)। কারণ, এদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এইরূপ—এদের দাঁত তীক্ষ্ণ, শ্বদন্ত বা ছেদক দাঁত (canine) বড় এবং সুগঠিত, সে তুলনায় সামনের কৃন্তক (incisor)-গুলি ছোট, পায়ে ধারালো নখর আছে, পদাঙ্গুলির (toes) সংখ্যা কখনও চারের কম হয় না, ইত্যাদি।

চিত্র ৪। গৃহপালিত বিড়াল—ফেলিস্ ডোমেস্‌টিকা *(Felis domestica)* [আলোকচিত্র-শিল্পী—ডাঃ প্রদীপকুমার রাহা]

অনুরূপভাবে, কারনিভোরা (Carnivora), প্রাইমেট (Primate), ইডেন্‌টাটা (Edentata), রোডেনটিয়া (Rodentea), সিটেসিয়া (Cetacea) প্রভৃতি বর্গগুলি নিয়ে গঠিত হয়েছে স্তন্যপায়ী (Mammalia) শ্রেণী (Class)। আবার, মাছ (Pisces), উভচর (Amphibia), সরীসৃপ (Reptilia), পাখি (Aves) ও স্তন্যপায়ী (Mammalia) শ্রেণীগুলি নিয়ে গঠিত হয়েছে কর্ডাটা (Chordata) পর্ব (Phylum)।

এইরূপ শ্রেণীবিভাগের ফলে কোনো উদ্ভিদ্ বা প্রাণী কোন্ শ্রেণীর, কোন্ গণের এবং কোন্ প্রজাতির অন্তর্গত, তা জেনে নিলেই তার দেহ-গঠন এবং দেহের ভিতরে
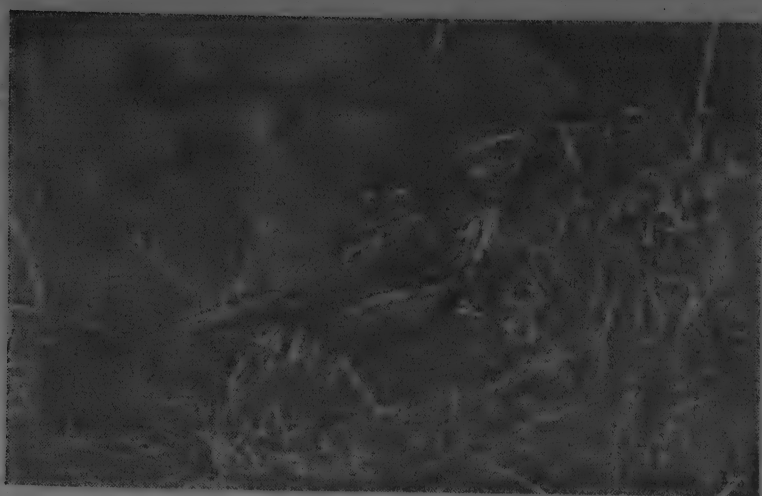
চিত্র ১৬৩। চড়াই পাখি তার বাচ্চাদের খাওয়াবার জন্যে সারাদিন ব্যস্ত থাকে।

চিত্র ১৬৪। অপোসামের বাচ্চাগুলি মায়ের পিঠে উঠে লোম আঁকড়ে ধরে ঝুলে থাকে, আর মা সব সময় তাদের পিঠে ক'রে বয়ে বেড়ায়। বাচ্চাদের নিরাপত্তার এ এক বিচিত্র ব্যবস্থা।

মাঝে আঠা দিয়ে আটকে রাখে, এবং পরে শুক্রাণু নির্গত ক'রে তাদের নিষেক ঘটায়। শুধু তাই নয়, বাচ্চা হওয়া পর্যন্ত তাদের সযত্নে রক্ষা করে। আবার, স্ত্রী-পাইপা (Pipa) ব্যাঙ, ডিমগুলি চামড়ার ছোট ছোট গর্তের মধ্যে রেখে দেয়। সেখানেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। অপোসামের বাচ্চাগুলি মায়ের পিঠে উঠে

যন্ত্রগুলি কিভাবে কাজ করছে তা আমরা জানতে পারবো। তবে কোনো উদ্ভিদ্ বা প্রাণীকে চেনাতে হলে, সাধারণতঃ তার গণ (Genus) এবং প্রজাতি (Species) এই দু'টিরই শুধু উল্লেখ করা হয়ে থাকে। যেমন, শ্বেতোৎপল (বা কুমুদ, বা শালুক)-এর বৈজ্ঞানিক নাম হ'ল 'নিম্ফিয়া অ্যাল্বা' (*Nymphæa alba*), আর গৃহপালিত বিড়ালের বৈজ্ঞানিক নাম 'ফেলিস্ ডোমেস্টিকা' (*Felis domestica*)। এদের শ্রেণীবিভাগ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ নীচে দেওয়া হ'ল।

			Plant (উদ্ভিদ্)		**Animal (প্রাণী)**
1.	Phylum	...	Spermatophyta	...	Chordata
	(পর্ব)	...	(স্পার্মাটোফাইটা)	...	(কর্ডাটা)
2.	Sub-phylum	...	Angiosperm	...	Cephalochordata
	(উপ-পর্ব)	...	(অ্যাঞ্জিওস্পার্ম)	...	(সিফালোকর্ডাটা)
3.	Class	...	Dicot	...	Mammalia
	(শ্রেণী)	...	(ডাইকট)	...	(ম্যামালিয়া)
4.	Order	...	Ranales	...	Carnivora
	(বর্গ)	...	(র‍্যানালিস)	...	(কারনিভোরা)
5.	Family	...	Nymphæaceæ	...	Felidæ
	(গোত্র)	...	(নিম্ফিয়াসিয়ী)	...	(ফেলিডী)
6.	Genus	...	*Nymphæa*	...	*Felis*
	(গণ)	...	(নিম্ফিয়া)	...	(ফেলিস্)
7.	Species	...	*Alba*	...	*Domestica*
	(প্রজাতি)	...	(অ্যাল্বা)	...	(ডোমেস্টিকা)
	Common name	...	White water-lily	...	Domestic cat
	(সাধারণ নাম)	...	(শ্বেতোৎপল, কুমুদ, শালুক)	...	(গৃহপালিত বিড়াল)

একটি উদ্ভিদ্ বা প্রাণীকে দেখে তাকে চিনতে শেখাই হ'ল তার সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের প্রথম ধাপ।

উদ্ভিদ্-জগৎ ঃ

উদ্ভিদ্-জগৎকে প্রধানতঃ দু'টি ভাগে (Phylum) ভাগ করা হয়েছে। যাদের ফুল

চিত্র ১৬৭। গরু-বাছুর দাঁড়িয়ে আছে। বাছুরটি মায়ের আদর পাওয়ার জন্যে পাগল।
[আলোকচিত্র-শিল্পী—ডাঃ প্রদীপ কুমার রাহা]

চিত্র ১৬৮। মা-গণ্ডার তার বাচ্চাকে আদর করছে।
[ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

হয় না, তাদের অপুষ্পক উদ্ভিদ্ (Cryptogams) **বলা হয়** ; **আর যাদের ফুল হয়, তাদের বলা হয় সপুষ্পক উদ্ভিদ্** (Phanerogams or Spermatophyta)।

I. **অপুষ্পক উদ্ভিদ্** (**Cryptogams**) **:**

(১) **থ্যালোফাইটা** (**Thalloplyta ;** ***Thallus*=সমাঙ্গদেহ, *phyton*=উদ্ভিদ্**) **বা সমাঙ্গদেহী**—এরাই সবচেয়ে নিম্নস্তরের উদ্ভিদ্। এদের দেহের জটিলতা সবচেয়ে কম, এবং এদের দেহ আগাগোড়া প্রায় একই রকম। অর্থাৎ, এদের দেহে মূল, কাণ্ড এবং পাতা আলাদাভাবে বোঝা যায় না। এই জাতীয় উদ্ভিদ্ প্রধানতঃ দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(ক) **অ্যাল্‌গি** (**Algae**) **বা শৈবাল** (**বা, পিচ্ছিল শেওলা**)—যেখানেই বেশী জল পড়ে, যেমন—কলতলা, পুকুরঘাট কিংবা বাড়ির উঠান বা ছাত, সেখানেই শেওলা পড়ে পিছল হয়। অর্থাৎ যেখানেই জল আছে, সেখানেই পিচ্ছিল শেওলাও আছে। তবে অধিকাংশ শেওলারই আবাসস্থল হ'ল সমুদ্র। এদের কেউ একটি মাত্র কোষ দিয়ে তৈরি, আবার কেউ অনেকগুলি কোষের সমষ্টি। তবে সকলেরই দেহের গঠন খুব সরল। এদের কারুরই শিকড় নেই, ডালপালা, পাতা, ফুল, ফল ইত্যাদিও কিছুই নেই। সবরকম শেওলার মধ্যেই সবুজ ক্লোরোফিল আছে, তাই তারা সূর্যের আলোর সাহায্যে জল ও বাতাসের উপাদান দিয়ে সরাসরি নিজেদের খাদ্য নিজেরাই তৈরি ক'রে নিতে পারে। শেওলাই হ'ল পৃথিবীর আদিম উদ্ভিদ্। এদের প্রথম আবির্ভাব ঘটে সমুদ্রের জলে। স্পাইরোগাইরা (Spirogyra), ফিউকাস (Fucus) প্রভৃতি এজাতীয় উদ্ভিদ্।

(খ) **ফাঙ্গি** (**Fungi**) **বা ছত্রাক**—ছত্রাক অনেক রকমের হয়। ছত্রাকের দেহ-গঠনও শেওলার মতই সরল। ছত্রাক কখনও সবুজ হয় না। এদের দেহে ক্লোরোফিল থাকে না, তাই এরা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে না। এরা পরভোজী। এরা কেউ মৃতজীবী (Saprophyte)—বাসি, পচা রুটি, ফল, গোবর, চামড়া প্রভৃতির উপরে বাস করে, আর কেউ বা জীবন্ত উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর দেহে পরজীবী (Parasite) হিসেবে বাস করে, এবং সেখান থেকেই প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করে। নানাপ্রকার ব্যাক্‌টিরিয়া (Bacteria), ঈস্ট (Yeast), মিউকর (Mucor) প্রভৃতি এজাতীয় উদ্ভিদ্।

[এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, অনেক সময় বড় গাছের গায়ে, কিংবা পাথরের গায়ে, একরকম উদ্ভিদ্ জন্মায়, তার নাম লাইকেন (Lichens)। লাইকেন যেন শেওলা

চিত্র ১৬৯। শাবকসহ জিরাফ। [শিল্পী—শ্রীতরুণ গুহ]

চিত্র ১৭০। শাবকসহ হস্তিনী। [শিল্পী—শ্রীতরুণ গুহ]

ও ছত্রাকের মাঝামাঝি একরকম উদ্ভিদ্। এদের দেহের মাঝে মাঝে সবুজ ক্লোরোফিলযুক্ত কোষগুলি ছড়ানো থাকে। এই সবুজ অংশ অসবুজ অংশের জন্যও খাদ্য তৈরি করে। আবার অসবুজ অংশটি অসময়ে সবুজ অংশকে বাঁচিয়ে রাখে। মেরু-অঞ্চলে, যেখানে কোনো গাছই বাঁচতে পারে না, সেখানেও লাইকেন জন্মায়।]

(২) **ব্রাইওফাইটা** (**Bryophyta** ; *Bryon*=মস্, বা, সবুজ শেওলা, *Phyton*=উদ্ভিদ্) **বা মস্‌বর্গ**—কুয়োর ধারে, বা ভিজে দেওয়ালে, সবুজ গলিচার মতো যে শেওলা দেখা যায়, তাকেই মস্ (Moss) বলে। সাধারণতঃ ভিজে এবং স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় এরা জন্মায়। এদের কাণ্ড ও পাতা থাকে, কিন্তু সাধারণ গাছের মতো শিকড় থাকে না। মূলের পরিবর্তে একরকম অঙ্গ থাকে, তাদের রাইজয়েড বলে। এদের ডালপালা নেই, ফুল-ফলও নেই। পৃথিবীর ডাঙ্গায় মস্-জাতীয় উদ্ভিদই প্রথম জন্মায়। মস্ (Moss), মারকেন্‌সিয়া (Marchantia), রিক্সিয়া (Riccia) প্রভৃতি এজাতীয় উদ্ভিদ্।

(৩) **টেরিডোফাইটা** (**Pteridophyta ;** *Pteris*=পালক, *Phyton*= উদ্ভিদ্) **বা ফার্নবর্গ**—সাধারণতঃ বন-জঙ্গলের ছায়াঘেরা ঠাণ্ডা ও স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় এরকম গাছ দেখা যায়। সাধারণ গাছপালার মতো এদেরও মূল, কাণ্ড ও পাতা থাকে, কিন্তু তাদের মতো ফুল, ফল বা বীজ হয় না। অপুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে এরাই সবচেয়ে উন্নত স্তরের। এদের দেহে সংবহন-কলার (Vascular tissue) উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাণ্ড মাটির নীচে থাকে, পাতাই শুধু মাটির উপরে থাকে। ফার্ন গাছের পাতা ভারি সুন্দর দেখতে। আজ থেকে প্রায় পঁচিশ কোটি বছর আগে, পৃথিবীটা বিরাট আকারের (পঞ্চাশ-ষাট ফুট উঁচু) অসংখ্য ফার্ন গাছে ভর্তি ছিল। প্রধানতঃ তাদের দেহাবশেষ থেকেই মাটির নীচে কয়লা তৈরি হয়েছে। ফার্ন (Fern), শুশনি শাক (Marilea), লাইকোপোডিয়াম (Lycopodium) প্রভৃতি এজাতীয় উদ্ভিদ্।

II. সপুষ্পক উদ্ভিদ্ (Phanerogams or Spermatophyta) :

আমরা সচরাচর যে-সব গাছপালা দেখতে পাই, তাদের সকলেরই ফুল ও বীজ হয়। এদের প্রধানতঃ দু'ভাগে (Sub-phylum) ভাগ করা হয়েছে—**ব্যক্তবীজী** (বা, **নগ্নবীজী**) এবং **গুপ্তবীজী**।

(১) **জিম্‌নোস্পার্ম (Gymnosperms ;** *Gymnos*=নগ্ন, *Sperma*= বীজ) **বা ব্যক্তবীজী (বা, নগ্নবীজী)**—এদের ফল হয় না, বীজ অনাবৃত

চিত্র ১৭১। শাবকসহ জেব্রা। [শিল্পী—শ্রীতরুণ গুহ]

চিত্র ১৭২। বাঘিনী তার সন্তানদের অত্যন্ত স্নেহ করে এবং বিপদ-আপদে তাদের রক্ষা করে ।
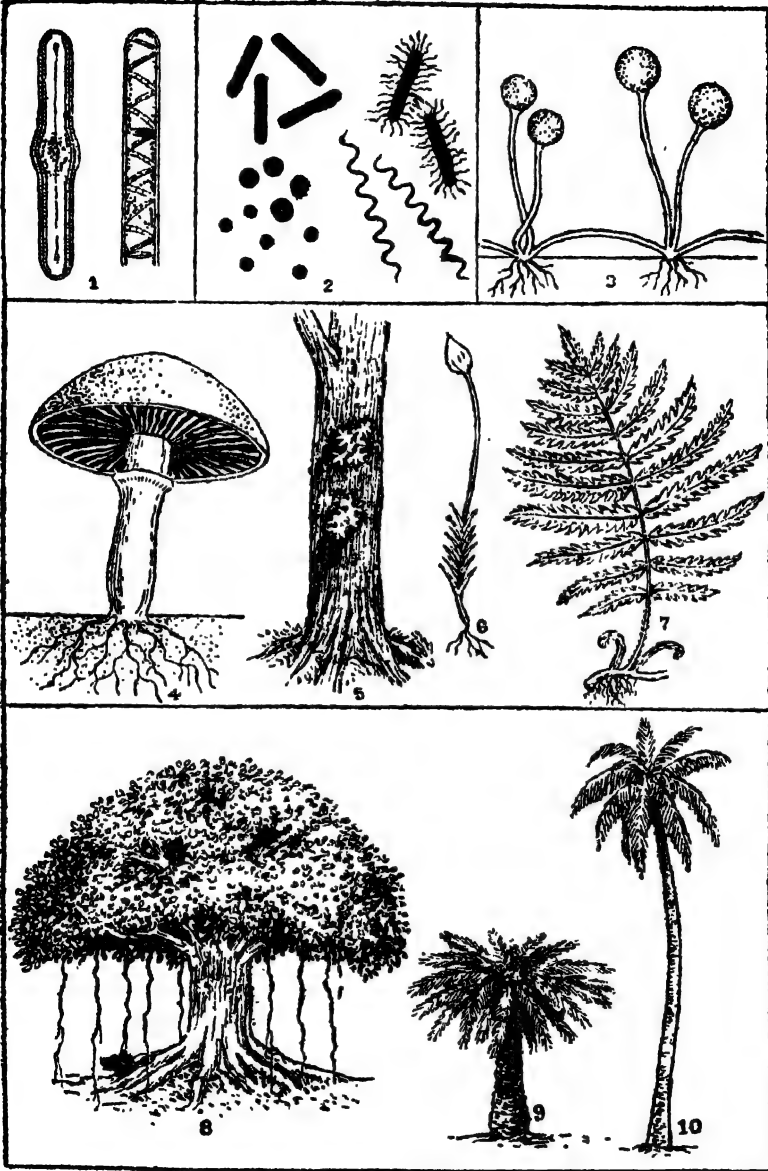
চিত্র ৫। নানাপ্রকার উদ্ভিদ্—1. দু'রকম শ্যাওলা – ডায়াটম ও স্পাইরোগাইরা, 2. কয়েক রকম জীবাণু, 3. পাউরুটির উপর ছাতা (মিউকর), 4. ব্যাঙের ছাতা, 5. গাছের গুঁড়িতে লাইকেন, 6. মস্, 7. ফার্ন, 8. বটগাছ (দ্বি-বীজপত্রী), 9. সাইকাস (জিম্নোস্পার্ম বা ব্যক্তবীজী), 10. নারকেল গাছ (এক-বীজপত্রী)।

চিত্র ১৭৩। একটি সুন্দর ও সুখী পরিবার। এই পরিবারে আছে, একটি সিংহ, দু'টি সিংহী এবং দু'টি শাবক। বাচ্চার গায়ে চাকা চাকা দাগ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। উল্লেখ্য যে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই দাগ ক্রমশ মিলিয়ে যায়।

[শিল্পী—শ্রীতরুণ গুহ]

অবস্থায় বাইরের দিকে থাকে। সপুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে এরাই সবচেয়ে নিম্নস্তরের; যেমন—সাইকাস (Cycus), পাইন (Pine), সাইপ্রেস (Cypress), লার্চ (Larch), ফার (Fir) ইত্যাদি।

(২) **অ্যান্‌জিওস্পার্ম (Angiosperms ; *Angion*=আধার, *Sperma* =বীজ) বা গুপ্তবীজী**—এরূপ গাছে ফল হয়, এবং ফলের মধ্যে বীজ আবদ্ধ থাকে। এরাই সবচেয়ে উন্নত ধরনের উদ্ভিদ, আর এরকম গাছের সংখ্যাই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী। বীজের মধ্যে অবস্থিত বীজপত্রের সংখ্যানুসারে এদের আবার দু'টি শ্রেণীতে (Class) ভাগ করা হয়েছে; যেমন—

(ক) **মনোকটিলিডনাস (Monocotyledonous ; *Mono*=এক, *Cotyledon*=বীজপত্র) বা এক-বীজপত্রী**—এরূপ উদ্ভিদের বীজে একটিমাত্র বীজপত্র থাকে; যেমন—ধান, গম, ভুট্টা প্রভৃতি বর্ষজীবী উদ্ভিদ, আর নারকেল, সুপারি, তাল প্রভৃতি বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ্।

(খ) **ডাইকটিলিডনাস (Dicotyledonous ; *Di*=দ্বি বা দুই, *Cotyledon*=বীজপত্র) বা দ্বি-বীজপত্রী**—এরূপ উদ্ভিদের বীজে দু'টি ক'রে বীজপত্র থাকে; যেমন—মটর, ছোলা, শিম, আম, তেঁতুল, বট, রেঁড়ি ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত প্রত্যেক শ্রেণীর উদ্ভিদ্‌কে আবার বিভিন্ন বর্গে (Order), গোত্রে (Family), গণে (Genus) এবং প্রজাতিতে (Species) ভাগ করা হয়েছে। তবে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই।

প্রাণী-জগৎ:

আজ পর্যন্ত যত প্রাণীর কথা জানা গেছে, তাদের দেহের গঠন ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে নানা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। নোটোকর্ড (Notochord) আছে কি নেই, তার ওপর নির্ভর ক'রে প্রাণীদের প্রধান দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যেমন—**আকর্ডাটা** (Achordata) (বা, অমেরুদণ্ডী) এবং **কর্ডাটা** (Chordata) (বা, মেরুদণ্ডী)। আকর্ডাটা (বা, অমেরুদণ্ডী) প্রাণীদের নয়টি পর্বে এবং কর্ডাটা (বা, মেরুদণ্ডী) প্রাণীদের একটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। অর্থাৎ, প্রাণী-জগৎকে, মোট দশটি পর্বে (Phylum) ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি পর্ব আবার অনেক শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। প্রাণী-বিজ্ঞানীরা পর্বগুলিকে বিবর্তনের ক্রম অনুযায়ী সাজিয়েছেন। এই দশটি মুখ্য পর্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হ'ল।
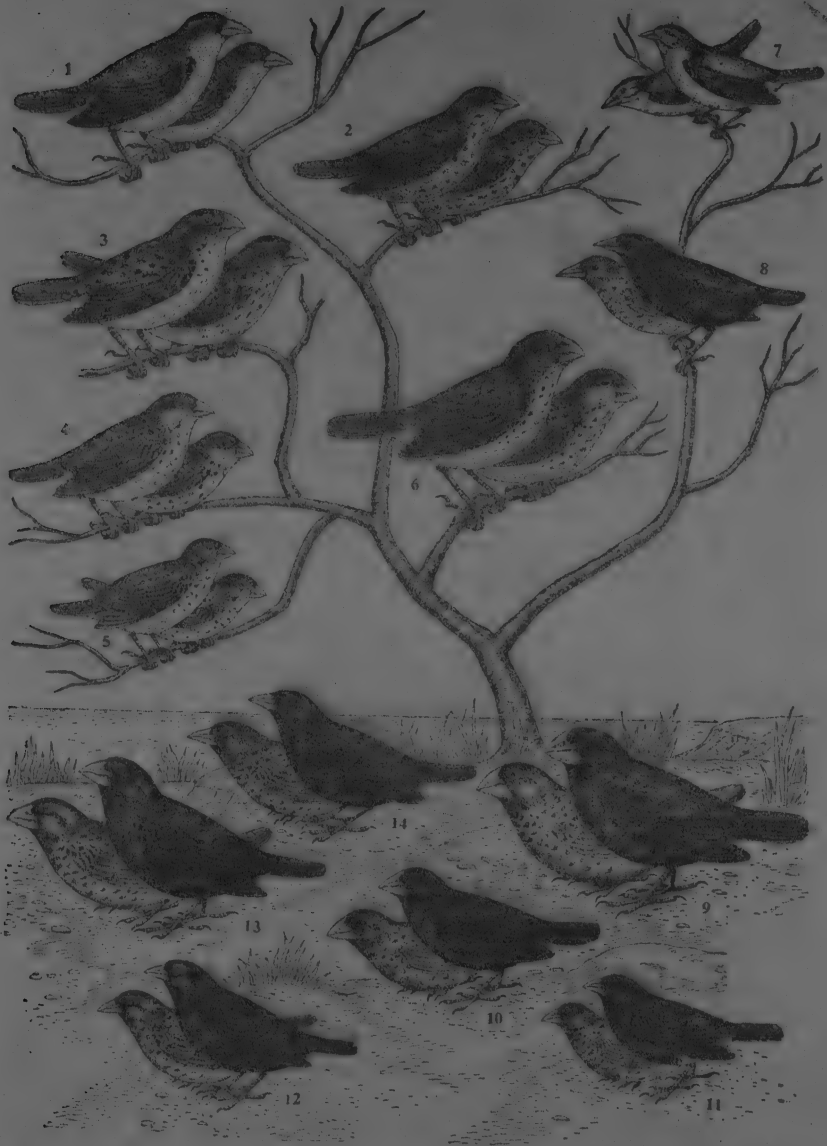
চিত্র ১৭৪। ডারউইনের ফিন্‌চ বা তুতি পাখি (Finches)। ধূসর-বাদামী থেকে কালো রঙের পাখিগুলি সবই জিওস্পিজিনী (Geospizinae) নামক উপ-গোত্র (Sub-Family)-এর অন্তর্গত। এদের আবার প্রধান ছ'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যেমন—(ক) ভূমিবাসী ফিন্‌চ (আদিম পাখির নিকটতম আত্মীয়), এবং (খ) বৃক্ষবাসী ফিন্‌চ (এদের উদ্ভব হয় পরবর্তীকালে)।
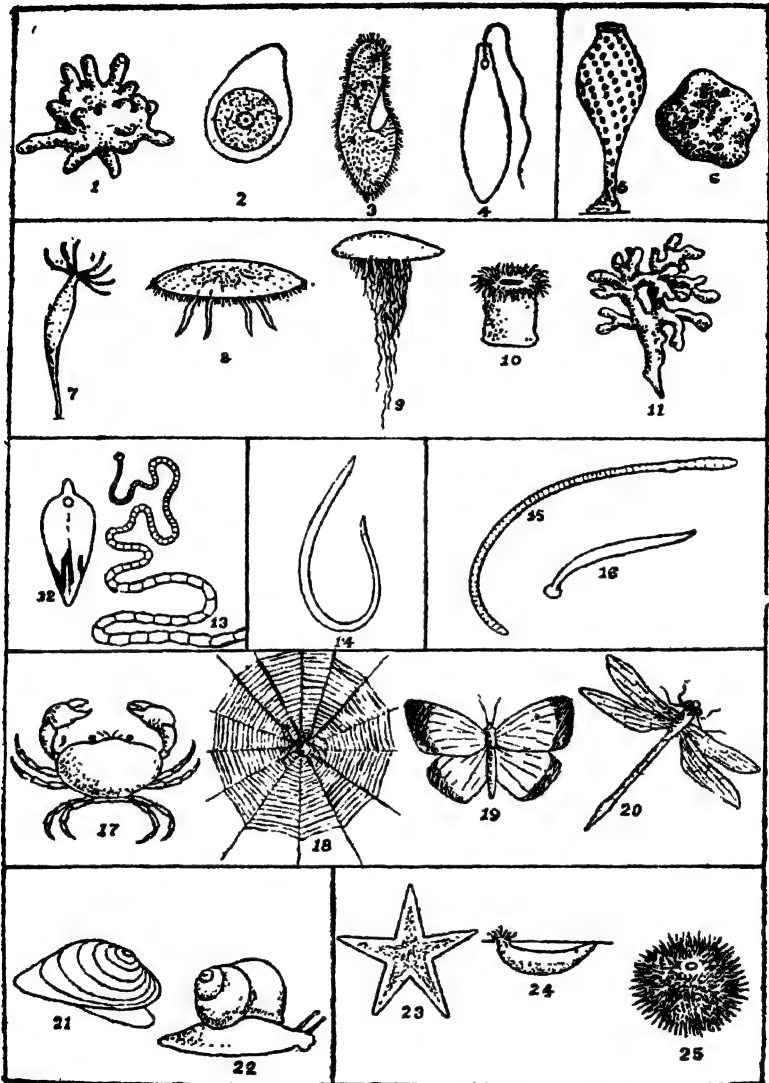
চিত্র ৬। নানাপ্রকার অমেরুদণ্ডী প্রাণী—আদি প্রাণী—1. অ্যামিবা, 2. এণ্টামিবা, 3. প্যারামিসিয়াম, 4. ইউগ্লিনা ; ছিদ্রাল প্রাণী—5. সাধারণ স্পঞ্জ, 6. স্নানের স্পঞ্জ : একনালী-দেহী—7. হাইড্রা, ৪. জেলিফিস্, 9. ফাইসেলিয়া, 10. সাগর-কুসুম, 11. প্রবাল ; চ্যাপ্টা কৃমি—12. যকৃৎ-কৃমি, 13. ফিতা-কৃমি ; গোল কৃমি—14. বড় কৃমি ; অঙ্গুরীমাল—15. কেঁচো, 16. জোঁক ; সন্ধিপদ—17. কাঁকড়া, 18. মাকড়সা, 19. প্রজাপতি, 20. জল-ফড়িং ; কোমলদেহী—21. ঝিনুক, 22. শামুক ; কণ্টকত্বক—23. সমুদ্র-তারা (বা, তারা-মাছ), 24. সমুদ্র-শশা, 25. সি-আর্চিন।

চিত্র ১৮৪। কার্বনিফেরাস যুগের জলাভূমি ও জঙ্গল।

এদের প্রতিনিধি হিসেবে ল্যাম্প্রে, হ্যাগ্‌ফিস্ প্রভৃতি এখনও এই পৃথিবীতে বিরাজ করছে।

সিলুরিয়ান ও দেভোনিয়ান-পর্যায়—সিলুরিয়ান পর্যায়ে (Silurian period) জলজ উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর খুব বেশী পরিবর্তন হ'ল না। কিন্তু এই সময়েই

(১) **প্রোটোজোয়া** (**Protozoa ; গ্রীক** *Protos*=**প্রথম,** *Zoon*=**প্রাণী**) **বা আদি-প্রাণী**—এদের দেহ মাত্র একটি কোষ দিয়ে তৈরি। এরা এতো ছোট যে, খালি চোখে এদের দেখা যায় না। এদের দেখতে হয় অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, প্রাণ সৃষ্টির প্রথম যুগেই এদের সৃষ্টি হয়েছিল, তাই এদের বলা হয় আদি-প্রাণী। বিভিন্ন রকমের আদি-প্রাণী দেখতে বিভিন্ন রকম। এরা সাধারণতঃ ক্ষণপদ (pseudopodia), ফ্ল্যাজেলা (flagella) বা সিলিয়া (cilia) দ্বারা চলাফেরা করে। এদের কেউ থাকে জলে, আবার কেউ বা থাকে মানুষ অথবা অন্যান্য জীবজন্তুর দেহে পরজীবী হিসেবে। যেমন—অ্যামিবা (Amœba), প্যারামিসিয়াম (Paramecium), ম্যালেরিয়া রোগের জন্য দায়ী প্লাস্‌মোডিয়াম (Plasmodium), কালাজ্বরের জন্য দায়ী লিস্‌ম্যানিয়া (Leishmania), আমাশয়ের জন্য দায়ী এণ্টামিবা (Entamœba) ইত্যাদি। সকলেই যে ক্ষতিকারক, তা নয়। জলে বা ভিজে মাটিতে এমন অনেক আদি-প্রাণী থাকে, যারা কারুর কোনো ক্ষতি করে না।

(২) **পোরিফেরা** (**Porifera ; গ্রীক** *Poros*=**ছিদ্র,** *Ferre*=**বহন করা**) **বা ছিদ্রাল প্রাণী**—এরা সমুদ্রের প্রাণী, তবে কেউ কেউ নদীতেও থাকে। এরা নড়াচড়া করতে পারে না, জলের নীচে অবস্থিত কোনো বস্তুর সঙ্গে নিজেকে আটকে রাখে। এরা বহুকোষী, কোষগুলি অস্পষ্ট দু'টি স্তরে বিন্যস্ত। এদের দেহে বহু ছিদ্র থাকে। স্পঞ্জ রবারের মতো নরম। এ জাতীয় অন্যান্য প্রাণীর খোলস এরকম নরম নয়, তাদের খোলস ফোঁপরা হলেও শক্ত। জীবন্ত অবস্থায় এদের খোলসের মধ্যে অনেক কোষ থাকে। দেহের ছিদ্র দিয়ে জলের সঙ্গে যে-সব ক্ষুদে প্রাণী আর উদ্ভিদ্ ঢুকে পড়ে, তাদের খেয়েই এরা বেঁচে থাকে। সাইকন, স্পঞ্জ, ফেরোনিমা প্রভৃতি এজাতীয় প্রাণী।

(৩) **সিলেন্‌টারাটা** (**Coelenterata ; গ্রীক** *Koilos*=**ফাঁপা,** *Enteron*=**অন্ত্র**) **বা একনালীদেহী**—এরাও সমুদ্রের প্রাণী। হয় একাকী, নয়তো উপনিবেশ স্থাপন ক'রে এরা সমুদ্রে বাস করে। তবে হাইড্রার মতো কেউ কেউ নদী বা পুকুরের মিষ্টি জলেও বাস করে। এজাতীয় প্রাণীর দেহ একটি ফাঁপা নলের মতো ; শ্রম-বিভাগসম্পন্ন দ্বি-স্তর বিশিষ্ট দেহ। এদের দেহে খাদ্যবহা-নালী ছাড়া অন্য কোনো নালী নেই। মুখের চারিদিকে টেন্‌টাকল (Tentacle) বা শুঁড় থাকে। এদের সাহায্যে তারা খাদ্য শিকার করে এবং আত্মরক্ষা করে। এদের

চিত্র ১৮৫। কয়েক প্রকার কোনিকার (Conifer=Cone bearing Species of tree and shrub) প্রত্যেকটি গাছের সঙ্গে সেই গাছের কোন্ (Cone) বা ফল (Berry) দেখানো হয়েছে। 1. পাইন (Pine), 2. সাইপ্রেস (Cypress), 3. লার্চ (Larch), 4. ফার (Fir)।

কাউকে দেখায় খোলা ছাতার মতো (জেলিফিস), কাউকে দেখায় ফুলের মতো (সাগর-কুসুম), কাউকে বা দড়িদড়া সমেত ভাসমান থলির মতো (ফাইসেলিয়া), ইত্যাদি। এই পর্বেই আছে নানাপ্রকার প্রবাল-কীট। অসংখ্য প্রবাল-কীটের চুন-জাতীয় খোলস জমে জমে এক-একটি প্রবাল-দ্বীপের সৃষ্টি হয়।

(৪) **প্ল্যাটিহেল্‌মিন্‌থিস (Platyhelminthes; গ্রীক** *Platys*=**চ্যাপ্টা,** *helmins*=**কৃমি) বা চ্যাপ্টা কৃমি**—এদের সবারই দেহ চ্যাপ্টা, অধিকাংশই উভলিঙ্গ এবং পরজীবী। এদের কাউকে দেখতে গাছের পাতার মতো, কেউ আবার ফিতের মতো লম্বা। দেহের কোষগুলি তিনটি স্তরে বিন্যস্ত। গৃহপালিত পশু ও মানুষের দেহে বাস ক'রে এরা নানাপ্রকার রোগ সৃষ্টি করে; যেমন—যকৃত-কৃমি, ফুসফুস-কৃমি, ফিতা-কৃমি ইত্যাদি। পরজীবী নয় এরকম চ্যাপ্টা কৃমির উদাহরণ প্ল্যানেরিয়া।

(৫) **নিমাটহেল্‌মিন্‌থিস (Nemathelminthes; গ্রীক** *Nema*=**সূতা** *helmins*=**কৃমি) বা গোল কৃমি (বা, সূতা-কৃমি)**—এদের দেহ সূতো বা দড়ির মতো গোল ও লম্বা। এদের পৌষ্টিক নালী নলাকার এবং সম্পূর্ণ। দেহের অগ্রভাগে মুখ-ছিদ্র এবং পশ্চাৎভাগে পায়ু-ছিদ্র আছে। তাছাড়া এদের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে। মানুষ ও পশু-পাখির দেহে বিভিন্ন রকমের গোল কৃমি পরজীবী হিসেবে বাস করে এবং বিভিন্ন রকমের রোগ সৃষ্টি করে, যেমন—বড়-কৃমি (Ascaris), ক্ষুদে-কৃমি (Pin-worm), বঁড়শি-কৃমি (Hook-worm) ইত্যাদি।

(৬) **অ্যানিলিডা (Annelida; ল্যাটিন** *Annulus*=**অঙ্গুরী, বা, আংটি,** *eidos*=**গঠন) বা অঙ্গুরীমাল**—দেহ নলাকৃতি, বাইরে থেকে দেখলে মনে হয়, এদের দেহ কতকগুলি আংটির মতো খণ্ডক দিয়ে তৈরী। যেমন—কেঁচো, জোঁক প্রভৃতি। এ জাতীয় প্রাণীরা সাধারণতঃ মাটিতে বা নদীর জলে থাকে, তবে কেউ কেউ সমুদ্রেও থাকে। এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য রক্ত-সংবহন-তন্ত্র এবং সিলোম। এরা ত্বকের সাহায্যে শ্বাসকার্য এবং নেফ্রিডিয়ার সাহায্যে রেচনকার্য চালায়। এরা সিটি (Setae) অথবা প্যারাপোডিয়ার (Parapodia) সাহায্যে চলাফেরা করে। কয়েকটি ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ থাকলেও অধিকাংশ প্রাণীই উভলিঙ্গ।

(৭) **আর্থ্রোপোডা (Arthropoda; গ্রীক** *Arthron*=**সন্ধি,** *Podos* =**পদ) বা সন্ধিপদ**—এই পৃথিবীতে সন্ধিপদ পর্বের প্রাণীর সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। এজাতীয় প্রাণীর দেহের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল কয়েক জোড়া (অন্ততঃ তিন জোড়া) পা, প্রত্যেকটি পা কয়েকটি খণ্ডক দিয়ে তৈরী। মাথায় অন্ততঃ এক জোড়া শুঁড়

চিত্র ১৯০। প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী—জলে আছে ডিপ্লোডোকাস (**Diplodocus**), আর ডাঙ্গায় রয়েছে ব্রণ্টোসরাস (Brontosaurus)।
[শিল্পী—শ্রীমৃত্যুঞ্জয় প্রসাদগুহ]

থাকে, আর অন্ততঃ এক জোড়া পুঞ্জাক্ষি (অনেকগুলি ছোট ছোট চোখের সমষ্টি)। এদের দেহ-গহ্বরের মধ্যে রক্ত প্রবাহিত হয়। ফুলকা (Gill), গিল্-বুক (Gill-book), বায়ু-নালী (Trachea) কিংবা বুক্-লাং (Book-lung) দিয়ে শ্বাসকার্য চালায়। মুখ এবং পায়ু-ছিদ্র থাকে, অন্ন-নালী মোটামুটি নলাকার এবং সম্পূর্ণ। এদের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে।

কীট-পতঙ্গের দেহে থাকে তিনটি অংশ—মাথা, বুক আর পেট। বুকের নীচে থাকে তিন জোড়া পা। কারও ডানা আছে, কারও নেই। ফড়িং, প্রজাপতি, মৌমাছি, বোলতা, পিঁপড়ে প্রভৃতির দু'জোড়া ক'রে ডানা আছে। মশা, মাছি ইত্যাদির এক জোড়া ক'রে ডানা আছে। আর ছারপোকা, উকুন প্রভৃতির ডানা নেই। এদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের চরম শত্রু, আবার কেউ বা পরম সুহৃদ। মশা, মাছি, আরশোলা ইত্যাদি রোগ-জীবাণু বহন ক'রে আমাদের দেহে নানা রকম রোগ সৃষ্টি করে। কেউ কেউ আমাদের শস্য এবং ফসলের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। কিন্তু মৌমাছি, প্রজাপতি প্রভৃতি ফুলে ফুলে উড়ে উড়ে পরাগ-সংযোগ ঘটায়। তাই সপুষ্পক উদ্ভিদের ফল ও বীজ হয়। আবার বোলতা, জল-ফড়িং, জোনাকি-পোকা প্রভৃতি পতঙ্গরা ক্ষতিকারক অনেক পতঙ্গ খেয়ে আমাদের অশেষ উপকার করে। এরা না থাকলে, আমাদের শত্রু-পতঙ্গের সংখ্যা এতো বেড়ে যেত যে, পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দিত। মাকড়সাও সন্ধিপদ প্রাণী, কিন্তু সাধারণ কীট-পতঙ্গের মতো নয়। এর শরীরে মাত্র দু'টি অংশ—মাথা ও পেট। আর এদের পা থাকে আটটি ক'রে।

চিংড়ি, কাঁকড়া প্রভৃতি জলজ প্রাণী। এদের শরীর এক-একটি খোলসের মধ্যে আবদ্ধ থাকে, তাই এদের কবচী (crustacea) বলে।

(৮) **মোলাস্কা (Mollusca ; ল্যাটিন** *Mollis*—**কোমল বা নরম) বা কোমলদেহা (বা, কম্বোজ)**—পুকুরের জলে কিংবা বাগানের মাটিতে নানা রকম শামুক, ঝিনুক, গেঁড়ি, গুগলি ইত্যাদি দেখা যায়। আবার সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেলে, সমুদ্রতীরে নানা রকম ঝিনুকের খোলা পড়ে থাকতে দেখা যায়। আমরা যে শাঁখ বাজাই, তাও একরকম সামুদ্রিক শামুকের খোলস। এদের দেহ খুব নরম খানিকটা মাংসপিণ্ডের মতো, এবং তা পাতলা আবরণ (mantle) দ্বারা আবৃত থাকে। আবরণ-নিঃসৃত রস দ্বারা চুনময় খোলস (shell) সৃষ্টি হয়। আর নরম দেহটা ওই শক্ত খোলসের মধ্যে সুরক্ষিত থাকে। শামুকের খোলা একদিকে
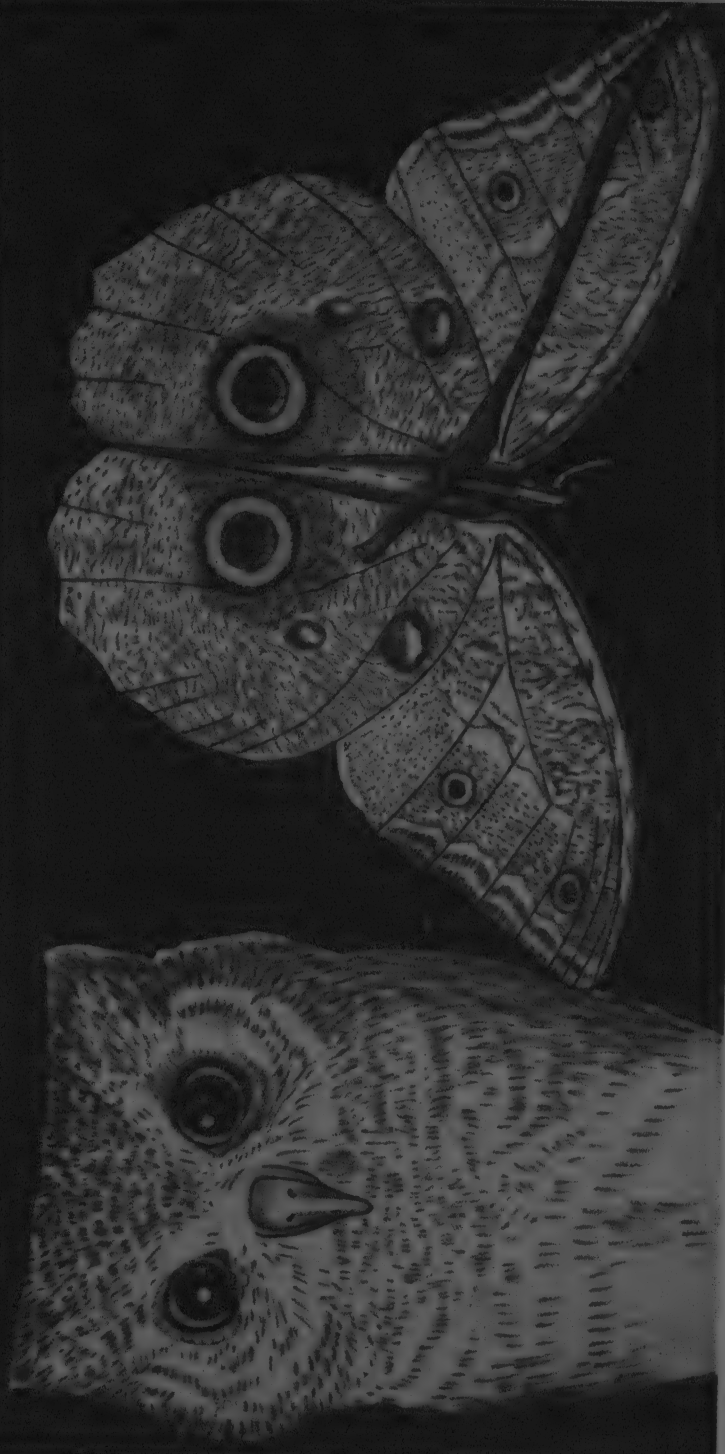
রঙীন চিত্র—V. পেচক প্রজাপতি (Caligo or Owl butterfly) ঠিক পেঁচার মতো আকৃতি ধারণ করে, এজন্য পাখিরা একে এড়িয়ে চলে। এইভাবে প্রজাপতিটি আত্মরক্ষার প্রয়াস পায়। [শিল্পী—শ্রীমৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ]

প্যাচালো, আর মুখের দিকে থাকে একটি ঢাকনা। কিন্তু ঝিনুকের খোলা যেন কব্জাওয়ালা দরজার দু'টি পাল্লা। অঙ্কদেশে মাংসল পদ থাকে, এবং তা প্রাণীটির গমনাগমনে সহায়তা করে। এদের রক্ত-সংবহন-তন্ত্র উন্নত ধরণের এবং হৃৎপিণ্ড আছে। অক্টোপাসও এই পর্বের প্রাণী, তবে এদের দেহে কোনো খোলার আবরণ নেই।

(৯) **একাইনোডার্মাটা** (**Echinodermata ; গ্রীক** *Echinos*=**কণ্টক, বা কাঁটা,** *derma*=**ত্বক**) **বা কণ্টকত্বক**—এজাতীয় প্রাণীরা সকলেই সমুদ্রে থাকে। এদের দেহের বাইরে ছোট ছোট অনেক কাঁটা বা পাত (plate) থাকে। দেহের মধ্যে জল-সংবহন-তন্ত্র বিদ্যমান। এজন্য এদের দেহ-মধ্যে অনেকগুলি নালী থাকে, এবং তাদের ভিতর দিয়ে সব সময় সমুদ্রের জল প্রবাহিত হয়। চলবার জন্য এদের বিশেষ ধরনের নালী-পা (tube feet) থাকে। এদের দেহের আকৃতি বড় বিচিত্র, কাউকে দেখতে তারার মতো (star fish=তারা-মাছ), আবার কাউকে বাহারী নক্সাকাটা সন্দেশের মতো (cake urchin), কাউকে পিন-কুশনের মতো (Sea urchin), আর কাউকে বা একটি শশার মতো (Sea cucumber= সমুদ্র-শশা) দেখায়।

(১০) **কর্ডাটা** (**Chordata ; গ্রীক** *Chorde*=**বাদ্যযন্ত্রের তন্ত্রী**) **বা মেরুদণ্ডী**—এই পর্বের প্রাণীদের পৃষ্ঠদেশে **নোটোকর্ড** (Notochord) বা **মেরুদণ্ড** (Vertebral column) থাকে, আর থাকে **স্নায়ু-সূত্র** (Nerve chord)। কঙ্কালদ্বারা এদের দেহ-কাঠামো গঠিত। এদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল বদ্ধ রক্ত-সংবহন-তন্ত্র।

কর্ডাটা পর্বের প্রাণীদের দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যেমন—**প্রোটোকর্ডাটা** (Protochordata) এবং **ভার্টিব্রেটা** (Vertebrata)। প্রোটোকর্ডাটার প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল নোটোকর্ডের অবস্থান। অপরদিকে ভার্টিব্রেটার ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় দেখা যায় অস্থিযুক্ত মেরুদণ্ড।

মানুষ সমেত যে-সব প্রাণীর দেহে মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া আছে, তারা সবাই ভার্টিব্রেটার অন্তর্ভুক্ত। এদের আবার দু'টি উপ-পর্বে (Sub-phylum) ভাগ করা হয়েছে—(i) চোয়ালহীন (Agnatha ; *A*=Without, *gnathos*=jaws) এবং চোয়ালযুক্ত (Gnathostomata)। অ্যাগ্‌নাথা উপ-পর্বের প্রাণীরা করোটি-যুক্ত, কিন্তু চোয়ালহীন মেরুদণ্ডী প্রাণী, দেখতে অনেকটা বান মাছের মতো। এদের

চিত্র-বিচিত্র শৈল-মাছ (Rock-fish)—অগভীর সমুদ্রের তলদেশে অবস্থিত সাগর-কুসুমের মধ্যে আত্মগোপণ ক'রে রয়েছে।
[ইউ. এস্. আই. এস্-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

জোড়া পাখনা নেই, আঁশও নেই; যেমন—ল্যাম্প্রে, হ্যাগ্-ফিশ্ ইত্যাদি। অপর দিকে ন্যাথোস্টোমাটা উপ-পর্বের প্রাণীরা করোটি এবং চোয়ালযুক্ত মেরুদণ্ডী প্রাণী (cephalochordata)। এইসব প্রাণীর মাথায় একটি খুলি এবং তার মধ্যে মস্তিষ্ক (বা, মগজ) থাকে। তাছাড়া এদের মুখে দু'টি চোয়াল, এবং এক জোড়া সরল চোখ থাকে। প্রায় সকলেরই এক জোড়া নাকের ছিদ্র থাকে। সাপ ও কয়েকপ্রকার গিরগিটি ছাড়া অন্যান্য সকলের দেহেই চলাচল করার জন্যে দু'জোড়া অঙ্গ থাকে; যেমন—রুই মাছের দু'জোড়া পাখনা, টিকটিকির দু'জোড়া পা, পাখির একজোড়া ডানা এবং একজোড়া পা, স্তন্যপায়ীর চারটি পা, মানুষের দু'টি হাত এবং দু'টি পা, ইত্যাদি এই উপ-পর্বের প্রাণীদের পাঁচটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে; যেমন—

(i) **পিসেস (Pisces) বা মৎস্য (বা, মাছ)**—মাছ জলে বাস করে এবং সাধারণতঃ ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়। মাছের পটকা (Swim-bladder) বা বায়ুস্থলী থাকে। বেশীর ভাগ মাছের গায়ে আঁশ থাকে, তবে আঁশ নাও থাকতে পারে। মাছের দেহে এক জোড়া বক্ষ-পাখনা (Pectoral fins) এবং এক জোড়া শ্রোণী-পাখনা (Pelvic fins) থাকে। প্রত্যেক পাখনার মধ্যেই নরম বা শক্ত কাঁটা থাকে। দেহের দু'পাশে বিশেষ অনুভূতি-যন্ত্র পার্শ্ব-রেখা (Lateral lines) থাকে

হাঙ্গর, শঙ্করমাছ ইত্যাদি হ'ল নীচু জাতের মাছ। এদের দেহে হাড়ের বদলে নরম কার্টিলেজ (Cartilage) বা তরুণাস্থি থাকে।

আবার কয়েক প্রকার মাছের পটকা কক্ষ-বিশিষ্ট হয়। এর সাহায্যে ফুসফুসের মতো বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ ক'রে শ্বাসকার্য-চালানো সম্ভব হয়। এদের ডিপ্নয় (Dipnoi) বা লাং-ফিশ্ (Lung fish) বলা হয়। এরা উঁচু জাতের মাছ।

(ii) **অ্যাম্ফিবিয়া (Amphibia ; *Amphi*=both, *bios*=life) বা উভচর**—ব্যাঙ, স্যালামাণ্ডার প্রভৃতি জীবনের প্রথম অবস্থায় জলে বাস করে, কিন্তু পূর্ণ-বয়স্ক অবস্থায় ডাঙ্গায় চরে বেড়ায়। জলে বাস করার সময় ফুলকার সাহায্যে এবং পরে ফুসফুসের সাহায্যে, শ্বাসকার্য চালায়। এদের দেহের চামড়ায় আঁশ, পালক বা লোম থাকে না। হাতে আর পায়ে আঙুল থাকে, কিন্তু আঙুলে নখর (বা, নখ) থাকে না; লেজ থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে।

(iii) **রেপ্টিলিয়া (Reptilia) বা সরীসৃপ**—টিকটিকি, গিরগিটি, সাপ, কুমীর, কচ্ছপ ইত্যাদি এই শ্রেণীর প্রাণী। জন্ম থেকেই এদের দেহে ফুসফুস থাকে।

সতত সতর্ক গিরগিটি—সবুজ পাতার মধ্যে এরা এমনভাবে মিশে থাকে যে, সহজে মালুম হয় না। এরা ইচ্ছামত গায়ের রং বদলাতে পারে, তাই এদের বলা হয় বহুরূপী।

প্রার্থনারত ম্যান্টিস — দেখে মনে হয়, এ যেন হাত জোড় ক'রে প্রার্থনা করছে। আসলে এ পাতার আড়ালে লুকিয়ে আছে। কীট-পতঙ্গ দেখলেই খপ্ ক'রে ধরে ফেলবে।
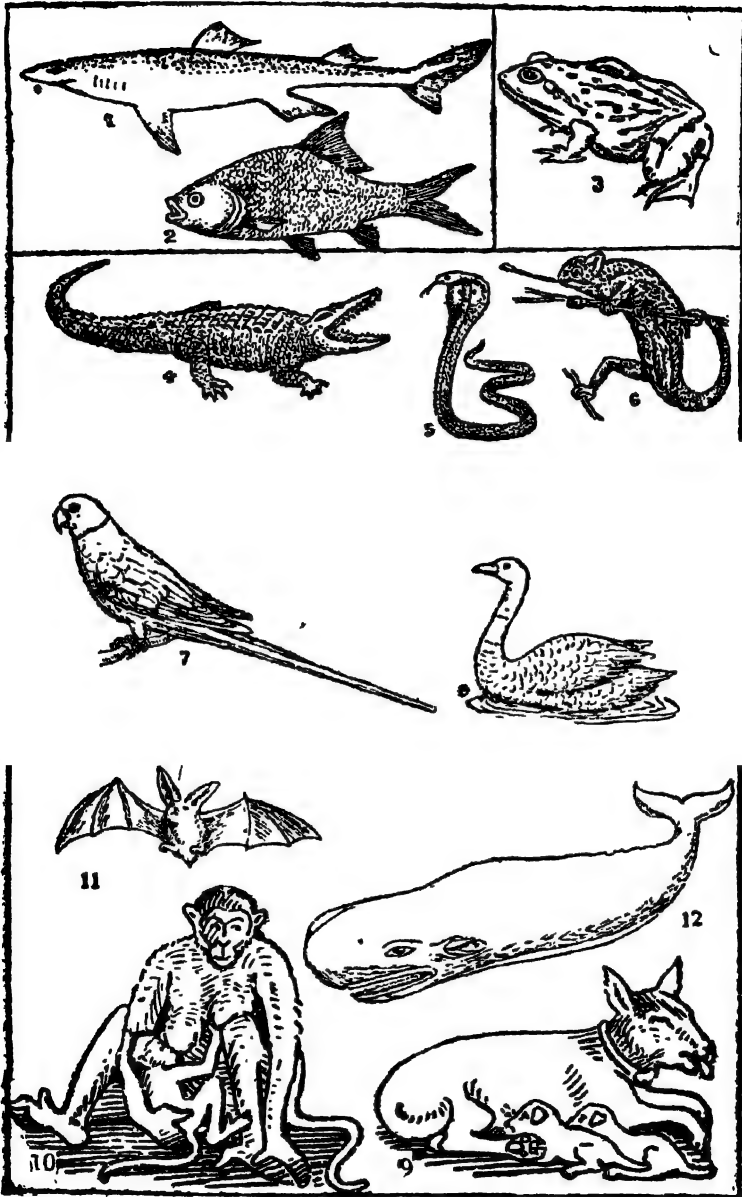
(শিল্পী—শ্রীমৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ)

রঙীন চিত্র—VII

চিত্র ৭। নানাপ্রকার মেরুদণ্ডী প্রাণী—মাছ—1. হাঙ্গর, 2. কাতলা মাছ; উভচর—3. সোনা ব্যাঙ; সরীসৃপ—4 কুমীর, 5. সাপ, 6. বহুরূপী; পাখি—7. টিয়া, 8. হাঁস. স্তন্যপায়ী—9. কুকুর, 10. বানর, 11. বাদুড়, 12. তিমি।

রঙীন চিত্র—VIII

সুন্দরবনের
ডোরা-কাটা বাঘ—
ঘাসবনের আলো-ছায়ার
সঙ্গে বেমালুম মিশে
যেতে পারে।

জলে থাকলেও এরা জলে ডিম পাড়ে না, ডিম পাড়ে ডাঙ্গায়। এদের দেহের চামড়া আঁশ দিয়ে ঢাকা থাকে। সাপ আর কয়েক রকম গিরগিটির পা নেই। এরা বুকে ভর দিয়ে চলে। অন্যান্যদের চারটি ক'রে পা থাকে, আর পায়ের আঙ্গুলে নখর (বা, নখ) থাকে।

(iv) **অ্যাভিস** (**Aves=birds**) **বা পক্ষী** (**বা, পাখি**)—পাখি দেখলেই চেনা যায়। পাখির শরীরটা পালকে ঢাকা। অগ্র-পদ এক জোড়া ডানায় রূপান্তরিত, কিন্তু পশ্চাৎ-পদ সুগঠিত এবং অঙ্গুলিযুক্ত। আঙ্গুলে নখর (বা, নখ) আছে। পায়ের অনাবৃত অংশে আঁশ থাকে। মুখে এক জোড়া চঞ্চু (বা, ঠোঁট) আছে। আধুনিক পাখির দাঁত নেই। ডানার সাহায্যে পাখি উড়তে পারে। উটপাখি, এমু, কিউই প্রভৃতি দৌড়বাজ পাখি। এদের পা সুগঠিত, কিন্তু ডানা অপুষ্ট। এরা ভাল দৌড়তে পারে, কিন্তু উড়তে পারে না। অপরপক্ষে, কাক, চিল, বাজ, পায়রা প্রভৃতি হ'ল উড়বাজ পাখি, অর্থাৎ, তারা ভাল উড়তে পারে।

(v) **ম্যামালিয়া** (**Mammalia=mammals**) **বা স্তন্যপায়ী**—এরূপ প্রাণীর ভ্রূণ মাতৃগর্ভে (জরায়ুর মধ্যে) অবস্থান করে এবং নির্দিষ্ট সময় পরে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীরূপে ভূমিষ্ঠ হয়। সন্তান শৈশবে মাতার স্তন্য পান ক'রে বেঁচে থাকে। যেমন—মানুষ, বাঁদর, গরু, মোষ, বিড়াল, কুকুর, ইঁদুর ইত্যাদি। এদের স্তন্যপায়ী বলে। এদের সকলেরই স্তনবৃন্ত থাকে। স্তন্যপায়ী প্রাণীর শরীরে কম হোক, বেশী হোক, কিছু লোম থাকবেই। এদের মাথায় এক জোড়া চোখ, আর মাথার দু'পাশে এক জোড়া কানের পাতা থাকে। উল্লেখ্য যে, ক্যাঙ্গারু, অপোসাম প্রভৃতির সন্তান পূর্ণাঙ্গ এবং পুষ্ট হওয়ার পূর্বেই ভূমিষ্ঠ হয়। এই সন্তান মায়ের উদর-সংলগ্ন একটি থলির মধ্যে অবস্থান ক'রে মায়ের স্তন্য পান ক'রে পূর্ণাঙ্গ এবং সুপুষ্ট হয়। তিমি, সীল, শুশুক, ডুগং প্রভৃতি জলচর, কিন্তু স্তন্যপায়ী প্রাণী। বাদুড়, চামচিকা প্রভৃতি খেচর (অর্থাৎ, আকাশে উড়তে পারে), কিন্তু স্তন্যপায়ী প্রাণী। আবার, হংসচঞ্চু, একিডনা প্রভৃতি পাখির মতো ডিম পাড়ে, কিন্তু সেই ডিম ফুটে যে বাচ্চা হয়, তা মায়ের স্তন্য পান ক'রে পুষ্ট হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, প্রতিটি পর্ব বিভিন্ন শ্রেণী (Class), বর্গ (Order), গোত্র (Family), গণ (Genus) এবং প্রজাতিতে (Species) বিভক্ত। তবে সে সব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার স্থান এখানে নেই।

চিত্র ২৭৭। পিপীলিকাভুক প্রাণী—আর্মাডিলো। মজবুত নখগুলির সাহায্যে এ মাটি খুঁড়ে সহজেই উইপোকা বের ক'রে খেতে পারে।
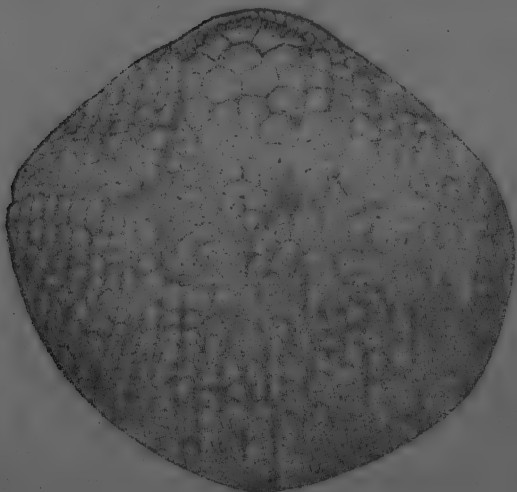
চিত্র ২৭৮। বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই, আর্মাডিলো নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে একটি বলের মতো হয়ে যায়। তখন তার চারদিকে থাকে একটি শক্ত আবরণ। এইভাবে অনেক সময় সে আত্মরক্ষা করতে পারে।

দ্বিতীয় পর্ব

জীবমণ্ডল

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জীবমণ্ডল

জীব-জগৎ এবং এই পৃথিবীর অশ্মমণ্ডল (lithosphere), বারিমণ্ডল (hydrosphere) এবং বায়ুমণ্ডল (atmosphere)—এই সব মিলিয়ে হ'ল জীবমণ্ডল (biosphere)। অশ্মমণ্ডল, বারিমণ্ডল এবং বায়ুমণ্ডল বলতে বোঝায়, এই পৃথিবীর কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয় আবরণ, যেখানে নানাপ্রকার জীবের অবস্থান।

ভূপৃষ্ঠে আছে প্রধান দু'টি মণ্ডল—অশ্মমণ্ডল ও বারিমণ্ডল। আর পৃথিবীর চারদিকে বায়ুর যে আবরণ আছে, তার নাম বায়ুমণ্ডল। অশ্মমণ্ডলে সাধারণভাবে আগ্নেয়শিলার প্রাচুর্য দেখা যায়, সেই সঙ্গে কিছুটা পাললিক শিলাও থাকে। ভূপৃষ্ঠে অবশ্য স্থল অপেক্ষা জলই বেশী (ভূপৃষ্ঠের চারভাগের প্রায় তিন ভাগই জল)।

বিজ্ঞানীরা এখন বুঝতে পেরেছেন যে, মৌল বা মৌলিক পদার্থের সংখ্যা প্রায় এক-শ', আর এদের প্রায় সবগুলিকেই পৃথিবীতে পাওয়া যায়। ভূত্বকে সোনা, রূপা, তামা, প্ল্যাটিনাম প্রভৃতি কয়েকটি মৌল মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। তবে অধিকাংশ মৌলই পাওয়া যায় অন্য মৌলের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায়, অর্থাৎ যৌগ বা যৌগিক পদার্থ-রূপে। বিজ্ঞানী ক্লার্ক ভূপৃষ্ঠে (২৪ মাইল গভীরতা পর্যন্ত অশ্মমণ্ডল এবং বারিমণ্ডল) এবং বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত বিভিন্ন মৌলের পরিমাণ সম্পর্কে একটি হিসেব করেছেন। তাঁর হিসেব অনুযায়ী সবচেয়ে বেশী পরিমাণে আছে অক্সিজেন (৪৯.৮৫ শতাংশ);

রঙীন চিত্র—IX

চিতল হরিণ—বনের আলো-ছায়ার মধ্যে অনায়াসে আত্মগোপণ ক'রে থাকতে পারে।

তারপর আছে সিলিকন্ (২৬·০৩ শ.), অ্যালুমিনিয়াম (৭·২৮ শ.) এবং আয়রন বা লোহা (৪·১২ শ.)। তার চেয়েও কম আছে ক্যাল্সিয়াম (৩·১৮ শ.), সোডিয়াম (২·৩৩ শ.), পটাসিয়াম (২·৩৩ শ.) ও ম্যাগ্নেসিয়াম (২·১১ শ.)। আর খুব কম পরিমাণে আছে হাইড্রোজেন (০·৯৭ শ.), টাইটেনিয়াম (০·৪১ শ.), ক্লোরিন (০·২০ শ.), কার্বন (০·১৯ শ.) প্রভৃতি মৌল।
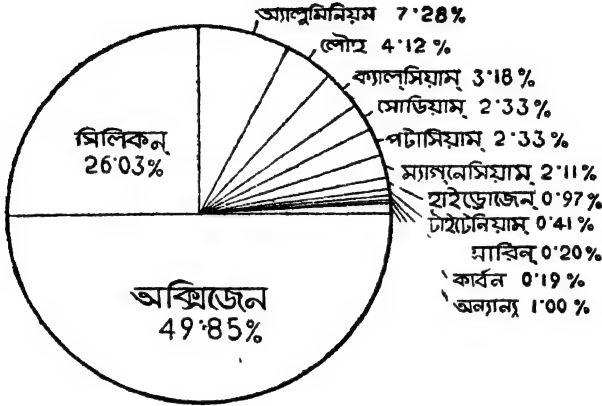
চিত্র ৮। বিজ্ঞানী ক্লার্ক-এর হিসেব অনুযায়ী, ভূপৃষ্ঠে (২৪ মাইল গভীরতা পর্যন্ত অশ্মমণ্ডল ও বারিমণ্ডল) এবং বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত বিভিন্ন মৌলের পরিমাণ।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ভূপৃষ্ঠের ঊর্ধ্বে অন্ততঃ ২৫০ মাইল (৪০০ কি. মি.) পর্যন্ত বায়ু বিদ্যমান। তবে এই বায়ুমণ্ডল ভূপৃষ্ঠ থেকে ঠিক কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা এখনও সম্ভব হয় নি। অনেকের অনুমান, এর বিস্তার উপর দিকে প্রায় এক হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত।

বায়ুর ওজন আছে। তাই উপরের বায়ুস্তর নীচের স্তরের উপর চাপ দেয়। এজন্য ভূপৃষ্ঠের ঠিক উপরের স্তরই সবচেয়ে ঘন। যত উপরে ওঠা যায়, বায়ুস্তর তত পাতলা হয়ে গেছে। সেখানকার বায়ুতে শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে প্রয়োজনীয় বায়ু যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না, এজন্য শ্বাসকষ্ট হয়।

বায়ু একটি মিশ্র। আয়তন হিসেবে বায়ুর প্রায় একভাগ অক্সিজেন ও চার ভাগ নাইট্রোজেন—এ দু'টি হ'ল বায়ুর প্রধান উপাদান। এছাড়া বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প এবং কতকগুলি নিষ্ক্রিয় গ্যাস আছে, তবে তাদের পরিমাণ খুব কম।

চিত্র ৩১৭। শ্বেত-ভল্লুক বরফের মতই সাদা। লক্ষ্যণীয়, মায়ের স্নেহ-যত্নে বাচ্চাটি বেশ বড় হয়ে উঠেছে।

জীব তার গঠনগত উপাদানের জন্য প্রধানতঃ নির্ভর করে পৃথিবীর উপর, আর শক্তির জন্য নির্ভর করে সূর্যের উপর। একটি জীবদেহে উৎপন্ন শক্তি অন্য জীবের কোনো কাজে লাগে না। সুতরাং, শক্তির জন্য জীব-জগতে অবিরাম সৌর শক্তির প্রবাহ প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সবুজ উদ্ভিদই শুধু সৌর শক্তিকে কাজে লাগাতে পারে। এজন্য অন্য সকল জীবকেই শক্তির জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সবুজ উদ্ভিদের উপরই নির্ভর করতে হয়। বিজ্ঞানীরা হিসেব ক'রে দেখেছেন যে, সূর্য থেকে যে পরিমাণ তেজ-রশ্মি পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়, তার ০·১ শতাংশ মাত্র সবুজ উদ্ভিদ্ কাজে লাগাতে পারে। এই শক্তি নানারূপ খাদ্যদ্রব্যে সঞ্চিত হয়ে থাকে। আর বিভিন্ন জীব সেই সব খাদ্য থেকেই তাদের প্রয়োজনীয় শক্তি আহরণ ক'রে থাকে।

উল্লেখ্য যে, এই সবুজ উদ্ভিদ্ জীবমণ্ডলের সেই সব অঞ্চলেই শুধু সীমাবদ্ধ, যেখানে দিনের বেলায় সূর্যের আলো পৌঁছায়। এগুলি হ'ল বায়ুমণ্ডল, ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগ, কয়েক মিলিমিটার গভীরতা পর্যন্ত মৃত্তিকাস্তর, সমুদ্রের উপরিভাগ, হ্রদ এবং নদ-নদী।

উন্মুক্ত সাগরের উদ্ভিদ-জীবন বলতে প্রধানতঃ প্ল্যাঙ্কটন বোঝায়। এরা সাধারণতঃ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে থাকে এবং সমুদ্রবক্ষে ইতস্ততঃ ভেসে বেড়ায়। এরা সমুদ্রের লবণাক্ত জলের তুলনায় সামান্য ভারি। কাজেই সমুদ্র সম্পূর্ণ শান্ত থাকলে, এরা ধীরে ধীরে তলিয়ে যেত এবং শেষে একেবারে সমুদ্রের তলায় গিয়ে থিতিয়ে পড়তো। সমুদ্রের উপরিভাগ থেকে এই সব উদ্ভিদ্ যে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয় না, তার কারণ, বায়ু-তাড়িত সমুদ্র সব সময়ই অশান্ত থাকে। এই রকম কিছু উদ্ভিদ্ হয়তো ধীরে ধীরে ডুবে যায়, ডুবে যেতে যেতে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তারপর জলের তাড়নায় আবার উপরদিকে ভেসে ওঠে। এই সব উদ্ভিদ-কোষ সব সময় একটি অঞ্চলে আবদ্ধ থাকলে, সেখানকার পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য নিঃশেষিত হয়ে যেত। কিন্তু জলের তাড়নায় এরা এক জায়গা থেকে এমন আর এক জায়গায় সরে যেতে পারে, যেখানে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

আমাদের মতো যে-সব প্রাণী ডাঙ্গার উপরে কঠিন ও গ্যাসীয় পদার্থের সংযোগস্থলে বাস করে, তারা অবশ্য চলে-ফিরে, স্থান থেকে স্থানান্তরে গিয়ে, তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ ক'রে নিতে পারে। জলচর প্রাণীরাও জলের মধ্যে বিচরণ ক'রে, স্থান থেকে স্থানান্তরে গিয়ে, খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে।

চিত্র ৩১৮। চিতাবাঘ গাছের ডালে উঠে পাতার আলো-ছায়ার মধ্যে লুকিয়ে থাকে, এবং সুযোগ বুঝে বিদ্যুৎগতিতে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তবে প্রায়ই দেখা যায়, গাছের ডাল থেকে তার লেজটা ঝুলে রয়েছে। আর এজন্যই অনেক সময় সে শিকারীর কাছে ধরা পড়ে যায়।

[শিল্পী—শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ]

স্বাভাবিক কারণেই নীচের দিকে জীবমণ্ডলের বিস্তার খুবই সীমাবদ্ধ, কিন্তু তার চেয়ে আরও বেশী সীমাবদ্ধ উপরদিকে। সুউচ্চ পর্বতে (যেমন—হিমালয়ে) প্রায় ছ-হাজার মিটার সীমারেখার উপরে সবুজ উদ্ভিদের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। এর প্রধান কারণ, তরল জলের একান্ত অভাব। কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের নিম্নচাপ (অর্ধেকেরও কম) সম্ভবতঃ আর একটি কারণ। আরও অধিক উচ্চতায় কয়েক প্রকার নিম্নশ্রেণীর প্রাণী (যেমন—মাকড়সা) হয়তো দেখা যায়। এরা হয়তো এমন সব ছোটখাট কীট-পতঙ্গ ধরে খায়, যারা হাওয়ায় ভেসে আসা ফুলের পরাগ (বা, রেণু) কিংবা অন্যান্য জৈব পদার্থ আহার ক'রে বেঁচে থাকতে অভ্যস্ত।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, জীবের পক্ষে কঠিন মৃত্তিকা ও বায়ুর সংযোগস্থলে জীবন ধারণ অপেক্ষাকৃত সহজ। কারণ, সেখানেই তার আহার্য পাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। অবশ্য পুকুর বা জলা-জায়গার স্থির জল এবং বায়ুর সংযোগস্থলেও নানাপ্রকার কীটাণু বা জীবাণু বেঁচে থাকতে এবং বংশ-বিস্তার করতে পারে। এজন্য বিজ্ঞানী বারনেল অনেকদিন আগেই বলেছেন যে, সুদূর অতীতে জলের সংস্পর্শযুক্ত মৃত্তিকা-স্তরই সম্ভবতঃ জীবের জন্ম ও বিকাশের দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

সবুজ উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষ সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে, সবচেয়ে বেশী পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রধানতঃ তিনটি শর্ত অবশ্য পালনীয়—(১) জল, যা উদ্ভিদ্ সহজেই শিকড়ের সাহায্যে শোষণ ক'রে নিতে পারবে, এবং সেজন্য তা মৃত্তিকা-কণাগুলির মাঝে সব সময় উপযুক্ত চাপে সঞ্চিত থাকা প্রয়োজন, (২) কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস, যা উদ্ভিদ্ বায়ুমণ্ডল থেকে সহজেই গ্রহণ করতে পারবে, এবং (৩) অক্সিজেন (বিশেষতঃ রাত্রিবেলা), যা জলের চেয়ে বায়ু থেকেই অপেক্ষাকৃত সহজে গ্রহণ করা সম্ভব। এছাড়া প্রয়োজন হয় নানাপ্রকার খনিজ লবণ, যেগুলি মৃত্তিকা-কণাগুলির মধ্যে অবস্থিত জলে দ্রবীভূত হয়ে থাকে।

অশ্মমণ্ডল, বারিমণ্ডল এবং বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে জীবের এক নিবিড় সম্পর্ক আছে, এবং তাদের জীবন প্রধানতঃ ঐ সবের উপরেই নির্ভরশীল। পৃথিবী থেকে প্রাপ্ত উপাদানগুলি পর্যায়ক্রমে জীবদেহে প্রবেশ করে এবং আবার পৃথিবীতেই ফিরে আসে। অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন এবং জলের বিবর্তন-চক্রগুলি পর্যালোচনা করলে, এ বিষয়ে আরও স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হবে।

জীব-জগতে বেঁচে থাকার জন্যে প্রত্যেকেরই খাদ্যের প্রয়োজন। এই ব্যাপারে
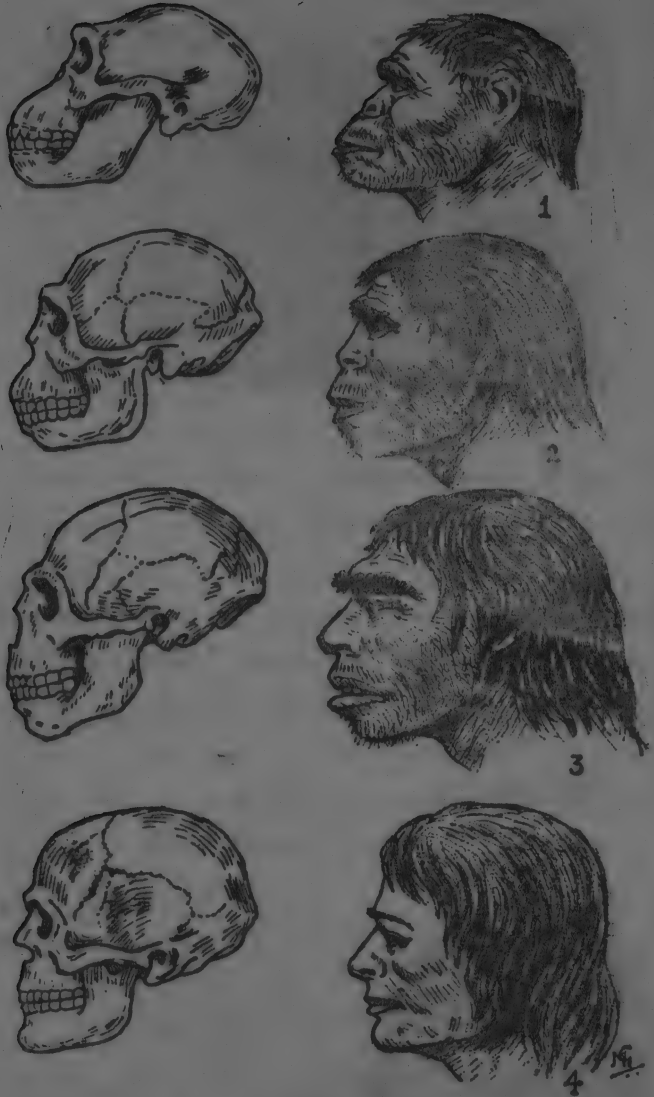
চিত্র ৩৩৭। মানুষের ক্রমবিকাশ—প্রাপ্ত জীবাশ্ম-করোটি অনুযায়ী কয়েক প্রকার জীবাশ্ম-মানবের মুখের গড়ন। (Side-view বা পার্শ্বচিত্র)—1. অষ্ট্রালোপিতেকাস, (আবির্ভাব ৫০ লক্ষ বৎসর পূর্বে), 2. পিতেকানথ্রোপাস (আবির্ভাব ৫ লক্ষ বৎসর পূর্বে), 3. নিয়ানডারথাল মানুষ (আবির্ভাব ২ লক্ষ বৎসর পূর্বে), 4. ক্রমাঞ্চঁ মানুষ (আবির্ভাব ৩৫ হাজার বৎসর পূর্বে)।

বিভিন্ন রকম জীবের মধ্যেও একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কারণ, একের বেঁচে থাকার জন্যে, খাদ্য হিসেবে, অন্যের প্রয়োজন। যেমন, সবুজ উদ্ভিদ্ অজৈব উপাদান দিয়ে খাদ্য সংশ্লেষিত করে। আর হরিণ, গরু, মোষ, শূয়োর প্রভৃতি তৃণভোজী প্রাণীরা ঐ সব উদ্ভিদ্ বা ঘাসপাতা খেয়ে বেঁচে থাকে। আবার বাঘ, সিংহ, শিয়াল
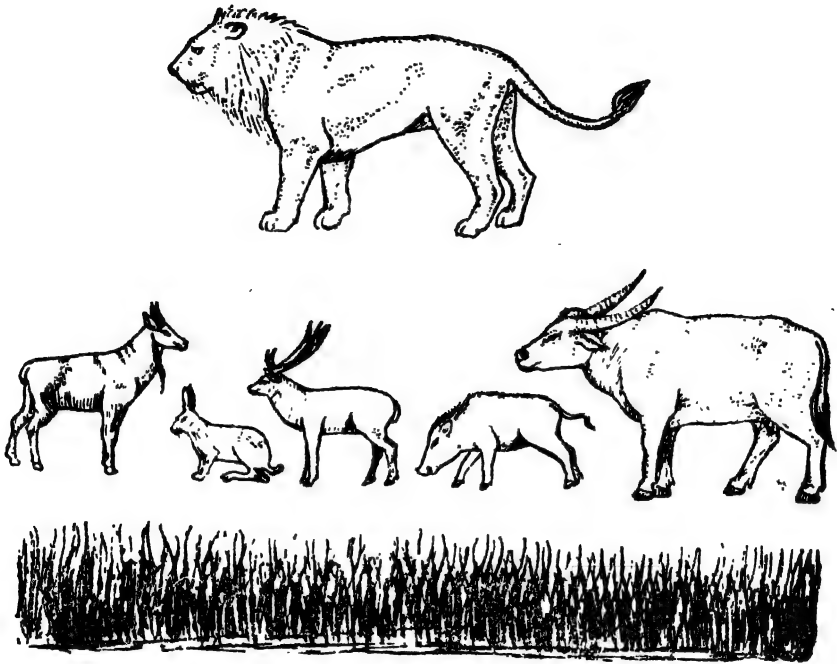
চিত্র ৯। গির-অরণ্যের খাদ্য-পিরামিড

প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণীরা তাদের খাদ্যের জন্যে একান্তভাবে নির্ভর করে ঐ সব তৃণভোজী প্রাণীদের উপরে। এই খাদ্য-শৃঙ্খল নিম্নরূপ :—

সবুজ উদ্ভিদ্——→তৃণভোজী প্রাণী——→মাংসাশী প্রাণী

ঘাস, পাতা	হরিণ, গরু,	বাঘ, সিংহ,
ইত্যাদি	মোষ ইত্যাদি	শিয়াল ইত্যাদি।

এই রকম আর একটি খাদ্য-শৃঙ্খল হ'ল :—

ঘাস——→কীট-পতঙ্গ——→ব্যাঙ——→সাপ——→ময়ূর
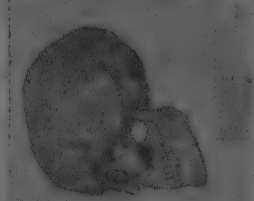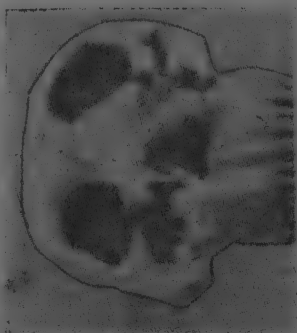
চিত্র ৩৩৮। বিভিন্ন রকম জীবাশ্ম-মানবের করোটি এবং তাদের মুখের গড়ন। 1. অষ্ট্রালোপিথেকাস, 2. পিথেকানথ্রোপাস, 3. নিয়ানডারথাল মানুষ, 4. ক্রমাঞ্জ মানুষ, 5. সমকালীন মানুষ।

আবার এইরকম অপর একটি খাদ্য-শৃঙ্খল হ'ল :—

অ্যাল্‌গি (বা, পিচ্ছিল শেওলা)———→অ্যামিবা———→জলজ কীট-পতঙ্গ
———→ছোট মাছ———→বড় মাছ

এইভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, এই পৃথিবীতে এইরকম খাদ্য-শৃঙ্খল আরও অনেক আছে। আর তা থেকেই বোঝা যাবে যে, খাদ্যের ব্যাপারে একে অন্যের উপরে কতটা নির্ভরশীল। খাদ্য উৎপাদককে (সবুজ উদ্ভিদ্) সবচেয়ে নীচের স্তরে রেখে, তার উপরে দ্বিতীয় স্তরের খাদক এবং তারও উপরে তৃতীয় স্তরের খাদককে রাখলে যে কাল্পনিক পিরামিড পাওয়া যায়, তাকে খাদ্য-পিরামিড বলা হয়।

এ থেকেই বোঝা যায় যে, যে-কোন রকম খাদ্যের অভাব ঘটলে, তার উপর নির্ভরশীল প্রাণীর পক্ষে বেঁচে থাকা কঠিন। মরুভূমিতে জলাভাব, তাই সেখানে গাছপালা বিশেষ জন্মাতে পারে না। আর গাছপালা না থাকায়, সেখানে তৃণভোজী প্রাণীরা থাকতে পারে না। আবার তৃণভোজী প্রাণীরা থাকে না ব'লে, সেখানে মাংসাশী প্রাণীরাও থাকতে পারে না। তুষারাবৃত মেরু-অঞ্চলের অবস্থাও অনেকটা এই রকম। অপরদিকে গভীর অরণ্যে, যেখানে নানাপ্রকার সবুজ উদ্ভিদের সমারোহ, ফুল-ফলের প্রাচুর্য, সেখানেই সাধারণতঃ হরেক রকম প্রাণীরও সন্ধান পাওয়া যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শক্তির উৎস

সূর্যই আমাদের জীবন ও কর্মের প্রেরণাদাতা। সূর্যের অফুরন্ত তেজ-শক্তিকে আশ্রয় ক'রেই পৃথিবী হয়েছে শস্য-শ্যামলা, ফুলে-ফলে ভরা, দিকে দিকে জেগে উঠেছে প্রাণের স্পন্দন।

সূর্য যেন একটি বিশাল আগুনের কুণ্ডের মতো সব সময় দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে। যুগ যুগ ধরে এ থেকে প্রচণ্ড তাপ এবং চোখ-ঝল্‌সানো আলো বেরুচ্ছে। এর কোনো বিরাম নেই।

গ্রীষ্মকালে দুপুরে ঘরে থেকেই গরমে ছটফট করতে হয়, একবার রোদে দাঁড়ালেই বোঝা যাবে, কি রকম অসম্ভব গরম! সূর্য থেকে পৃথিবী প্রায় ন'কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে আছে। সূর্য থেকে এত দূরে থাকা সত্ত্বেও এতটা তাপ পাওয়া যাচ্ছে, এ থেকেই বোঝা যাবে, সূর্যের তাপটা কেমন ভয়ঙ্কর! জ্বলন্ত সূর্য থেকে যে প্রচণ্ড

পৃথিবী সূর্যকিরণের কতটুকু
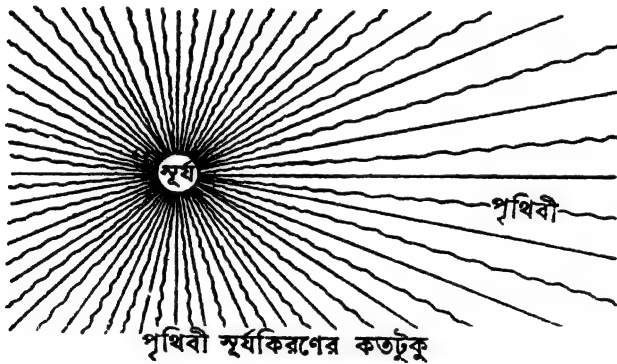
চিত্র

তেজ-রশ্মি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তার অতি সামান্য অংশ (প্রায় ২২০ কোটি ভাগের ১ ভাগ) এই পৃথিবীতে এসে পৌছায়। কিন্তু এতটুকুই কি ভয়ঙ্কর তার হিসেব বিজ্ঞানীরা করেছেন। এর পরিমাণ বছরে প্রায় $১২\cdot৩ \times ১০^{২৩}$ ক্যালরি। তবে এর সবটা ভূপৃষ্ঠে এসে পৌছায় না। এর কিছু অংশ মেঘ, ধূলি, ধোঁয়া প্রভৃতিতে প্রতিফলিত হয়ে আবার মহাশূন্যে ফিরে যায়। আর যেটুকু পৌছায়,

তারও কিছু অংশ আবার ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত হয়ে চলে যায়। এইভাবে শেষ পর্যন্ত যে পরিমাণ তেজ-রশ্মি ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছায়, তারই ফলে ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা হয়েছে জীবন ধারণের অনুকূল। বিভিন্ন ঋতুতে এই উষ্ণতা ওঠা-নামা করলেও তা জীবের সহ্য-সীমার মধ্যেই থাকে।

যতটা তেজ-রশ্মি পৃথিবীতে পৌঁছায়, তার এক সামান্য অংশ এসে পড়ে সবুজ উদ্ভিদের উপরে। হিসেব ক'রে দেখা গেছে, ঐ তেজ-রশ্মির দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র সবুজ উদ্ভিদ্ কাজে লাগাতে পারে। এর পরিমাণ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৪×১০^{১৩} ক্যালরি।

আর একটি কথা। একটি প্রিজম্ বা তিন-শিরা কাচের ভিতর দিয়ে সূর্য-রশ্মি পাঠালে, তা সাতটি বর্ণে ভাগ হয়ে যায়। এর ফলে পাওয়া যায় সাতটি বর্ণের আলোর পটি—বেগনী, নীল, আকাশী, সবুজ, হলুদ, কমলা এবং লাল। এরই নাম **সৌর বর্ণালী** (solar spectrum)।

বিজ্ঞানীদের মতে, আলো হ'ল এক প্রকার তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ। বিভিন্ন আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বিভিন্নরূপ (ঢেউয়ের পাশাপাশি দু'টি উচ্চতম স্থানের মধ্যবর্তী দৈর্ঘ্যকে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বলা হয়)। এর আগে যে সাতটি রঙের কথা বলা হ'ল, তাতে বেগনী থেকে আরম্ভ ক'রে লাল আলোর দিকে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ, দৃশ্যমান আলোর মধ্যে বেগনী আলোর তরঙ্গ ক্ষুদ্রতম, আর লাল আলোর তরঙ্গ দীর্ঘতম। তবে সেন্টিমিটারের মাপে তা-ও খুবই ছোট।†

আলোর গতিবেগ=তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য × কম্পন-সংখ্যা

$$= ৩ \times ১০^{১০} \text{ সে. মি. —প্রতি সেকেণ্ড}$$

[বিশেষ দ্রষ্টব্য :—তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বাড়লে, কম্পন-সংখ্যা কমে, আবার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কমলে, কম্পন-সংখ্যা বাড়ে। কারণ, নির্দিষ্ট মাধ্যমে আলোর গতিবেগ অপরিবর্তিত থাকে।]

বেগনী আলোর সীমা ছাড়িয়ে পাওয়া যায় **অতিবেগনী রশ্মি** (Ultra-violet rays), এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বেগনী আলোর চেয়ে কম। একে আমরা চোখে দেখতে পাই না, এর অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় ফটোগ্রাফ-ফলকের সাহায্যে। আবার লাল আলোর সীমা ছাড়িয়ে পাওয়া যায় **অবলোহিত বা লাল-উজানী রশ্মি**

† প্রকৃতপক্ষে, বেগনী আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হ'ল ৪০০০ অ্যাংষ্ট্রম, আর লাল আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ৭০০০ অ্যাংষ্ট্রম।

১ অ্যাংষ্ট্রম $= ১০^{-৮}$ সেন্টিমিটার = ০·০০০০০০০১ সেন্টিমিটার।

(Infra-red rays), এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য লাল আলোর চেয়ে বেশী হয়। একেও আমরা চোখে দেখতে পাই না, এ আমাদের অনুভূতিতে ধরা দেয় তাপ-রশ্মি রূপে।

সবুজ উদ্ভিদে সবুজ ক্লোরোফিল থাকে, তাই তা সূর্য-রশ্মি ধরে কাজে লাগাতে পারে। কোনো প্রাণী সূর্য-রশ্মি ধরে তার সাহায্যে খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না। কারণ, তার দেহে সবুজ ক্লোরোফিল নেই।

[তবে আমাদের দেহে সূর্য-রশ্মি পড়লে, একটা উপকার হয়—অতিবেগনী রশ্মির সহায়তায় আমাদের দেহে ভিটামিন-ডি উৎপন্ন হয়।]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সবুজ জিনিস অন্য সব রকম আলো শোষণ ক'রে শুধু সবুজ আলো ফিরিয়ে দেয়। সবুজ উদ্ভিদ্ সবুজ আলো শোষণ করতে পারে না। সুতরাং, কোনো সবুজ উদ্ভিদ্ যদি শুধু সবুজ আলো পায় (অর্থাৎ, অন্য কোন প্রকার আলো না পায়), তাহ'লে তার পক্ষে সালোক-সংশ্লেষ করা সম্ভব হবে না। কারণ, তখন সবটা আলোই প্রতিফলিত হয়ে যাবে, কিছুই শোষিত হবে না। এই অবস্থায় খাদ্যের অভাবে গাছটি অল্প সময়ের মধ্যেই মরে যাবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বায়ু ও জীব-জগৎ

জন্মের মুহূর্ত থেকেই বায়ুকে আমরা জীবন-ধারণের প্রধান সহায়রূপে উপলব্ধি করে আসছি। যার অভাবে আমরা মুহূর্তেই অচেতন হয়ে পড়ি, শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে নাভিশ্বাস উঠে পড়ে, এহেন বায়ু সম্পর্কে আমরা যে সতত সচেতন থাকব তাতে আর আশ্চর্য কি? শৈশবে যদি ক্ষুধার সময় প্রাণপণ চীৎকার করেও মাকে আমার ক্ষুধা সম্বন্ধে সচেতন করতে না পারতাম, তাহ'লে আজ বায়ুর কাহিনী বলবার বহু পূর্বেই আমার প্রাণবায়ুর কাহিনীই শেষ হয়ে যেত।

আর একটি কথা, আজকাল নানা বক্তার বক্তৃতার বিচিত্র ছন্দে মাঠঘাট, পার্ক, বিধানসভা প্রভৃতি মুখরিত, কিন্তু বায়ু না থাকলে, এদের বাণী কি আমাদের কর্ণকুহরে পৌঁছাত? বিজ্ঞানের কোনো ছাত্র হয়তো বলবেন, বায়ু না থাকলে আমরা তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের সাহায্যেই কথাবার্তা চালাবার ব্যবস্থা করতাম, রেডিওতে যেভাবে গান-বাজনা, বক্তৃতা ইত্যাদি শোনা যায়। সেই বিজ্ঞানী হয়তো মাথা নেড়ে আরও বলবেন, বায়ুর সংস্পর্শে শ্বাসক্রিয়ার ফলে আমাদের দেহ অবিরত ক্ষয়ে যাচ্ছে, আর সেই ক্ষয় পূরণের জন্য খাদ্যের সন্ধানে আমাদের প্রাণপাত পরিশ্রম করতে হচ্ছে। কাজেই বায়ু না থাকলে, বরঞ্চ আমাদের জীবনযাত্রা আরও সহজ হ'ত, খাদ্যের প্রয়োজন থাকত না ব'লে আমাদের পরিশ্রম তো কমতই, তাছাড়া পৃথিবী থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারামারি, কাড়াকাড়ি ইত্যাদিও চিরতরে লোপ পেত। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, এই দার্শনিক বিজ্ঞানীটির চিন্তাধারায় একটি মারাত্মক গলদ রয়ে গেল। একটি ইঞ্জিনে জল ও কয়লা খরচ করলে তবে পাওয়া যায় শক্তি, আর তারই সাহায্যে ইঞ্জিনটি সচল রাখা যায়। তেমনি আমাদের দেহরূপ ইঞ্জিনেও জল ও খাদ্য সরবরাহ করলে তা থেকে দেহের পুষ্টি হয় এবং পরে শ্বাসক্রিয়ার সময় বায়ুর সংস্পর্শে মৃদু-দহন হ'লে তবেই আমরা পেশী-সঞ্চালনের শক্তি পাই। কাজেই বায়ুর অভাবে শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে আমাদের দেহযন্ত্র বিকল হয়ে পড়তো, এবং তার ফলে আমরা যে অচেতন জড়পদার্থে পরিণত হতাম, একথাও কি বৈজ্ঞানিক মহাশয়কে বলে দিতে হবে?

আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রণের অধিপতি এই বায়ু সম্বন্ধে এখন আলোচনা করা যাক। পৃথিবীর চারিদিকে যে গ্যাসীয় আবরণ আছে, তারই নাম বায়ুমণ্ডল (Atmosphere)। পৃথিবীর আকর্ষণে এটি পৃথিবীর সঙ্গে লেগে রয়েছে। বিজ্ঞানীদের অনুমান, উপরদিকে প্রায় এক হাজার মাইল অবধি বায়ুমণ্ডল বিস্তৃত। উপরের বায়ুস্তর নীচের স্তরের উপর ক্রমাগত চাপ দেয়, কাজেই ভূপৃষ্ঠের ঠিক উপরের স্তরই সবচেয়ে ঘন। যত উপরে যাওয়া যায় বায়ুস্তর তত পাতলা। এ রাজ্যের বর্ণসমস্যা নেহাৎ কম নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হ'ল নাইট্রোজেন (শতকরা প্রায় ৭৭·১৬ ভাগ), তারপরই স্থান হ'ল অক্সিজেনের (শতকরা প্রায় ২০·৬০ ভাগ)। জলীয় বাষ্পের পরিমাণও নেহাৎ কম নয় (শতকরা প্রায় ১·৪০ ভাগ)। আর কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ মাত্র ০·০৪ শতাংশ হ'লেও তাকে নাগরিকের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা চলেনা, বরং মাইনরিটিদের মধ্যে ইনিই হলেন সবচেয়ে কুলীন। এছাড়া আর্গন, নিয়ন প্রভৃতি অনেকেই বায়ুরাজ্যের বর্ণসমস্যা বাড়িয়ে দিয়েছে।

বিজ্ঞানীর মতে, নাইট্রোজেন নিতান্তই নিষ্ক্রিয়, অপরদিকে বিশুদ্ধ অক্সিজেন অতিমাত্রায় সক্রিয়। বায়ুতে যদি নাইট্রোজেন না থাকত, তাহ'লে জীবদেহে এবং

নাইট্রোজেনের বিবর্তন-চক্র

চিত্র ১১
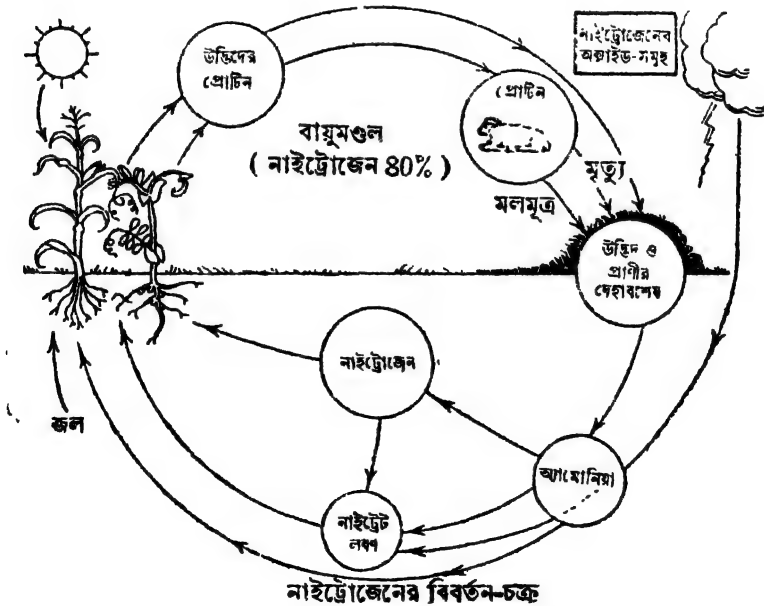
আমাদের আশেপাশে সর্বত্র দহনক্রিয়া এতো সহজ এবং এতো দ্রুত সম্পাদিত হ'ত যে, আমাদের জীবনধারণ করাই অসম্ভব হয়ে পড়তো। অতিরিক্ত সক্রিয় অক্সিজেনের সঙ্গে অতিরিক্ত নিষ্ক্রিয় নাইট্রোজেন মিশ্রিত আছে ব'লেই অক্সিজেনের ক্রিয়া কিছুটা সংযত করা সম্ভব হয়েছে এবং তার ফলে আমাদের জীবন-যাত্রা এমন সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে পারছে। আর একটি কথা, বায়ুমণ্ডলের এই অকর্মণ্য নাইট্রোজেনই যদি আমাদের আহার্যের একটি প্রধান অংশরূপে দেখা না দিত, তবে আমরা নিজেরাই যে কবে অকর্মণ্য হয়ে সর্বপ্রকার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতাম তা ভাবতেও হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। আজকাল ডাক্তাররা কথায় কথায় 'হাই-প্রোটিন' সম্বলিত খাদ্য গ্রহণ করার উপদেশ দেন। কিন্তু সেজাতীয় খাদ্য যে নাইট্রোজেন থেকেই উদ্ভূত একথা কি ভেবে দেখেছেন? ক্ষুধার্ত বালক যেমন কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে খাওয়ার অপেক্ষা রাখেনা, তেমনি আমাদেরও নাইট্রোজেন গ্রহণের কোন নির্দিষ্ট রীতি নেই। তবে প্রধানতঃ দু'টি উপায়ে আমরা বায়ুমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেন পেয়ে থাকি ; যেমন—

(১) আকাশে তড়িৎ-ক্ষরণের সময় বায়ুমণ্ডলের কিছু নাইট্রোজেন অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে নাইট্রোজেনের নানা প্রকার অক্সাইড উৎপন্ন করে। সেগুলি বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশে নাইট্রিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। অনুমান করা হয়েছে যে, সমস্ত পৃথিবীতে এভাবে প্রতিদিন প্রায় ২,৫০,০০০ টন নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। সেই অ্যাসিড ভূমধ্যে প্রবেশ ক'রে নানা প্রকার নাইট্রেট-জাতীয় লবণ প্রস্তুত করে। উদ্ভিদ্ এইসব লবণ শিকড়ের সাহায্যে গ্রহণ ক'রে তা থেকে প্রোটিন-জাতীয় খাদ্য তৈরি করে।

(২) আবার, শিম্ব-জাতীয় (leguminous) গাছপালার শিকড়ে এক প্রকার ব্যাকটিরিয়া (bacteria) (বা, ছত্রাক-জাতীয় অণু-উদ্ভিদ্) ঐসব গাছপালার বন্ধুরূপে বাস করে। এরা বায়ুমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ ক'রে তাই দিয়ে খাদ্য তৈরি করে। এদের কাছ থেকে উদ্ভিদ, কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় খাদ্যের বিনিময়ে, নাইট্রোজেন-ঘটিত খাদ্য আদায় ক'রে নিজ দেহেব পুষ্টি সাধন করে। এর নাম সিম্‌বাইওসিস (Symbiosis) বা মিথোজীবিতা। এইরূপ পরস্পর বোঝাপড়ার ভিত্তিতে বায়ুর নাইট্রোজেন থেকে উদ্ভিদ্-দেহে প্রোটিন-জাতীয় খাদ্য তৈরী হয়। তাছাড়া যে মাটিতে এ-জাতীয় গাছপালা জন্মায়, সেখানেও নাইট্রোজেনের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়।

প্রাণীরা উদ্ভিজ্জাত প্রোটিন গ্রহণ করে, তাইতে তাদের দেহের রক্ত-মাংস তৈরী

হয়। উদ্ভিজ্জাত বা প্রাণী-দেহস্থ প্রোটিন গ্রহণ ক'রেই আমরা দেহের পুষ্টি-সাধন করি। প্রাণী-দেহে গৃহীত প্রোটিন থেকে উদ্ভূত আবর্জনা মল-মূত্রের সঙ্গে ভূপৃষ্ঠে পরিত্যক্ত হয়। সেগুলি, এবং উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর মৃত্যুর পর তাদের দেহাবশেষ, ভূপৃষ্ঠস্থ নানাবিধ ব্যাক্‌টিরিয়ার ক্রিয়ায় পুনরায় নাইট্রোজেনে রূপান্তরিত হয়ে বায়ুতে ফিরে আসে। তারই সাহায্যে আবার নূতনের সৃষ্টি সম্ভব হয়।
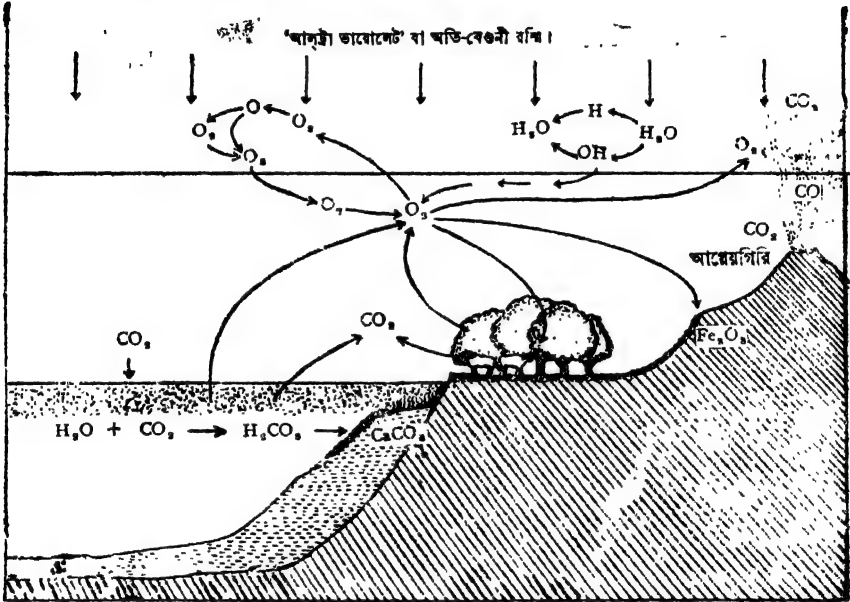
চিত্র ১২। অক্সিজেনের বিবর্তন-চক্র

বায়ুর অক্সিজেন ছাড়া কোন জীবই বাঁচতে পারে না। জীব যখন শ্বাস নেয় তখন তার ফুসফুসে বায়ু প্রবেশ করে। সেই বায়ুর অক্সিজেন-সংস্পর্শে জীবদেহে যে মৃদু-দহন-ক্রিয়া চলে, তাতে জলীয় বাষ্প ও কার্বন ডাই-অক্সাইড্ গ্যাসের সৃষ্টি হয়, এবং সেগুলি বায়ুতে ফিরে আসে। এইভাবে পৃথিবীর অগণিত জীব সর্বদা শ্বাসক্রিয়া চালাচ্ছে ব'লে প্রতি মুহূর্তে বায়ুর অক্সিজেন কমছে, আর কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে। তবে কি এমন দিন আসবে, যখন বায়ুর অক্সিজেন একেবারে ফুরিয়ে যাবে, আর জীব শ্বাস বন্ধ হয়ে মরে যাবে? ভয় নেই, উদ্ভিদ্ আছে ব'লে সে-রকম হ'তে পারবে না। কারণ, উদ্ভিদ্ এই দূষিত বায়ুকে আবার শোধন ক'রে দেয়।

উদ্ভিদ পাতার সাহায্যে বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও শিকড়ের সাহায্যে

মাটির রস গ্রহণ করে। পাতায় সবুজ-কণার সাহায্যে আবার কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলের উপাদান দিয়ে শর্করা-জাতীয় খাদ্য তৈরি করে এবং অক্সিজেন গ্যাস পরিত্যাগ করে। এর ফলে বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কমছে, আর অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়ছে। পৃথিবীতে যদি শুধু উদ্ভিদ্ থাকতো, তাহ'লে অল্পদিন পরেই বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ফুরিয়ে যেত, এবং খাদ্যের অভাবে উদ্ভিদও
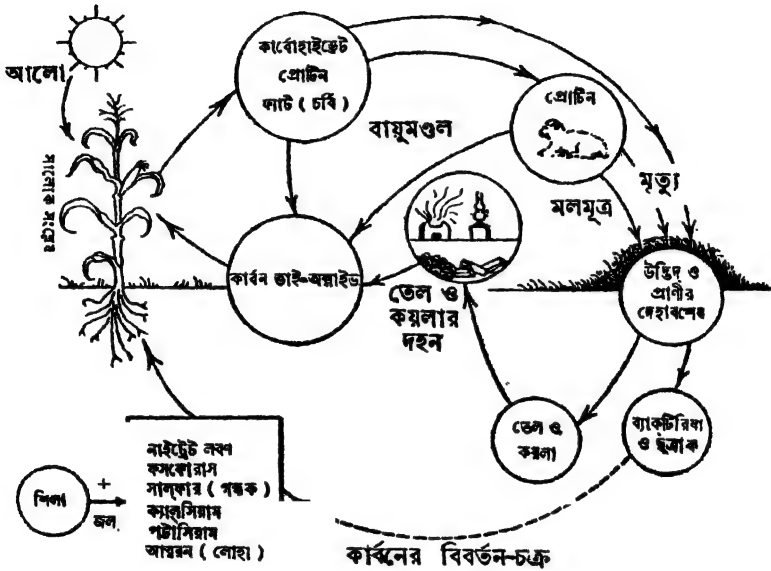
চিত্র ১৩

নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। জীবের শ্বাসক্রিয়া এবং উদ্ভিদের অঙ্গার-আত্তীকরণ-প্রক্রিয়া পাশাপাশি চলছে ব'লেই বায়ুতে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড এই দু'টি গ্যাসের পরিমাণ প্রায় একই রকম থেকে যাচ্ছে।

জল ছাড়াও উদ্ভিদ্ বা প্রাণী কোন জীবই বেঁচে থাকতে পারে না। কারণ, জীবদেহের প্রধান উপাদানই হ'ল জল। আর এইজন্য জলের আর এক নাম জীবন। ভূ-পৃষ্ঠের চার ভাগের প্রায় তিন ভাগই জলে ডুবে আছে। পৃথিবীর এই বিরাট জলের ভাণ্ডার কখনও নিঃশেষ হবার নয়। সূর্যের প্রখর তাপে সমুদ্র, নদ-নদী, খাল-বিল প্রভৃতির জল সর্বদাই বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুর সঙ্গে মেশে। এতে ভূ-পৃষ্ঠের স্থানে স্থানে সাময়িকভাবে জলাভাব ঘটে। সেই অবস্থায় উদ্ভিদ্ এবং উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল

প্রাণীর জীবন ধারণ করাও কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু আবার বর্ষা-সমাগমে বায়ুমণ্ডলে সঞ্চিত জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়েই মেঘের সৃষ্টি করে এবং তাই পরে বৃষ্টির আকারে
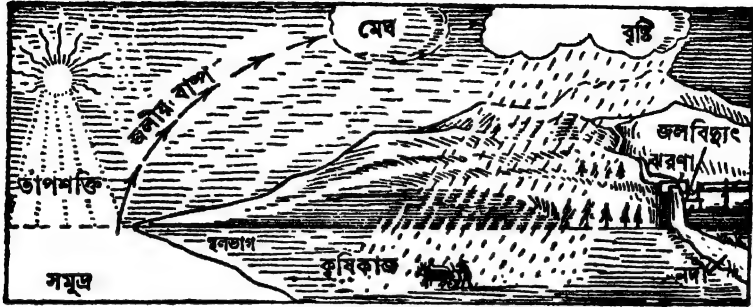
জলের বিবর্তন চক্র

চিত্র ১৪

ভূ-পৃষ্ঠে ফিরে আসে। সেই জলধারায় খাল-বিল, নদ-নদী সব আবার কূলে কূলে ভরে উঠে এবং শুকনো মাটি সরস ও উর্বরা হয়। এর ফলে উদ্ভিদ্ ও প্রাণী সহজেই প্রয়োজনীয় জল সংগ্রহ ক'রে বেঁচে থাকার সুযোগ পায়। জলাভাবে একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হওয়া আশ্চর্য নয়, যেমন দেখা যায় রাজপুতনা, সাহারা প্রভৃতি অঞ্চলে। যুগ যুগ ধ'রে বায়ুমণ্ডলে এইভাবে জলের আদান-প্রদান চলছে বলেই উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর জীবনযাত্রা এতো সহজ হয়েছে।

বায়ু যেন আমাদের দীনবন্ধু দাদার ভাণ্ডার। এ থেকে উদ্ভিদ্ ও প্রাণী যখন যা দরকার তাই পেয়ে বেঁচে থাকছে। কিন্তু এ ভাণ্ডার কখনও ফুরাবার নয়। এ থেকে যতই খরচ হচ্ছে, প্রকৃতির নিয়মে তা আবার আপনা থেকেই পূরণ হয়ে থাকছে। আর তাইতে পুরাতনের পুষ্টি ও নূতনের সৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে।

তৃতীয় পর্ব

জৈবনিক প্রক্রিয়াসমূহ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সালোক-সংশ্লেষ

বর্তমানে মানুষই হ'ল এই পৃথিবীর অধিপতি। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে—সর্বত্রই তার অবাধ গতিবিধি। মোট সংখ্যা এবং ওজন সবদিক দিয়েই, একমাত্র মাছ ছাড়া, আর সকল জীবকেই সে এখন ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু একদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, সে নগণ্য শেওলার চেয়েও অধম। কারণ, ক্ষুদ্রতম সবুজ শেওলাটিও নিজের খাদ্য নিজেই তৈরি ক'রে নিতে পারে, কিন্তু খাদ্যের ব্যাপারে মানুষ একান্তভাবে পরনির্ভরশীল। তার প্রয়োজনীয় সব রকম খাদ্যই তাকে সংগ্রহ ক'রে নিতে হয় অপর কোন উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর কাছ থেকে।

এই পৃথিবীতে, কিংবা অপর কোন গ্রহে, সবুজ উদ্ভিদকে বাদ দিয়ে অন্য কোন জীবের অস্তিত্বের কথা কল্পনাও করা যায় না। কারণ, বিজ্ঞানীরা বলেন যে, একমাত্র সবুজ উদ্ভিদের পক্ষেই অজৈব উপাদান থেকে জীবন-ধারণের জন্য অত্যাবশ্যক কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrates) বা শর্করা, প্রোটিন (Proteins) এবং স্নেহ (Fats)-জাতীয় জৈব যৌগগুলি প্রস্তুত করা সম্ভব। আর এ কাজের প্রধান সহায়ক হ'ল সৌর শক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার। বিজ্ঞানীরা শত চেষ্টা ক'রেও আজ অবধি ল্যাবরেটরীতে কৃত্রিম উপায়ে এই বিক্রিয়া সম্পাদন করতে সক্ষম হন নি। অথচ কি আশ্চর্য, সুবিশাল মহীরুহ থেকে আরম্ভ ক'রে ক্ষুদ্রতম শেওলা পর্যন্ত প্রতিটি সবুজ উদ্ভিদ্ প্রতিদিন অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে এই বিক্রিয়া সাধন ক'রে চলেছে!

বিজ্ঞানীদের অনুমান, এই পৃথিবীতে সবুজ উদ্ভিদের সহায়তায় প্রতি বছর প্রায় ১৫০ মহাপদ্ম* টন কার্বন ২৫ মহাপদ্ম টন হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিলিত হয়, এবং তার ফলে ৪০০ মহাপদ্ম টন অক্সিজেন মুক্ত হয়। অনেকেই হয় তো জানেন না যে, এর প্রায় ৯০ শতাংশ বিক্রিয়াই সম্পাদিত হয় সমুদ্রে, জলের তলায়, নানা প্রকার সবুজ শেওলার সহায়তায়। আর বাকি ১০ শতাংশ মাত্র সম্পাদিত হয় ডাঙ্গায়, সবুজ গাছপালার সহায়তায়।

এইভাবে সংশ্লেষিত জৈব পদার্থসমূহের অতি সামান্য অংশ পরে ব্যবহৃত হয় নানারকম প্রাণীর খাদ্য হিসেবে। সে তুলনায় অনেক বেশী অংশ ব্যয়িত হয় ঐ সব উদ্ভিদেরই শ্বাসক্রিয়া এবং অন্যান্য জৈবনিক কার্যকলাপ সম্পাদনের জন্য। তবে মৃত উদ্ভিদ্ এবং পাতার পচনকালে বেশীর ভাগই বিয়োজিত হয়ে পুনরায় কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), জল (H_2O) এবং বিবিধ লবণে পরিণত হয়ে যায়।

সালোক-সংশ্লেষ সম্পর্কে গবেষণার সূত্রপাত করেন ইংরেজ বিজ্ঞানী যোসেফ প্রিস্টলী। ১৭৭২ সালে তিনি ঘোষণা করেন,—"মোমবাতি জ্বলার দরুন বাতাস দূষিত হয়, কিন্তু সেই দূষিত বাতাসকে পরিশুদ্ধ করার এক সার্থক প্রয়াস যে প্রকৃতিই ক'রে রেখেছে—দৈবাৎ এই তথ্য আবিষ্কার ক'রে আমি আনন্দে অভিভূত হলাম। প্রকৃতপক্ষে কাজটা করে উদ্ভিদ্। এরূপ ধারণা করা খুবই স্বাভাবিক যে, যেহেতু উদ্ভিদ্ ও প্রাণী উভয়েরই বাতাসের প্রয়োজন হয়, সেহেতু উভয়েই একই পদ্ধতিতে বাতাসকে দূষিত করে। স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, আমারও এই রকমই ধারণা ছিল, যখন আমি একটি ছোট্ট মিণ্ট-গাছ (**Mint=aromatic kitchen herb**) একটি জলের পাত্রে একটি কাচের জার দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম। কিন্তু গাছটি যখন এইভাবে মাসের পর মাস ধরে বড় হতে লাগল, তখন আমি দেখলাম যে, জারের ঐ বাতাস না পারলো জ্বলন্ত মোমবাতি নেভাতে, না পারলো একটি জ্যান্ত ইঁদুরের কোনরকম অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটাতে।"
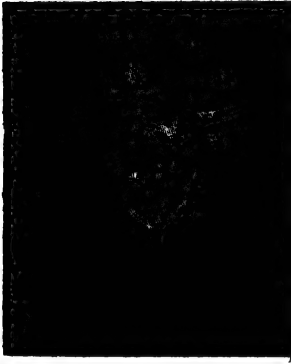
চিত্র ১৫। যোসেফ প্রিস্টলী

এই সামান্য কয়েকটি কথায় প্রিস্টলী জীব-বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার

---

* এক মহাপদ্ম = 1 billion = 10^{12}

বর্ণনা দেন। বলা বাহুল্য, উদ্ভিদ্ যে মুক্ত অক্সিজেন তৈরি করতে সক্ষম, এ তথ্য তিনিই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন।
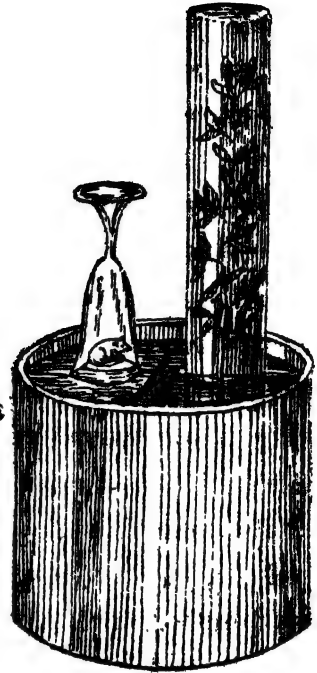
চিত্র ১৬। যোসেফ প্রিষ্টলী বলেন,—আমি একটি ছোট্ট মিণ্ট-গাছ একটি কাচের জার দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম। কিন্তু গাছটি যখন এইভাবে মাসের পর মাস ধরে বড় হতে লাগল, তখন আমি দেখলাম যে, জারের ঐ বাতাস না পারলো জ্বলন্ত মোমবাতি নেভাতে, না পারলো একটি জ্যান্ত ইঁদুরের কোন রকম অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটাতে।

এর সাত বছর পরে অস্ট্রীয় বিজ্ঞানী ইয়ান ইংগেন-হাউস এই ঘটনার আর একদিকে আলোকপাত করেন। ১৭৭৯ সালে একটি প্রবন্ধে তিনি লেখেন,—"ডঃ প্রিস্টলীর পরীক্ষায় যেমন দেখা গেছে, আমিও সেরকম দেখলাম যে, উদ্ভিদ্ আট-দশ দিনের মধ্যেই দূষিত বাতাসকে পরিশুদ্ধ করতে পারে। তবে এই শোধন-ক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে উদ্ভিদের মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে। এই বিস্ময়কর প্রক্রিয়ায় প্রধান ভূমিকা উদ্ভিদের, একথা কিন্তু ঠিক নয়। কারণ, উদ্ভিদের উপর সূর্যালোকের ক্রিয়ার ফলেই একাজ সংঘটিত হয়। ······আমি দেখলাম, পরিষ্কার দিনে সূর্যালোকের পরিমাণ যত বাড়ে, এই প্রক্রিয়াও তত দ্রুত সংঘটিত হয়, অপরাহ্ণে তা ক্রমশঃ কমে আসে, আর সূর্যাস্তের পরে এই প্রক্রিয়া একেবারে থেমে যায়। আরো দেখলাম, গোটা গাছটি নয়, শুধু সবুজ পাতা এবং সবুজ ডালপালাই এই ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ ক'রে থাকে।"

এইভাবে আবিষ্কৃত হ'ল যে, সালোক-সংশ্লেষের জন্য সূর্যালোক এবং সবুজ-

কণা বা ক্লোরোফিল সমভাবেই প্রয়োজন। এর অল্পদিন পরেই আর একটি নতুন তথ্য সংযোজিত হ'ল। ১৭৮২ সালে জেনেভার পাদ্রি জঁ্যা সেনেবিয়ার বললেন,—"বাতাসে স্থির-বায়ুর (Fixed-air) (অর্থাৎ, কার্বন ডাই-অক্সাইডের) পরিমাণ মাত্র ·০৩ শতাংশ। কিন্তু বাতাস থেকে এই সামান্য গ্যাসটুকু অপসারিত করলেই দেখা যাবে, অক্সিজেন উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে।"

এইসব ঘটনার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ফরাসী বিজ্ঞানী আঁতোয়ান ল্যাভয়সিয়ার বললেন,—"সূর্যালোকে সবুজ উদ্ভিদ্ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস শোষণ করে এবং তারপর অক্সিজেন পরিত্যাগ করে।"

এখন প্রশ্ন, তাহ'লে কার্বন ডাই-অক্সাইডের অপর উপাদান কারবন-এর কী হয়? এর সঠিক উত্তর দিলেন ইংগেন-হাউস। ১৭৯৬ সালে তিনি বললেন,—"উদ্ভিদের পুষ্টির প্রধান উপাদান হ'ল কারবন। অর্থাৎ, সালোক-সংশ্লেষ যে শুধু মানুষ এবং অন্যান্য জীবজন্তুর হিতার্থেই সম্পাদিত হয়, তা নয়, এই প্রক্রিয়াটি হয় প্রধানতঃ উদ্ভিদসমূহের নিজেদের স্বার্থেই।"

১৮০৪ সালে জেনেভার আর এক বিজ্ঞানী নিকোলাস থিওডোর দ্য সসার আর একটি হারানো সূত্রের সন্ধান দিলেন। তিনি বললেন, সালোক-সংশ্লেষের জন্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়া জলেরও প্রয়োজন হয়। আর সূর্যালোকে, সবুজ-কণার সহায়তায়, এই দু'টি উপাদান থেকেই তৈরী হয় জৈব পদার্থ এবং অক্সিজেন।

$$\text{কার্বন ডাই-অক্সাইড} + \text{জল} \xrightarrow[\text{আলোক}]{\text{সবুজ-কণা}} \text{জৈব পদার্থ} + \text{অক্সিজেন}$$

গাছের শাখা-প্রশাখায় অবস্থিত চেপ্টা সবুজ রঙের অঙ্গকে বলা হয় পাতা। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যায়, গাছের পাতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক কোষ দ্বারা গঠিত। বিভিন্ন কোষে প্রচুর সবুজ-কণা বা ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে ব'লে পাতা সবুজ দেখায়। এর প্রধান উপাদান ক্লোরোফিল। আর এ থেকেই উদ্ভিদ-জগতে যত প্রকার বৈচিত্র্যের উদ্ভাবন হয়েছে। এমনিতে ক্লোরোফিল নিষ্ক্রিয়। কিন্তু যে শক্তি নিষ্ক্রিয় ক্লোরোফিলকে সক্রিয় ক'রে তুলতে পারে, তা কেবলমাত্র সূর্য-রশ্মি থেকেই পাওয়া সম্ভব। সূর্যের সেই শক্তি গ্রহণ করেই ক্লোরোফিল উদ্ভিদের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজটি অত্যন্ত নিপুণভাবে সম্পন্ন করে। প্রাণিদেহে সবুজ-কণা বা ক্লোরোফিল থাকে না, এজন্য প্রাণীরা সূর্য-রশ্মিকে কাজে লাগিয়ে খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না।

বিজ্ঞানীরা হিসেব ক'রে দেখেছেন, যে পরিমাণ আলোক-রশ্মি সবুজপাতায় পড়ে,

তার ৮০ শতাংশ অবশোষিত হয়, ১৫ শতাংশ প্রতিফলিত হয়, আর প্রায় ৫ শতাংশ বায়ুমণ্ডলে বিনষ্ট হয়। আবার, অবশোষিত রশ্মির মাত্র ২০ শতাংশ

চিত্র ১৭। সালোক-সংশ্লেষ—যে পরিমাণ আলোক-রশ্মি সবুজ পাতায় পড়ে, তার ৮০ শতাংশ অবশোষিত হয়, ১৫ শতাংশ প্রতিফলিত হয়, আর প্রায় ৫ শতাংশ বায়ুমণ্ডলে বিনষ্ট হয়। আবার, অবশোষিত রশ্মির মাত্র ২০ শতাংশ কাজে লাগিয়ে সবুজ পাতা সালোক-সংশ্লেষ-প্রক্রিয়া সম্পাদন করতে সক্ষম হয়।
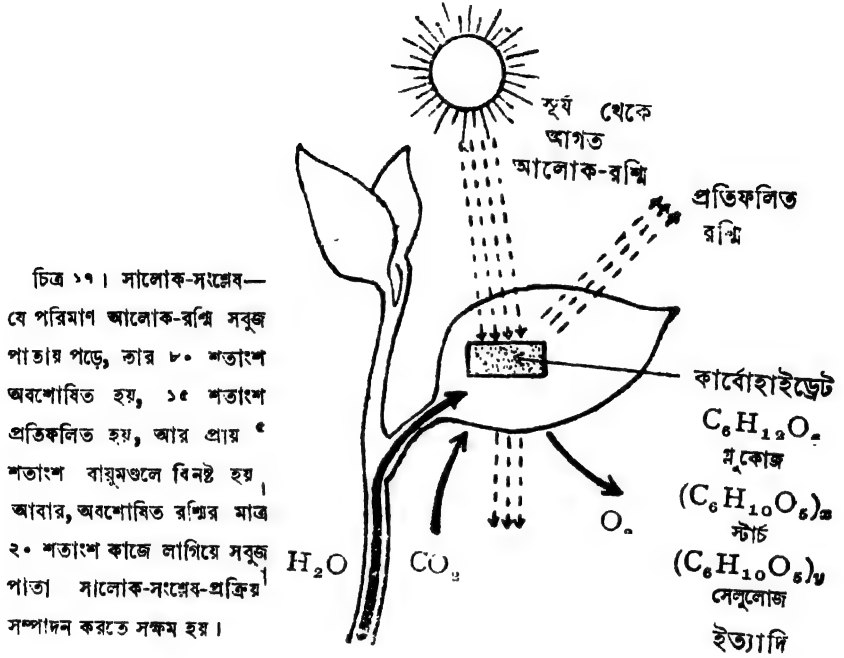
কাজে লাগিয়ে সবুজ পাতা সালোক-সংশ্লেষ-প্রক্রিয়া (Photosynthesis) সম্পাদন করতে সক্ষম হয়।

সূর্য-রশ্মি থেকে প্রাপ্ত শক্তির সহায়তায়, সবুজ পাতায় ক্লোরোফিল বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস এবং মাটি থেকে প্রাপ্ত জলের সাহায্যে কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrate) বা শর্করা-জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে, আর সেই সঙ্গে অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলে ফিরিয়ে দেয়। এজন্য প্রতিটি গাছের পাতাই চায় বেশী ক'রে অলোক-রশ্মি পেতে। তাইতো দেখা যায়, সকল পত্রপল্লব এক জায়গায় স্তূপীকৃত অবস্থায় না থেকে, ডালপালার উপরে নানা ভঙ্গিমায় অবস্থান করে, যাতে প্রত্যেকের পক্ষেই যথাসম্ভব বেশী পরিমাণ আলো পাওয়া সম্ভব হয়। যে লতাটি দুর্বল, সেও অন্ধকারে পড়ে থাকে না, অন্য কোন সবল বৃক্ষকে অবলম্বন ক'রে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় আলোর সন্ধানে।

গাছের পাতায় অনেক রন্ধ্র বা ছিদ্র আছে। পাতার ওপর সূর্যকিরণ পড়লে, এ-সব ছিদ্রের মুখ খুলে যায় এবং বায়ুর সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস পাতার
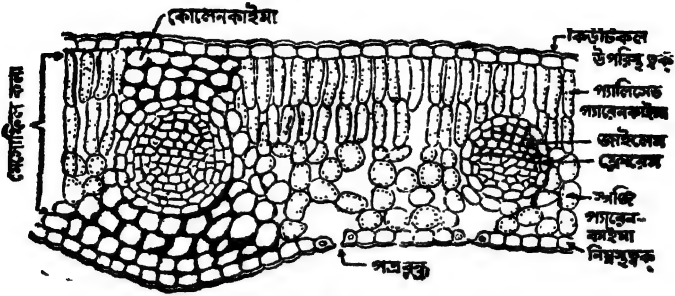
চিত্র ১৮। দ্বি-বীজপত্রী উদ্ভিদের পাতার প্রস্থচ্ছেদ।

মধ্যে প্রবেশ করে। এই গ্যাস মাটি থেকে সংগৃহীত রসের সঙ্গে মিশে যায়। সূর্য-কিরণ এবং সবুজ-কণার সাহায্যে তা থেকে কার্বন-ঘটিত খাদ্য তৈরী হয়, আর অক্সিজেন গ্যাস পাতার ছিদ্রপথে বায়ুমণ্ডলে পরিত্যক্ত হয়। এভাবে প্রথমে শর্করা (যেমন, গ্লুকোজ বা দ্রাক্ষা-শর্করা) এবং পরে স্টার্চ, সেলুলোজ প্রভৃতি কার্বোহাইড্রেট
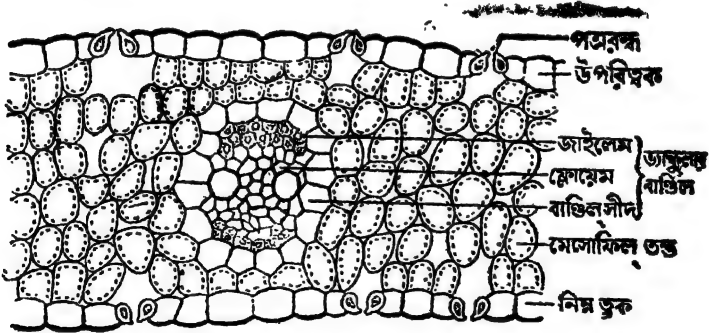
চিত্র ১৯। এক-বীজপত্রী উদ্ভিদের পাতার প্রস্থচ্ছেদ।

তৈরী হয়। একেই বলা হয় সালোক-সংশ্লেষ (Photosynthesis) বা অঙ্গার-আত্তীকরণ প্রক্রিয়া (Carbon-assimilation)। পাতা যেন উদ্ভিদের রান্নাঘর। এখানে নানারকম খাদ্য প্রস্তুত হয়। উদ্ভিদ্ তাই খেয়ে জীবন ধারণ করে। তবে এখানে যে পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন হয়, তার সবটা তখনই খরচ হয় না। উদ্বৃত্ত অংশ উদ্ভিদ-দেহের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ভাঁড়ার-ঘরে সঞ্চিত থাকে, ভবিষ্যতের জন্ত। এই সব সঞ্চিত খাদ্যই মানুষ বা অন্যান্য প্রাণী তাদের খাদ্যরূপে ব্যবহার ক'রে থাকে।

উপরিউক্ত বিক্রিয়াটি সংক্ষেপে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :—

$$n\,CO_2 + n\,H_2O \longrightarrow (CH_2O)_n + nO_2$$
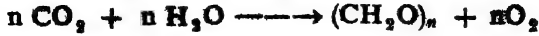
প্রকৃতপক্ষে বিক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল, এবং অনেকগুলি ছোটখাট বিক্রিয়ার ফলে কার্বোহাইড্রেট প্রস্তুতি-পর্ব সমাপ্ত হয়।

[শক্তিশালী ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে পরীক্ষা করলে দেখা যায়, সবুজ-কণার মধ্যে ক্লোরোফিল 'গ্রানা' (Grana) নামক অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র স্তরে সজ্জিত থাকে। গ্রানার চারিদিকে থাকে 'স্ট্রোমা' (Stroma) নামক পদার্থ। সাম্প্রতিক-কালের গবেষণার ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, সালোক-সংশ্লেষ সংক্রান্ত সমগ্র বিক্রিয়াটি পৃথক্ দু'টি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। ক্লোরোফিলযুক্ত অংশ গ্রানা-তে আলোক-দশা এবং ক্লোরোফিলবিহীন অংশ স্ট্রোমা-তে অন্ধকার দশা সংঘটিত হয়ে থাকে।

(১) **আলোক দশা (Light Phase, or Photo-chemical Reactions)**—ক্লোরোফিল সূর্যালোক থেকে আলোক-কণা 'ফোটন' (Photon) শোষণ ক'রে
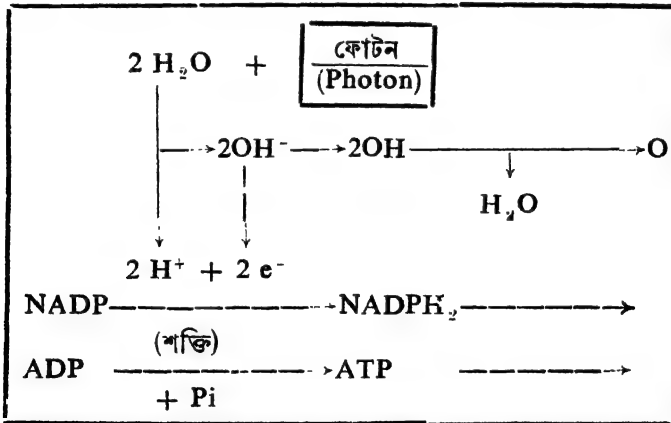
সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই সক্রিয় ক্লোরোফিল কোষস্থ জল (H_2O)-কে হাইড্রোজেন (H^+) এবং হাইড্রক্সিল (OH^-) আয়নে বিভক্ত করে। তারপর কতকগুলি রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে, একদিকে হাইড্রক্সিল আয়ন (OH^-)-গুলি থেকে উৎপন্ন হয় জল (H_2O) এবং অক্সিজেন (O_2), অপরদিকে হাইড্রোজেন (H^+) গিয়ে নিকোটিন্যামাইড অ্যাডেনিন ডাই-নিউক্লিওটাইড ফস্‌ফেটকে, সংক্ষেপে NADP-কে, বিজারিত (Reduce) বা অপচিত ক'রে তৈরি করে $NADPH_2$. প্রকৃতপক্ষে দু'টি হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে একটি ঐ অণুর সঙ্গে যুক্ত হয়, আর অন্যটি ইলেক্‌ট্রন

পরিত্যাগ ক'রে একটি হাইড্রোজেন আয়ন (H^+)-রূপে নির্গত হয়। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি বিক্রিয়া সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ অ্যাডেনোসিন ডাই-ফস্‌ফেট, সংক্ষেপে ADP, এবং অজৈব ফস্‌ফেট (Pi)-এর মধ্যে বিক্রিয়া ঘটে। এর ফলে পাওয়া যায় অ্যাডেনোসিন ট্রাই-ফস্‌ফেট, সংক্ষেপে ATP। $NADPH_2$ এবং ATP কার্বন ডাই-অক্সাইড সদ্ব্যবহার করার শক্তি সরবরাহ করে।

(২) **অন্ধকার দশা** (Dark Phase, or Dark Reactions)—এই পর্যায়ে সূর্যালোকের কোন প্রয়োজন হয় না, তবে এক্ষেত্রে একাধিক উৎসেচক (Enzyme) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

অবশোষিত কার্বন ডাই-অক্সাইডের সদ্ব্যবহার এবং কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় খাদ্য উৎপাদন এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তবে সমগ্র বিক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল
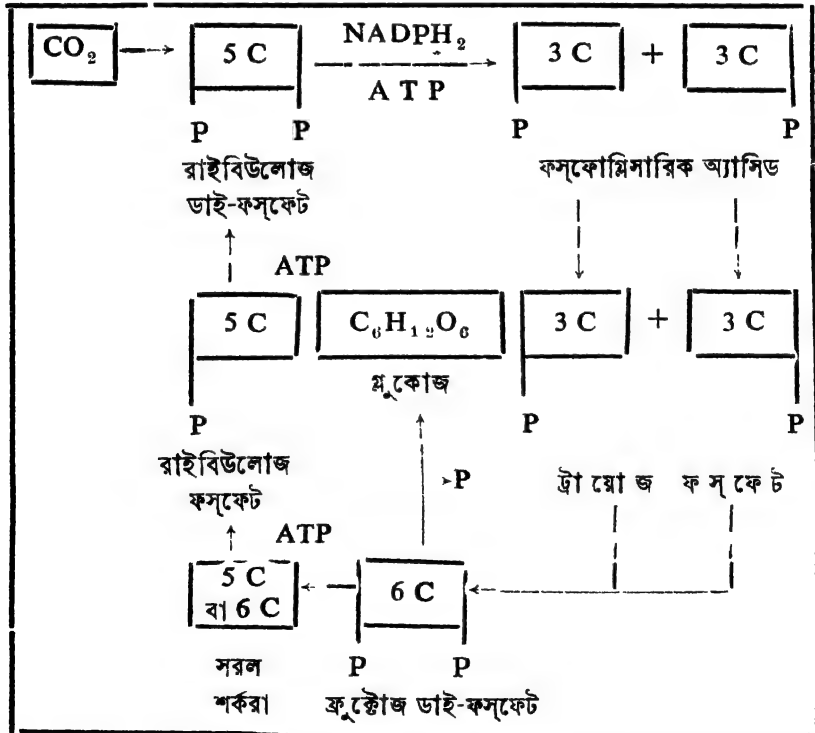
এবং পরপর সুশৃঙ্খলভাবে সংঘটিত অনেকগুলি ছোট ছোট বিক্রিয়ার মাধ্যমে তা নিষ্পন্ন হয়ে থাকে। আলোক দশায় উৎপন্ন $NADPH_2$ এবং ATP সম্মিলিত-ভাবে অন্ধকার দশার বিক্রিয়াগুলি এগিয়ে নিয়ে যায়।

৫-কার্বন যৌগ রাইবিউলোজ ডাই-ফস্‌ফেট প্রথমে কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ ক'রে একটি দুস্থিত (unstable) ৬-কার্বন যৌগে পরিণত হয়। এটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে দু'টি ৩-কার্বন যৌগ উৎপন্ন করে। এদের একটি হ'ল ফস্‌ফোগ্লিসারিক অ্যাসিড। এটি বিজারিত (Reduced) বা অপচিত হয়ে ফস্‌ফোগ্লিসার্যাল্‌ডিহাইডে পরিণত হয়। কয়েকটি জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে এ থেকেই উৎপন্ন হয় ৬-কার্বন যৌগ গ্লুকোজ (বা, দ্রাক্ষা-শর্করা)। আবার তা থেকেই পরে উৎপন্ন হয় স্টার্চ, সেলুলোজ প্রভৃতি কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় পদার্থ।

বিজ্ঞানী মেল্‌ভিন ক্যাল্‌ভিন-এর সুদীর্ঘকালের গবেষণার ফলে সালোক-সংশ্লেষ সংক্রান্ত এইসব বিক্রিয়ার কথা আমরা জানতে পেরেছি। এজন্যে এই বিজ্ঞানীকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে।]

খাদ্যদ্রব্য ছাড়াও আরও নানাপ্রকার উদ্ভিজ্জ দ্রব্য আমরা নিত্য ব্যবহার ক'রে থাকি। তুলো, কাগজ প্রভৃতি সেলুলোজ-জাতীয় পদার্থ। এগুলি সালোক-সংশ্লেষের ফলে উৎপন্ন প্রাথমিক পদার্থেরই পরিবর্তিত রূপ। এছাড়া চা, কফি, কোকো, নানাপ্রকার ভেষজ ওষুধ, তেল, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি কত জিনিস আমরা ব্যবহার করি! সালোক-সংশ্লেষের ফলে উদ্ভিদ-দেহে যে সব কাঁচামাল (raw materials) উৎপন্ন হয়, উদ্ভিদ্ তার নিজস্ব ল্যাবরেটরীতে সেই সব কাঁচামালের সদ্ব্যবহার করেই যেন ঐ সব জিনিস আমাদের জন্য তৈরি ক'রে রাখে।

সূর্য থেকে যে সব শক্তি নিয়ত বিকীর্ণ হয়, তার মধ্যে শুধু আলোক-শক্তিকেই সবুজ পাতা গ্রহণ করে এবং নিজদেহে নানাভাবে সঞ্চয় ক'রে রাখে। পরে তা থেকেই পাওয়া যায় রাসায়নিক শক্তি—তাপ-শক্তি। সভ্য মানুষ অগ্নি-উৎপাদনের জন্য যে জ্বালানি কাঠ ব্যবহার করে, তা গাছেরই সঞ্চিত পদার্থ। অনেকেই হয়তো বলবেন যে, বর্তমান সভ্য-জগৎ কাঠের চেয়ে কয়লা ও খনিজ তেলের উপরে অনেক বেশী পরিমাণে নির্ভরশীল। কিন্তু ভুললে চলবে না যে, এগুলিও আদিযুগের উদ্ভিদ্ এবং সমুদ্রের তলায় অবস্থিত নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর দেহাবশেষ থেকেই উৎপন্ন হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, প্রতিটি প্রাণীই শ্বাসক্রিয়া সম্পাদন করে। এসময় বায়ুর অক্সিজেন গৃহীত হয় এবং তারই সাহায্যে কোষে কোষে মৃদু-দহন-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এর ফলে প্রাণী-দেহে শক্তির সৃষ্টি হয়। সেই শক্তির সাহায্যেই প্রাণীরা অঙ্গ-সঞ্চালন ক'রে জীবনীশক্তির পরিচয় দেয়। শ্বাসকার্যের ফলে কার্বন ডাই-

অক্সাইড গ্যাস এবং জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়। প্রাণীর নিঃশ্বাসের সঙ্গে এগুলি বায়ুমণ্ডলে পরিত্যক্ত হয়।

উদ্ভিদও পাতার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়। উদ্ভিদ্ প্রধানতঃ পাতার ছিদ্রপথে বাতাসের অক্সিজেন গ্রহণ করে। এই অক্সিজেনের সাহায্যে কোষে কোষে মৃদু-দহন-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আর তার ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস, জলীয় বাষ্প এবং তাপ-শক্তি উৎপন্ন হয়। এই সব গ্যাস পাতার ছিদ্রপথে বেরিয়ে যায়।

উদ্ভিদের শ্বাসকার্য দিনরাত সমানভাবে চলে। এজন্য সবুজ-কণা বা সূর্য-কিরণের কোন প্রয়োজন হয় না। দিনের বেলা পাতার মধ্যে অঙ্গার-আত্তীকরণ-প্রক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুত চলতে থাকে ব'লে শ্বাসক্রিয়া যেন ঢাকা পড়ে যায়। রাতের বেলা আলোর অভাবে অঙ্গার-আত্তীকরণ-প্রক্রিয়া বন্ধ থাকে, তাই তখন শুধু শ্বাসক্রিয়া বোঝা যায়। এ সময় কেবল অক্সিজেন গৃহীত হয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও জলীয় বাষ্প পরিত্যক্ত হয়।

শ্বাসকার্যের ফলে উদ্ভিদ্ যে শক্তি অর্জন করে, তার সাহায্যেই সে কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা-জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে। এই খাদ্যই পরে, শক্তি উৎপাদনের ব্যাপারে, ইন্ধনের মতো কাজ করে। উদ্ভিদ্ প্রাণীদের মতো অঙ্গ-সঞ্চালন করতে পারে না, তাই তার নিজের জন্যে বেশী শক্তির প্রয়োজন হয় না। মানুষ এবং তৃণভোজী প্রাণীরা উদ্ভিদ-দেহের এই সঞ্চিত শক্তি ক্ষয় ক'রে মহানন্দে চলে বেড়ায়। একদিকে সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ্ শক্তি সঞ্চয় করে, অন্যদিকে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীরা তারই ধ্বংস-সাধন করে। একের ক্ষতি, তাই অপরের সমৃদ্ধি। উদ্ভিদ্ অচল, কিন্তু তারই বিনিময়ে আমরা সচল।

আর একটি কথা। যে কোন জীবের শ্বাসক্রিয়ার সময় অক্সিজেন গৃহীত হয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস পরিত্যক্ত হয়। এর ফলে বাতাস অবিরত কলুষিত হচ্ছে। কিন্তু সালোক-সংশ্লেষ-প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ্ বাতাসে-কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ ক'রে অক্সিজেন ফিরিয়ে দেয়। এইভাবে দূষিত বাতাস পুনরায় শোধিত হয়।

সবুজ উদ্ভিদ্ই প্রধানতঃ প্রাণী-জগৎকে খাদ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করে। শুধু তাই নয়, জীব-জগতের প্রতিটি জীবের শ্বাসক্রিয়ার ফলে বাতাস অবিরত কলুষিত হয়, আর সবুজ উদ্ভিদ্ সেই দূষিত বাতাসকে অবিরত কলুষমুক্ত করে। এ থেকেই বোঝা যায় যে, সবুজ উদ্ভিদ্ আমাদের পরম সুহৃদ্। কিন্তু তবুও অকৃতজ্ঞ মানুষ প্রতিনিয়ত গাছপালা ধ্বংস ক'রে চলেছে। বলা যায়

না. উদ্ভিদ্ হয়তো একদিন এই পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে সরে গিয়ে এর নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণ ক'রবে। সেদিন মানুষ মর্মে মর্মে উপলব্ধি ক'রবে, উদ্ভিদ্ তার কত বড় সুহৃদ্ ছিল!

প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর সহাবস্থান প্রয়োজন। একটি গাছ একটি প্রাণ, এবং তা আরও অনেক প্রাণের প্রধান সহায়। তাছাড়া উদ্ভিদ্ ভূমিক্ষয় নিবারণ করে, পাহাড়ে ধ্বস নামা বন্ধ করে। বিজ্ঞানীরা বলেন, দেশের বনভূমির আয়তন দেশের সমগ্র ভূ-ভাগের অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ হওয়া দরকার। বনের আয়তন এই হিসেবের চেয়ে কম হ'লে, তা একটি কঠোর সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, তাহ'লে সেখানকার বাতাস আরও বেশী ক'রে কলুষিত হবে, আর সেখানে বৃষ্টি কম হবে এবং ভূমিক্ষয় বেশী ক'রে হবে ব'লে মরুভূমির প্রসার আরও বাড়বে। আর মরুভূমির প্রসার যত বাড়বে, প্রাণীর সংখ্যাও তত কমবে। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ক্রমাগত বন কেটে বসত গড়ে তুলেছে, এর ফলে বনভূমির আয়তন ক্রমশঃ কমেছে। হিসেব ক'রে দেখা গেছে যে, বর্তমানে ভারতের বনভূমির আয়তন তেরো শতাংশ মাত্র। সুতরাং একথা অনুমান করার পক্ষে যুক্তি আছে যে, ভারতের বনভূমির আয়তন যথাসত্বর যথোচিত প্রসারিত না হ'লে, জাতির বৈষয়িক উন্নতির যাবতীয় প্রয়াসের উপর দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে থাকবে। সকলেরই মনে রাখা দরকার যে, উদ্ভিদ্ শুধু বনের সম্বল নয়, জাতির জীবনেরও সম্বল।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তথাকথিত সভ্য শহরবাসীরা অপরাহ্নে যে শ্বাসকষ্ট অনুভব করে, তার প্রধান কারণ, শহরে গাছপালার একান্ত অভাব। শহরে যদি আরও গাছপালা থাকতো, তাহ'লে শহরের বাতাস আরও সহজে কলুষমুক্ত হতে পারতো। আর আমরা প্রশ্বাসের সঙ্গে বিশুদ্ধতর বাতাস গ্রহণ ক'রে আরও বেশী স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে পারতাম।

ভরসার কথা এই যে, মানুষ এখন স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে যে, উদ্ভিদ্ ছাড়া কোন প্রাণীরই বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তাই সে আজ বৃক্ষ-রোপণে এবং বন-সৃজনে আগের চেয়ে অনেক বেশী মনোযোগী হয়েছে। তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, শুধু গাছ লাগালেই চলবে না, সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণেরও ব্যবস্থা করতে হবে।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, মানুষের হঠকারিতার ফলে, অরণ্যবহুল একটি দেশে রঅণ্যের ক্ষয় এতো দ্রুত এবং বৃহৎ আকারে হতে পারে যে, দেশটি দু-তিন শতাব্দীর

মধ্যেই মরুদেশে পরিণত হতে পারে। তাঁদের মতে, অবাধ বনক্ষয় ও তজ্জনিত ভূমিক্ষয়ের কারণে ভারতের বহু শস্য-শ্যামল এবং ক্রমদলশোভিত অঞ্চল মাত্র এক-শ' বছরের মধ্যেই অর্ধ-মরুদশা প্রাপ্ত হয়েছে। একটি বাস্তব সত্য এই যে, দেশের কোন অঞ্চল একবার মরুদশায় অভিভূত হ'লে, সেখানে নতুন অরণ্য-সৃজন এক দুরূহ ব্যাপার। সুতরাং, প্রতি বছরই বনভূমির আয়তন প্রশস্ত করবার একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করা উচিত। আর সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য সকলের সমবেত-ভাবে সচেষ্ট হওয়া দরকার। নতুবা অদূর ভবিষ্যতে আমাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

খাদ্য ও পুষ্টি

আমাদের খাদ্য ঃ

একটা ইঞ্জিন চালাতে হ'লে যেমন কয়লা ও জল চাই, আমাদের দেহটাকে সচল রাখবার জন্যও তেমনি খাদ্য ও জলের দরকার। খাদ্য থেকেই আমাদের দেহের পুষ্টি (Nutrition) ও বৃদ্ধি (Growth) হয়। অর্থাৎ, জীব-কোষগুলির ক্ষয়-পূরণ এবং নূতন জীব-কোষের সৃষ্টি হয়। আর এ থেকেই আমাদের শরীরে উত্তাপ কর্মশক্তি ও রোগ প্রতিরোধ-শক্তি জন্মায়। এক কথায় জীবের বেঁচে থেকে তার বিভিন্ন জৈবনিক কাজ সম্পন্ন করার জন্যে খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্য ছাড়া কোন জীব বাঁচতে পারে না। একটি উনুনে যতক্ষণ কয়লা দেওয়া হবে, ততক্ষণই সেটা জ্বলবে— কয়লা পুড়ে গেলে উনুন নিভে ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে। তেমনি খাদ্য আমাদের শরীরে ইন্ধনের কাজ করে। জীব-কোষগুলি যতক্ষণ খাদ্য-রস পায়, ততক্ষণ আমাদের শরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধি স্বাভাবিক নিয়মে চলে। খাদ্যের অভাব হ'লে, প্রথমে দেহের সঞ্চিত খাদ্য ইন্ধন যোগায়, কিন্তু সেগুলি শেষ হ'লে, দেহের ক্ষয় হ'তে থাকে। এ ভাবে শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয়।

সবুজ উদ্ভিদ্ নিজেরা নিজেদের খাদ্য প্রস্তুত ক'রতে পারে, কিন্তু প্রাণীরা তা পারে না। তাই আমরা এবং বিভিন্ন প্রাণী খাদ্যের জন্যে উদ্ভিদ্ কিংবা অন্য প্রাণীর উপর নির্ভরশীল। মানুষ খাদ্য হিসেবে অনেক জিনিসই খায়। দেশ, আবহাওয়া, এবং সেই দেশে কি কি খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়, তার উপরই সেই দেশের লোকের কি খাদ্য হ'বে তা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। একজনের নিকট যা খাদ্য, অপরজনের নিকট তা খাদ্য না-ও হ'তে পারে।

তবে আমরা সাধারণতঃ চাল, গম, ভুট্টা, যব, মাইলো, এরারুট, বিভিন্ন প্রকারের ডাল, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ঘি, মাখন, দই, চিনি এবং বিভিন্ন প্রকারের তেল খাদ্য হিসেবে ব্যবহার ক'রে থাকি। খাদ্যকে দু'টি অংশে ভাগ করা যায়—সারাংশ (Nutrients) ও অসার অংশ (Roughage)। খাদ্যের সারাংশ দেহের খাদ্য-নালীতে বিভিন্ন পাচক রসের সাহায্যে জীর্ণ হয় এবং তার ফলে দেহের পুষ্টি হয়।

খাদ্যের অসার অংশ জীর্ণ হয় না, কিন্তু এগুলি থাকলে খাদ্য জীর্ণ করা, অজীর্ণ অংশ পরিত্যাগ করা প্রভৃতি কাজে সহায়তা হয়।

খাদ্যকে আমরা যে ভাবেই গ্রহণ করি না কেন, বিভিন্ন রকম খাদ্যকে মোট ছয় ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

(১) কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা-জাতীয় খাদ্য (Carbohydrates)—চাল, গম, চিনি, ভুট্টা ইত্যাদি ;

(২) প্রোটিন বা আমিষ-জাতীয় খাদ্য (Proteins)—মাছ, মাংস, ডিম, ডাল ইত্যাদি ;

(৩) ফ্যাট বা স্নেহ-জাতীয় খাদ্য (Fats)—দুধ, দই, ঘি, মাখন, তেল ইত্যাদি ;

(৪) জল (Water) ;

(৫) লবণসমূহ (Salts) ; এবং

(৬) ভিটামিনসমূহ (Vitamins)—ভিটামিন-এ, বি, সি, ডি, ইত্যাদি।

যদি খাদ্যের সঙ্গে ভিটামিন না থাকে, তবে অপরাপর খাদ্যগুলি শরীরের কোন কাজেই লাগবে না, ভিটামিন-শূন্য খাদ্য প্রাণহীন পুতুলের মতো। তাই ভিটামিনকে 'খাদ্য-প্রাণ' বলা হয়। এই খাদ্য-প্রাণের অভাবে আমরা খাদ্যের উপাদানগুলিকে ঠিকমত গ্রহণ করতে পারি না ব'লে ক্রমে আমাদের স্বাস্থ্য ভেঙে যায়, আর নানা রোগে ভুগতে থাকি। বাসি, পচা, ভেজাল দেওয়া খাদ্যের ভিটামিন নষ্ট হ'য়ে যায়। টাটকা দুধ, টাটকা শাক-সব্জী, কপি, মটরশুঁটি, ঢেঁকি-ছাটা চাল, জাতায় পেষা আটা, টমেটো, কমলা-লেবু, মাছ, ডিম প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন থাকে। আজ পর্যন্ত ষোল রকমের ভিটামিনের সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য, এ, বি, সি, ডি, ই, এবং অন্যান্য ভিটামিনগুলি অপরিহার্য।

শরীরের পুষ্টি সাধন ক'রতে হ'লে নিয়মিতভাবে খাদ্য গ্রহণ করলেই তা' থেকে পুষ্টি হয় না। খাদ্যকে পরিপাক ক'রে তা থেকে খাদ্যরস তৈরি করতে পারলে, তবেই আমাদের দেহের পুষ্টি সম্ভবপর হয়। সে জন্য আমরা যে খাদ্য খাই, তা সুস্বাদু, সহজপাচ্য এবং পুষ্টিকর কিনা সে দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। এ ছাড়া খাদ্যের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সব আছে কিনা, সেদিকেও বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। যে খাদ্যে শরীরের বৃদ্ধি, পুষ্টি এবং ক্ষয়-পূরণের জন্যে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সবই উপযুক্ত পরিমাণে থাকে, এবং যে খাদ্য নির্দিষ্ট পরিমাণ 'ক্যালরি' তাপ দেয়, তা'কে সুষম খাদ্য (Balanced diet) বলে।

(১) **কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা-জাতীয় খাদ্য (Carbohydrates) :**

আমাদের খাদ্যের প্রধান উপাদান হ'ল কার্বোহাইড্রেট। চাল, ডাল, গম, ভুট্টা, মাইলো, যব, চিনি, গুড় ইত্যাদি কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা-জাতীয় খাদ্য। আমরা সাধারণতঃ এগুলি নানা প্রকার উদ্ভিদ্ থেকে পেয়ে থাকি। শর্করা-জাতীয় খাদ্য তুলনামূলক ভাবে সুলভ এবং আমাদের শরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধির সহায়ক এবং কর্ম-শক্তির প্রধান উৎস।

শর্করা-জাতীয় খাদ্য-বস্তুসমূহ কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন পরমাণু দ্বারা গঠিত হয় এবং তাতে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন সর্বদাই ২ : ১ এই অনুপাতে থাকে ; যেমন জলের অণুতে (H_2O) থাকে। তবে যে কোন জৈব যৌগে এ দু'টি মৌলের অনুপাত জলের অনুরূপ হ'লেই যে তাকে এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তা' নয়। এরূপ শ্রেণী-বিভাগের সময় অন্যান্য ধর্মের কথাও বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়। শর্করা-জাতীয় যৌগগুলির সাধারণ সংকেত $C_x(H_2O)_y$।

এক অণু কার্বোহাইড্রেট কতগুলি সরল শর্করার অণু দ্বারা গঠিত সে অনুসারে এদের প্রধানতঃ তিনভাগে ভাগ করা হয় :—

(i) **মনো-স্যাকারাইড (Mono-saccharides)**—এই ধরনের শর্করাতে সাধারণতঃ ছয় অবধি কার্বন পরমাণু থাকে ; যেমন—গ্লুকোজ (Glucose), ($C_6H_{12}O_6$), ফ্রুক্টোজ ($C_6H_{12}O_6$) ইত্যাদি। জল-বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়ায় এ'র থেকে আরও সরল শর্করা পাওয়া যায় না। গ্লুকোজ আঙুরে পাওয়া যায়, তাই এর আর এক নাম দ্রাক্ষা-শর্করা (Grape sugar)। চাকের মধু, ফুলের মধু, ইক্ষু-শর্করা, এবং স্টার্চেও গ্লুকোজ আছে। শিল্পে স্টার্চ থেকে গ্লুকোজ উৎপন্ন করা হয়। গ্লুকোজ সাধারণতঃ রোগীর পথ্য এবং ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। নানা প্রকার মিঠাই, ও জ্যাম ইত্যাদি তৈরি করতেও অনেক গ্লুকোজ-এর প্রয়োজন হয়। এ থেকে কৃত্রিম উপায়ে ভিটামিন-সি তৈরি করা হয়।

(ii) **ওলিগো-স্যাকারাইড (Oligo-saccharides)**—এর অণুতে সাধারণতঃ ১২-টি কিংবা ১৮-টি কার্বন পরমাণু থাকে। দু'টি, তিনটি বা চারটি মনো-স্যাকারাইড অণু পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে এরূপ অণু গঠন করে। যেমন—মল্টোজ ($C_{12}H_{22}O_{11}$), সুক্রোজ ($C_{12}H_{22}O_{11}$) ইত্যাদি। জল বিশ্লেষণের ফলে এ থেকে মনো-স্যাকারাইড অণুগুলি পৃথক্ হ'য়ে যায়।

$$C_{12}H_{22}O_{11} \xrightarrow{+H_2O} 2\,C_6H_{12}O_6$$

মল্টোজ জল-বিশ্লেষণ গ্লুকোজ

$$C_{12}H_{22}O_{11} \xrightarrow{+H_2O} C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6$$

সুক্রোজ জল-বিশ্লেষণ গ্লুকোজ ফ্রুক্টোজ
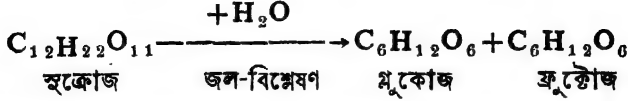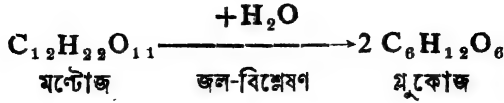
দৈনন্দিন প্রয়োজনে আমরা যে চিনি ব্যবহার করি, তা সুক্রোজ। আখ থেকে পাওয়া যায় ব'লে এর আর এক নাম ইক্ষু-শর্করা (Cane-sugar)। বীট, তাল, খেজুর প্রভৃতির রস থেকেও এ চিনি পাওয়া যায়। আমাদের প্রতিদিনের খাদ্যে মিষ্ট-দ্রব্য হিসেবে এই চিনি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া এ থেকে রকমারি লজেন্স এবং মিছরী জাতীয় মিষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করা হয়।

(iii) **পলি-স্যাকারাইড (Poly-saccharides)**—এ জাতীয় অণুর সাধারণ সংকেত $(C_6H_{10}O_5)_n$। অনেকগুলি গ্লুকোজ-অণু পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে এরূপ অণু গঠন করে। যেমন—স্টার্চ, সেলুলোজ, ডেক্সট্রিন, গ্লাইকোজেন ইত্যাদি। এসব পদার্থের জল-বিশ্লেষণের ফলে শুধু গ্লুকোজ পাওয়া যায়।

$$(C_6H_{10}O_5)_n + nH_2O \rightarrow nC_6H_{12}O_6$$
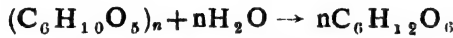
আলু, চাল, গম, ভুট্টা, যব, এরারুট, আলু প্রভৃতির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে স্টার্চ বা শ্বেতসার থাকে। এদের যে-কোন একটি থেকে স্টার্চ তৈরি করা যায়। আমাদের খাদ্যের সর্বপ্রধান উপাদান হ'ল স্টার্চ। আর আমরা চাল, গম, যব, ভুট্টা, আলু প্রভৃতি যে-সব খাদ্য প্রতিদিন গ্রহণ করি, তাদের প্রধান উপাদান স্টার্চ। গ্লুকোজ প্রস্তুত করতেও প্রচুর স্টার্চের প্রয়োজন হয়। পরিপাক-ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইলে স্টার্চ গ্লুকোজে পরিণত হয় এবং রক্তে গৃহীত হয়। তারপর রক্ত-স্রোতের সঙ্গে দেহের কোষে কোষে পৌঁছায়। সেখানে অক্সিজেনের সংস্পর্শে তার মৃদু-দহন-কার্য সম্পাদিত হয় এবং তার ফলে উত্তাপের সৃষ্টি হয়। আবার, দেহের উদ্‌বৃত্ত শর্করা যকৃতে ও পেশীতে গ্লাইকোজেনরূপে সঞ্চিত হয়।

(২) **প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় খাদ্য (Proteins) :**

আমরা প্রতিদিন খাদ্য হিসেবে কিছু না কিছু মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, অথবা মুগ, মুসুর, ছোলা, মটর, সোয়াবীন প্রভৃতি ডাল-জাতীয় জিনিস খেয়ে থাকি। এগুলি হচ্ছে প্রোটিন বা আমিষ-জাতীয় খাদ্য। প্রোটিন বা আমিষ-জাতীয় খাদ্যের অণু-গুলি খুব জটিল নাইট্রোজেন-ঘটিত যৌগিক পদার্থ। প্রোটিন অণুতে কার্বন, হাই-

ড্রোজেন এবং অক্সিজেন ছাড়াও সর্বদাই নাইট্রোজেন পরমাণু থাকে; তাছাড়া কোনো কোনো প্রোটিন-অণুতে সাল্‌ফার কিংবা ফস্‌ফরাসও থাকে। প্রোটিন ব্যতীত জীব-কোষের প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm) তৈরী হ'তে পারে না। প্রোটিন-অণুতে শতকরা ৫৪ ভাগ কার্বন, ৭ ভাগ হাইড্রোজেন, ১৬ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। কখনও কখনও কোনো প্রোটিনে ১ ভাগ সাল্‌ফার কিংবা ০·৬ ভাগ ফস্‌ফরাসও থাকে। প্রোটিন-অণু কতকগুলি অ্যামিনো-অ্যাসিড [$H_2N.\ CHR.\ COOH$]-এর সমষ্টি। প্রোটিন-অণুগুলি প্রত্যেকটি প্রত্যেকের থেকে সব দিক দিয়ে স্বতন্ত্র এবং একটি প্রোটিন কখনও অপর একটি প্রোটিনের অনুরূপ হয় না। ইহাই প্রোটিনেব অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অ্যামিনো-অ্যাসিডকে প্রোটিনের একক (unit) হিসেবে গণ্য করা হয়।

অসংখ্য অ্যামিনো-অ্যাসিড অণু পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে এক-একটি প্রোটিন অণু গঠন করে। এজন্য জল-বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়া সম্পাদন করলে, প্রোটিন বিয়োজিত হয়ে যায়, এবং তার ফলে সবশেষে নানা প্রকার অ্যামিনো-অ্যাসিড অণু উৎপন্ন হয়।

প্রোটিন ——> পলি-পেপ্‌টাইড ——> সরল পেপ্‌টাইড ——> অ্যামিনো-অ্যাসিড

প্রকৃতি অনুসারে প্রোটিনগুলিকে তিন ভাগে ভাগ কবা হয়। যেমন, (i) সিম্পল প্রোটিন (Simple Protein), (ii) কনজুগেটেড প্রোটিন (Conjugated Protein) এবং (iii) ডিরাইভড প্রোটিন (Derived Protein)।

(i) **সিম্পল প্রোটিন (Simple Proteins)**—এই গোষ্ঠীয় প্রোটিনসমূহ অন্য কোন প্রোটিনহীন বস্তুর সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে না, এবং সর্বদাই বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে। যেমন—প্রোটামিন্‌স (Protamins), হিস্টোন্‌স (Histones), অ্যাল্‌বিউমিন (Albumin), গ্লোবিউলিন (Globulin), ইত্যাদি।

(ii) **কনজুগেটেড প্রোটিন (Conjugated Proteins)**—এ গোষ্ঠীর প্রোটিন সর্বদাই একটি প্রোটিনহীন বস্তুর সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। যেমন, ক্রোমো-প্রোটিন (Chromo-protein)—এখানে প্রোটিন রঙীন বস্তুর সঙ্গে যুক্ত থাকে; ফস্‌ফো-প্রোটিন (Phospho-protein)—এখানে প্রোটিন ফস্‌ফোরিক অ্যাসিড (Phosphoricacid)-এর সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই রকম গ্লাইকো-প্রোটিন (Glyco-protein), লাইপো-প্রোটিন (Lipo-protein) ইত্যাদি।

(iii) **ডিরাইভড্‌ প্রোটিন (Derived Proteins)**—এই গোষ্ঠীর প্রোটিনসমূহ প্রকৃতিতে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না। জল-বিশ্লেষণ (Hydrolysis) প্রক্রিয়ায়

এগুলি উৎপন্ন হয়। যেমন—প্রোটিন→প্রোটিয়ান্‌স (Proteans)→মেটাপ্রোটিন (Meta-Protein)→প্রোটিওজেস্‌ (Proteoses)→পেপ্‌টোন (Peptone)→পেপ্‌-টাইড (Peptide)→অ্যামিনো-অ্যাসিড (Amino-acid) ইত্যাদি।

সরল প্রোটিনের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার প্রোটিন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(i) **অ্যাল্‌বিউমিন**—দুধ, ডিমের সাদা অংশ, রক্তমস্ত এবং বিভিন্ন রকম দানাশস্যে এ-জাতীয় প্রোটিন পাওয়া যায়।

(ii) **গ্লোবিউলিন**—রক্তমস্ত এবং মাংসপেশীতে এ-জাতীয় প্রোটিন পাওয়া যায়।

(iii) **গ্লুটেলিন**—ধান, গম প্রভৃতি দানাশস্যে পাওয়া যায়।

(iv) **হিস্‌টোন**—হিমোগ্লোবিনে পাওয়া যায়।

(v) **প্রোলামিন**—ধান ও গমে পাওয়া যায়।

(vi) **প্রোটামিন**—স্যামন, হেরিং প্রভৃতি মাছের শুক্ররসে পাওয়া যায়।

(vii) **স্ক্লেরোপ্রোটিন**—চুল, পালক, নখ, খুর প্রভৃতিতে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন রকম প্রোটিন (Proteins) বিশ্লেষণ ক'রে এ যাবৎ ২০ রকম অ্যামিনো-অ্যাসিড (Amino-acid)-এর সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলিই নানা ভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে নানাপ্রকার প্রোটিনের অণু গঠন করে।

উৎসবের সময় ছেলেরা রঙিন কাগজ জুড়ে জুড়ে কেমন সুন্দর শিকল বানায়, আর তা দিয়ে ঘর সাজায়! এ-জাতীয় রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময়ও সেই রকম ছোট ছোট অনেকগুলি অণু পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে গিয়ে যেন এক-একটি শিকল গড়ে তোলে। এই ভাবে সৃষ্টি হয় এক-একটি অতিকায় অণুর শৃঙ্খল। বিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন মহাণু (Polymer), আর এই প্রক্রিয়ার নাম দিয়েছেন মহাণুভবন (Polymerisation)।

কয়েকটি অ্যামিনো-অ্যাসিডের পরিচয় এখানে দেওয়া হ'ল। এরূপ একটি অণুতে একই প্রকার কার্যকরী পুঞ্জ (Functional group) থাকে, এবং সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে বিক্রিয়া ক'রে পলিপেপ্‌টাইড শৃঙ্খল গঠন করে। এরূপ প্রতিটি অণুতে বিশেষ রকম পার্শ্ব-শৃঙ্খল থাকে, এবং তাইতেই তার স্বকীয়তা বজায় থাকে। পলিপেপ্‌টাইড শৃঙ্খল গঠন করার জন্য একের অ্যামিনো-পুঞ্জ ($-NH_2$) অপরের কার্বক্সিল-পুঞ্জের ($-COOH$) সঙ্গে বিক্রিয়া করে। এর ফলে একটি ক'রে জলের অণু (H_2O) উৎপন্ন হয়, এবং সেই সঙ্গে পেপ্‌টাইড-বন্ধ (Peptide bond) গঠিত হয়।

$$\begin{array}{c}
H-\underset{\substack{|\\H}}{N}-\overset{\substack{R\\|}}{\underset{\substack{|\\H}}{C}}-\overset{\substack{O\\\|}}{C}-OH + H-\underset{\substack{|\\H}}{N}-\overset{\substack{R'\\|}}{\underset{\substack{|\\H}}{C}}-\overset{\substack{O\\\|}}{C}-OH + H-\underset{\substack{|\\H}}{N}-\overset{\substack{R''\\|}}{\underset{\substack{|\\H}}{C}}-\overset{\substack{O\\\|}}{C}-OH
\end{array}$$

নানা প্রকার অ্যামিনো-অ্যাসিড

$$\rightarrow H-\underset{\substack{|\\H}}{N}-\overset{\substack{R\\|}}{\underset{\substack{|\\H}}{C}}-\overset{\substack{O\\\|}}{C}-\underset{\substack{|\\H}}{N}-\overset{\substack{R'\\|}}{\underset{\substack{|\\H}}{C}}-\overset{\substack{O\\\|}}{C}-\underset{\substack{|\\H}}{N}-\overset{\substack{R''\\|}}{\underset{\substack{|\\H}}{C}}-\overset{\substack{O\\\|}}{C}-\cdots\cdots$$ ইত্যাদি।
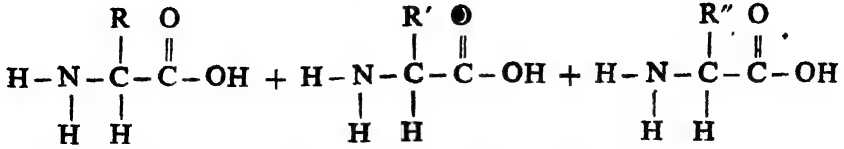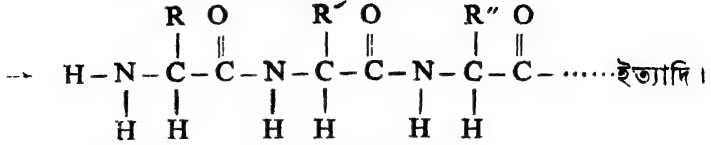
পলি-পেপ্‌টাইড শৃঙ্খল (সাধারণ সংকেত)

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অ্যামিনো-অ্যাসিডের সংকেত ঃ—

অ্যামিনো-অ্যাসিডের সাধারণ সংকেত— $HOOC-\overset{\substack{NH_2\\|}}{\underset{\substack{|\\H}}{C}}-$	— R
1. গ্লাইসিন (Glycine)—	— H
2. অ্যালেনিন (Alanine)—	— CH_3
3. ভ্যালিন (Valine)—	— $\underset{\substack{|\\CH_3}}{CH}-CH_3$
4. আইসো-লিউসিন (Iso-leucine)—	— $\underset{\substack{|\\CH_3}}{CH}-CH_2-CH_3$
5 ফিনাইল-অ্যালেনিন (Ph. alanine)—	— $CH_2-C_6H_5$
6. টাইরোসিন (Tyrosine)—	— $CH_2-C_6H_4-OH$
7. সেরিন (Serine)—	— CH_2OH
8. সিস্‌টাইন (Cysteine)—	— CH_2SH
9. থ্রিওনিন (Threonine)—	— $\underset{\substack{|\\OH}}{CH}-CH_3$
10. অ্যাস্‌পারটিক অ্যাসিড (Aspartic acid)—	— CH_2-COOH
11. গ্লুটামিক অ্যাসিড (Glutamic acid)—	— CH_2-CH_2-COOH
12. লাইসিন (Lysine)—	— $(CH_2)_4-NH_2$
ইত্যাদি	ইত্যাদি।

প্রোটিন ছাড়া জীবন সম্ভব নয়। উদ্ভিদ্ সাধারণতঃ নিজেদের প্রয়োজনীয় প্রোটিন নিজেরা সংশ্লেষ করতে পারে, কিন্তু প্রাণীরা তা পারে না। তাই আমাদের প্রোটিনের জন্যে উদ্ভিদ্ কিম্বা অন্য প্রাণীর উপর নির্ভর করতে হয়। আমাদের দেহের মেদ্-মজ্জা, মাংসপেশী এবং শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সমূহ সবই প্রোটিন দ্বারা গঠিত। আমাদের শরীরের ক্ষয়-পূরণ, বৃদ্ধি এবং শক্তি যোগানই প্রোটিনের প্রধান কাজ।

মুগ, মুসুর, সোয়াবীন, মটর, অড়হর প্রভৃতি ডাল থেকে আমরা যে প্রোটিন পাই তাকে ভেষজ প্রোটিন (Vegetative proteins) বলে। মাছ মাংস, ডিম দুধ ইত্যাদি প্রাণীর থেকে পাই বলে এদেরকে প্রাণিজ প্রোটিন (Animal-proteins) বলে। প্রোটিনের পরিপাক-ক্রিয়া সম্পূর্ণ হ'লে নানা প্রকার অ্যামিনো-অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। তারপর অ্যামিনো-অ্যাসিড অণুগুলি নানাভাবে সংশ্লেষিত হয়। ফলে এসব থেকেই নানাপ্রকার জটিল দেহতন্তু গড়ে উঠে। ভেষজ প্রোটিনের চেয়ে প্রাণিজ প্রোটিন আমরা সহজে হজম (Assimilate) করতে পারি।

(২) ফ্যাট বা স্নেহ-জাতীয় খাদ্য (Fats):

দুধ, ঘি, মাখন, দই, চর্বি এবং তেল-জাতীয় খাদ্য-দ্রব্যগুলিকে ফ্যাট বা স্নেহ-জাতীয় খাদ্য বলে। স্নেহ-জাতীয় বস্তুগুলি, কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন পরমাণু দ্বারা গঠিত। কিন্তু হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন জলের অনুপাতে থাকে না। এগুলি সবই জৈব অ্যাসিড এবং গ্লিসারল থেকে উদ্ভূত এস্টার-জাতীয় যৌগ; তাই এদের অনেক সময় গ্লিসারাইড (Glyceride) বলা হয়। বিভিন্ন স্নেহ-দ্রব্যে প্রধানতঃ স্টিয়ারিক অ্যাসিড, পামিটিক অ্যাসিড প্রভৃতির গ্লিসারাইড থাকে। সাধারণ উষ্ণতায় যেগুলি তরল তাদের তেল (oil) এবং যেগুলি কঠিন তাদের চর্বি (Fat) বলা হয়। তেলে অসংপৃক্ত অ্যাসিডের গ্লিসারাইড অধিক পরিমাণে থাকে। এজন্য নিকেল-চূর্ণ অনুঘটকের (বা, প্রভাবকের) সহায়তায় হাইড্রোজেনান্বিত ক'রে তাকে অর্ধতরল স্নেহ-পদার্থে পরিণত করা যায়, যেমন—বনস্পতি।

$$\begin{array}{lll} CH_2OH + HOOC.R & & CH_2O.CO.R \\ | & & | \\ CHOH + HOOC.R' & \rightarrow & CHO.CO.R' \quad + 3H_2O \\ | & & | \\ CH_2OH + HOOC.R'' & & CH_2O.CO.R'' \\ \text{গ্লিসারল} \quad \text{স্নেহজ অ্যাসিড} & & \text{ফ্যাট বা স্নেহ-পদার্থ} \end{array}$$
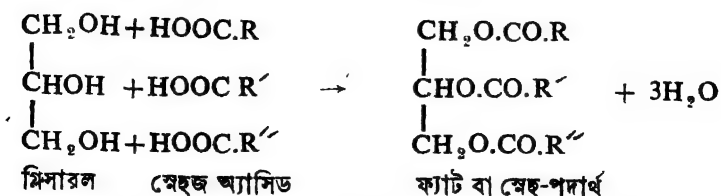
স্নেহ-জাতীয় পদার্থ আমরা উদ্ভিদ্ এবং প্রাণী উভয়ের কাছ থেকেই পেয়ে থাকি।

নারকেল তেল, সরষের তেল, বাদাম তেল, বনস্পতি ঘি, অলিভ অয়েল ইত্যাদি উদ্ভিদ্ থেকে পেয়ে থাকি। আর বিভিন্ন প্রকার ডালে এবং চাল ও আটাতেও কিছু পরিমাণে স্নেহ-জাতীয় পদার্থ থাকে। ঘি, মাখন, দুধ, মাছের তেল, মাংসের চর্বি ইত্যাদি প্রাণিজ স্নেহ-জাতীয় পদার্থ। স্নেহ-জাতীয় পদার্থ, শর্করা এবং প্রোটিনের চেয়ে অনেক বেশী শক্তি ও তাপ উৎপন্ন করে। দেহের মধ্যে নানা প্রকার এন্‌জাইমের (বা, উৎসেচকের) সহায়তায় ফ্যাট বা স্নেহ-জাতীয় পদার্থের মৃদু-দহন-ক্রিয়ার ফলে প্রচুর 'ক্যালরি' তাপ উৎপন্ন হয়। আর কিছু পরিমাণে ফ্যাট বা স্নেহ-জাতীয় পদার্থ সঞ্চিত হয়ে দেহের মধ্যে মজুত ভাণ্ডার (মেদ বা চর্বি) গড়ে তোলে। এই সঞ্চিত খাদ্য, উপবাস বা অনশনের সময়, সাময়িক ভাবে শরীরের শক্তি যোগায়।

পুষ্টি ঃ

সবরকম প্রাণীই পরভোজী, অর্থাৎ খাদ্যের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। এরা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি ক'রে নিতে পারে না। অপরদিকে সব রকম সবুজ উদ্ভিদই নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য নিজেরাই তৈরি ক'রে নিতে পারে, অর্থাৎ খাদ্যের ব্যাপারে তারা স্বনির্ভরশীল।

বিভিন্ন প্রাণীর পুষ্টি-পদ্ধতিকে মোটামুটি দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়—(1) স্যাপ্রোজোইক (saprozoic) এবং (2) হোলোজোইক (holozoic)। কোন কোন প্রাণী অতি সরল ও তরল খাদ্য গ্রহণ ক'রে দেহের পুষ্টি সাধন করে। এর নাম স্যাপ্রোজোইক পুষ্টি। আর যে পুষ্টি-পদ্ধতি জটিল ও কঠিন জৈব খাদ্য গ্রহণ, পাচন, শোষণ এবং অপাচ্য অংশের বহিষ্করণ দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাকে হোলোজোইক পুষ্টি বলে। সাধারণ এক-কোষী প্রাণী থেকে মানুষ পর্যন্ত সকল জাতের প্রাণীই এই পদ্ধতিতে দেহের পুষ্টি-সাধন (Nutrition) ক'রে থাকে। বিপাক (Metabolism) সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করলে আমরা বুঝতে পারি, ভুক্তদ্রব্য দেহের মধ্যে প্রবেশ করার পর তার কি কি পরিবর্তন সাধিত হয়, এবং তার শেষ পরিণতি কি হয়।

বিপাক নির্ভর করে প্রধানতঃ কয়েকটি প্রাণ-রাসায়নিক বিক্রিয়ার উপর। আর তাতে সহায়তা করে আমাদের দেহ-নিঃসৃত নানাপ্রকার এন্‌জাইম (Enzyme) বা উৎসেচক। এগুলি অত্যন্ত জটিল প্রোটিন-জাতীয় জৈব প্রভাবক (বা, অনুঘটক) (catalyst)। এরা বিপাক-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যকলাপ অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু নিজেরা অপরিবর্তিত থাকে। উল্লেখ্য যে, একটি নির্দিষ্ট এন্‌জাইম একটি

নির্দিষ্ট রাসায়নিক পদার্থ বা বিক্রিয়কের উপরেই ক্রিয়া করতে এবং তার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। এদের মধ্যে যেন রয়েছে তালা-চাবির সম্পর্ক—একটি তালায় একটি মাত্র চাবিই লাগে, অন্য চাবি দিয়ে ওই তালা খোলা বা বন্ধ করা যায় না, এ-ও সেইরকম। মানুষের বেলায় নিম্নলিখিত চারটি প্রক্রিয়া বিপাকের অন্তর্ভুক্ত।
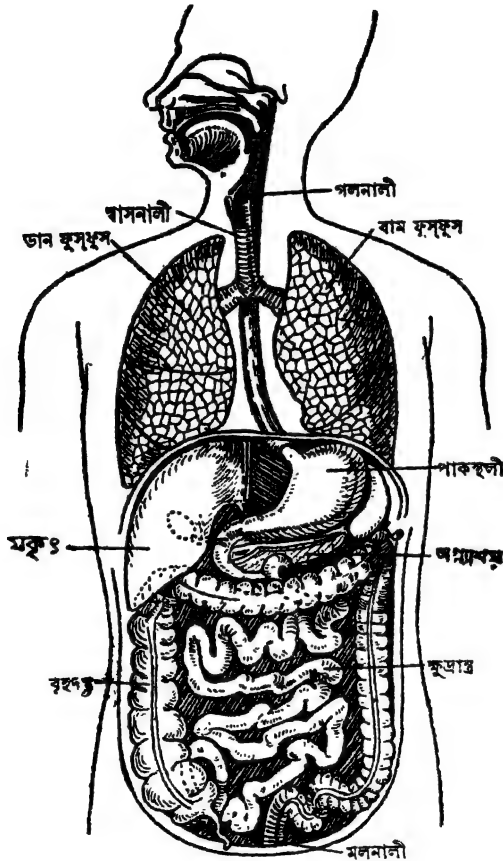
চিত্র ২০। মানুষের উদর-গহ্বরে আছে পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্র, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয় ইত্যাদি।

(i) **খাদ্যগ্রহণ (Ingestion)**—খাদ্যদ্রব্য প্রথমে মুখে গ্রহণ করা হয়। সেখানে দন্ত সাহায্যে তার ছেদন, চর্বণ ও পেষণ-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এর ফলে তা সূক্ষ্ম হয়ে লালার সঙ্গে মেশে। বলা বাহুল্য, খাদ্যদ্রব্য যত সূক্ষ্মাংশে বিভক্ত হয়, তার উপর বিভিন্ন জারক-রসের ক্রিয়া তত সহজে সম্পাদিত হয়।

(ii) **পরিপাক-ক্রিয়া (Digestion)**—খাদ্যদ্রব্য মুখ থেকে যায় পাকস্থলীতে এবং সেখান থেকে যায় ক্ষুদ্রান্ত্রে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম জারক-রস নিঃসৃত হয়। যেমন, লালার মধ্যে থাকে টায়ালিন (ptyalin) নামক এন্‌জাইম বা উৎসেচক। পাকস্থলীতে নিঃসৃত হয় পাচক-রস (gastric juice)। এর মধ্যে থাকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং পেপ্‌সিন (pepsin) ও রেনিন (rennin) নামক এন্‌জাইম; আর ক্ষুদ্রান্ত্রে নিঃসৃত হয় পিত্তরস (bile), অগ্ন্যাশয়-রস (pancreatic juice) ও আন্ত্রিক রস (intestinal juice)। অগ্ন্যাশয়-রসে থাকে অ্যামাইলেজ (amylase), ট্রিপ্‌সিন (trypsin) ও লাইপেজ (lypase) নামক এন্‌জাইম, আর আন্ত্রিক রসে থাকে ইরেপ্‌সিন (erepsin), সুক্রেজ (sucrase), ল্যাক্‌টেজ (lactase) এবং মল্টেজ (maltase) নামক এন্‌জাইম। বিভিন্ন এন্‌জাইমের ক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্য ক্রমশঃ জীর্ণ হতে থাকে। সূক্ষ্মাংশে বিভক্ত এবং লালার সঙ্গে মিশ্রিত খাদ্যের পরিপাক-ক্রিয়া শুরু হয় মুখবিবরে, পাকস্থলীতে গিয়ে তা আরও অগ্রসর হয় এবং সম্পূর্ণ হয় ক্ষুদ্রান্ত্রে গিয়ে।
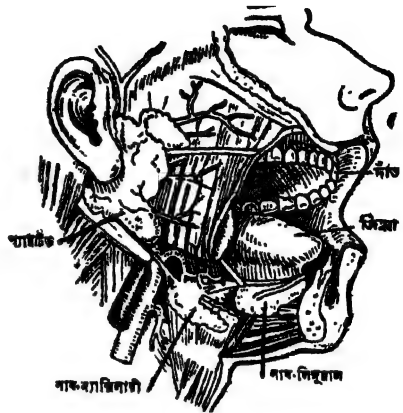
চিত্র ২১। মানুষের লালা নিঃসারক গ্রন্থিসমূহ (Salivary glands)।

যকৃত-নিঃসৃত পিত্ত অম্লধর্মী পাকমণ্ডের অম্লভাব নষ্ট করে এবং ক্ষুদ্রান্ত্রে বিভিন্ন উৎসেচকের ক্রিয়া সার্থক ক'রে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষারীয় মাধ্যম সৃষ্টি করে। তাছাড়া পিত্ত খাদ্যের স্নেহপদার্থের সঙ্গে মিশে একটি ইমাল্‌শন (emulsion) বা অবদ্রব প্রস্তুত করে। এর উপরে লাইপেজ সহজেই ক্রিয়া করে এবং তাকে গ্লিসারল এবং স্নেহজ অ্যাসিডে পরিণত করে। বিভিন্ন স্থানে যেসব বিক্রিয়া সম্পাদিত হয়, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে জল-বিশ্লেষণ (hydrolysis) ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন—

$$\text{(a)}\quad \underset{\text{স্টার্চ}}{2(C_6H_{10}O_5)_n} \xrightarrow[\text{(টায়ালিন)}]{+\,n\,H_2O} \underset{\text{মল্টোজ}}{n\,C_{12}H_{22}O_{11}} \xrightarrow[\text{(মল্টেজ)}]{+\,n\,H_2O} \underset{\text{গ্লুকোজ}}{2nC_6H_{12}O_6}$$

$$\text{(b)}\quad \underset{\text{প্রোটিন}}{\overset{\overset{R}{|}}{CH}(NH_2).\,CO.\,NH.\,\overset{\overset{R'}{|}}{CH}.\,CO.\,NH.\,\overset{\overset{R''}{|}}{CH}.\,CO\cdot} \quad \underset{\text{এন্‌জাইম)}}{+\,H_2O}$$

$$\underset{|}{\overset{R}{}}CH(NH_2).COOH + \underset{|}{\overset{R'}{}}CH(NH_2).COOH + \underset{|}{\overset{R''}{}}CH(NH_2).COOH$$ ইত্যাদি

পেপ্‌সিন, রেনিন, ট্রিপ্‌সিন, ইরেপ্‌সিন ইত্যাদি নানা প্রকার অ্যামিনো-অ্যাসিড।

(c)
$$\begin{array}{l} CH_2O.\ CO.\ R \\ | \\ CHO.\ CO.\ R' \\ | \\ CH_2O.\ CO.\ R'' \end{array} \xrightarrow[\text{(এন্‌জাইম)}]{+3H_2O} \begin{array}{l} CH_2OH + R.\ COOH \\ | \\ CHOH + R'.\ COOH \\ | \\ CH_2OH + R''.\ COOH \end{array}$$
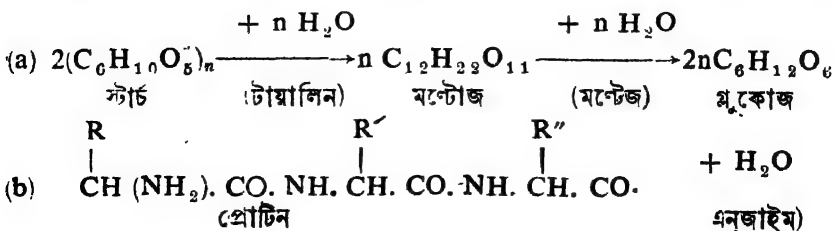
স্নেহ-পদার্থ .... গ্লিসারল .... স্নেহজ অ্যাসিড
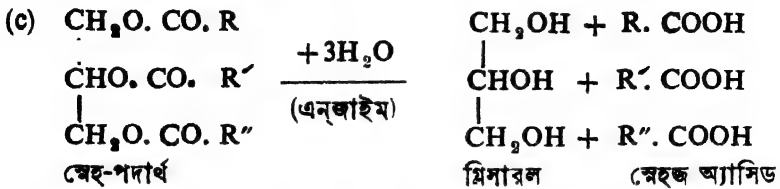
উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে, পরিপাক-ক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি সম্পাদিত হয়—

(a) স্টার্চ (কার্বোহাইড্রেট) সরলতম শর্করা গ্লুকোজে পরিণত হয় ;

(b) প্রোটিন নানাপ্রকার অ্যামিনো-অ্যাসিডে পরিণত হয় ; এবং

(c) স্নেহ-পদার্থ গ্লিসারল ও নানাপ্রকার স্নেহজ অ্যাসিডে পরিণত হয়।

(iii) **অবশোষণ (Absorption)**—জীর্ণ খাদ্যের সারাংশ ক্ষুদ্রান্ত্রের সাহায্যে অবশোষিত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতরের আবরণে অসংখ্য সূক্ষ্ম শুঁয়ার মতো শোষক-যন্ত্র (Villi) আছে। সরল শর্করা এবং অ্যামিনো-অ্যাসিডগুলি সোজাসুজি শোষক-যন্ত্রের মধ্যে অবস্থিত নাড়ী-জালকে (Capillaries) প্রবেশ করে। স্নেহপদার্থ জীর্ণ হলে স্নেহজ অ্যাসিডগুলি যকৃত নিঃসৃত পিত্তের সাহায্যে ইমাল্‌সনে (বা, অবদ্রবে) পরিণত হয় এবং নাড়ী-জালকের মধ্যে গৃহীত হয়। স্নেহ-পদার্থের কিছু অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্নেহকণা (droplets of fat)-রূপে ল্যাক্‌টিয়েলের মধ্যে প্রবেশ করে। এগুলি সেখান থেকে লসিকা-নালীর (lymphatic vessels) ভিতর দিয়ে গিয়ে শেষে শিরার (veins) মধ্যে প্রবেশ করে।
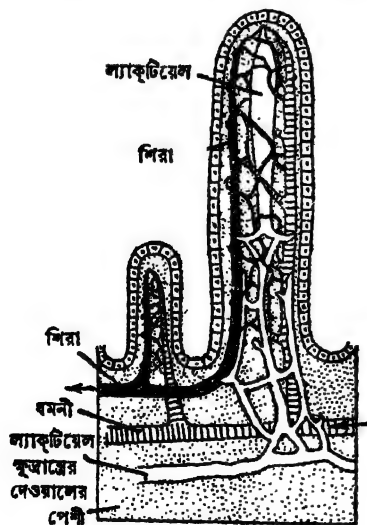
চিত্র ২২। শোষক-যন্ত্র (Villi)

খাদ্যের দ্রবীভূত অংশ শোষিত হয়ে রক্ত-মধ্যে গৃহীত হয় এবং রক্তস্রোতের

সঙ্গে দেহের কোষে পৌঁছায়। সেখানে খাদ্যরস প্রোটোপ্লাজ্‌ম-এর অঙ্গীভূত হয়। এর নাম আত্তীকরণ (Assimilation)। পরে অক্সিজেন-সংস্পর্শে এবং নানাপ্রকার এন্‌জাইমের সহায়তায় এদের মৃদু-দহন-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

অ্যামিনো-অ্যাসিড অণুগুলি থেকে ক্রমে জটিলতর ও বৃহত্তর অণু সংশ্লেষিত হয় এবং তা থেকে জটিল দেহতন্তু গড়ে ওঠে।

দেহের উদ্‌বৃত্ত শর্করা যকৃতে (Liver) ও পেশীতে গ্লাইকোজেন-রূপে সঞ্চিত হয়। অপরদিকে অ্যামিনো-অ্যাসিডের উদ্‌বৃত্ত অংশ যকৃতে গিয়ে ডিঅ্যামিনেশন-প্রক্রিয়ায় ইউরিয়া ও গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত হয়। ইউরিয়া রক্ত-প্রবাহের সঙ্গে বৃক্কে (kidney) পৌঁছালে, সেখানে মূত্রের সঙ্গে পরিত্যক্ত হয়। আর উদ্‌বৃত্ত স্নেহ-পদার্থ চর্বি-রূপে চামড়ার নীচে এবং উদর-গহ্বরে সঞ্চিত হয়।

(iv) **অপাচ্য অংশের বহিষ্করণ (Egestion)**—খাদ্যদ্রব্য পাচিত ও শোষিত হওয়ার পর কিছু অংশ অপাচিত থেকে যায়। এই অংশ দেহের বাইরে পরিত্যক্ত হয়।

অ্যামিবার মতো এক কোষী প্রাণীর বেলায়, খাদ্য-গ্রহণের বিপরীত পদ্ধতিতে, প্লাজ্‌মালিমার সাহায্যে কোন স্থান দিয়ে অজীর্ণ অংশ দেহের বাইরে নিক্ষিপ্ত হয় হাইড্রার মতো একনালী-দেহী প্রাণীর কোনো পায়ু-ছিদ্র নেই। এদের বেলায় খাদ্যের অজীর্ণ অংশ প্রধানতঃ দেহ-প্রাচীরের সঙ্কোচন-প্রসারণের দ্বারা দেহ-গহ্বরস্থিত জলের সঙ্গে মুখ-ছিদ্রের ভিতর দিয়েই দেহের বাইরে চলে যায়। উচ্চতর প্রাণীদের বেলায় এই অজীর্ণ অংশ সাধারণতঃ সাময়িকভাবে মলাশয়ে সঞ্চিত হয়। তারপর মলাশয়ের পেশী-প্রাচীরের সঙ্কোচন ও প্রসারণ দ্বারা পায়ু-ছিদ্র দিয়ে দেহের বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য—স্টার্চ আমাদের খাদ্য, কিন্তু সেলুলোজ নয়, যদিও উভয়প্রকার পদার্থই বহু-সংখ্যক গ্লুকোজ অণুর সমবায়ে গঠিত। এর প্রধান কারণ, আমাদের পাকস্থলীতে সেলুলোজ জীর্ণ করার উপযোগী উৎসেচক উৎপন্ন হয় না।

অপরদিকে, সেলুলোজ হ'ল তৃণভোজী প্রাণীদের প্রধান খাদ্য। তৃণভোজী প্রাণীরা যে সেলুলোজও হজম করতে পারে, তার কারণ, তাদের পৌষ্টিক নালীতে এমন ব্যাকটিরিয়া বাস করে, যা প্রয়োজনীয় উৎসেচক উৎপন্ন করে। উইপোকার পৌষ্টিক নালীতে সেলুলোজ জীর্ণ করার উপযোগী উৎসেচক এমনিই উৎপন্ন হয়। তাই কাঠ, কাগজ, কাপড় ইত্যাদি উইপোকার স্বাভাবিক খাদ্য।]

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শ্বসন

কাজ করার জন্য প্রত্যেকেরই শক্তি প্রয়োজন। মানুষ এবং অন্যান্য উষ্ণ-শোণিত প্রাণীর দেহে নির্দিষ্ট উষ্ণতা বজায় রাখার জন্যও শক্তির প্রয়োজন হয়। তাছাড়া দেহ-কোষে প্রোটোপ্লাজ্‌ম সৃষ্টি, কোষ-বিভাজন, বৃদ্ধি ও নানা প্রকার জৈবনিক কাজগুলি সম্পাদনের জন্যও প্রতিটি জীবেরই শক্তি প্রয়োজন। উদ্ভিদ্ অচল, কাজেই তাদের তুলনায় সচল জীবদের শক্তির প্রয়োজন হয় বেশী।

জীবদেহে কোষের ভিতরে শ্বসন-ক্রিয়ার (Respiration) মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্যের মৃদু-দহনের ফলে শক্তি উৎপন্ন হয়। শ্বসন-প্রক্রিয়ায় প্রতিটি জীব অক্সিজেন গ্রহণ করে। এই অক্সিজেন দ্বারা খাদ্যদ্রব্য জারিত (oxidised) বা উপচিত হয়। এর ফলে শক্তি উৎপন্ন হয়, আর কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস এবং জলীয় বাষ্প পরিত্যক্ত হয়। শ্বসন জীব-জগতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। যে-কোন উদ্ভিদ্ বা প্রাণী-দেহের প্রতিটি জীবন্ত কোষে আমৃত্যু এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। কোষ-মধ্যে অবস্থিত নানা প্রকার এন্‌জাইম বা উৎসেচক এই প্রক্রিয়া সম্পাদনে সহায়তা করে।

বিভিন্ন জীবের দৈহিক গঠন বিভিন্ন রকম। কাজেই তাদের অক্সিজেন গ্রহণের পদ্ধতিও বিভিন্ন রকম। নিম্নশ্রেণীর প্রাণী-দেহের ভিতরের গঠন উচ্চশ্রেণীর চেয়ে অনেক সরল। তাই এক-কোষী প্রাণী, যেমন—অ্যামিবা, অথবা বহুকোষী প্রাণী, যেমন—হাইড্রা (যাদের দেহে রক্ত নেই), এরা পরিবেশ থেকে সরাসরি অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং ব্যাপন-প্রক্রিয়ায় (Diffusion) দূষিত বায়ু পরিত্যাগ ক'রে থাকে। কিছু কিছু উচ্চশ্রেণীর অমেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহের বহিস্ত্বকের মাধ্যমে বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে। এই অক্সিজেন দেহের ভিতরের রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। রক্তের পরিবহণের সঙ্গে সঙ্গে এই অক্সিজেন দেহের কোষে-কোষে ছড়িয়ে পড়ে।
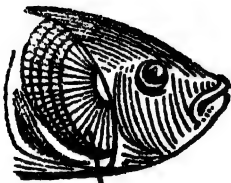
মাছের ফুলকা

চিত্র ২৩

জলের মধ্যে যেসব মেরুদণ্ডী প্রাণী বাস করে, তাদের মধ্যে মাছই প্রধান। এদের শ্বাসযন্ত্র ডাঙ্গার প্রাণীদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মাছের দু'টি কান্‌কোর নীচে

থাকে ফুল্‌কা। আর এই ফুল্‌কার সাহায্যেই জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন শোষণ ক'রে নেয়। ফুলকার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রক্ত-জালিকা থাকায়, অক্সিজেন সহজেই রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পারে।

চিত্র ২৪। মাছ ফুল্‌কার সাহায্যে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ ক'রে শ্বাসকার্য চালায়

কিন্তু উভচর প্রাণীর ক্ষেত্রে (যেমন—ব্যাঙ), এদের শ্বাসকার্য সম্পাদিত হয় দু'ভাবে। যখন ছোট ব্যাঙাচি অবস্থায় জলের মধ্যে থাকে, তখন তার মাথার পিছন দিকে ফুল্‌কা থাকে এবং তারই সাহায্যে ব্যাঙাচি জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন শোষণ ক'রে নিতে পারে। আর কিছু পরিমাণ অক্সিজেন গ্রহণ করে দেহের পাতলা বহিস্ত্বকের সাহায্যে। কিন্তু ব্যাঙাচি দশা অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এই ফুল্‌কাগুলিও লুপ্ত হয়ে যায়, আর সেই সঙ্গে তৈরী হয় নতুন ফুসফুস। এই ফুসফুসই হচ্ছে ডাঙ্গার মেরুদণ্ডী প্রাণীদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ব্যাঙের নাসারন্ধ্রের ভিতর দিয়ে বায়ু প্রবেশ ক'রে প্রথমে মুখবিবরে যায়। পরে মুখ-বিবরের পেশী সঙ্কোচনের ফলে সেই বায়ু ট্র্যাকিয়া (Laryngo-tracheal chamber) দিয়ে ফুসফুসের রক্ত-জালকে গিয়ে পৌঁছায়। এখানে বায়ুর অক্সিজেন রক্তের সঙ্গে মিশে যায়।

মানুষ এবং অন্যান্য উচ্চ-শ্রেণীর প্রাণীর ক্ষেত্রে শ্বাসকার্যের প্রধান অঙ্গ হ'ল ফুসফুস। ফুসফুস ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর সাহায্যে প্রথমে বাহ্য এবং পরে কোষের ভিতরে অন্তস্থ শ্বাসকার্য সম্পাদিত হয়।

উদ্ভিদের পৃথক্ শ্বাস-অঙ্গ নেই। কিন্তু উচ্চ-শ্রেণীর উদ্ভিদের পাতায় অসংখ্য পত্ররন্ধ্র আছে। এছাড়া কাণ্ডের অথবা মূলের কিংবা ফলের ত্বকের উপর ছোট ছোট ভগ্নস্থান (denticle) থাকে। এইসব পত্ররন্ধ্র বা ভগ্নস্থান দিয়ে উদ্ভিদ্ বায়ু থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ ক'রে থাকে। কারণ, উদ্ভিদের কোষের মধ্যে যে পরিমাণ অক্সিজেন থাকে, তা শ্বাসকার্যের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তবে দিনের বেলায় সালোক-সংশ্লেষের ফলে উৎপন্ন অক্সিজেনের কিছুটা কাজে লাগে শ্বাসকার্যের জন্যে।

উল্লেখ্য যে, বায়ু থেকে সংগৃহীত অক্সিজেন দ্বারা শ্বাসকার্য শুধু কোষের ভিতরেই

হয়ে থাকে। আর কোষমধ্যস্থ মাইটোকন্‌ড্রিয়া (Mitochondria) থেকে প্রাপ্ত কতকগুলি এন্‌জাইম (Enzyme) বা উৎসেচক দ্বারা শ্বাসকার্য নিয়ন্ত্রিত হয়।
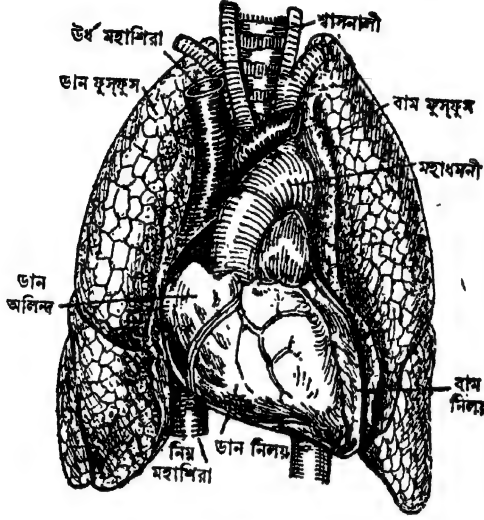
চিত্র ২৫। মানুষের বক্ষ-গহ্বরে ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডের অবস্থান।

প্রথমে গ্লাইকোলিসিস-প্রক্রিয়ায় (Glycolysis) গ্লুকোজ থেকে ধাপে ধাপে পাইরুভিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে ধাপে ধাপে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল উৎপন্ন হয়। পাইরুভিক অ্যাসিড ভাঙবার এই জটিল পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করেন ইংরেজ বিজ্ঞানী হান্‌স ক্রেব্‌স, তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে ক্রেব্‌স চক্র (Krebs cycle)। এইসব জটিল বিক্রিয়ার রহস্য সমাধানে কৃতিত্বের জন্যে এই বিজ্ঞানীকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে।

ক্রেব্‌স-এর সাইট্রিক অ্যাসিড-চক্রে শক্তি পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে শ্বসন সংক্রান্ত উৎসেচকগুলিতে (Enzymes) সঞ্চালিত হয়। এই সময় বিভিন্ন উৎসেচক বিজারিত (Reduced) বা অপচিত হয় (কারণ, তার সঙ্গে হাইড্রোজেন বা ইলেকট্রন যুক্ত হয়), এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বর্জ্য পদার্থরূপে মুক্ত হয়ে আসে। এই জটিল প্রক্রিয়ার প্রথম লগ্নে পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে অ্যাসিটাইল-কোএন্‌জাইম-এ নামক সক্রিয় পদার্থটি উৎপন্ন হয়। এর সঙ্গে অক্সালো-অ্যাসিটিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া ঘটলে পাওয়া যায় সাইট্রিক অ্যাসিড। এ থেকে ধাপে ধাপে কয়েকটি

I. গ্লাইকোলিসিস (Glycolysis) :

HC(OH)- | HCOH | HOCH O | HCOH | HC—— | CH₂OH

ATP → (উৎসেচক)

HC(OH)- | HCOH | HOCH O | HCOH | HC—— OH | CH₂·O—P—OH ‖ O

(উৎসেচক)

CH₂OH | HOC— | HOCH O | HCOH | HC— OH | CH₂·O—P—OH ‖ O

গ্লুকোজ — গ্লুকোজ-৬-ফস্‌ফেট — ফ্রুক্টোজ-৬-ফস্‌ফেট

ATP → (উৎসেচক)

CH₂· O—P(OH)—OH ‖ O | HOC —— | HOCH O | HCOH | HC — | CH₂ O—P(OH)—OH ‖ O

→ (উৎসেচক)

CH₂· O—P(OH)—OH ‖ O | C=O | CH₂OH + HC=O | HCOH | CH₂· O—P(OH)—OH ‖ O

ফ্রুক্টোজ ১,৬-ডাই-ফস্‌ফেট

→ (উৎসেচক) 2 CH₂· O—P(OH)—OH ‖ O | HCOH | HC=O

NADPH, NADP → (উৎসেচক)

2 HCOH (CH₂·O—P(OH)—OH ‖ O) | COOH → (উৎসেচক)

৩-ফস্‌ফো-গ্লিসার‍্যাল্‌ডিহাইড — ৩-ফস্‌ফো-গ্লিসারিক অ্যাসিড

[এরপর ৬৪ পৃষ্ঠায়]

$$2HC(CH_2OH)(COOH)\cdot O-P(OH)(=O)-OH \xrightarrow[\text{(উৎসেচক)}]{(-2H_2O)} 2C(=CH_2)(COOH)\cdot O-P(OH)(=O)-OH \xrightarrow[\text{(উৎসেচক)}]{ADP} 2C(CH_3)(=O)COOH$$

২-ফস্‌ফো-গ্লিসারিক অ্যাসিড পাইরুভিক অ্যাসিড

[অক্সিজেন না থাকলে, পাইরুভিক অ্যাসিড নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে ল্যাক্‌টিক অ্যাসিডে অথবা ইথাইল অ্যাল্‌কোহলে পরিণত হয়। কিন্তু অক্সিজেন থাকলে, ক্রেব্‌স-চক্র অনুযায়ী বিক্রিয়া সংঘটিত হয়ে থাকে।]

$$CH_3-CO-COOH \xrightarrow[NADP]{\downarrow NADPH_2} CH_3-CH(OH)-COOH$$

পাইরুভিক অ্যাসিড ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড

$$\downarrow -CO_2$$

$$CH_3-CHO \xrightarrow[NADP]{\downarrow NADPH_2} CH_3-CH_2OH$$

অ্যাসিট্যাল্‌ডিহাইড ইথাইল অ্যাল্‌কোহল
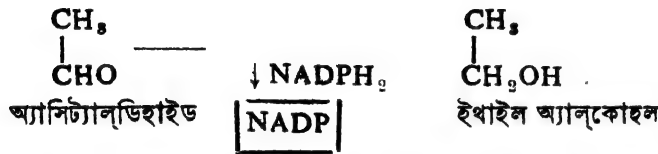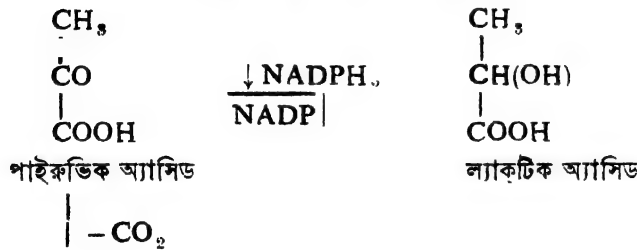
বিক্রিয়া ঘটে এবং তার ফলে অক্সালো-অ্যাসিটিক অ্যাসিড পুনরুৎপাদিত হয়। এজন্য বিক্রিয়ার শৃঙ্খলটি অব্যাহত থাকে।

উদ্ভিদের দ্রুত বর্ধনশীল অংশে, যেমন—অঙ্কুরোদ্‌গমের সময় বীজে, ফুল ফোটার সময় কুঁড়িতে, এবং পাকবার সময় ফলে, শ্বসনের হার বেশী হয়।

উদ্ভিদের ক্ষেত্রে শ্বসনের হার সাধারণতঃ রাত্রেই বেশী হতে দেখা যায়। কারণ, তখন অঙ্গার-আত্তীকরণ বন্ধ থাকে। প্রাণীদের বেলায় দৈহিক পরিশ্রমের সময় বাহ্যিক শ্বসনের হার বেড়ে যায়। শিশুর বাহ্যিক শ্বসনের হার একজন প্রাপ্তবয়স্কের শ্বসনের হারের প্রায় দ্বিগুণ থাকে।

শ্বসনকালে প্রধানতঃ কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা-জাতীয় খাদ্য ব্যবহৃত হয়। তবে প্রয়োজন হলে, স্নেহ-পদার্থ এবং প্রোটিন-জাতীয় পদার্থও ব্যবহৃত হতে পারে। শীত-স্তম্ভের (Hibernation) সময় অনেক প্রাণীর দেহে (যেমন, ব্যাঙ) সঞ্চিত স্নেহ-পদার্থ এজন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

M ক্রেব্স-চক্র (Krebs cycle) :
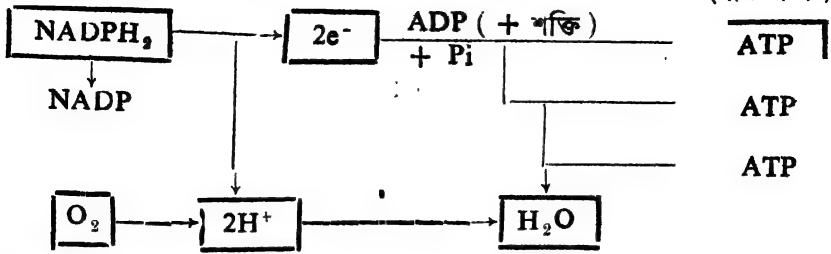
উল্লেখ্য,

NADP = Niacin (or, Nicotinamide) adenine dinucleotide phosphate

[নিয়াসিন (বা, নিকোটিন্যামাইড) অ্যাডেনিন ডাই-নিউক্লিওটাইড ফস্‌ফেট]

$$\boxed{\text{Adenosine}}-O-\underset{\underset{O}{\|}}{\overset{OH}{\overset{|}{P}}}-O-\underset{\underset{O}{\|}}{\overset{OH}{\overset{|}{P}}}-OH \quad + \quad HO-\underset{\underset{O}{\|}}{\overset{OH}{\overset{|}{P}}}-OH \quad + \text{ শক্তি}$$
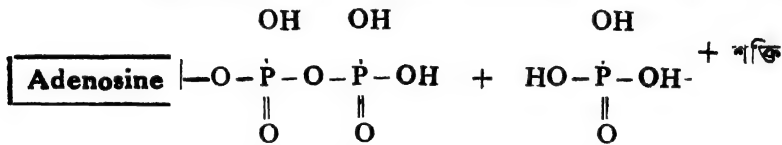
ADP = Adenosine diphosphate (অ্যাডেনোসিন ডাই-ফস্‌ফেট) Phosphoric acid (ফস্‌ফোরিক অ্যাসিড

$$\boxed{\text{Adenosine}}-O-\underset{\underset{O}{\|}}{\overset{OH}{\overset{|}{P}}}-O-\underset{\underset{O}{\|}}{\overset{OH}{\overset{|}{P}}}-O-\underset{\underset{O}{\|}}{\overset{OH}{\overset{|}{P}}}-OH$$
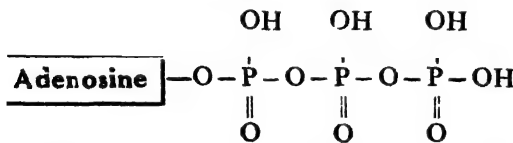
ATP = Adenosine triphosphate (অ্যাডেনোসিন ট্রাই-ফস্‌ফেট)

এখন সমগ্র বিক্রিয়াটি সংক্ষেপে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :—

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 6H_2O + 690{,}000 \text{ ক্যালরি}$$

গ্লুকোজ অক্সিজেন কার্বন ডাই-অক্সাইড জল তাপ-শক্তি
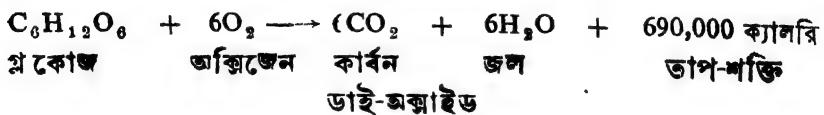
অষ্টম পরিচ্ছেদ

আভ্যন্তরীণ পরিবহণ

খাদ্যদ্রব্য, বর্জ্যপদার্থ এবং জল দেহের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবহণের জন্য সব রকম উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর দেহে নির্দিষ্ট পরিবহণ-ব্যবস্থা (Transport arrangement) রয়েছে। নিম্ন-শ্রেণীর উদ্ভিদ ও প্রাণীরা সাধারণতঃ ব্যাপন-প্রক্রিয়া দ্বারা বিভিন্ন পদার্থ (প্রয়োজন অনুযায়ী) জল মাধ্যমে শোষণ ও বর্জন ক'রে থাকে। উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদের দেহমধ্যে অবস্থিত কোষ ও কলাগুলিতে বিভিন্ন পদার্থের চলাচলের জন্য বিশেষ ধরনের পরিবহণ-ব্যবস্থা আছে।

প্রানিদেহের সংবহন-ব্যবস্থা উদ্ভিদদেহ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যদিও নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী (যেমন—অ্যামিবা) থেকে আরম্ভ ক'রে উচ্চ শ্রেণীর প্রাণী পর্যন্ত (মানুষসহ) সব রকম মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহেই খাদ্য এবং জল দেহাভ্যন্তরে সরল এবং তরল হওয়ার পরে সরাসরি কোষসমূহে অথবা রক্তে শোষিত হয় ব্যাপন অথবা অভিস্রবণ-প্রক্রিয়ায় (Osmosis)। সাধারণতঃ উচ্চ শ্রেণীর প্রানিদেহে ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যে খাদ্যবস্তু জীর্ণ হয়ে সরলতম উপাদানে পরিবর্তিত হয়, এবং সেখানে যে-সব শোষক-নালী (Villi) থাকে, তাদের সাহায্যে ঐ সব খাদ্যদ্রব্য শোষিত হয়ে রক্ত প্রবাহের সঙ্গে মিশে যায় এবং দেহের অন্যান্য কোষসমূহে পৌঁছায়।

উদ্ভিদদেহে পরিবহণ-ব্যবস্থা :

জল ছাড়া উদ্ভিদ্ বাঁচতে পারে না। নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ্ থেকে আরম্ভ ক'রে উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদ্ পর্যন্ত, সব রকম সবুজ উদ্ভিদই নিজেদের দেহাভ্যন্তরে খাদ্য প্রস্তুত করে, মাটি থেকে শোষিত রস (বা, জলীয় দ্রবণ) এবং বায়ু থেকে সংগৃহীত কারবন ডাই-অক্সাইডের সহায়তায়। বিভিন্ন উদ্ভিদের জল সংগ্রহ করার পদ্ধতিও বিভিন্ন রকম। আবার উদ্ভিদ্ যখন খাদ্য প্রস্তুত করে, তখন সেই খাদ্য উদ্ভিদদেহের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরের জন্যেও নির্দিষ্ট পরিবহণ-পদ্ধতির প্রয়োজন হয়। তবে সব রকম উদ্ভিদেরই পরিবহণ-ব্যবস্থা আংশিকভাবে, অথবা সম্পূর্ণরূপে, নির্ভর করে ব্যাপন অথবা অভিস্রবণ-প্রক্রিয়ার উপর।

যে প্রক্রিয়ায় দু'টি বিভিন্ন ঘনত্বের পদার্থ একটি সম-ঘনত্ব পদার্থে পরিণত হয়, তারই নাম ব্যাপন (Diffusion)। অন্য একটি পরীক্ষায় দেখা গেছে, দু'টি

বিভিন্ন ঘনত্বের তরল পদার্থ একটি অর্ধ-পারগম্য ঝিল্লী (Semi-permeable membrane) দ্বারা পৃথক্ হয়ে থাকলে, ব্যাপন-প্রক্রিয়ায় কম ঘনত্ববিশিষ্ট তরল পদার্থের অণুগুলি বেশী ঘনত্ববিশিষ্ট তরল পদার্থের অণুগুলির তুলনায় দ্রুতবেগে চলে। আর এই প্রক্রিয়া ততক্ষণই চলে, যতক্ষণ না তরল পদার্থ দু'টি সম ঘনত্বে পরিণত হয়। এই ধরনের ব্যাপনকে অভিস্রবণ (Osmosis) বলা হয়।
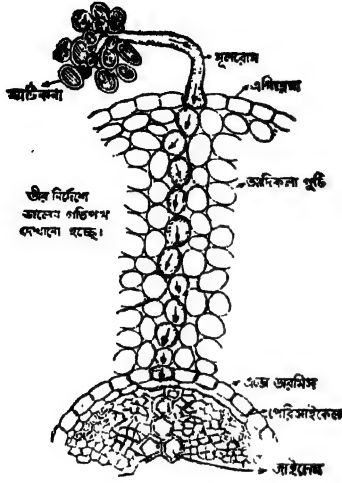
চিত্র ২৬। মূলরোম দিয়ে কোষান্তর অভিস্রবণ-প্রক্রিয়ায় মাটির রস (বা, জলীয় দ্রবণ) বহির্মজ্জায় প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে জাইলেম-টিস্যুতে পৌঁছায়। (মূলের অল্প একটু অংশের প্রস্থচ্ছেদ এখানে দেখানো হয়েছে।) (বিবর্ধিত)

শৈবাল-জাতীয় নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদের সকল দেহ-কোষই এক-একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ল্যাবরেটরী (বা, প্রয়োগশালা), এবং প্রতিটি কোষই নিজেদের খাদ্য প্রস্তুত করতে সক্ষম (দেহ-কোষে সবুজ-কণা থাকায়)। সুতরাং, এইসব উদ্ভিদের কোন প্রকার পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। তবে কোন কোষের জল বা খাদ্যের প্রয়োজন হলে, ব্যাপন-প্রক্রিয়ায় অন্য কোষ থেকে জল বা খাদ্য পেয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, উচ্চ শ্রেণীর কোন কোন সামুদ্রিক শৈবালের ক্ষেত্রে কিছু কোষ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি পরিবহণ-প্রণালী সৃষ্টি করে।

ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ্ নিজেদের খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না। কারণ, তাদের দেহে সবুজকণা থাকে না। এজন্য এরা যে বস্তুর উপরে জন্মায়, সেই বস্তু থেকেই, তাদের নোঙর করা অঙ্গের (Anchoring organ) সাহায্যে, খাদ্য শোষণ ক'রে তারপর ব্যাপন অথবা অভিস্রবণ-প্রক্রিয়ায় অন্য কোষে পাঠিয়ে দেয়।

মস্ (বা, সবুজ শেওলা)-জাতীয় উদ্ভিদে প্রথম ছোট পাতার উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু ঐসব উদ্ভিদের কাণ্ডে অথবা পাতায় শিরাত্মক কলাসমষ্টি তৈরি হয়নি। সুতরাং, পরিবহণ-ব্যবস্থার জন্য এক্ষেত্রে পাতার এবং কাণ্ডের মধ্যস্থলে এক প্রকার শক্ত প্যারেনকাইমা-কলা দেখা যায়, এবং এই কলার সাহায্যেই খাদ্য এবং জল পরিবাহিত হয়।

কিন্তু ফার্ন-জাতীয় উদ্ভিদে খাদ্য এবং জল পরিবহণের জন্য নির্দিষ্ট শিরাত্মক

কলাসমষ্টির সমাবেশ দেখা যায়, এবং এই শিরাত্মক কলাসমষ্টি জাইলেম এবং ফ্লোয়েম কলা দ্বারা গঠিত। অপরদিকে জাইলেম কলাতে ট্র্যাকীড-নামক (Tracheids) এক প্রকার কোষ দেখা যায়। এই কোষগুলি যখন পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন এর প্রোটোপ্লাজম নষ্ট হয়ে যায় এবং সাধারণভাবে কোষগুলিকে মৃত কোষ বলা হয়। এইসব কোষের কোষ-প্রাচীরে কিছু কিছু ছোট গর্ত (Pits) দেখা যায়। এইসব গর্তের মাধ্যমে একটি কোষের সঙ্গে অপর কোষের সংযোগ স্থাপিত হয়। সুতরাং, মাটি থেকে জল এবং অন্যান্য লবণসমূহ মূলরোম দ্বারা শোষিত হয়ে, কোষান্তর অভিস্রবণ-প্রক্রিয়াতে, সেগুলি এসে উপস্থিত হয় শিরাত্মক কলাসমষ্টির বাইরের কলায়। এখান থেকে জাইলেম-কলার ট্র্যাকীড-কোষে জল প্রবেশ করে, প্রধানতঃ অভিস্রবণ চাপ (Osmotic pressure) এবং মূলজ চাপ (Root pressure)-এর ফলে। এই জল ট্র্যাকীড-কোষগুলির ভিতর দিয়ে গিয়ে কাণ্ড ও পাতার শীর্ষদেশে পৌঁছায়।
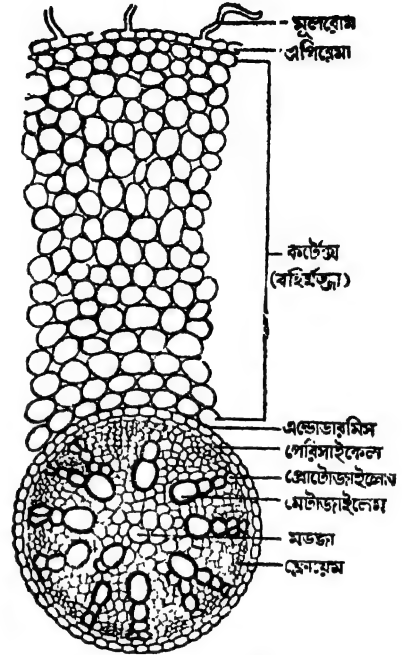
চিত্র ২৭। এক-বীজপত্রী উদ্ভিদের মূলের প্রস্থচ্ছেদ (বিবর্ধিত)

অপরদিকে পাতায় যখন খাদ্য প্রস্তুত হয় তখন সেই খাদ্য সরল এবং তরল অবস্থায় প্রথমে এসে পৌঁছায় ফ্লোয়েম-কলার চালনী-নালিকায় (Sieve tube)। সাধারণতঃ ফার্ন-জাতীয় উদ্ভিদে ফ্লোয়েম-কলার চালনী-নালিকাগুলি সঙ্গী-কোষবিহীন হয় এবং তার প্রস্থ-প্রাচীরে কিছু প্লাস্‌মোডেস্‌মাটা (Plasmodesmata) দেখা যায়, যার সাহায্যে একটি কোষের সঙ্গে অপর কোষের সংযোগ স্থাপিত হয়। এখন খাদ্য একটি চালনী-নালিকার ভিতরে যে প্রোটোপ্লাজম-জালিকা (Protoplasmic strands) আছে, তার সাহায্যে উপর থেকে নীচের দিকে প্রবাহিত হয়। আর প্রস্থ-প্রাচীরের ভিতর দিয়ে অপর চালনী-নালিকার ভিতরে প্রবাহিত হয়।

পাইন-জাতীয় উদ্ভিদে জল শোষণ-প্রক্রিয়া ফার্ন-জাতীয় উদ্ভিদের মতো। কিন্তু এতে শিরাত্মক কলাসমষ্টি আরও উন্নত ধরনের। জাইলেম-কলার ট্র্যাকীড-কোষ
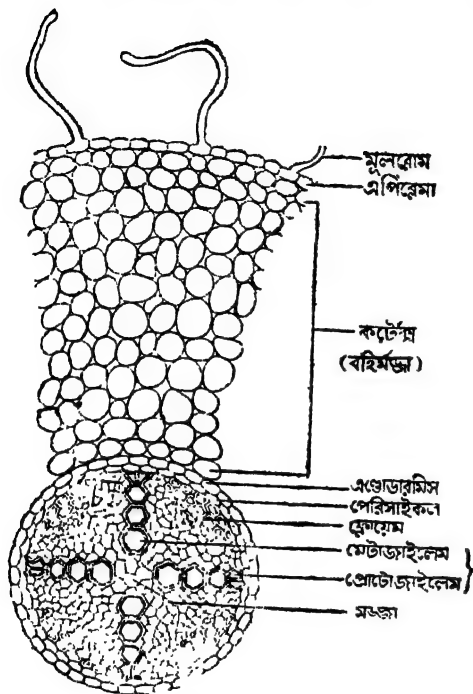
চিত্র ২৮। দ্বি-বীজপত্রী উদ্ভিদের মূলের প্রস্থচ্ছেদ (বিবর্ধিত)

[কোষান্তর অভিস্রবণ-প্রক্রিয়ায় (Osmosis) মাটির রস (বা, জলীয় দ্রবণ) প্রথমে মূলরোম দিয়ে বহির্মজ্জায় প্রবেশ করে, এবং সেখান থেকে জাইলেম-টিস্যুতে পৌঁছায়। জাইলেম হ'ল মূল থেকে আরম্ভ ক'রে, কাণ্ডের ভিতর দিয়ে, নবপল্লব (Shoot) পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন সংযোগকারী টিস্যু (Continuous connecting tissue)। এদের ভিতর দিয়েই মাটির রস (বা, জলীয় দ্রবণ) নবপল্লবের শীর্ষে পৌঁছায়।]

ব্যতীত জাইলেম-তন্তু এবং জাইলেম-প্যারেনকাইমা-কোষও দেখা যায়। ফলে মূল আরও শক্ত এবং দৃঢ় হয়। এছাড়া তাড়াতাড়ি জল পরিবহণের জন্যে ট্র্যাকীড-কোষের পার্শ্ব-প্রাচীরের গর্তগুলি (Pits) আরও সুবিন্যস্ত ও সুগঠিত হয়। সাধারণতঃ ৮০/৯০ ফুট দীর্ঘ পাইন গাছে দেখা গেছে যে, জল জাইলেম-কলার ভিতর দিয়ে ঘণ্টায় ৩/৬ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত বেগে, মূল থেকে কাণ্ডের দিকে প্রবাহিত হয়।

অনুরূপ ক্ষেত্রে ফ্লোয়েম-কলার চালনী-নালিকার (Sieve-tube) সঙ্গে সঙ্গী-কোষের বদলে আর এক প্রকার
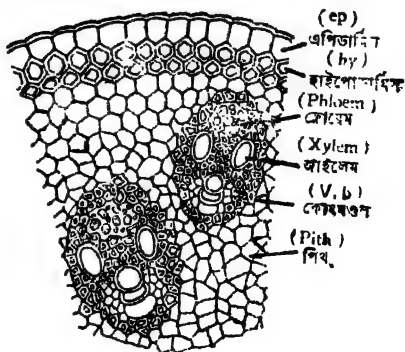
চিত্র ২৯। এক-বীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ (বিবর্ধিত)

অ্যাল্‌বিউমিন-যুক্ত (Albuminous) কোষ দেখা যায়। এখানে চালনী-নালিকার প্রোটোপ্লাজ্‌ম স্থানে স্থানে জমা হয়ে ক্যালাস (Callous) বা পিণ্ড তৈরি করে। কিন্তু চালনী-নালিকার ভিতরের প্রোটোপ্লাজ্‌ম-জালিকা তার প্রস্থ-প্রাচীরের ক্যালাস-এর মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে একটি কোষের সঙ্গে অপর কোষের সংযোগ স্থাপন ক'রে থাকে। ফলে তরল খাদ্য একটি চালনী-নালিকা থেকে অপর চালনী-নালিকায় এরূপ প্রোটোপ্লাজ্‌ম-জালিকার সাহায্যেই প্রবাহিত হয়ে থাকে।
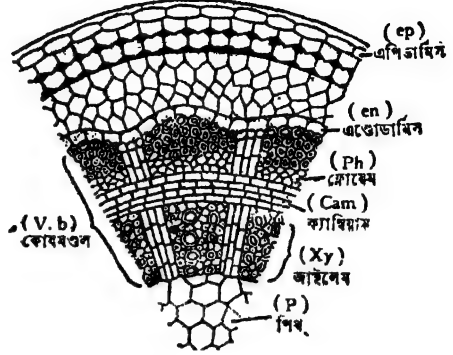
চিত্র ৩০। দ্বি-বীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ (বিবর্ধিত)

ক্রমবিকাশের ধারা অনুযায়ী, এক-বীজপত্রী এবং দ্বি-বীজপত্রী উদ্ভিদে পরিবহণের জন্য সবচেয়ে উন্নত ধরনের শিরাত্মক কলাসমষ্টি পরিলক্ষিত হয়। এতে জাইলেম-কলা বিভিন্ন রকম কোষ দিয়ে গঠিত। এদের মধ্যে অন্যতম প্রধান কোষের নাম ট্র্যাকিয়া (Trachea) বা বাহিকা। দৈর্ঘ্যে ট্র্যাকীড-কোষের চেয়ে ছোট এবং এর প্রস্থ-প্রাচীর বিলুপ্ত হয়ে যায়। এজন্য একটি কোষের সঙ্গে অপর কোষের সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হয়, এবং তার ফলে মূল থেকে পাতা পর্যন্ত এক-একটি অখণ্ড নলের ভিতরে বায়ু-বিহীন জল একটি জলস্তম্ভের সৃষ্টি করে। এই ভাবে জল উদ্ভিদের মূল থেকে কাণ্ডের বিভিন্ন স্থানে প্রবাহিত হয়।
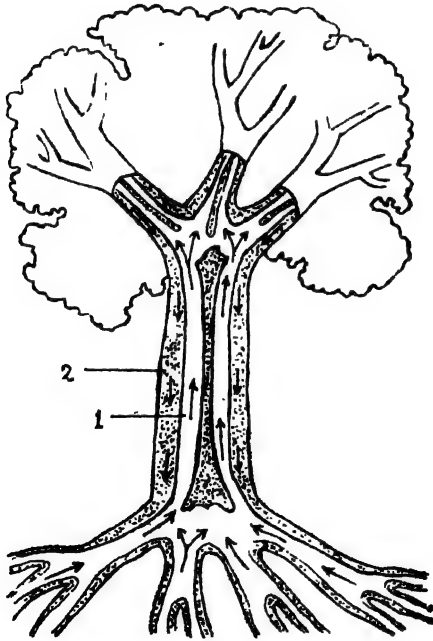
1. জাইলেম (Xylem), 2. ফ্লোয়েম (Phloem)
চিত্র ৩১। একটি বৃক্ষের লম্বচ্ছেদ—জাইলেম ও ফ্লোয়েম-টিস্যুর অবস্থান এবং তাদের ভিতর দিয়ে কি ভাবে রস চলাচল করে তা তীর-চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে।

উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদে জাইলেম-কলার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, ফ্লোয়েম-কলারও উন্নতি দেখা যায়। এখানে ফ্লোয়েম-কলা সাধারণতঃ গঠিত হয়ে থাকে চালনী-নালিকা, সঙ্গী-কোষ, প্যারেনকাইমা-কোষ এবং ফ্লোয়েম-তন্তু দ্বারা। পাতায় প্রস্তুত খাদ্য প্রথমে সরল এবং তরল অবস্থায় চালনী-নালিকা দিয়ে উদ্ভিদের নীচের দিকে প্রবাহিত হয়ে তার বিভিন্ন অঙ্গে গিয়ে সঞ্চিত হয়; যেমন – কাণ্ড, মূল ইত্যাদি। এইসব স্থানে সাধারণতঃ খাদ্য অদ্রবণীয় প্রোটিন এবং স্টার্চ (বা, শ্বেতসার)-কণা রূপে জমা হয়ে থাকে। আবার গাছের সক্রিয় বৃদ্ধির সময়, যেমন—মুকুল বা ফুল তৈরির সময়, গাছের এইসব অদ্রবণীয় খাদ্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তখন এই খাদ্য পুনরায় তরল হয়ে উদ্ভিদের উপর দিকে জাইলেম-কলা দ্বারা বাহিত হয়। উদ্ভিদ্‌দেহে কোনো পাম্প নেই। তাহ'লে কোন্ শক্তি দ্বারা তরল খাদ্য এইভাবে একবার উপর থেকে নীচের দিকে, এবং প্রয়োজন মত, আবার নীচ থেকে উপরের দিকে প্রবাহিত হয়ে থাকে? এ বিষয়ে সঠিকভাবে এখনও কিছু জানা যায় নি। তবে অনেকে মনে করেন, প্রস্বেদন (Transpiration)-এর ফলে পাতার মেসোফিল-কোষে জলের ঘাটতি হয়, তাই তা জল আকর্ষণ করে। এর ফলে এক শোষণ-বল (Suction force)-এর সৃষ্টি হয়। তাই জাইলেম-নালিকা দিয়ে জল ক্রমাগত উপরে উঠতে থাকে।

প্রাণিদেহে পরিবহণ-ব্যবস্থা:

উদ্ভিদ্ তার খাদ্য নিজদেহে তৈরি ক'রে থাকে, কিন্তু প্রাণী সাধারণতঃ তার দেহের ভিতরে খাদ্য তৈরি করতে পারে না। যে কোন একটি প্রাণী প্রকৃতি থেকে খাদ্য আহরণ ক'রে নিজদেহে গ্রহণ ক'রে থাকে। তাই নিম্ন শ্রেণীর প্রাণিদেহে (এককোষী অথবা বহুকোষী প্রাণীর ক্ষেত্রে) সাধারণতঃ দেখতে পাই যে, তারা দেহের ভিতরে খাদ্য গ্রহণ করে এবং সরাসরি ব্যাপন-ক্রিয়া দ্বারা দেহের অন্যান্য কোষসমূহে পরিচালিত করে। প্রাণিদেহের ভিতরের গঠনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হয়েছে রক্ত। তখন খাদ্যের সারাংশ প্রথমে শোষিত হয়ে থাকে রক্তে. পরে এই খাদ্য রক্তের সঙ্গে বাহিত হয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত কোষে কোষে পৌঁছায়।

রক্ত প্রাণিদেহে আবর্তিত হয়ে থাকে বিভিন্ন রক্তবহা-নালীর মাধ্যমে। আবার রক্তবহা-নালীগুলি শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পরিণত হয় সূক্ষ্ম কৌশিক নালীতে (Capillaries)। পরে এই কৌশিক নালীগুলি পাকস্থলী এবং দেহের অন্যান্য কোষসমূহের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ক'রে থাকে। যখন রক্ত শুধুমাত্র রক্তবহা-নালী দিয়ে প্রবাহিত হয়ে থাকে, তখন এই ধরনের সংবহন-তন্ত্রকে বদ্ধ-সংবহন-তন্ত্র

(Closed system) বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী কেঁচো, উচ্চ শ্রেণীর প্রাণী মানুষ ইত্যাদি। কিন্তু পতঙ্গ শ্রেণীর প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখা যায়, রক্ত প্রথমে কিছুদূর রক্তবহা-নালী দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তারপর মুক্ত অবস্থায় দেহের কোষসমূহের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে থাকে। তখন এই ধরনের সংবহন-তন্ত্রকে বলা হয় মুক্ত-সংবহন-তন্ত্র (Open system)। এই শ্রেণীর প্রাণীর ক্ষেত্রে অপর আর একটি সংবহন-তন্ত্র দেখা যায়—একে বলা হয় গ্যাস-সংবহন-তন্ত্র। সাধারণতঃ কিছু ছোট ছোট শাখা-প্রশাখাযুক্ত নালী (Tracheal tubes) পরস্পর যুক্ত হয়ে এই তন্ত্র গঠন ক'রে থাকে। এই নালীগুলি দেহের বাইরে মুক্ত অবস্থায় থাকে। অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড দেহের সর্বত্র বাহিত হয়ে থাকে এই তন্ত্রের মাধ্যমে।

প্রাণিদেহের ভিতরে রক্তের আবর্তনের জন্যে রক্ত-সংবহন-তন্ত্রের অন্তর্গত রক্তবহা-নালীর কিছু স্থানে বিশেষ পরিবর্তন হয়ে থাকে। এই বিশেষ স্থানটিকে হৃৎপিণ্ড (Heart) বলা হয়। আবার হৃৎপিণ্ড যেসব পেশী দ্বারা গঠিত, তাদের সঙ্কোচন এবং প্রসারণের ফলে রক্ত দেহের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রবাহিত হয়ে থাকে। সুতরাং এই ভাবেই রক্তের সঙ্গে খাদ্যের সারাংশ দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং বর্জ্য পদার্থ ব্যাপন-প্রক্রিয়া দ্বারা এসে জমা হয় রেচন-তন্ত্রে।

মানুষের রক্ত-সংবহন-তন্ত্র পর্যালোচনা করলে এ-বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা করা যাবে।

মানবদেহের রক্ত-সংবহন-তন্ত্র ঃ

উইলিয়ম হার্ভী (১৫৭৮-১৬৫৭ খ্রীঃ) নামক একজন ইংরেজ চিকিৎসক সর্বপ্রথম মানবদেহের রক্তসঞ্চালন-প্রণালী আবিষ্কার করেন। তিনি ফোক্‌স্টোনে জন্মগ্রহণ করেন এবং কেম্ব্রিজে শিক্ষালাভ করেন। ডাক্তারী পরীক্ষায় পাস করেন প্রথমে পাদুয়া এবং তারপরে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এরপর তিনি চিকিৎসক হিসেবে লণ্ডনের সেণ্ট্‌ বার্থোলোমিউ হাসপাতালে যোগ দেন এবং রাজা প্রথম চার্লসের পারিবারিক চিকিৎসক নিযুক্ত হন। এসময় তিনি মানবদেহের রক্ত-সঞ্চালন-প্রণালী সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ক'রে একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি পুস্তকে তাঁর এই মতবাদ প্রকাশ করেন। যদিও তিনি অনেক বক্তৃতা দিয়ে এবং অনেক প্রবন্ধ লিখে তাঁর এই মতবাদ সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করার চেষ্টা করেন, তবুও প্রথমদিকে খুব কমসংখ্যক চিকিৎসকই তাঁর এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। সুখের বিষয় হার্ভী-র জীবিতকালেই তাঁর এই মতবাদ চিকিৎসক-সমাজে সত্য ব'লে গৃহীত হয়।

(১) **হৃৎপিণ্ড বা হৃদ্‌যন্ত্র**—হৃদ্‌যন্ত্র (Heart) অনৈচ্ছিক পেশী দিয়ে তৈরী, দেখতে অনেকটা নোনা-আতার মতো। এর অবস্থান বুকে, দুই ফুসফুসের মাঝে একটু বাঁদিক ঘেঁষে। এর গঠন শুধু বিচিত্র নয়, কাজও অতি বিচিত্র এবং বিরাম-বিহীন। হৃদ্‌যন্ত্র একটি পাম্পের মতো অবিরাম কাজ ক'রে চলেছে। এর সংকোচন ও প্রসারণের ফলে বুকের মধ্যে অবিরত 'লাব্-ডুপ্' শব্দ হয়, আর সেই সঙ্গে সমস্ত দেহের রক্তপাত নিয়ন্ত্রিত হয়। চার-পাঁচ মাসের ভ্রূণ অবস্থা থেকে হৃদ্‌স্পন্দন আরম্ভ হয় এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত অবিরাম চলতে থাকে।

হৃদ্‌যন্ত্র অবিরত পর্যায়ক্রমে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হচ্ছে। ঘর্ষণজনিত ক্ষয়-ক্ষতি নিবারণের জন্যে এর চারদিকে একটি শক্ত আবরণ আছে, এর নাম **পেরিকার্ডিয়াম** (Pericardium)। এটি খুব মসৃণ, এর তলায় একপ্রকার পিচ্ছিল তরল পদার্থ নিঃসৃত হয় ব'লে ঘর্ষণ কম হয়।
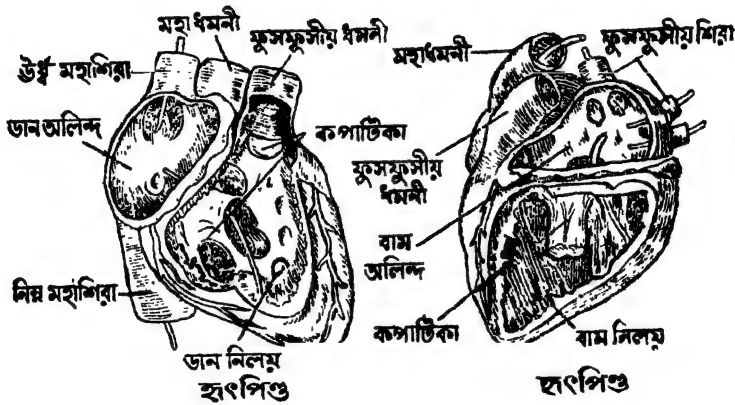
চিত্র ৩২। মানুষের হৃৎপিণ্ড (লম্বচ্ছেদ)

হৃদ্‌যন্ত্রে চারটি কুঠরি আছে। ডানদিকে উপরে-নীচে দু'টি কুঠরি, আর বাঁদিকে উপরে-নীচে আরও দু'টি কুঠরি। উপরের কুঠরি দু'টিকে বলে **অলিন্দ** (Auricle), আর নীচের কুঠরি দু'টিকে বলে **নিলয়** (Ventricle)। অলিন্দ দু'টি এবং নিলয় দু'টির মাঝে পেশীর দেওয়াল থাকায়, এক অলিন্দ থেকে আর অলিন্দে, কিংবা এক নিলয় থেকে আর নিলয়ে, রক্ত যেতে পারে না। ডান অলিন্দ থেকে ডান নিলয়ে এবং বাম অলিন্দ থেকে বাম নিলয়ে, রক্ত যাবার পথ আছে। ডান অলিন্দ এবং ডান নিলয়ের মধ্যেকার ছিদ্রপথে একটি ত্রিপত্র কপাটিকা

(Tricuspid valve) আছে, আর বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়ের মধ্যেকার ছিদ্রপথে আছে একটি দ্বিপত্র কপাটিকা (Bicuspid valve)। এই কপাটিকা দু'টি এমন-ভাবে রয়েছে যে, অলিন্দ রক্তে পূর্ণ হ'লেই এগুলি নীচের দিকে খুলে যায় এবং রক্ত নিলয়ে চলে আসে। আবার নিলয় রক্তে পূর্ণ হ'লে উপরদিকে চাপ পড়ে, তখন কপাটিকা বন্ধ হ'য়ে যায় ব'লে রক্ত অলিন্দে ফিরে যেতে পারে না। ডান নিলয় থেকে ফুসফুসীয় ধমনীর (Pulmonary artery) পথে এবং বাম নিলয় থেকে মহাধমনীর পথে পৃথক্ দু'টি অর্ধচন্দ্র কপাটিকা (Semilunar valve) আছে। এগুলি এমনভাবে রয়েছে যে, নিলয় প্রসারিত হওয়ার সময় এই কপাটিকা দু'টি বন্ধ হ'য়ে যায় ব'লে ধমনীর রক্ত হৃদ্‌যন্ত্রে ফিরে আসতে পারে না।

হৃদ্‌যন্ত্রের মধ্যে সব সময়ই প্রচুর রক্ত থাকে, কিন্তু তবুও তা থেকে হৃদ্‌যন্ত্রের কোষগুলির পুষ্টি হয় না। করোনারী ধমনী (Coronary artery) নামক এক-প্রকার বিশেষ ধরনের ধমনী ও তার শাখা-প্রশাখার ভিতর দিয়ে হৃদ্‌যন্ত্রের কোষ-গুলিতে বিশুদ্ধ রক্ত সঞ্চালিত হ'য়ে তাদের পুষ্টি সাধন করে।

হৃদ্‌যন্ত্রে দু'প্রকার নার্ভ আছে, একপ্রকার নার্ভ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া দ্রুত করতে এবং অন্যপ্রকার নার্ভ তা মন্দীভূত করতে সাহায্য করে।

(২) **রক্ত**– একফোঁটা রক্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, অসংখ্য **লাল কণিকা** (Red corpuscles) আর কতকগুলি **সাদা কণিকা** (White corpuscles) হলদে রঙের **রক্তরসে** (Plasma) ঘুরে বেড়াচ্ছে। লাল কণিকাগুলি টাকার মতো গোল আর চেপ্টা। এরা সংখ্যায় অনেক বেশী ব'লে রক্তের রং লাল দেখায়। এরা বাতাস থেকে অক্সিজেন শোষণ করে এবং পরে সেই অক্সিজেন জীবকোষে পরিবেশন করে। আবার জীবকোষের মধ্যে মৃদু-দহনের ফলে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের সৃষ্টি হয়, রক্তরস তা বহন ক'রে এনে ফুসফুসে পৌঁছে দেয়। সাদা কণিকাগুলির আকার ও গঠন পরিবর্তনশীল, তবে স্থির অবস্থায় এদের অনেকটা গোলাকার দেখায়। এরা লাল কণিকাদের চেয়ে কিছু বড়। খাদ্য ও পানীয়ের সঙ্গে বা ক্ষতস্থান দিয়ে রোগ-জীবাণু শরীরে ঢোকামাত্রেই সাদা কণিকাগুলি তাদের আক্রমণ

চিত্র ৩৩। রক্তের লাল ও সাদা কণিকা (বিবর্ধিত)

ক'রে গ্রাস করার চেষ্টা করে, অর্থাৎ সাদা কণিকাগুলি আমাদের শরীরে সর্বদাই দেহরক্ষীর কাজ করছে। এরূপ বিশেষ-গুণসম্পন্ন সাদা-কণিকাকে **ফেগোসাইট** (Phagocyte) বলা হয়। লাল কণিকাদের চেয়েও আকারে ছোট, অসমান সাদা চাকতির মতো আর একপ্রকার কণিকা দেখা যায়, তাদের **অণুচক্রিকা** (Blood platelates) বলে। দেহের কোথাও রক্ত পড়তে আরম্ভ করলে অণুচক্রিকার সাহায্যেই রক্ত জমাট বাঁধে, এর ফলে সহজেই রক্তপাত বন্ধ হতে পারে।
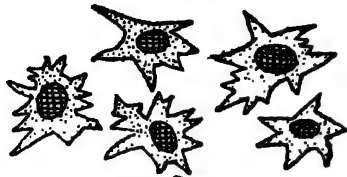
চিত্র ৬৪। অণুচক্রিকা (বিবর্ধিত)

রক্ত যতক্ষণ দেহের মধ্যে প্রবাহিত হয় ততক্ষণ তরল থাকে, কিন্তু দেহের বাইরে এলেই জমাট বাঁধে। তরল রক্তে থাকে তরল ফাইব্রিনোজেন, কিন্তু দেহের বাইরে এলে তা সরু-সুতোর মতো ফাইব্রিন নামক পদার্থে পরিণত হয়। ইহাই রক্ত-কণিকার সঙ্গে মিলিত হ'য়ে জমাট বাঁধে। জমাট রক্ত সংকুচিত হ'লে যে তরল রস চুইয়ে বেরিয়ে আসে, তাকে **রক্তমস্তু** (Serum) বলা হয়। অণুচক্রিকা থেকে নিঃসৃত থ্রম্বোকাইনেজ নামক পদার্থ ফাইব্রিনোজেনকে ফাইব্রিনে পরিণত হ'তে সাহায্য করে।
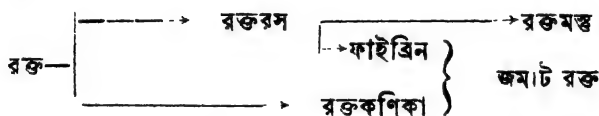
(২) **রক্তবহা-নালীসমূহ**—আমাদের দেহে **ধমনী** (Artery), **শিরা** (Vein) ও **জালক** (Capillaries) এই তিনরকম রক্তবহা-নালী আছে। এদের মধ্যে দিয়েই ফুসফুস, হৃদ্‌যন্ত্র এবং দেহের বিভিন্ন অংশের জীবকোষের মধ্যে রক্ত চলাচল করে।

ধমনীর কাজ বিশুদ্ধ রক্ত হৃদ্‌যন্ত্র থেকে সারা দেহে পৌঁছে দেওয়া। ধমনীর গায়ে পেশী থাকে ব'লে তা স্থিতিস্থাপক। ধমনীর শাখা-প্রশাখাগুলি সর্বদাই সংকুচিত থাকে, কাজেই রক্ত হৃদ্‌যন্ত্র থেকে যত দূরে যায় তত তার গতি বাধা পায়। এজন্য ধমনী কেটে গেলে হৃদ্‌যন্ত্রের সংকোচনের তালে তালে লাল রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে বেরুতে থাকে। শিরার কাজ সমস্ত দেহের দূষিত ও কাল্‌চে রক্ত বয়ে এনে হৃদ্‌যন্ত্রে পৌঁছে দেওয়া। এজন্য শিরা কাটলে কাল্‌চে রক্ত বেরুতে থাকে। শিরা'র স্থিতিস্থাপকতা এবং সর্বদা সংকুচিত থাকার ধর্ম খুবই কম। হৃদযন্ত্রের রক্ত পাছে

শিরা দিয়ে বিপরীত দিকে চলে যায়, এজন্য শিরার মধ্যে স্থানে স্থানে অনেক কপাটিকা আছে।

চিত্র ৩৫। রক্তবহা-নালীসমূহ (বিবর্ধিত)

ধমনী ও শিরা এতো সূক্ষ্ম নয় যে, তারাই দেহকোষে রক্তের আদান-প্রদান করতে পারবে। তাই ধমনী ও শিরার মাঝে একপ্রকার সূক্ষ্ম নাড়ী-জালক ছড়িয়ে রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ধমনী অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হ'য়ে খুব সূক্ষ্ম নাড়ী-জালকে পরিণত হয়েছে। এগুলি আবার অপরদিকে শিরার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। সাধারণ ভাবে রক্ত ধমনী থেকে জালকে এবং সেখান থেকে শিরাতে যায়। কিন্তু সে-সময় জালকের পাতলা দেওয়াল দিয়ে চুইয়ে রক্তের জলীয় অংশটুকু বেরিয়ে আসে এবং দেহকোষে যায়। এর নাম লসিকা (Lymph)। ইহা দেহকোষগুলিকে অক্সিজেন ও খাদ্যের সারাংশ সরবরাহ করে এবং তাদের কাছ থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ গ্রহণ করে। এরপর লসিকা বিশেষ ধরনের **লসিকা-নালীর** (Lymphatic vessels) ভিতর দিয়ে শেষে শিরাতে পৌছায়।

রক্ত-সঞ্চালন-প্রণালীসমূহ—রক্ত-সঞ্চালন-প্রণালী প্রধানত দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—

(ক) **বৃহত্তর রক্ত-সঞ্চালন-প্রণালী**—বাম নিলয় থেকে বিশুদ্ধ রক্ত মহাধমনী (Aorta) পথে বেরিয়ে ধমনীর শাখা-প্রশাখা ও নাড়ী-জালকের ভিতর দিয়ে গিয়ে শিরাতে পৌছায়। রক্ত-সঞ্চালনের সময় জালকের পাতলা আবরণের ভিতর দিয়ে লসিকা চুইয়ে বেরিয়ে আসে। ইহাই কোষে কোষে খাদ্যের সারাংশ ও অক্সিজেন সরবরাহ করে। খাদ্যের সারাংশ থেকে কোষগুলির পুষ্টি হয় এবং অক্সিজেনের সাহায্যে কোষগুলির মধ্যে মৃদু-দহন-ক্রিয়া চলে। এর ফলে উদ্ভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও কোষের অবাঞ্ছিত পদার্থসহ লসিকা-নালীতে গৃহীত

হয় এবং সেখান থেকে শিরায় যায়। দূষিত রক্ত শিরার মধ্য দিয়ে গিয়ে মহাশিরার (Vena cava) ভিতর দিয়ে হৃদ্‌যন্ত্রের ডান অলিন্দে ফিরে আসে। এরই নাম **বৃহত্তর রক্ত-সঞ্চালন-প্রণালী**। দু'টি শাখা-প্রণালী এর অন্তর্ভুক্ত।

যাকৃতিক রক্ত-সঞ্চালন-প্রণালীতে বিশুদ্ধ রক্ত পৌষ্টিক নালী, প্লীহা, যকৃত প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে তারপর হৃদ্‌যন্ত্রে ফিরে আসে। এর ফলে কোষ-

চিত্র ৩৬। মানুষের রক্ত-সংবহন-তন্ত্র
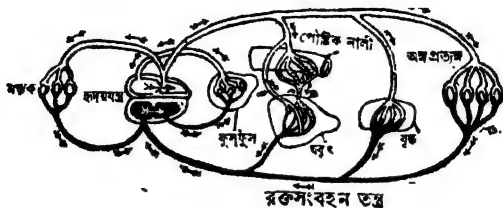
গুলিতে খাদ্যের সারাংশ এবং অক্সিজেন পৌছানো সম্ভব হয়। খাদ্যের উদ্‌বৃত্ত অংশ যকৃতে এসে গ্লাইকোজেনরূপে সঞ্চিত হয়। এখানেই প্রোটিন-জাতীয় খাদ্য থেকে উদ্ভূত আবর্জনা রক্তের সঙ্গে মিশে যায় এবং পরে মূত্রের সঙ্গে পরিত্যক্ত হয়। প্লীহা ও যকৃতের সাহায্যে রক্তের জীর্ণ লাল কণিকাগুলি ধ্বংস হ'য়ে যায় এবং তার ফলে যে পিত্তরসের সৃষ্টি হয়, তাই পিত্তাশয়ে গিয়ে সঞ্চিত হয়।

বৃক্কের রক্ত-সঞ্চালন-প্রণালীতে হৃদ্‌যন্ত্র থেকে রক্ত বৃক্কে পৌছালে রক্তে সঞ্চিত আবর্জনা মূত্ররূপে পরিত্যক্ত হয় এবং সেই আবর্জনামুক্ত রক্ত আবার হৃদ্‌যন্ত্রের ডান অলিন্দে ফিরে আসে।

(খ) **ক্ষুদ্রতর বা ফুসফুসীয় রক্ত-সঞ্চালন-প্রণালী**—সমস্ত দেহের দূষিত রক্ত ডান অলিন্দে আসে এবং সেখান থেকে ডান নিলয় হ'য়ে ফুসফুসে পৌছায়। সেখানে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস পরিত্যক্ত হয় এবং বাতাসে অক্সিজেন গৃহীত হয় ব'লে রক্ত পুনরায় শোধিত ও লাল রঙের হয়। অক্সিজেন-বহুল বিশুদ্ধ রক্ত ফুসফুসীয় শিরা (Pulmonary vein) দিয়ে প্রথমে হৃদ্‌যন্ত্রের বাম অলিন্দে যায় এবং সেখান থেকে বাম নিলয়ে পৌছায়। সেখান থেকে এই রক্ত সমস্ত দেহে ছড়িয়ে যায়। এরই নাম **ক্ষুদ্রতর বা ফুসফুসীয় রক্ত-সঞ্চালন-প্রণালী**।

রক্ত-সঞ্চালনের ফল—নিলয় দু'টি সংকুচিত হওয়ার সময় অলিন্দ ও নিলয়ের মাঝের কপাটিকা দু'টি হঠাৎ বন্ধ হ'য়ে দীর্ঘ 'লাব্' শব্দের সৃষ্টি করে। আবার

অল্পক্ষণ পরেই নিলয় দু'টি প্রসারিত হওয়ার সময় অর্ধচন্দ্র কপাটিকা দু'টি বন্ধ হওয়ার জন্য হ্রস্ব 'ডুপ্' শব্দ হয়। স্বল্প-ব্যবধানে 'লাব্-ডুপ্' শব্দ দু'টি শোনা যায়, তারপর খানিকক্ষণ বিরাম থাকে, এসব মিলিয়ে হৃদ্‌যন্ত্রের কর্মচক্র রচিত হয়েছে। আমরা যখন ঘুমাই তখন বিরাম বেশিক্ষণ থাকে, আবার যখন দৌড়াই তখন বিরামের সময় কমে যায়।

হৃদ্‌যন্ত্রের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে ধমনীতে রক্তস্রোতের যে ছন্দোবদ্ধ স্পন্দনের সৃষ্টি হয়, তাকেই বলে **নাড়ী-স্পন্দন** (Heart-beat)। কব্‌জির কাছে নাড়ী হাড়ের উপরে রয়েছে, তাই এখানে নাড়ী-স্পন্দন সহজেই অনুভব করা যায়। পূর্ণবয়সে নাড়ী-স্পন্দন হয় ৭২ থেকে ৮০ বার, কৈশোরে ৮০ থেকে ৯০ বার, আর অতি শৈশবে প্রায় ১৩০ বার। বৃদ্ধবয়সে এবং অসুস্থ অবস্থায় নাড়ী-স্পন্দন ৭২ বারের চেয়ে বেশী বা কম হ'য়ে যায়। ভয়, রাগ বা অন্য কোনো কারণে মানসিক চাঞ্চল্য ঘটলে, সঙ্গে সঙ্গে নাড়ী-স্পন্দন অনেক বেড়ে যায়।

রক্তের প্রবাহ আমাদের দেহে তাপসাম্য রক্ষা করে। রক্তের প্রধান কাজ দেহের কোষে কোষে খাদ্যরস ও অক্সিজেন পৌঁছে দেওয়া, আর জীবকোষ থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস, রোগ জীবাণু ও অন্যান্য অবাঞ্ছিত পদার্থ বয়ে আনা, এবং পরে তাদের দেহ থেকে বের ক'রে দেওয়া। রক্তে রোগ-প্রতিষেধক পদার্থ সঞ্চিত থাকে, তারই সাহায্যে আমরা সাধারণত রোগমুক্ত থাকতে পারি। এ ছাড়া দেহে কোনো রোগ-জীবাণু প্রবেশ করামাত্রই দেহরক্ষী সাদা কণিকাগুলি তাদের আক্রমণ ক'রে ধ্বংস ক'রে দেয়।

নবম পরিচ্ছেদ

রেচন

জীবদেহের প্রতিটি জীবন্ত কোষে নানাপ্রকার বিপাকীয় ক্রিয়ার ফলে কয়েক প্রকার উপজাত পদার্থের সৃষ্টি হয়। কোষ থেকে এগুলি দূরীভূত না হলে বিষক্রিয়া দেখা দেয়। তার ফলে কোষের এবং পরে সামগ্রিকভাবে জীবেরই মৃত্যু হয়। শ্বাসক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং অন্যান্য বিপাকীয় ক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত নানাপ্রকার নাইট্রোজেন-ঘটিত যৌগ (যেমন-ইউরিয়া) দেহের পক্ষে ক্ষতিকর। সাধারণভাবে এদের দেহের বাইরে বর্জন করাকেই রেচন (Excretion) বলা হয়।
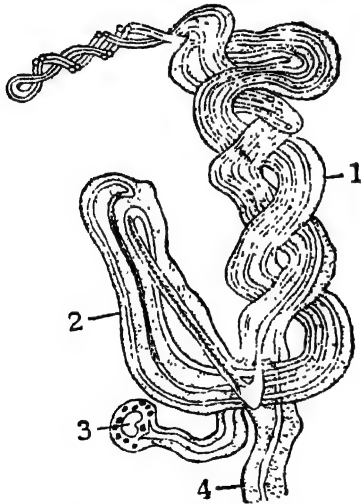
1. পাকানো বা জড়ানো অংশ (Twisted loop), 2. সোজা অংশ (Straight lobe), 3. নেফ্রিডিওস্টোম (Nephridio-stome), 4. প্রান্তভাগ (Terminal duct)।

চিত্র ৩৭। কেঁচোর সেপ্‌টাল নেফ্রিডিয়াম।

অবিপাকীয় কাজের জন্যও প্রাণীদের কিছু কিছু বর্জ্য পদার্থ বর্জন করতে দেখা যায়; যেমন—খাদ্যনালীতে যে-সব খাদ্যের পরিপাক হয় না, অথবা ভিলাই দ্বারা যে-সব খাদ্য শোষিত হয় না। এ ছাড়া প্রাণীদের খোলস, পালক এবং নখ বর্জন করতে দেখা যায়।

নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীর ক্ষেত্রে রেচন-তন্ত্র বিভিন্ন রকম হয়। যেমন, কেঁচোর প্রায় প্রতিটি দেহ-খণ্ডের দু'ধারে একটি ক'রে মোট দু'টি U-এর মতো রেচন-নালী দেখা যায়। এর নাম নেফ্রিডিয়াম (Nephridium)। এর একটি প্রান্ত দেহ-গহ্বর থেকে বর্জ্য পদার্থ শোষণ করে, অপর প্রান্ত দ্বারা তা পৌষ্টিক নালীতে জমা হয়। অবশেষে ঐ বর্জ্য পদার্থ পায়ু-ছিদ্র দিয়ে দেহের বাইরে চলে আসে।

পতঙ্গ শ্রেণীর প্রাণীর (যেমন, আরশোলা) পাকস্থলী ও অন্ত্রের সংযোগস্থলে কতকগুলি চুলের মতো সরু ও লম্বা

রেচন-নালী দেখা যায়। এর নাম ম্যাল্‌ফিজিয়ান-নালী। এই নালী দেহ-গহ্বর থেকে বর্জ্য পদার্থগুলি শোষণ ক'রে তারপর অন্ত্রে পাঠিয়ে দেয়। ঐ স্থানে প্রয়োজনীয় পদার্থগুলি, যেমন—গ্লুকোজ, জল ইত্যাদি অন্ত্রের গাত্র দিয়ে শোষিত হয়। বাকি আবর্জনা পায়ু-ছিদ্র দিয়ে দেহের বাইরে চলে যায়।
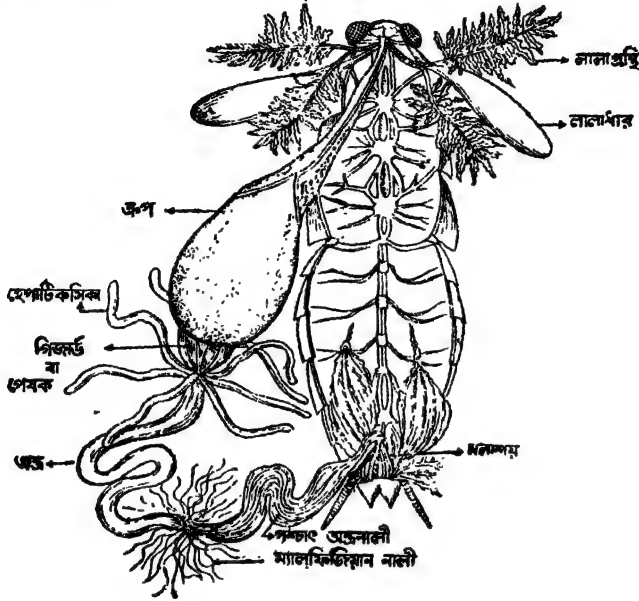
চিত্র ৩৮। আরশোলার রেচন-তন্ত্র

কিন্তু অধিকাংশ মেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্ষেত্রে, যেমন—ব্যাঙ থেকে আরম্ভ ক'রে মানুষ পর্যন্ত, রেচন-তন্ত্রের গঠন প্রায় একই প্রকার এবং ঐ তন্ত্রের কার্য-প্রণালীও প্রায় একই রকম।

আমাদের দেহের মধ্যে যে-সব আবর্জনার সৃষ্টি হয়, তাদের মধ্যে শ্বাসক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফুসফুসের প্রধান কাজ নিশ্বাস-বায়ুর সঙ্গে একে পরিত্যাগ করা। এই সঙ্গে অবশ্য খানিকটা জলীয় বাষ্পও বেরিয়ে যায়।

চর্মের ঘর্ম-গ্রন্থিতে ঘাম উৎপন্ন হয়ে ঘর্ম-নালী দিয়ে বেরিয়ে যায়। ঘামের সঙ্গে দেহের অতিরিক্ত জল এবং দূষিত পদার্থ পরিত্যক্ত হয়। ঘর্ম-নালী বন্ধ থাকলে, দূষিত পদার্থ বেরোতে পারে না ব'লে রোগ জন্মায়। ঘাম হওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য

হ'ল দেহের তাপসাম্য বজায় রাখা। এজন্য গরমের দিনে, অথবা শারীরিক পরিশ্রম করলে, প্রচুর ঘাম বেরিয়ে শরীর ঠাণ্ডা ক'রে দেয়। কিন্তু শীতের দিনে, যখন শরীর ঠাণ্ডা করার কোনো প্রয়োজন হয় না, তখন ঘাম হয় না বললেই চলে।

চিত্র ৩৯। মানুষের রেচন-তন্ত্র
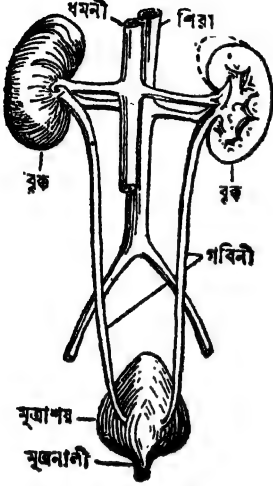
কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন-জাতীয় খাদ্য জীর্ণ হলে তাদের সারাংশ রক্তে গৃহীত হয় এবং তাদের সাহায্যেই জীব-কোষগুলির পুষ্টি ও বৃদ্ধি হয়। শর্করা-জাতীয় পদার্থ (অর্থাৎ, গ্লুকোজ), যা উদ্‌বৃত্ত হয়, তা রক্তের সঙ্গে যকৃতে এসে গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত হয়, এবং ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত থাকে। প্রোটিন-জাতীয় খাদ্য থেকে শেষ পর্যন্ত যেসব অ্যামিনো-অ্যাসিড পাওয়া যায়, সেগুলি প্রধানতঃ জীব-কোষগুলির পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যই ব্যয়িত হয়। কিন্তু রক্তে এদের পরিমাণ বেশী হলে, সেগুলিও যকৃতে এসে গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত হয় এবং সঞ্চিত থাকে। এই প্রক্রিয়াকালে অ্যামিনো-অ্যাসিড থেকে ইউরিয়া ($H_2N.CO.NH_2$) নামক আবর্জনার সৃষ্টি হয়। নিম্নতর কয়েক প্রকার প্রাণী ব্যতীত সকল উন্নত প্রাণীর দেহে এই আবর্জনা নিষ্কাশনের জন্য নির্দিষ্ট রেচন-অঙ্গ আছে। এজন্য ইউরিয়া রক্তের সঙ্গে প্রথমে বৃক্কে যায়, এবং সেখানে মূত্রের সঙ্গে তা পরিত্যক্ত হয়। রক্তের জরাজীর্ণ লোহিত-কণিকাগুলি ক্রমাগত ধ্বংস হয়ে যায়। এরূপ লোহিত-কণিকার হিমোগ্লোবিন থেকে যকৃতে পিত্ত-রসের সৃষ্টি হয়। তা পিত্তাশয়ে গিয়ে সঞ্চিত হয়। সেখান থেকে পিত্তনালী দিয়ে তা ক্ষুদ্রান্ত্রে পৌঁছায় এবং পরিশেষে মলের সঙ্গে পরিত্যক্ত হয়।

আমাদের তলপেটে দু'পাশে দু'টি বৃক্ক থাকে। বৃক্কের রঙ বাদামী, লম্বায় চার-পাঁচ ইঞ্চি এবং দেখতে অনেকটা শিমের বীজের মতো। রক্ত যকৃৎ থেকে বৃক্কে পৌঁছায়। প্রতিটি বৃক্কে অসংখ্য লম্বা, পেঁচানো নালিকা থাকে, এদের নেফ্রন (Nephrons) বলা হয়। এর এক প্রান্ত এমন একটি নলে গিয়ে শেষ হয়েছে যেখানে মূত্র সংগৃহীত হয়। অপর প্রান্তে আছে বাটির মতো বোম্যান্‌স ক্যাপ্‌সুল (Bowman's capsule)।

প্রতিটি বোম্যান্স ক্যাপ্‌সুলের গহ্বরে রেনাল-ধমনীর শাখা থেকে উৎপন্ন রক্ত-জালক জট পাকিয়ে একটি কুণ্ডলী গঠন করে। এর নাম গ্লোমেরুলাস (Glomerulus)। এটি অতি সূক্ষ্ম পরিস্রাবক (Ultra-filter)-রূপে কাজ করে।
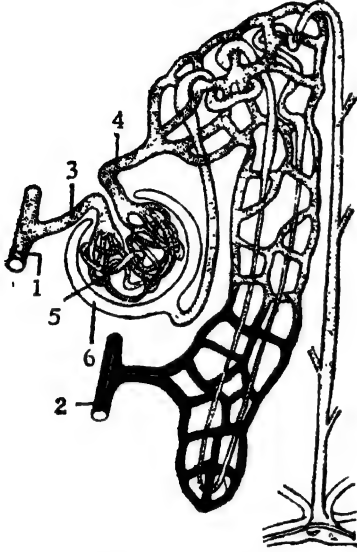
চিত্র ৪০। একটি নেফ্রন-এর গঠন।

1. ধমনী (artery),
2. শিরা (vein),
3. অন্তর্মুখী সূক্ষ্ম ধমনী (affernt arteriole),
4. বহির্মুখী সূক্ষ্ম ধমনী (efferent arteriole),
5. গ্লোমেরুলাস (glomerulus),
6. বোম্যান্স ক্যাপসুল (Bowman's capsule)।

গ্লোমেরুলাসের ভিতরে রক্ত উচ্চ চাপে থাকে, তাই রক্তের জলীয় অংশ, অন্যান্য দ্রবীভূত পদার্থসহ, জালকের দেওয়াল দিয়ে চুঁইয়ে বেরিয়ে আসে। এই পরিস্রুত দ্রবণ প্রথমে বোম্যান্স ক্যাপ্‌সুলে সঞ্চিত হয়, তারপর নিকটবর্তী নালিকায় চলে যায়। এই অংশে গ্লুকোজ, অ্যামিনো-অ্যাসিডে, ভিটামিন, হরমোন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় পদার্থ পুনরায় অবশোষিত হয় এবং রক্ত-স্রোতে ফিরে আসে।

দেহের আবর্জনা নিষ্কাশনের উদ্দেশ্যে, লক্ষ লক্ষ নেফ্রন দ্বারা পরিস্রুত দ্রবণের পরিমাণ নেহাৎ কম নয়। তবে তার ৮০ শতাংশই পুনরায় অবশোষিত হয়, তাই রক্ষা। নতুবা আমাদের জীবন ধারণ করা এক কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়াতো। একটি হিসেবে দেখা যায়, আমাদের দু'টি বৃক্কের মাধ্যমে প্রতিদিন প্রায় ১৮০ লিটার তরল পদার্থ পরিস্রুত হয়ে আসে, কিন্তু মূত্র নির্গত হয় এক থেকে দেড় লিটার মাত্র।

যাই হোক, এইভাবে উৎপন্ন মূত্র গবিনী দিয়ে এসে মূত্রাশয়ে সঞ্চিত হয়। এর মধ্যে আবর্জনা হিসেবে থাকে প্রধানতঃ ইউরিয়া এবং কিছু অজৈব লবণ।

মূত্রাশয় পূর্ণ হলে, মূত্রত্যাগের ইচ্ছা হয়। তখন মূত্রনালী দিয়ে মূত্র পরিত্যক্ত হয়। এইভাবে ইউরিয়া, অজৈব লবণ প্রভৃতি আবর্জনা দেহের বাইরে চলে যায়।

বিভিন্ন জৈবনিক কার্যকালে উদ্ভিদের দেহেও নানাপ্রকার অপ্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। কিন্তু প্রাণীদের মতো উদ্ভিদ্ দেহে এইসব আবর্জনা নিষ্কাশনের জন্য বিশেষ অঙ্গ নেই ব'লে তারা নিজদেহের বিভিন্ন কোষে এদের সঞ্চয় ক'রে রাখে। এরূপ বর্জ্য পদার্থ উদ্ভিদের যে কোন অঙ্গে সঞ্চিত হতে পারে ; যেমন—মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল ও বীজ। কোন কোন উদ্ভিদ্ শীতের প্রাক্কালে পাতা ঝরিয়ে পাতার কোষে কোষে সঞ্চিত বর্জ্য পদার্থ পরিত্যাগ করে। কোন কোন উদ্ভিদ্ প্রতি বছরই বল্কল (বা, বাকল) ত্যাগ করে। এইসব উদ্ভিদ্ বল্কলের কোষে কোষে সঞ্চিত বর্জ্য পদার্থ পরিত্যাগ করে। কিন্তু মূল ও কাণ্ডের বিভিন্ন কলায় যে-সব বর্জ্য পদার্থ সঞ্চিত হয়, উদ্ভিদ্ তাদের পবিত্যাগ করতে পারে না, আমৃত্যু নিজদেহে ধারণ ক'রে থাকে। সাধারণতঃ এইসব পদার্থ বিষাক্ত হয়ে থাকে। তাই উদ্ভিদ্ তাদের এমন সব কলায় মধ্যে সঞ্চয় ক'রে রাখে, যেখানে থাকলে ওই উদ্ভিদের জৈবনিক প্রক্রিয়াসমূহের কোনো ব্যাঘাত ঘটে না।

উদ্ভিদের এইসব বর্জ্য পদার্থ কিন্তু মানুষের অনেক কাজে লাগে। যেমন, অ্যাল্‌কালয়েড বা উপক্ষার-জাতীয় বর্জ্য উপাদান থেকে নানা প্রকার ওষুধ প্রস্তুত করা হয়। এছাড়া অন্যান্য বর্জ্য পদার্থও আমাদের নানা কাজে লাগে ; যেমন—কর্ক, গঁদ, রঞ্জন, ট্যানিন, রবার ইত্যাদি।

দশম পরিচ্ছেদ

জীবমাত্রেই উদ্দীপনায় সাড়া দেয়

সকল জীবেরই প্রাণ বা চেতনা আছে। তাছাড়া অনেকেরই বুদ্ধি আছে। জীবমাত্রেই উদ্দীপনায় সাড়া দেয়। নানারূপ উত্তেজনায় প্রাণীরা নানা ভাবে সাড়া দেয়। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যাবে।

দিনের বেলায় ঘরের মধ্যে খানিকটা গুড়, পাকা আম বা কাঁঠাল রেখে দিলে দেখা যাবে, দলে দলে মাছি এসে তার উপর বসছে। এতেই বোঝা যায়, মাছির ঘ্রাণ-শক্তি কেমন প্রখর!

ফুলের সুমিষ্ট গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে মৌমাছি তার কাছে এসে গুণগুণ করে, আর ফুলের মধু খেতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

কেঁচো শুকনো দিনে মাটির নীচে থাকে, আর বর্ষাকালে মাটির উপরে এসে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায়।

অনেক কীট-পতঙ্গ আছে যা আগুন দেখলেই তার উপব ঝাঁপিয়ে পড়ে। আবার আগুন দেখলে হিংস্র প্রাণীরা ভয় পায়, তাই শিকারীরা আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে জঙ্গলে আগুন জ্বালিয়ে রাখে।

সামান্য শব্দ শুনলেই হরিণ, খরগোশ প্রভৃতি কান খাড়া ক'রে থাকে, আর বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই দৌড়ে পালায়। এরাই আবার দূর থেকে বাঘ, সিংহ প্রভৃতি প্রাণীর গায়ের গন্ধ পেলেই সাবধান হয়ে যায়।

গায়ে চিমটি কাটলে, কিংবা আলপিন দিয়ে খোঁচা দিলে আমরা ব্যথা পাই। তেমনি, গাড়ির গরু কিংবা হালের গরুকে খোঁচা দিলে সে ব্যথা পায় ব'লে তাড়াতাড়ি যায়। চাবুক মারলে, ঘোড়া তাড়াতাড়ি ছোটে। আবার অঙ্কুশের গুঁতো দিয়ে মাহুত হাতিকে চালায়।

উদ্ভিদের দেহে কোনো ইন্দ্রিয় নেই। তবুও উদ্ভিদের নানাপ্রকার উদ্দীপনায় সাড়া দেবার ক্ষমতা আছে। যেমন, গাছের কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা আলো-বাতাসের দিকে এগিয়ে যায়, আর শিকড় এগিয়ে যায় মাটিতে, আলো থেকে অন্ধকারের দিকে। উদ্ভিদ্ শিকড়ের সাহায্যে মাটির রস শোষণ করে, এজন্য গাছের শিকড় নিরন্তর জলের উৎস খোঁজে। আর একটি মজার কথা এই যে,
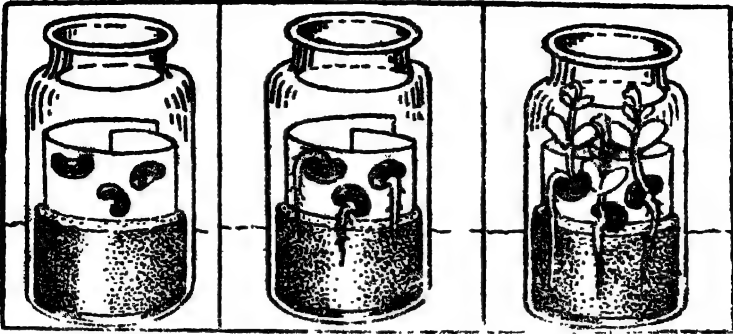
(ক) উদ্ভিদের শিকড় যেদিক থেকেই বেরোক না কেন, তা নীচের দিকে এগিয়ে যায়, জলের সন্ধানে। অপর দিকে কাণ্ড বাঁকা হয়ে ক্রমশঃ এগিয়ে যায় উপর দিকে, আলো-বাতাসের সন্ধানে।
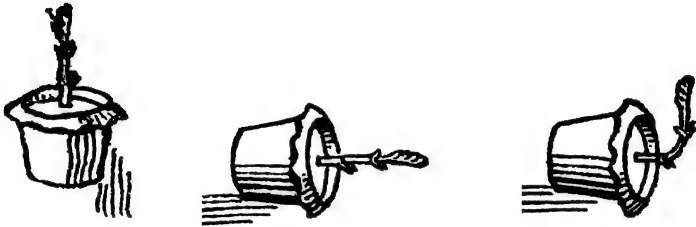
(খ) টবে বসানো গাছ কাত ক'রে রাখলে দেখা যাবে, গাছটি বাঁকা হ'য়ে উপরদিকে উঠে গেছে।

(গ) (i) শিমগাছ কাঠিটিকে জড়িয়ে ধ'রে উপর দিকে উঠেছে।

(ii) আকর্ষের সাহায্যে কাঠিটি আঁকড়ে ধ'রে লাউগাছ উপর দিকে উঠেছে।

(iii) লজ্জাবতী-লতার ডালের কোথাও স্পর্শ করলে সঙ্গে সঙ্গে পাতাগুলি মুড়ে যায়।

চিত্র ৪১। উদ্ভিদ্ নানাপ্রকার উদ্দীপনায় সাড়া দিতে পারে।

উদ্ভিদের উপর পৃথিবীর টানের অর্থাৎ অভিকর্ষেরও প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। যেমন, গাছের শিকড় মাটির দিকে, অর্থাৎ ভূ-কেন্দ্রের দিকে, বৃদ্ধি পায়। আবার গাছের কাণ্ড মাটি থেকে দূরে, অর্থাৎ ভূ-কেন্দ্রের বিপরীত দিকে এগিয়ে যায়।

বিভিন্ন গাছের উপর তাপেরও প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এজন্য কোন গাছ জন্মায় শীতপ্রধান দেশে ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়, আবার কোন গাছ জন্মায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গরম আবহাওয়ায়। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গাছের চেহারা যায় বদলে। তাই শীতের সময় অনেক গাছেরই পাতা ঝরে যায়, আবার বসন্তকালে সে-সব গাছ নতুন পাতায় সবুজ হয়ে ওঠে। এসময় শাল, শিমুল, কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতি গাছ ফুলে ফুলে ভরে যায়। বনভূমি তখন এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করে।

কোন কোন ফুলের পাপড়ি দিনের আলোতে মেলে, কিন্তু রাত্রিবেলা বন্ধ হয়ে যায়। আবার কোনো ফুল ফোটে রাত্রে।

দুর্বল কাণ্ডকে লতা বলা হয়। লতা দু'রকম। দুর্বাঘাস, রাঙা আলু ইত্যাদির কাণ্ড মাটির উপর দিয়ে লতিয়ে যায়। আবার মটর, শিম, লাউ, কুমড়ো, পান ইত্যাদির কাণ্ড কোন আশ্রয়কে অবলম্বন ক'রে উপরে ওঠে।

আবার লজ্জাবতী-লতা এতই স্পর্শকাতর যে, তার ডালের কোথাও স্পর্শ করলে সঙ্গে সঙ্গে পাতাগুলি মুড়ে যায়। জোর আঘাত দিলে, সম্পূর্ণ ডালটাই ঝুলে পড়ে। এও এক রকমের প্রতিক্রিয়া।

স্নায়ু-তন্ত্র ঃ

মেরুদণ্ডী প্রাণীর মাথায় করোটির বাক্সের মধ্যে অবস্থিত জমাট ঘিয়ের মতো পদার্থকে মস্তিষ্ক (Brain) বলে। মস্তিষ্কই জ্ঞান, বুদ্ধি, অনুভূতি ও বিচার-শক্তির কেন্দ্র। এটি অসংখ্য স্নায়ু-কোষ এবং স্নায়ু-তন্তু দিয়ে গঠিত।

নার্ভ-তন্ত্র বা স্নায়ু-তন্ত্র (Nervous system) প্রধানতঃ দু'টি ভাগে বিভক্ত —(১) সেরিব্রো-স্পাইন্যাল সিস্টেম (Cerebro-spinal system) বা মস্তিষ্ক-সুষুম্নাকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত স্নায়ু-তন্ত্র এবং (২) অটোনমিক সিস্টেম (Autonomic system) বা স্বয়ংক্রিয় স্নায়ু-তন্ত্র।

সেরিব্রো-স্পাইন্যাল সিস্টেম বা মস্তিষ্ক-সুষুম্নাকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত স্নায়ু-তন্ত্র-এর অধীন নার্ভ বা স্নায়ুগুলি বিভিন্ন পেশীর সংকোচন ও প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ করে। এরূপ আদেশ বা নির্দেশ প্রাণীটি সজ্ঞানেই দিয়ে থাকে। পার্শ্বীয় স্নায়ুগুলি শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে থাকে ; যেমন—ত্বক (বা, চর্ম), পেশী, দেহযন্ত্রসমূহ এবং

রক্তবহা-নালীসমূহ। সাধারণভাবে পার্শীয় স্নায়ু-তন্ত্রের (Peripheral nervous system)-এর প্রধান কাজ অনুভূতি বহন, অর্থাৎ দেহের মধ্যে সংবাদ আদান -প্রদান। আর কেন্দ্রীয় স্নায়ু-তন্ত্রের (Central nervous system)-এর প্রধান কাজ হ'ল, কেন্দ্র থেকে নির্দেশ পাঠিয়ে স্নায়বিক কার্যকলাপের সূত্রপাত এবং তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের বেলায়, মস্তিষ্ক (Brain) এবং সুষুম্নাকাণ্ড (Spinal cord) দিয়ে কেন্দ্রীয় স্নায়ু-তন্ত্র (Central nervous system) গঠিত। সুষুম্না-কাণ্ডের উর্ধ্বদেশে অবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত সর্বাপেক্ষা বিকশিত অংশই হ'ল মস্তিষ্ক। আর যাবতীয় প্রাণীর মধ্যে মানুষের মস্তিষ্কই হ'ল সর্বাপেক্ষা উন্নত।

অমেরুদণ্ডীদের বেলায়, কেন্দ্রীয় স্নায়ু-তন্ত্রে থাকে এক বা একাধিক স্নায়ু-রজ্জু (Nerve cord), এগুলি বিভিন্ন স্নায়ু-গ্রন্থির (Ganglions) মধ্যে সংযোগ সাধন করে। এগুলি আবার মস্তিষ্কের গ্রন্থির (Cerebral ganglion), অথবা মস্তকে অবস্থিত মস্তিষ্কের (Brain), সঙ্গে যুক্ত থাকে। এর আয়তন এবং অবস্থান নির্ভর করে প্রাণীটির ইন্দ্রিয়গুলি কতটা উন্নত তার উপর। কেঁচোর বেলায়, এটি খুব ছোট, কীট-পতঙ্গের বেলায় বেশ বড়, আর স্কুইড (Squid), অক্টোপাস (Octopus) প্রভৃতি কম্বোজ (Molusc)-এর বেলায় তো খুবই বড়।

মস্তিষ্কের প্রধান অংশ চারটি—(১) গুরু-মস্তিষ্ক (Cerebrum), (২) লঘু-মস্তিষ্ক (Cerebellum), (৩) সংযোজক-মস্তিষ্ক (Pons Varolii), এবং (৪) সুষুম্না-শীর্ষ (Medulla oblongata)। মস্তিষ্কের উপরের অংশ গুরু-মস্তিষ্ক, আর নীচের অংশ লঘু-মস্তিষ্ক। গুরু-মস্তিষ্কের অনেকগুলি খাত ও খাঁজ আছে। আমাদের দর্শন, শ্রবণ, শব্দ, চিন্তা, স্মৃতি প্রভৃতির অনুভূতি এর এক-একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকে। লঘু-মস্তিষ্ক পেশীগুলিকে সতেজ রাখে এবং তাদের সমতালে কাজ করার ব্যবস্থা করে। এই অংশ রোগগ্রস্ত হ'লে, পেশীগুলি ঢিলে হয়ে যায়। রোগী সুশৃঙ্খলভাবে অঙ্গ সঞ্চালন করতে পারে না, চলতে গেলে মাতালের মতো টলতে থাকে। সংযোজক-মস্তিষ্ক গুরু-মস্তিষ্কের নীচে এবং সুষুম্না-শীর্ষের উপরে অবস্থিত। এটি গুরু ও লঘু-মস্তিষ্কের সঙ্গে সুষুম্না-শীর্ষের এবং স্নায়ু-তন্ত্রের অন্যান্য অংশের যোগাযোগ রক্ষা করে। লঘু-মস্তিষ্কের নীচে থেকে মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে সুষুম্না-কাণ্ড (Spinal cord) নেমে এসেছে। এর সবচেয়ে উপরের অংশকেই সুষুম্না-শীর্ষ বলা হয়। রক্ত-সঞ্চালন, শ্বাসক্রিয়া, পরিপাক-ক্রিয়া,

প্রভৃতির মূল কেন্দ্র এখানে আছে। এই অংশে হঠাৎ আঘাত লাগলে, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়।
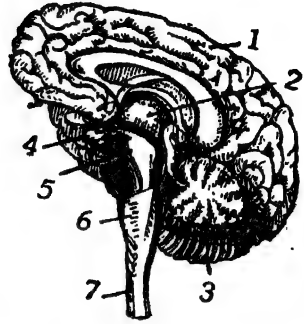
চিত্র ৪২। মানুষের মস্তিষ্ক—1. গুরু-মস্তিষ্ক (Cerebrum), 2. থ্যালামাস (Thalamus), 3. লঘু-মস্তিষ্ক (Cerebellum), 4. পিটুইটারি গ্রন্থি (Pituitary gland), 5. সংযোজক-মস্তিষ্ক (Pons-varolii), 6. সুষুম্না-শীর্ষ (Medulla oblongata), 7. সুষুম্না-কাণ্ড (Spinal cord)।

ছোট-বড় অসংখ্য নার্ভ বা স্নায়ু আমাদের শরীরের চারিদিকে জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। এইসব নার্ভ বা স্নায়ু সুষুম্না-কাণ্ডের সঙ্গে কিংবা তার ভিতর দিয়ে মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। এগুলি টেলিগ্রাফের তারের মতো সমস্ত শরীরে যেন সংবাদ আদান-প্রদান করে।

সুতোর মতো পীতাভ নার্ভ বা স্নায়ুর সৃষ্টি হয় স্নায়ু-কোষ (Nerve cell) থেকে। এরূপ প্রত্যেক কোষে একটি ক'রে নিউক্লিয়াস বা ন্যষ্টি এবং প্রটোপ্লাজ্‌ম (Protoplasm) বা প্রাণপঙ্ক থাকে। স্নায়ু-কোষের একদিকে কতকগুলি শাখা-প্রশাখা ছড়ানো থাকে। এরাই বাইরে থেকে স্নায়ু-কোষে উত্তেজনা বয়ে আনে। স্নায়ু-কোষের আর একটি দিক শাখা-বিহীন অবস্থায় বর্ধিত হয়, এই পরে স্নায়ু-তন্তুতে পরিণত হয়। স্নায়ু-তন্তু কিছুদূর গিয়ে অপর একটি স্নায়ু-কোষের শাখা-প্রশাখার সঙ্গে মিলিত হয়। স্নায়ু-তন্তু এভাবে ক্রমশঃ বড় হয়ে দেহের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এরূপ অনেকগুলি স্নায়ু-তন্তুর সমষ্টির নাম স্নায়ু-রজ্জু (Nerve fibre)।

স্নায়ু-তন্তু দুই প্রকার। এক প্রকারের স্নায়ু-তন্তু বাইরের উত্তেজনাকে মস্তিষ্কে পাঠায়, এ ধরনের স্নায়ু-তন্তুকে সংবেদী স্নায়ু-তন্তু (Sensory nerve) বলে। আর এক ধরনের স্নায়ু-তন্তু মস্তিষ্কের নির্দেশে শরীরের অঙ্গসমূহকে পরিচালনা করে। এই ধরনের স্নায়ু-তন্তুকে চেষ্টীয় স্নায়ু-তন্তু (Motor nerve) বলে।

ধরা যাক, পায়ে একটি মশা কামড়াচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্মুখী নার্ভ বা স্নায়ু

সুষুম্না-কাণ্ডে আর মস্তিষ্কে খবর পাঠালো। তখন মস্তিষ্ক সুষুম্না-কাণ্ডকে আর হাতের বহির্মুখী নার্ভ বা স্নায়ুকে হুকুম দিলো, চাপড় দিয়ে মশাটা মারতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে হাতের পেশী সংকুচিত হয়ে মশাটাকে আঘাত করলো। সাধারণতঃ এইভাবে নার্ভ বা স্নায়ুর সাহায্যে খবরের আদান-প্রদান হয়।

আবার ধরা যাক, হঠাৎ লণ্ঠনের গরম চিমনিতে, কিংবা প্রদীপের শিখায়, হাত লাগলো, আর সঙ্গে সঙ্গে হাতটা টেনে সরিয়ে নিলাম। এখানে সংবাদ পাঠানো, আর হুকুম দেওয়া, এক মুহূর্তের মধ্যেই ঘটে গেল। মস্তিষ্ক স্নায়ু-তন্ত্রের কেন্দ্র, এবং সাধারণভাবে সমস্ত স্নায়ুর কাজ নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু যে-সব কাজ এতো জরুরী যে, মস্তিষ্কে খবর পাঠিয়ে হুকুম আনার জন্যে অপেক্ষা করা চলে না, সে-সব কাজ জরুরী-ভিত্তিতে সুষুম্না-কাণ্ড নিজেই পরিচালনা করতে বাধ্য হয়। এর নাম প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া (Reflex action)।

চিত্র ৪৩। ছোট-বড় অসংখ্য নার্ভ বা স্নায়ু আমাদের শরীরের চারিদিকে জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে।

হঠাৎ প্রখর আলোর সামনে গেলে আপনা থেকেই আমাদের চোখের তারা-রন্ধ্র ছোট হয়ে যায়। আবার হঠাৎ আঘাত লাগার সম্ভাবনা দেখা দিলেই ভয়ে আপনা থেকেই আমাদের চোখ বুজে যায়। এগুলিও প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—এই কয়টি আমাদের বোধেন্দ্রিয়। এগুলির অন্তর্গত বিভিন্ন স্নায়ুর সাহায্যে আমাদের বিভিন্ন রকম অনুভূতি হয়। আমরা চোখ দিয়ে দেখি, কান দিয়ে শুনি, নাক দিয়ে ঘ্রাণ নিই, জিভ দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করি এবং ত্বকের সাহায্যে স্পর্শের জ্ঞান লাভ করতে পারি। আর এদের যাবতীয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হয় আমাদের স্নায়ু-তন্ত্রের সাহায্যে।

এছাড়া আমাদের দেহে এমন কতকগুলি স্নায়ু আছে যারা মস্তিষ্ক বা সুষুম্না-কাণ্ডের অধীন নয়। স্বয়ংক্রিয় স্নায়ু-তন্ত্র (Autonomic nervous system)-এর
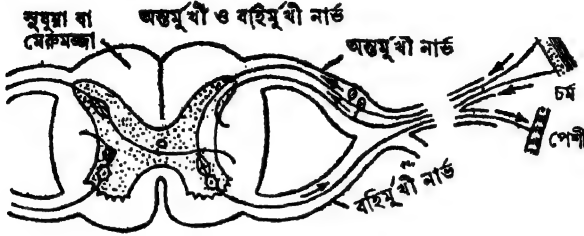
চিত্র ৪৪। নার্ভ বা স্নায়ুর কার্য-প্রণালী।

অন্তর্গত স্নায়ুগুলি দেহের নানা জায়গায় থেকে স্বাধীনভাবে নিজেদের কর্তব্য ক'রে যাচ্ছে। আবশ্যকমত ঘাম সৃষ্টি, নানারকম রস সৃষ্টি, এবং পরিপাক-যন্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত্র প্রভৃতির কাজ এদের সাহায্যে আপনা থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয়। এরা আমাদের ইচ্ছাধীন নয়।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ভিটামিন বা খাদ্য-প্রাণ

উনবিংশ শতাব্দীর কথা। চীন আর জাপানের মধ্যে বিবাদ লেগেই আছে তবে জাপানীরা নৌশক্তিতে প্রবল। তাই তারা জাহাজে ক'রে সমুদ্রে টহল দিয়ে বেড়ায়, আর চীনাদের জাহাজ দেখলেই তাকে আক্রমণ করে।

এই রকম পরিস্থিতিতে একদিন দূরে চীনাদের একটা জাহাজ দেখা গেল। টহলদারী জাপানী জাহাজটা সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে ছুটে গেল। গোলন্দাজ সৈন্যেরা প্রত্যেকেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, চীনা জাহাজটা কখন কামানের আওতার মধ্যে এসে পড়ে। তাহ'লে সঙ্গে সঙ্গে কামানের গোলায় তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে দেবে।

সেনাধ্যক্ষ দূরবীন চোখে লাগিয়ে লক্ষ্য করছিলেন। সুযোগ বুঝে হুকুম দিলেন —কামান দাগ।

কিন্তু একি! গোলন্দাজ সৈন্যটির হাত-পা তখন কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতে সে পড়ে গেল ডেকের উপর।

সেনাধক্ষ্য ছুটে এসে তার পিঠে চাবুক মারলেন। হেঁকে উঠলেন—এই শয়তান, উঠে দাঁড়া। কামান দাগ জল্‌দি।

কিন্তু হায়, অনেক চেষ্টা করেও সে উঠতে পারলো না। তার হাত-পা ক্রমশঃ অবশ হয়ে আসতে লাগলো। মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে বুঝতে পেরে এক বোবা কান্নায় তার মুখ ভরে উঠলো।

সেনাধ্যক্ষের আদেশে আর একজন সৈন্য সেখানে ছুটে এলো, বারুদে আগুন দিল। কিন্তু তারও হাত-পা কেমন যেন অবশ। তাই নিশানা ঠিক হ'ল না। কামান গর্জে উঠলো ঠিকই, কিন্তু কামানের গোলা শত্রুর জাহাজকে আঘাত হানতে পারলো না।

বিপদ বুঝে সেনাধ্যক্ষ জাহাজ নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে পালিয়ে এলেন। রাগে ক্ষোভে তিনি ফুঁসতে লাগলেন। তাঁর কেমন সন্দেহ হ'ল, সৈন্যেরা নিশ্চয়ই বিশ্বাসঘাতকতা করছে। তিনি গর্জে ওঠলেন—বেইমানের দল, সব সারবন্দী হয়ে দাঁড়া।

বিশ্বাসঘাতকতার চরম শাস্তি মৃত্যু। এবার তাদের গুলি ক'রে হত্যা করা হবে।

খবর পেয়ে নৌবাহিনীর বড় ডাক্তার টাকাকী (Takaki) সেখানে ছুটে এলেন। বললেন, ক্ষান্ত হোন, ওরা দোষী নয়। ওরা বিশ্বাসঘাতকতা করে নি, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এক রকম রোগ, যার নাম বেরিবেরি (Beriberi)। এই রোগ হলে কেউ বাঁচে না।

সব কথা শুনে জাপানের সম্রাট এই মারাত্মক রোগ প্রতিরোধের ভার দিলেন টাকাকীর উপর।

তখন নৌসেনাদের খাদ্যের প্রধান উপাদান ছিল কলেছাটা মিহি চালের ভাত, পরিষ্কার ধবধবে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে টাকাকী বিধান দিলেন, শুধু ভাত খেলেই চলবে না, তার সঙ্গে তরি-তরকারী, মাছ, মাংস এবং বার্লিও খেতে হবে —না হলে এই রোগে মৃত্যু অনিবার্য।

কিছু দিনের মধ্যেই সে দেশের মানুষ অবাক হয়ে দেখলো, টাকাকীর ব্যবস্থামত খাদ্য গ্রহণ ক'রে নৌসেনাদের কেউ আর এই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হ'ল না, কিংবা মৃত্যুমুখে পতিত হ'ল না। এভাবে টাকাকী একটা নূতন আবিষ্কারের পথ খুলে দিলেন। তবে এই রোগটা কেন হয়, তিনি তা ঠিক বলতে পারলেন না।

ডাচ্‌দের অধিকৃত পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেও তখন এই রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল অত্যন্ত বেশী। তাই আইকম্যান নামক একজন চিকিৎসককে সেখানে পাঠানো হ'ল, এই রোগ সম্পর্কে গবেষণার উদ্দেশ্যে।

পাখিদের এক রকম পক্ষাঘাত রোগ হয়, তার নাম পলিনিউরাইটিস (Polyneuritis)। এর সঙ্গে মানুষের বেরিবেরি রোগের খুব মিল আছে। গবেষণা করতে করতে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে আইকম্যান আবিষ্কার করলেন যে, মুরগীকে কেবলমাত্র কলেছাটা পরিষ্কার চাল খেতে দিলে তার এই রোগ হয়। কিন্তু ঐ মুরগীকে চালের কুঁড়া খেতে দিলে এই রোগ সেরে যায়। অপর দিকে মুরগীকে সাধারণ আছাটা চাল খেতে দিলে এই রোগ আদৌ হয় না।

এরপর আইকম্যানের স্থলাভিষিক্ত হলেন গ্রীন্‌স। আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঘোষণা করলেন যে, চালের কুঁড়ায় (Rice polishings) এমন একটি উপাদান আছে, যা আমাদের স্নায়ুকে সতেজ রাখে। এর অভাবেই মানুষের বেরিবেরি আর পাখির পলিনিউরাইটিস রোগ দেখা যায়।

কয়েক প্রকার ভিটামিন-এর সংযুক্তি-সংকেত—

$$H_3C,\ CH_3 \quad H\ H \quad H\ H\ H \quad H\ H$$
$$H_2C\ \ C{-}C{=}C{-}C{=}C{-}C{=}C{-}C{=}C{-}C{-}OH$$
$$H_2C\ \ C{-}CH_3 \quad CH_3 \quad CH_3 \quad H$$
$$C\ H_2$$
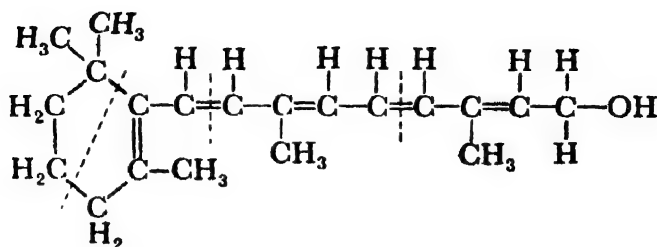
ভিটামিন-এ (Vitam n A)—পাওয়া য য়, দুধ, মাখন, মাছ, ডিম, কড্ বা হাঙ্গরের যকৃতের তেল, টাটকা শাক-সব্জি প্রভৃতি থেকে। এর অভাবে, দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। তাছাড়া রাতকানা রোগ এবং আরও কয়েক প্রকার চক্ষুরোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

$$H_3C\ CH_3 \quad H\ H \quad H\ H\ H \quad H\ H\ H\ H \quad H\ H\ H \quad H\ H \quad H_3C\ CH_3$$
$$H_2C\ \ C{-}C{=}C{-}C{=}C{-}C{=}C{-}C{=}C{-}C{=}C{-}C{=}C{-}C{=}C{-}C{=}C{-}C{=}C{-}C\ \ CH_2$$
$$H_2C\ \ C{-}CH_3 \quad CH_3 \quad CH_3 \quad CH_3 \quad CH_3 \quad H_3C{-}C\ \ CH_2$$
$$C\ H_2 \quad C\ H_2$$
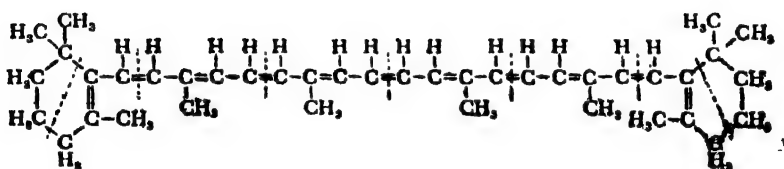
বিটা-ক্যারোটিন (β-Carotene)—গাজরে প্রচুর পরিমাণে থাকে। পরিপাক-ক্রিয়ার সময়, এটি সহজেই ভিটামিন-এ-তে পরিণত হয়। তাই এদিয়েও ভিটামিন-এ-র প্রয়োজন মেটে।

ভিটামিন-বি-মিশ্র (Vitamin B-Complex)—

$$\left[\begin{array}{l} H_3C{-}\ N \ {-}NH_2{\cdot}HCl \qquad S\ {-}CH_2OH \\ \quad N \quad\ {-}CH_2{-\!-\!-}N{-\!-\!-}CH_3 \end{array}\right]^{\ominus} Cl^{\ominus}$$
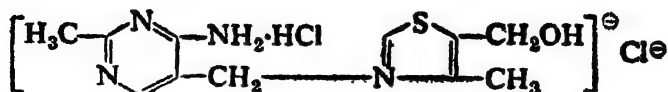
ভিটামিন-বি-১ (Vitamin B_1 = Thiamine Chloride hydrochloride)—পাওয়া যায় চালের কুঁড়া এবং ঈষ্ট (বা, খামির) থেকে। এর অভাবে মানুষের বেরিবেরি রোগ হয়। তাছাড়া কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় খাদ্যের বিপাকে, অন্যান্য ভিটামিনের সঙ্গে, এও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

এরপর ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রেচার মালয় দেশের কুয়ালালামপুরের এক উন্মাদাশ্রমে গবেষণা শুরু করলেন। একদল রোগীকে কলেছাটা পরিষ্কার চালের ভাত খেতে দিতেন, আর অন্য দলকে দিতেন আছাটা লাল চালের ভাত। প্রথম দলের ১২০ জন রোগীর মধ্যে ৩৬ জনেরই বেরিবেরি হ'ল এবং ১৮ জন এই রোগে মারা গেল। অপরদিকে দ্বিতীয় দলের ১২৩ জন রোগীর মধ্যে মাত্র দু-জন আক্রান্ত হ'ল, আর তাদের রোগও তেমন মারাত্মক হ'ল না। তারা আবার ভাল হয়ে উঠলো। এই পরীক্ষার বিবরণ প্রকাশিত হ'ল ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে।

এই সময় মালয়ের আর এক জায়গায় রেল-লাইন পাতা হচ্ছিল। ফ্রেজার এবং স্ট্যান্টন সেখানকার ৩০০ জন শ্রমিক নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। শ্রমিকদের দু-ভাগে ভাগ করা হ'ল। প্রথম দলকে খাদ্যের প্রধান উপাদান হিসেবে দেওয়া হ'ত কলেছাটা পরিষ্কার চালের ভাত, আর অন্য দলকে সাধারণ আছাটা চালের ভাত। প্রায় তিন মাসের মধ্যেই প্রথম দলের শ্রমিকদের মধ্যে বেরিবেরি রোগ মহামারীরূপে দেখা দিল, অথচ দ্বিতীয় দলের শ্রমিকদের কিছুই হ'ল না। এরপর ঐ দু-দল শ্রমিকদের চালের রেশন অদল-বদল ক'রে দেওয়া হ'ল। এর ফলে প্রথম দলের রোগীরা ক্রমশঃ ভাল হয়ে উঠলো, অপরদিকে বেরিবেরি রোগ মহামারীরূপে দেখা দিল দ্বিতীয় দলের মধ্যে। এই পরীক্ষার বিবরণ ল্যান্সেট পত্রিকায় প্রকাশিত হ'ল ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে।

ইতিমধ্যে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বিজ্ঞানী হপ্‌কিন্‌স এবং মার্কিন বিজ্ঞানী ম্যাক্‌কলম জানান যে, রাসায়নিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত বিশুদ্ধ কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট (স্নেহ-পদার্থ), প্রোটিন, লবণ ও জল—এই সব কয়টি উপাদানও জীবদেহের পুষ্টির জন্যে যথেষ্ট নয়। অথচ এদের সঙ্গে সামান্য পরিমাণে দুধ বা সুরাবীজ (Yeast) মিশিয়ে দিলেই জীবদেহের স্বাভাবিক পুষ্টি অব্যাহত থাকে।

এসব গবেষণার সূত্র ধরে লিস্টার ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ফাঙ্ক (Funk) ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে চালের কুঁড়া থেকে এমন একটি উপাদান পৃথক করতে সক্ষম হলেন, যার সাহায্যে পায়রার পলিনিউরাইটিস রোগ নিরাময় করা সম্ভব হ'ল। এই সব পরীক্ষার ফলাফল লক্ষ্য ক'রে তিনি বললেন, বেরিবেরি হ'ল খাদ্যে একটি অত্যাবশ্যক পদার্থের অভাবজনিত রোগ। এই অত্যাবশ্যক উপাদানটি থাকে চালের উপরের আবরণে। তিনি আরও বললেন, শুধু বেরিবেরি নয়—স্কার্ভি, পেলাগ্রা এবং সম্ভবতঃ রিকেট্‌স রোগেরও কারণ এমন সব উপাদান, যেগুলি আমরা সাধারণতঃ খাদ্য থেকেই পেয়ে
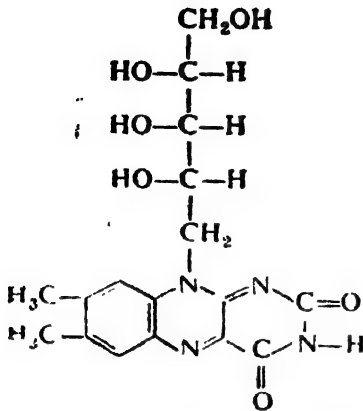
ভিটামিন-বি-২ (Vitamin B_2 = Riboflavin)—পাওয়া যায় ঈষ্ট, দুধ, মাংস এবং তাজা শাক-সব্জি থেকে। বিবিধ জারণ-ক্রিয়ায় এটি সহ-উৎসেচক (Coenzyme)-রূপে কাজ করে। দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্যে এবং সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্যে অত্যাবশ্যক।
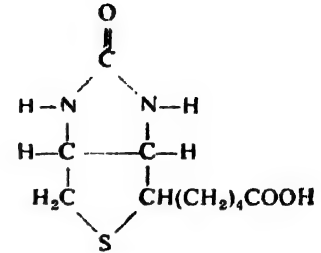
বায়োটিন (Biotin)—সর্বোত্তম উৎস হ'ল যকৃৎ (Liver) (বা, মেটে) এবং ডিম। দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্যে এর প্রয়োজন হয়। বিবিধ অকার্বনীকরণ-বিক্রিয়ায় (Decarboxylation reactions) এটি সহ-উৎসেচক-রূপে কাজ করে।
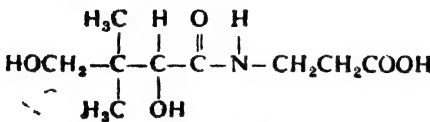
প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড (Pantothenic acid)—ঈষ্ট থেকে পাওয়া যায়। কার্বোহাইড্রেট, অ্যামিনো-অ্যাসিড এবং স্নেহ-জাতীয় খাদ্যের বিপাকে এটি সহ-উৎসেচক-রূপে কাজ করে।
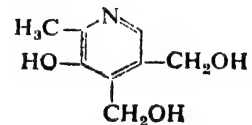
ভিটামিন-বি-৬ (বা, পিরিডক্সিন) (Vitamin B_6 = Pyridoxine)—চালের কুঁড়া এবং ঈষ্ট থেকে পাওয়া যায়। অ্যামিনো-অ্যাসিডের বিপাকে উৎসেচক-রূপে কাজ করে।
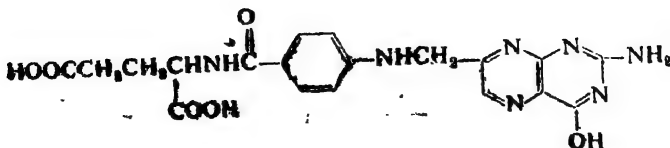
ফোলিক অ্যাসিড (Folic acid ; L. *folium* = leaf)—যকৃৎ, ঈষ্ট এবং কয়েকপ্রকার সবুজ পাতায় পাওয়া যায়। দেহের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এর অভাবে, রক্তের লোহিত-কণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

থাকি। কোন কারণে খাদ্যে এসব উপাদানের অভাব ঘটলেই দেখা দেয় এরূপ অভাবজনিত রোগ। তাই তিনিই সর্বপ্রথম এই জাতীয় অত্যাবশ্যক উপাদানের নাম দেন 'Vitamine' (ল্যাটিন Vita=প্রাণ, Amine=অ্যামোনিয়াজাত), কারণ চালের কুঁড়া থেকে যা পাওয়া যায়, তা ছিল অ্যামোনিয়াজাত পদার্থ। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন এই জাতীয় আরও কয়েকটি পদার্থের কথা জানা গেল, তখন বোঝা গেল যে, সবার সঙ্গে অ্যামোনিয়ার সম্পর্ক নেই। এজন্যে ইংরাজী নামের শেষ থেকে 'e' অক্ষরটি বর্জন ক'রে 'Vitamin' নামটি গ্রহণ করা হ'ল। বাংলায় এদের বলা হয় খাদ্য-প্রাণ।

এদিকে মার্কিন দেশে ওসবোর্ন এবং মেণ্ডেল ১৯১০ থেকে ১৯১৩ সালের মধ্যে প্রমাণ করলেন যে, মাখনে এমন একটি উপাদান আছে, যা ইঁদুরের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্যে অত্যাবশ্যক। এরপর ম্যাক্‌কলম এবং ডেভিসও সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ডিমের কুসুম, মাখন এবং কড্‌-লিভার তেলে এই উপাদানটির (এখন এর নাম ভিটামিন-এ) অস্তিত্বের কথা প্রমাণ করেন। ১৯১৫ সালে তাঁরা ঘোষণা করেন যে, "There are necessary for normal nutrition during growth two classes of unknown accessory substances, one soluble in fats and the other soluble in water, but not apparently in fats." অর্থাৎ, বৃদ্ধির সময় স্বাভাবিক পুষ্টির জন্যে দুই শ্রেণীর সহায়ক পদার্থের প্রয়োজন হয়—এক শ্রেণীর পদার্থ স্নেহ-পদার্থে দ্রবণীয় এবং অপর শ্রেণীর পদার্থ জলে দ্রবণীয়, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে স্নেহ-পদার্থে নয়।

যেটি স্নেহ-পদার্থে দ্রবণীয় তার নাম দেওয়া হ'ল ভিটামিন-এ (Vitamin A), আর যেটি জলে দ্রবণীয় তার নাম ভিটামিন-বি (Vitamin B)। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বোঝা গেল যে, দ্বিতীয়টি প্রকৃতপক্ষে দু'টি উপাদানের মিশ্রণ—একটি স্বল্প তাপেই বিয়োজিত হয়, যার নাম দেওয়া হ'ল ভিটামিন-বি$_১$ (Vitamin B_1); অন্যটি বিয়োজিত হয় না, তার নাম দেওয়া হ'ল ভিটামিন-বি$_২$ (Vitamin B_2)।

কালক্রমে এসব উপাদান সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ অবস্থায় পৃথক করা সম্ভব হ'ল এবং তাদের অণুর গঠন সম্পর্কেও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল। শুধু তাই নয়, গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে তাদের প্রস্তুত করাও সম্ভব হ'ল। ক্রমে আরও কতক-গুলি নূতন ভিটামিন আবিষ্কৃত হ'ল এবং তাদের কার্যকারিতার বিবরণও প্রকাশিত হ'ল। তার ফলে চিকিৎশাস্ত্রে এলো যুগান্তর।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য—ভিটামিন-বি (মিশ্র)-এর আর একটি উপাদান হ'ল নিয়াসিন (Niacin) বা নিকোটিন্যামাইড (Nicotinamide)। ঈষ্ট এবং চাল থেকে এটি পাওয়া যায়। কয়েক প্রকার জারণ-ক্রিয়ায় এটি সহ-উৎসেচক-রূপে কাজ করে।]

O=C—
HO—C
HO—C
H—C—
HO—C—H
CH_2OH
(O)
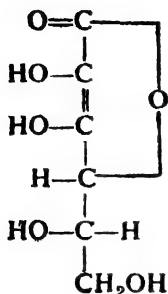
ভিটামিন-সি (Vitamin C = Ascorbic acid)— লেবু-জাতীয় ফল এবং টমেটো থেকে পাওয়া যায়। এর অভাবে, স্কার্ভি রোগ হয়।

ভিটামিন-ডি (Vitamin D)—

হ্যালিবাট বা কড-মাছের যকৃতের তেল, ডিমের কুসুম, এবং দুধ এর উৎকৃষ্ট উৎস। শৈশবে, অথবা বাল্যকালে, ভিটামিন-ডি-এর অভাব ঘটলে, রিকেট্স (Rickets)-নামক অস্থি-রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

H_3C, CH, CH, CH, CH_3, CH_3, H, C—$CH(CH_3)_2$, H_3C, HO

এরগোস্টেরল
(Ergosterol)

অতিবেগনী-রশ্মি →

H_3C, CH, CH, CH, CH_3, CH_2, H, C—$CH(CH_3)_2$, H_3C, HO
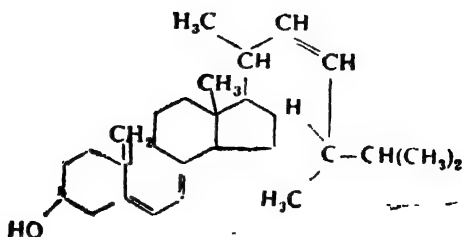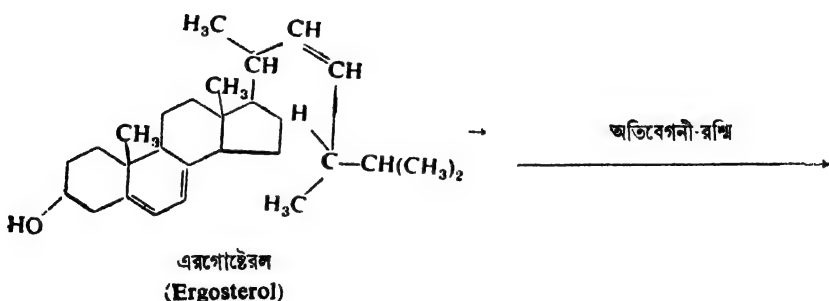
ভিটামিন-ডি-২ (Vitamin D_2 = Calciferol)

আগেকার দিনে নাবিকরা দীর্ঘকাল ধরে টাটকা তাজা ফল ও সব্‌জি পেত না। তাদের মধ্যে অনেকেই নিদারুণ স্কার্ভি (Scurvy) রোগে আক্রান্ত হ'ত। ১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সেণ্ট লরেন্স নদীবক্ষে অভিযানের সময় কার্টিয়ার (Cartier)-এর সঙ্গীদের মধ্যে অন্ততঃ ছাব্বিশ জন এই রোগে মারা যান। ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাকস্ট্রম সর্বপ্রথম ঘোষণা করলেন যে, তাজা ফল ও সব্‌জি স্কার্ভি রোগ নিবারণ করে। কিন্তু কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত ক'রল না। প্রায় ষাট বছর পরে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ নাবিকদের খাদ্যের সঙ্গে নিয়মিতভাবে লেবু-জাতীয় ফল দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। হাতে হাতে ফল পাওয়া যায়, এবং স্কার্ভি রোগ নিবারিত হয়। হাওয়ার্থ (Haworth) এবং রাইখস্টাইন (Reichstein) নামক দু'জন বিজ্ঞানী স্বাধীনভাবে, ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে, ভিটামিন-সি (Vitamin C) সংশ্লেষণের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

আমাদের দেহে ক্যাল্‌সিয়ামের বিপাকের জন্যে দরকার হয় ভিটামিন ডি (Vitamin D)। এর অভাবে শিশুদের রিকেট্‌স (Rickets) বা অস্থি-বিকৃতি রোগ হয়। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী স্যুটে (Schuette) সর্বপ্রথম বলেন যে, রিকেট্‌স রোগের চিকিৎসায় কড-লিভার তেল (Cod-liver oil) খুবই কার্যকরী হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রায় একশ' বছর ধরে এদিকে কারও নজর পড়েনি। ১৯২২ সালে নতুন ক'রে জানা গেল যে, কড-লিভার তেলের রিকেট্‌স রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা আছে। এরপর ব্রকম্যান (Brockman), ১৯৩৩ সালে, টানি মাছের লিভারের (বা, যকৃতের) তেল (Tunny liver oil) থেকে সর্বপ্রথম ভিটামিন-ডি$_৩$ (Vitamin-D_3) পৃথক করতে সক্ষম হন। ক্যাল্‌সিয়াম বিপাকের বেলায় এটি খুবই সক্রিয়। চামড়ায় এক প্রকার রাসায়নিক যৌগ থাকে (7-dehydrocholesterol), অতিবেগনী-রশ্মির ক্রিয়ায় তা ভিটামিন-ডি$_৩$-তে রূপান্তরিত হয়। ভিটামিন-ডি$_২$ (Vitamin D_2) ও সক্রিয়, তবে ডি$_৩$-র মতো নয়। এরগোস্টেরল (Ergosterol) নামক পদার্থটি অতিবেগনী-রশ্মির ক্রিয়ায় সহজেই ভিটামিন-ডি$_২$-তে পরিণত হয় এর আর এক নাম ক্যাল্‌সিফেরল (Calciferol)। এ-জাতীয় ভিটামিন পাওয়া যায় প্রধানতঃ নানারূপ স্নেহ-পদার্থ থেকে ; যেমন—হ্যালিবাট ও কড-লিভার তেল, ডিমের কুসুম, দুধ ইত্যাদি থেকে।

ভিটামিন-ই (Vitamin E) পাওয়া যায় প্রধানতঃ গমের অঙ্কুরের তেল (Wheat germ oil), তুলা-বীজের তেল (Cotton seed oil) প্রভৃতি থেকে। এর অভাবে সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা বিনষ্ট হয়। এদিক দিয়ে আল্‌ফা-টকোফেরল

৭-ডিহাইড্রো-কোলেস্টেরল
(7—Dehydro-cholesterol)

ভিটামিন-ডি-৩ (Vitamin D_3)
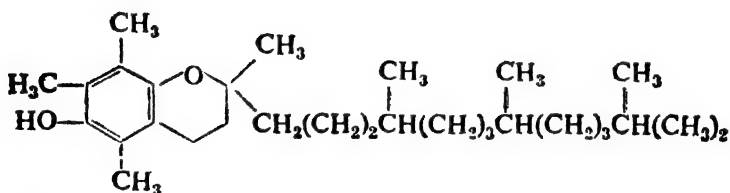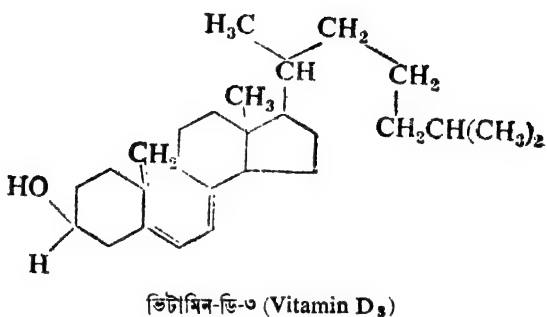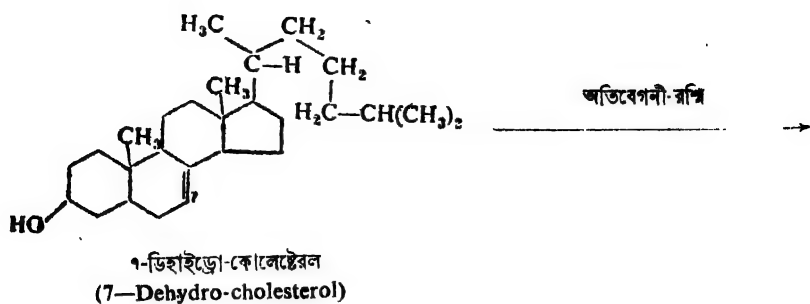
ভিটামিন-ই (Vitamin E = ∝-Tocopherol)—গমের অঙ্কুরের তেল, তুলা-বীজের তেল এবং কয়েক প্রকার তাজা শাক-সব্‌জি থেকে পাওয়া যায়। এর অভাবে, পুরুষের পুরুষত্বহীনতা রোগ হওয়ার এবং গর্ভবতী রমণীর গর্ভপাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
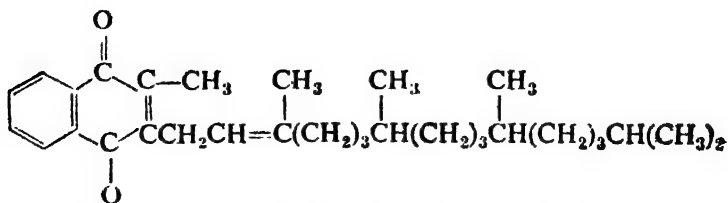
ভিটামিন-কে-১ (Vitamin K_1)—সবুজ উদ্ভিদ্ থেকে পাওয়া যায়। এটি রক্তপাত বন্ধ করতে সহায়তা করে (Antihæmorrhagic fator)।

ভিটামিনের তালিকা

ভিটামিন	কোন্ পদার্থে দ্রবণীয়	কার্যকারিতা	প্রধানতঃ কোন্ খাদ্যে বেশী পাওয়া যায়
A (এ)	স্নেহ-পদার্থে	শরীরের গঠন ও ক্ষয়পূরণ করে এবং রোগ প্রতিরোধক শক্তি বাড়ায়। এর অভাবে রাতকানা রোগ এবং অন্যান্য চোখের রোগ হয়।	দুধ, মাখন, মাছ, ডিম, পালং-শাক, মটরশুঁটি, বিলাতি কুমড়া, গাজর, কড্ বা হাঙ্গরের যকৃতের তেল ইত্যাদিতে।
B (Complex) (বি) (মিশ্র)	জলে	এর অভাবে বেরিবেরি, ক্ষুধামান্দ্য, দুর্বলতা, কোষ্ঠবদ্ধতা ও নানা-প্রকার চর্মরোগ দেখা দেয়।	ঢেঁকিছাঁটা চাল, যাঁতায় ভাঙ্গা আটা, দুধ, ডিম, মেটে, শাক-সব্জি, ফলমূল ইত্যাদিতে।
C (সি)	জলে	রক্ত ও দেহরসগুলিকে সুস্থ রাখে। এর অভাবে স্কার্ভি-রোগ এবং দাঁতের রোগ হয়।	পাতিলেবু, কাগজী-লেবু, কমলালেবু, টম্যাটো, কালো-জাম, আম, আনারস, আম-লকি ইত্যাদিতে।
D (ডি)	স্নেহ-পদার্থে	অস্থি, দন্ত, ও পেশীর পোষক। শিশুদের রিকেট্স্ বা অস্থি-বিকৃতি রোগ নিবারণ করে।	কড্ মাছের যকৃতের তেল এবং চিতল, চাঁই, হেরিং, স্যামন, সার্ডিন প্রভৃতি তৈলপ্রধান মাছ, ডিম, দুধ, মাখন ইত্যাদিতে। সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি গায়ে লাগালে এই ভিটামিন উৎপন্ন হয়।
E (ই	”	সন্তানবতী মায়ের জন্যে প্রয়োজন হয়। এর অভাবে সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা নষ্ট হয়।	গম, ছোলা ও ডালের অঙ্কুর, উদ্ভিজ্জ তেল, মটরশুঁটি, লেটুস ও শাক ইত্যাদিতে।
K (কে)	”	রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। সুতরাং, রক্তে এটি থাকলে সহজেই রক্তপাত বন্ধ হয়, নতুবা রক্তপাত বন্ধ হতে দেরী হয়।	মাছ, মাংস, মেটে, মাখন, বাঁধা-কপি, পালংশাক, টম্যাটো ইত্যাদিতে।

(α-Tocopherol ; গ্রীক *Tokos*=child, *pherein*=to bear) সর্বাপেক্ষা সক্রিয়। ১৯৩৮ সালে কারার (Karrer) এটি সংশ্লেষণের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

ভিটামিন-কে (Vitamin K) রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে (Antihæmorrhagic vitamin। এর অভাবে রক্তপাত বন্ধ হতে দেরী হয়। এটি পাওয়া যায় প্রধানতঃ টাটকা শাক-সব্জিতে। ড্যাম (Dam) ১৯২৯ সালে সর্বপ্রথম এটি আবিষ্কার করেন, আর ১৯৩৯ সালে ফাইজার (Fieser) এর সংশ্লেষণের পদ্ধতি বর্ণনা করেন।

এখন আমরা জানি যে, খাদ্যের প্রধান উপাদান হ'ল পাঁচটি—কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট (স্নেহ-পদার্থ), লবণ এবং জল। কিন্তু এসবেও দেহের পুষ্টি হবে না, যদি এদের সঙ্গে নানাপ্রকার ভিটামিন না থাকে। ভিটামিনশূন্য খাদ্য প্রাণহীন পুতুল বা চালকহীন ইঞ্জিনের মতো। কাজেই এদের বলা হয়েছে খাদ্য-প্রাণ। ভিটামিন নানাপ্রকার, যেমন—ভিটামিন A, ভিটামিন B (complex), ভিটামিন C, ভিটামিন D ইত্যাদি।

আমাদের দেহের উপযুক্ত পুষ্টি সাধনের জন্য যেসব উপাদান দরকার সেগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে সাধারণ খাদ্যদ্রব্যে পাওয়া যায় না। তবে আঙ্গুর, আপেল, ন্যাসপাতি, আম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, লিচু, আতা, আনারস প্রভৃতি মরসুমি ফল যেমন উপাদেয় তেমনি বিভিন্ন উপাদানে ভরপুর। আবার টমেটো, গাজর, বীট, শশা, মটরশুঁটি প্রভৃতি, যেগুলি ফল ও সব্জির মাঝামাঝি, তাদের মধ্যেও খাদ্যের নানা উপাদান প্রচুর পরিমাণে থাকে। এগুলি কাঁচা অবস্থায়, তরকারি রান্না ক'রে, কিংবা অর্ধসিদ্ধ অবস্থায় স্যালাড আকারে খাওয়া যায়। এদেশে সাধারণতঃ যে সব খাদ্য গ্রহণ করা হয়, সেগুলির কোন্‌টির মধ্যে কোন্ ভিটামিন যথেষ্ট পরিমাণে থাকে, তার একটি তালিকা আগের পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে। এখানে মনে রাখা দরকার যে, রন্ধনের সময় উত্তাপের ফলে কোন কোন ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং সে বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

হরমোন

মানবদেহের বিশেষ কতকগুলি গ্রন্থি, যাদের ইংরেজিতে 'Endocrine glands' আখ্যা দেওয়া হয়, তাদের কার্যকারিতা সম্পর্কে বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভকালেও জীব-বিজ্ঞানীদের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। অন্যান্য গ্রন্থির সঙ্গে এই বিশেষ গ্রন্থি-গুলির পার্থক্য এই যে, এই গ্রন্থি-নিঃসৃত রস (Hormone) নালিকা-বাহিত না হয়ে গ্রন্থির অভ্যন্তরে রক্তস্রোতের সঙ্গে মিশে যায়। সমগ্র শরীরে এই গ্রন্থিরস বা হরমোন-এর অবাধ গতি এবং এরই শাসনে ও তত্ত্বাবধানে দেহের বৃহৎ কর্মকাণ্ডের প্রায় সবই অনুষ্ঠিত হয়। পিতা-মাতার বংশগত বৈশিষ্ট্য যেমন 'জিন' (Gene) মারফৎ সন্তানে বর্তায়, জিনের একান্ত বশবর্তী এই বিশেষ গ্রন্থিগুলিও তেমনই দেহমনে নানা পরিবর্তন সংগঠিত করে। এই গ্রন্থিরস বা হরমোন-এর আধিক্য বা স্বল্পতা মানবদেহে বহু বিচিত্র রোগ বা অস্বাভাবিকতার জন্যে দায়ী।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে দু'জন ইংরেজ বিজ্ঞানী আর্নেস্ট স্টারলিং (Ernest Starling) এবং উইলিয়াম বাইলিস (William Byliss) এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণার সূত্রপাত করেন। কুকুরের অগ্ন্যাশয় (Pancreas) নিয়ে গবেষণার ফলে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরাই সর্বপ্রথম একটি হরমোন সিক্রিটিন (Secretin) আবিষ্কারের কৃতিত্ব অর্জন করেন।

এরই পরবর্তীকালে নানাদেশের নানা বিজ্ঞানীর একক অথবা যৌথ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে, সাধারণত প্রণালীহীন গ্রন্থি (Ductless gland), পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, বিশিষ্ট নার্ভ (বা, স্নায়ু)-কোষ ও নার্ভ (বা, স্নায়ু) তন্তু-প্রান্তে উৎপন্ন হরমোন উৎপত্তিস্থান থেকে রক্তস্রোতে বাহিত হয়ে, কোনও সন্নিহিত বা দূরবর্তী স্থানে গিয়ে, বিভিন্ন কোষ ও কলার ক্রিয়াকে উদ্বুদ্ধ করে। অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি-সংক্রান্ত বিদ্যা বিজ্ঞান-জগতে 'এণ্ডোক্রিনোলজি' (Endocrinology) নামে পরিচিত (গ্রীক, *endon*=within, *krinein*=to sift, *logos*=science)। একটি অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি একই সঙ্গে তার নিজস্ব হরমোনের কারখানা এবং সঞ্চয়কক্ষ (বা, ভাঁড়ার-ঘর) হিসেবে কাজ করে, কারণ ওই হরমোন অল্প সময়ের জন্যেও দেহের অন্যত্র সঞ্চিত থাকতে পারে না।*

*এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ষ্টারলিং হরমোন (গ্রীক, *hormaein*=to excite) কথাটি ব্যবহার করেন। এ বিষয়ে তাঁর মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

Hormones have to be carried from the organ where they are produced to the organ which they affect, by means of the blood stream, and the continually recurring physiological needs of the organism must determine their repeated production and circulation through the body.
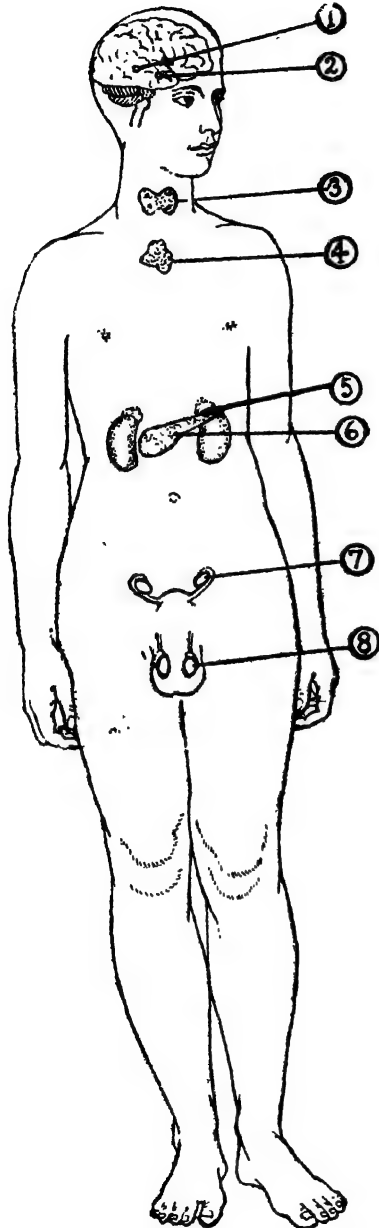
এ যাবৎ যে-সব ভিন্ন ভিন্ন হরমোন আবিষ্কৃত হয়েছে। তাদের ক্রিয়া সম্পর্কে প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। এরই ফলস্বরূপ মানুষের নানাপ্রকার আধিব্যাধি সম্পর্কেও আলোকপাত করা সম্ভব হয়েছে।

প্রণালীহীন গ্রন্থিগুলিতে, যেমন—মস্তিষ্কের গভীরে অবস্থিত হাইপোথ্যালামাসে (Hypothalamas) এবং মস্তিষ্কের ভূমিসংলগ্ন পিটুইটারিতে (Pituitary), গলদেশের থাইরয়েডে (Thyroid), উদরাভ্যন্তরে বৃক্ক-সংলগ্ন অ্যাড্রিন্যাল-গ্রন্থিতে এবং অ্যাড্রিন্যাল-ত্বকে (Adrenal cortex), স্ত্রী-দেহের ডিম্বাশয়ে (Ovary), এবং প্রণালীযুক্ত অগ্ন্যাশয়ে (Pancreas) ও পুং-দেহের শুক্রাশয়ে (Testis), এক বা একাধিক হরমোন প্রস্তুত হয়। এদের কতকগুলি বৃদ্ধি, বিকাশ ও বংশ-বিস্তারে এবং অন্যগুলি বিপাকে, উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

1. হাইপোথ্যালামাস (Hypothalamus),
2. পিটুইটারী (Pituitary`,
3. থাইরয়েড (Thyroid),
   [এর নীচের অংশ প্যারাথাইরয়েড (Parathyroid)],
4. থাইমাস (Thymus),
5. অ্যাড্রিন্যাল (Adrenal),
6. অগ্ন্যাশয় (Pancreas),
7. ডিম্বাশয় (Ovary),
8. শুক্রাশয় (Testis)।

চিত্র ৪৫। মানবদেহের কয়েকটি অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির (Endocrine glands) অবস্থান।

হরমোন প্রধানতঃ দু'রকম। কতকগুলির লক্ষ্যস্থল হ'ল কলা, কোষ বা প্রান্তিক অঙ্গ। আবার কতকগুলির লক্ষ্যস্থল হ'ল অপর কোন গ্রন্থি, যেখানে প্রথমটির ক্রিয়ায় অপর কোন হরমোন উৎপন্ন হয়। এইভাবে দেহের বিভিন্ন অংশে উৎপন্ন বিবিধ হরমোন দ্বারা দেহের বৃদ্ধি, বিকাশ ও বিপাক সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সুতরাং, এরূপ যে-কোন একটি গ্রন্থি ক্ষতিগ্রস্ত হলে এইসব ব্যাপারে বিঘ্ন ঘটে।

প্রকৃতপক্ষে প্রথম হরমোন আবিষ্কারের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন বিজ্ঞানী আবেল (Abel), ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে। এর নাম অ্যাড্রিন্যালিন (Adrenalin) বা এপিনেফ্রিন (Epinephrin ; গ্রীক *epi*=upon, *nephros*=kidney)। আর এটাই প্রথম হরমোন যা ল্যাবরেটরীতে সংশ্লেষণ করা সম্ভব হয়েছে। এই কৃতিত্ব অর্জন করেন স্বাধীনভাবে দু'জন বিজ্ঞানী—স্টল্‌জ (Stolz, 1904) এবং ডাকিন (Dakin, 1905)। বৃক্ক-সংলগ্ন অ্যাড্রিন্যাল-গ্রন্থি থেকে এটি নিঃসৃত হয়। এর ক্রিয়ায় রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় এবং হৃদ্‌স্পন্দনের বেগ বেড়ে যায়। হাঁপানির আক্রমণকালে এদ্বারা স্বস্তি পাওয়া যায়। করোটির মধ্যে মস্তিষ্কের ঠিক নীচেই আছে পিটুইটারি-গ্রন্থি। এটি দেখতে ছোট্ট একটি মটরদানার মতো। এর দু'টি অংশ—সম্মুখভাগ এবং পশ্চাদ্‌ভাগ। পিটুইটারির সম্মুখভাগে উৎপন্ন হরমোন (Somato-Tropic-Hormone, বা STH) দ্বারা সাধারণভাবে দেহের বৃদ্ধি হয়। দেহের বিকাশ, বিশেষত স্ত্রী ও পুরুষের যৌবন-লক্ষণসমূহের (যেমন, যৌবন সমাগমে স্ত্রী ও পুরুষের আকৃতিগত পার্থক্য), প্রধানতঃ যৌন-গ্রন্থিতে (Gonads) উৎপন্ন হরমোনের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস অংশের ক্ষরণক্ষম কোষ থেকে উৎপন্ন উত্তেজক উপাদান রক্তস্রোতে বাহিত হয়ে যখন পিটুইটারির সম্মুখভাগে পৌছয়, তখন সেখানে দু'রকম হরমোন (Follicle Stimulating Hormone, বা, FSH এবং Lutenising Hormone, বা, LH) সঞ্জাত হয়ে যৌন-গ্রন্থিকে সক্রিয় ক'রে তোলে এবং তাদের নিজ নিজ হরমোন-ক্ষরণে উদ্বোধিত করে। প্রথমটির প্রভাবে স্ত্রী-দেহে ডিম্ব-কোষের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে ও ঈস্ট্রোজেন-জাতীয় বিশিষ্ট হরমোনের (যেমন, ঈস্ট্রোন এবং ঈস্ট্রাডাইয়ল) ক্ষরণ হয়, আর পুং-দেহে শুক্র-কীটের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে। আবার দ্বিতীয়টির প্রভাবে স্ত্রী-দেহে ডিম্বাশয় থেকে ডিম্ব-কোষের নিষ্ক্রমণ ও প্রজেস্টেরোন নামক হরমোনের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। অপরপক্ষে পুং-দেহে টেস্টোস্টেরোনের ক্ষরণ হয়।

স্ত্রীলোকের যৌন হরমোন প্রধানতঃ দু'টি—ঈস্ট্রোন এবং ঈস্ট্রাডাইয়ল।

ঈস্ট্রোন (Estrone) সর্বপ্রথম নিষ্কাশিত হয় ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে (Butenandt ; Doisy)। এটি স্ত্রীলোকের ও পুরুষের মূত্রে পাওয়া যায়। আর ঈস্ট্রাডাইয়ল (Estradiol) পাওয়া যায় ডিম্বাশয়ের কলায় (Doisy, 1935) এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোকের মূত্রে। প্রজেস্টেরোন সর্বপ্রথম নিষ্কাশিত হয় ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে, গর্ভবতী শূকরীর জরায়ুর কর্পাস লিউটিয়াম (Corpus luteum) থেকে (Butenandt)। এরই ক্রিয়ায় জরায়ু নিষিক্ত ডিম্বকোষ ধারণের উপযোগী হয়। পুরুষের যৌন হরমোন দু'টি—এদের মধ্যে অ্যানড্রোস্টেরোন (Androsterone) সর্বপ্রথম পুরুষের মূত্র থেকে নিষ্কাশিত হয়, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে (Butenandt), আর টেস্টোস্টেরোন (Testosterone) সর্বপ্রথম নিষ্কাশিত হয় শুক্রাশয়ের কলা থেকে, ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে (Laqueur)। যৌন হরমোন-সংক্রান্ত গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্যে জার্মান বিজ্ঞানী বুটেনাণ্ট (Butenandt)-কে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রসায়নশাস্ত্রের নোবেল-পুরস্কার দেওয়া হয়, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হন।†

আমাদের গলার সামনের দিকে আছে থাইরয়েড (Thyroid)। কোন কিছু গেলার সময় কণ্ঠমণি (Adam's apple) যে ওঠা-নামা করে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। তার নীচেই থাইরয়েড-গ্রন্থির অবস্থান। এই গ্রন্থি অনেকটা মোটরগাড়ির অ্যাক্সিলেটরের মতো কাজ করে। কারণ, এথেকে উৎপন্ন আইওডিন-ঘটিত যৌগ থাইরক্সিন Thyroxine) ও ট্রাই-আইওডো-থাইরোনিন (Triiodothyronine) আমাদের দেহের সাধারণ বিপাক (Metabolism) নিয়ন্ত্রণ ক'রে থাকে। থাইরয়েড থেকে এই হরমোন অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হতে থাকলে, দেহরূপ এঞ্জিনটি যেন ছুটে চলে। তখন দেহমধ্যে ইন্ধনের দহন-ক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুত তালে সম্পাদিত হতে থাকে। এতে আমাদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, একথা সত্যি ; কিন্তু এর ফলে দেহের ক্ষয় হয় অত্যন্ত দ্রুত। আবার এই হরমোন স্বল্প পরিমাণে নিঃসৃত হতে থাকলে, দেহরূপ এঞ্জিনটি অত্যন্ত মৃদু-তালে বা মন্থর-গতিতে চলতে থাকে। তখন দেহমধ্যে ইন্ধনের দহন-ক্রিয়া অত্যন্ত ধীর গতিতে সম্পাদিত হতে থাকে। এর ফলে আমরা ক্রমশ নিস্তেজ এবং অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ি এবং আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, একটি শিশুর থাইরয়েড-গ্রন্থি থেকে এই

---

† He was awarded the Nobel chemistry prize in 1939 for his work on sex hormones. He was, however, abliged to refuge the prize in view of the German government's prohibitive law of 1937. [The New Universal Encyclopedia (The Caxton Publishing Co. Ltd.)—P. 1593.
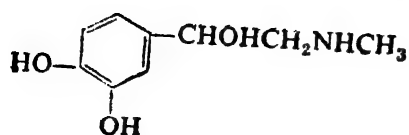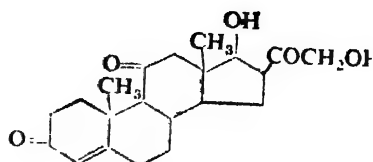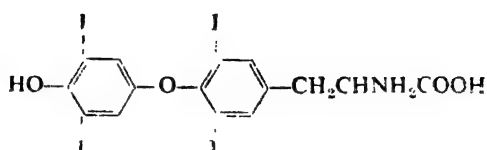
HO— —$CHOHCH_2NHCH_3$
OH

অ্যাড্রিন্যালিন (Adrenalin)

OH
CH_3 $COCH_2OH$
O=
CH_3
O=

কর্টিসোন (Cortisone)

I I
HO— —O— —CH_2CHNH_2COOH
I I

থাইরক্সিন (Thyroxine)

O
CH_3
CH_3
HO

অ্যান্ড্রোস্টেরোন
(Androsterone)

O
CH_3
HO

ঈস্ট্রোন
(Estrone)

OH
CH_3 H
CH_3
O=

টেস্টোস্টেরোন
(Testosterone)

OH
CH_3 H
H
O=
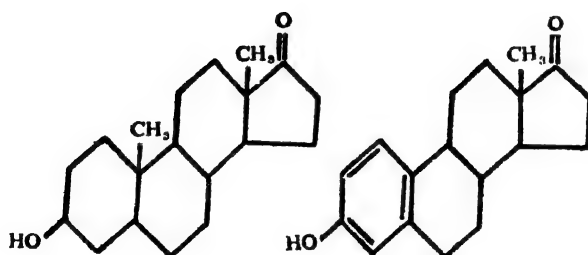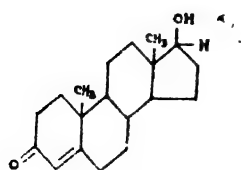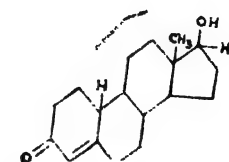
১৯-নর-টেস্টোস্টেরোন
(19-Nor-Testosterone)
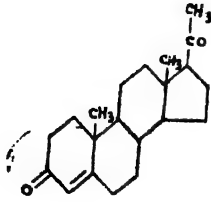
প্রজেষ্টেরোন
(Progesterone)
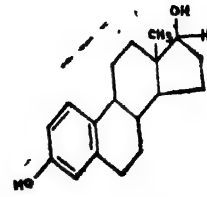
ঈস্ট্রাডাইয়ল
(Estradiol)

[বিশেষ দ্রষ্টব্য—অ্যানড্রোষ্টেরোন, টেষ্টোষ্টেরোন, এবং ১৯-নর-টেষ্টোষ্টেরোন হ'ল স্বাভাবিক পুং-যৌন হরমোন। এদের ক্রিয়ায় পুং-যৌবন-লক্ষণসমূহ বিকশিত হয়, তবে এ-বিষয়ে বিশেষভাবে সক্রিয় হ'ল টেষ্টোষ্টেরোন। অপরদিকে ঈস্ট্রোন এবং ঈস্ট্রাডাইয়ল হ'ল স্বাভাবিক স্ত্রী-যৌন-হরমোন। উল্লেখ্য যে, প্রজেষ্টেরোন জরায়ুতে উৎপন্ন হয়, এবং এরই ক্রিয়ায় জরায়ু নিষিক্ত ডিম্বকোষ (বা, জ্রূণাণু) ধারণ করার উপযোগী হয়।]

হরমোন নির্দিষ্ট পরিমাণে নিঃসৃত না হলে তার বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, এবং তার বুদ্ধিবৃত্তি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এজন্য সমবয়স্ক অন্যান্য শিশুরা যতটা লেখাপড়া শিখতে পারে, সে তা পারে না।

উল্লেখ্য যে, হাইপোথ্যালামাস থেকে উৎপন্ন হরমোন (Thyrotropin Releasing Factor, সংক্ষেপে TRF) সোজাসুজি পিটুইটারির সম্মুখভাগে যায়। তখন তা থেকে থাইরোট্রোপিন (Thyrotropin), বা TSH (Thyroid-Stimulating Hormone), নিঃসৃত হয়ে রক্তস্রোতে মিশে যায়। এই হরমোনের ক্রিয়ায় থাইরয়েড-গ্রন্থিতে থাইরক্সিন ও ট্রাই-আইওডো-থাইরোনিন সংশ্লেষিত হয় এবং সেগুলি রক্তস্রোতের সঙ্গে প্রবাহিত হয়। আবার, এখান থেকে যে পরিমাণ থাইরয়েড-হরমোন রক্তস্রোতে প্রবাহিত হয়ে গিয়ে হাইপোথ্যালামাসে পৌঁছয়, তা থেকেই যথাক্রমে TRF-এর এবং TSH-এর নিঃসরণ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এভাবে এই চক্রটি সম্পূর্ণ হয়, এবং স্বাভাবিক অবস্থায়, প্রত্যেকটি গ্রন্থির কাজ সুষ্ঠু-ভাবে পরিচালিত হয়।

কিন্তু আইওডিনের অভাব ঘটলে, থাইরয়েডে যথেষ্ট হরমোন উৎপন্ন হয় না। এজন্যে থাইরয়েড-হরমোন স্বল্প পরিমাণে হাইপোথ্যালামাসে যায়। এর ফলে সমগ্র চক্রটি ব্যাহত হয়। এরূপ অবস্থায় প্রথমে TRF, এবং পরে TSH, অধিক

পরিমাণে নিঃসৃত হয়। আর অত্যাধিক TSH-এর প্রভাবে আইওডিনের অভাবগ্রস্ত থাইরয়েড-গ্রন্থি আকারে বড় হয়ে যায়। এইভাবে গলগণ্ড (Goiter) রোগ দেখা দেয়।

বিজ্ঞানী কেন্ড্যাল (Kendall) ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম গরুর থাইরয়েড থেকে এই হরমোন (থাইরক্সিন) নিষ্কাশিত করেন। তারপর ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী হ্যারিংটন (Harington) এটি সংশ্লেষিত করেন। মানবদেহের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে এই হরমোন এখন ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

আমেরিকার দুই বিশিষ্ট বিজ্ঞানী রোজার গিলেমিন (Roger Guillemin) এবং অ্যান্‌ড্রু স্যালি (Andrew Schally) হাইপোথ্যালামিক হরমোন সম্পর্কে গবেষণা করেন। প্রচণ্ড শ্রমসাধ্য এই কাজ। এজন্য তাঁরা ৫০০ টন ভেড়ার মগজ সংগ্রহ ক'রে তা থেকে ৭ টন হাইপোথ্যালামাস-কোষ সংগ্রহ করেন। অবশেষে এই ৭ টন পদার্থ থেকে, ১৯৬৮ সালে, তাঁরা মাত্র এক মিলিগ্রাম TRF নিষ্কাশন করতে সক্ষম হলেন।

এতো কম পরিমাণ TRF নিয়ে কাজ করতে গিয়ে কী প্রচণ্ড বাধাই না তাঁদের অতিক্রম করতে হয়েছে। অবশেষে এ থেকেই তাঁরা নিষ্কাশন করলেন তিনটি 'হরমোন রিলিজিং ফ্যাক্টর'; যেমন—থাইরয়েড, লিউটেনাইজিং এবং ফলিক্‌ল রিলিজিং ফ্যাক্টর। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে এইসব বস্তুর অণু-ভার (Molecular weight), আণবিক গঠন, সবই জানা গেল, যা পরবর্তীকালে এদের সংশ্লেষণে সহায়তা করেছে।

বিজ্ঞানীদের আশা, গিলেমিন এবং স্যালির সাফল্য দৈহিক এবং মানসিক কার্য-কারণ ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করবে। সাহায্য করবে, বিভিন্ন বিপাকীয় ব্যাধি নিরাময়ের ব্যাপারেও। এই যুগান্তরকারী আবিষ্কারের জন্য এই দু'জন বিজ্ঞানীকে ১৯৭৭ সালের শারীরতত্ত্ব এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নোবেল-পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। নোবেল কমিটির সদস্য রল্‌ফ এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন,—'তাঁদের কাজ দেহ এবং আত্মার সংযোগটি খুঁজে বের ক'রল।'

অগ্ন্যাশয় (Pancreas) মূলত নানা উৎসেচক (Enzyme)-এর কারখানা। এই উৎসেচকগুলি নালিকা-বাহিত হয়ে অন্ত্রমধ্যে নিঃসৃত হয় এবং খাদ্যের পাচন-ক্রিয়ায় সহায়তা করে। কিন্তু এই অগ্ন্যাশয়ের মধ্যেই ছড়ানো রয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বৈপ অংশ (Islets of Langerhans)। এই দ্বৈপ অংশে উৎপন্ন হয় ইন্‌সুলিন

(Insulin)। এই হরমোন আমাদের দেহে কার্বোহাইড্রেটের সদ্ব্যবহার এবং পেশী-মধ্যে, অথবা যকৃতে (Liver), উদ্বৃত্ত কার্বোহাইড্রেটের সঞ্চয় প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। এর অভাবে বহুমূত্র বা মধুমেহ (*diabetes mellitus*) রোগ দেখা দেয়। তখন রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। রোগের প্রকোপ বেশী হলে (অর্থাৎ, গ্লুকোজের মাত্রা, ১০০ মিলিলিটার রক্তে ১৬০ মিলিগ্রামের চেয়ে বেশী হলে) মূত্রের সঙ্গে শর্করা, অ্যাসিটো-অ্যাসিটিক অ্যাসিড এবং অ্যাসিটোন নির্গত হয়। এই অবস্থায় বহুমূত্র রোগ সহজেই ধরা পড়ে।

কানাডার দুই বিজ্ঞানী ম্যক্লিয়ড (Macleod) এবং ব্যান্টিং (Banting) ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম অগ্ন্যাশয়ের নির্যাস বহুমূত্র রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করে সুফল পান। তাঁরাই এই সক্রিয় পদার্থটির নাম দেন ইন্সুলিন। এই উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের জন্যে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের নোবেল-পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

পিটুইটারির পশ্চাদ্‌ভাগ থেকে এমন কতকগুলি বিভিন্ন গুণান্বিত হরমোন উৎপন্ন হয়, যেগুলি মাতৃগর্ভ থেকে শিশুর জন্মকালে জরায়ুর সঙ্কোচন উদ্বোধিত করে, প্রসবের পর মাতৃস্তনে দুগ্ধ সঞ্চার করে, এবং বৃক্ক থেকে মূত্র-রেচন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

প্যারাথাইরয়েড এবং অ্যাড্রিন্যাল-ত্বক (adrenal cortex) থেকে উৎপন্ন হরমোনসমূহ সাধারণভাবে অজৈব উপাদানগুলির বিপাক, তথা গ্রহণ ও বর্জন-ক্রিয়া, নিয়ন্ত্রণ করে। উল্লেখ্য যে, পিটুইটারির সম্মুখভাগে উৎপন্ন হরমোন (Adreno-Cortico-Tropic Hormone, সংক্ষেপে ACTH) অ্যাড্রিন্যাল-ত্বককে উদ্বোধিত করে। অ্যাড্রিন্যাল-ত্বক থেকে নিঃসৃত হয় করটিন (cortin)। পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হয়েছে, এটি একটি জটিল মিশ্র। এ থেকে প্রায় চল্লিশটি স্টিরয়েড-জাতীয় যৌগ (steroid compounds) পৃথক করা সম্ভব হয়েছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল করটিসোন (cortisone)। কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিনের বিপাকে এর ক্রিয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া বাত-ব্যধিতেও এ দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। বর্তমানে গবাদি পশুর অ্যাড্রিন্যাল-গ্রন্থি থেকে এটি সুলভে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। এ জাতীয় বিভিন্ন যৌগের আণবিক গঠন এবং সেই সঙ্গে জীববিদ্যা-সংক্রান্ত গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্যে দুই মার্কিন বিজ্ঞানী কেনড্যাল (Kandall) এবং হেন্‌চ (Hench)-কে, এবং সেই সঙ্গে সুইজারল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী রাইখস্টাইন (Reichstein)-কে, ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নোবেল-পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্যে, এবং সেই সঙ্গে বংশ-বিস্তার সুনিশ্চিত হওয়ার জন্যে, হরমোনগুলির স্বাভাবিক ক্ষরণ অত্যাবশ্যক। অত্যধিক অথবা অত্যল্প ক্ষরণ, কোনটাই কাম্য নয়। কারণ, তাহলে বৈকল্য অবশ্যম্ভাবী। যেমন, পিটুই-টারির সম্মুখভাগের অক্ষমতায় ঘটে বামনত্ব, অকালবার্ধক্য এবং অতিকৃশতা। বিপরীতভাবে পিটুইটারির অতি-সক্রিয়তার ফলে দেখা দেয় অতিকায়ত্ব (বা, দৈত্যাকৃতি)। তেমনি থাইরয়েডের ক্রিয়া-স্বল্পতায় ঘটে মেদ-বাহুল্য। আবার, এর ক্রিয়া-বৃদ্ধিহেতু দেখা দেয় কৃশকায়ত্ব, সদা-বিস্ফারিত-নেত্র (exophthalmos) প্রভৃতি রোগ। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, হরমোন-সংক্রান্ত এই সব গবেষণার ফলে আমাদের জ্ঞান যেমন বেড়েছে, তেমনি হরমোন নিঃসরণের ত্রুটি-জনিত নানা প্রকার রোগ নিরাময় করার সম্ভাবনাও এখন অনেক বেড়েছে।

আর একটি কথা। প্রথম দিকে অনেকেরই ধারণা ছিল যে, কেবলমাত্র উচ্চতর প্রাণীদের বেলায়ই এরূপ হরমোন নিঃসৃত হয়ে থাকে। কিন্তু সম্প্রতি কতকগুলি অমেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহেও হরমোনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে।

শুধু প্রাণী-জগতে নয়, বিজ্ঞানীদের মতে—উদ্ভিদের বৃদ্ধি, ফুল ফোটা, পাতা-ঝরা প্রভৃতিও নানা প্রকার উদ্ভিদ-হরমোন (plant hormones) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

চতুর্থ পর্ব

প্রজননবিদ্যা

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

প্রাণের স্ফুরণ সম্পর্কে আমাদের ধারণা— অতীতে ও বর্তমানে

অ্যান্টনি ভ্যান লাভেনহুক (১৬৩২-১৭২৩) ছিলেন হল্যাণ্ডের অন্তর্গত ডেল্‌ফ্‌ট-এর সিটি-হলের সামান্য একজন দ্বাররক্ষী। বলতে গেলে অশিক্ষিত। কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত কৌতূহলী এবং অত্যন্ত খেয়ালী। তিনি শুনেছিলেন, স্বচ্ছ কাচ ঘষে ঘষে লেন্‌স-এর (বা, আতশী কাচের) আকার দিলে, তার ভিতর দিয়ে ছোট্ট জিনিসকে অনেক বড় দেখায়। তাঁর শখ হ'ল, অনেকদিন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে কাচ ঘষে ঘষে একটি লেন্‌স তৈরি করলেন। ধাতু-নির্মিত একটি নলের মধ্যে এই লেন্‌স বসিয়ে সুন্দর একটি অণুবীক্ষণ-যন্ত্র (বা, অণুবীন) (Simple microscope) বানালেন।

এর পর তার আশেপাশে যা কিছু দেখেন, তাই তাঁর অণুবীনের নীচে রেখে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি তিমিমাছের মাংসপেশী পরীক্ষা করলেন, গায়ের মরা চামড়া তুলে দেখলেন, আর দেখলেন, বিভিন্ন প্রাণীর গায়ের লোম। ছোট্ট ছেলের মতো অবাক বিস্ময়ে দেখলেন, সুতোর মতো সরু একটি ভেড়ার লোম তাঁর অণুবীনের নীচে দেখাচ্ছে, অমসৃণ একটি গাছের গুঁড়ির মতো! তিনি মৌমাছির হুল এবং উকুনের

পা পরীক্ষা ক'রে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ঘুরে ঘুরে বার বার এগুলি পরীক্ষা করেন, আর বলে ওঠেন,—"অসম্ভব! অবিশ্বাস্য!"

এই নমুনাগুলি তাঁর অণুবীনের তলায় বসানো রইলো মাসের পর মাস ধরে। নতুন নতুন জিনিস পরীক্ষা করার জন্যে তিনি আবার নতুন ক'রে অণুবীন তৈরি করতে বসলেন। তাঁর শখ ক্রমে ছেলেমানুষী নেশায় পরিণত হ'ল। ধীরে ধীরে তাঁর ছোট্ট ঘরটি শত শত শক্তিশালী অণুবীনে ভরে গেল। এদের প্রত্যেকটির নীচে বসানো রইলো এক-একটি অত্যাশ্চর্য দর্শনীয় বস্তু।

চিত্র ৪৭। অ্যাণ্টনি ভ্যান লাভেনহুক

দৈবাৎ একদিন বাগানের নোংরা জল পরীক্ষা ক'রে তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। দেখলেন, তার মধ্যে অসংখ্য কীটাণু কিলবিল করছে। লাভেনহুক এই সব কীটাণুদের সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান করতে লাগলেন। একদিন লক্ষ্য করলেন যে, গোলমরিচের গুঁড়ো তিন সপ্তাহ ধরে জলে ভিজিয়ে রাখলে, সেই জলের একটিমাত্র ফোঁটায় লক্ষ লক্ষ কীটাণু (বা, জীবাণু) দেখা যায়। ১৬৮৩ সালে তিনি দাঁতের গোড়া থেকে জমাট ময়লা তুলে এনে পরীক্ষা করেন, এবং তাতে লম্বা লম্বা কাঠির মতো কতকগুলি জীবাণু দেখতে পান। কিন্তু এসবের সঙ্গে দাঁতের রোগের কোন সম্পর্ক আছে কিনা, সে বিষয়ে তিনি কিছু বলতে পারেন নি।

লাভেনহুক দিনের পর দিন ধরে নানারকম জীবাণুর বিচিত্র জীবনলীলা প্রত্যক্ষ করেন, আর তাদের বিবরণ লিখে পাঠান লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির কাছে। এই সব বিবরণ ছাপা হয় ফিলজফিক্যাল ট্র্যানজাকশন-এর বিভিন্ন সংখ্যায়, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে। কিন্তু প্রাণহীন জড়বস্তুর মধ্যে এই সব জীবাণুর আবির্ভাব হয় কি ক'রে, এ প্রশ্নের মীমাংসা তিনি করতে পারেন নি। তাছাড়া নানা ধরনের জীবাণুই যে মানুষের নানারকম ব্যাধির কারণ হতে পারে, এ কথাও তাঁর কখনও মনে হয় নি। ভগবানের রাজ্যে যে এমন বিচিত্র জগৎ আছে, আর সেখানে এমন সব বিচিত্র জীবাণু আছে, এইটুকু জেনেই তিনি খুশী ছিলেন।

এখন প্রশ্ন হ'ল,—এসব ক্ষেত্রে প্রাণের স্ফুরণ হয় কি ক'রে? আগেকার দিনে এনিয়ে তুমুল বাদানুবাদ চলতো। একদল বিজ্ঞানী বলতেন, প্রাণের স্ফুরণ হয় আপনা থেকেই। কিন্তু আর একদল বলতেন, না, তা কখনই সম্ভব নয়। অ্যারিস্‌টট্‌লের মতো বিশ্ব-বিখ্যাত দার্শনিকও প্রথমোক্ত মতো বিশ্বাসী ছিলেন।

চিত্র ৪৮। অ্যারিস্‌টট্‌ল

এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত লেখক হগবেন তাঁর 'Science for the Citizen' নামক গ্রন্থে লিখেছেন,—"জনন সম্পর্কে অ্যারিস্‌টট্‌লের মতবাদ সংক্ষেপে এইভাবে বলা যায়। প্রাণীদের প্রধানত দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) যাদের জন্ম হয় জনক-জননীর মিলনের ফলে, এবং (২) যাদের জন্ম হয় কাদা, বালি, জল, মল-মূত্র বা উদ্ভিদের রস থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তদের মধ্যে যারা ডিম্বজ (Oviparous) (অর্থাৎ, যারা ডিম পাড়ে এবং সেই ডিম থেকে সন্তানের জন্ম হয়), তাদের থেকে জরায়ুজ (Viviparous) প্রাণীদের (অর্থাৎ, মানুষ এবং অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের) অনায়াসে পৃথক করা যায়। ডিম বলতে অ্যারিস্‌টট্‌ল বোঝাতে চেয়েছেন এমন জিনিস যা খালি চোখেই দেখা যায়, এবং যা কমবেশি মুরগির ডিমের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। যৌন-মিলন ঘটেছে, কি ঘটেনি, তার উপর নির্ভর ক'রে এই ডিম নিষিক্ত, অথবা অনিষিক্ত, যে-কোন রকম হতে পারে।"
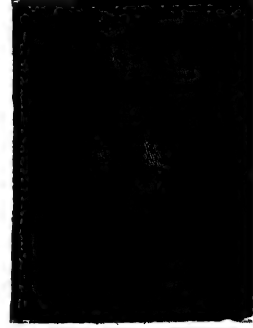
সপ্তদশ শতাব্দীতেই রেডি নামক একজন ইতালীয় বিজ্ঞানী একটি সহজ পরীক্ষা করেন। তিনি দু-খণ্ড মাংস নিয়ে দু'টি জারে রাখলেন। প্রথম জারের মুখ খোলা রাখলেন, কিন্তু দ্বিতীয় জারের মুখ এক টুকরো কাপড় দিয়ে ভাল ক'রে বন্ধ ক'রে দিলেন। খোলা জারের মধ্যে মাছি যাতায়াত শুরু ক'রে দিল, কিন্তু দ্বিতীয় জারে কোন মাছি প্রবেশ করতে পারল না। কয়েক দিন পরে দেখা গেল, খোলা জারে অবস্থিত মাংসে মাছির পোকা (Maggot) কিলবিল করছে। কিন্তু দ্বিতীয় জারে এরকম কোন পোকা দেখা গেল না। এতে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হ'ল যে, মাংসে আপনা

চিত্র ৪৯। রেডির পরীক্ষা

থেকে এই সব পোকার আবির্ভাব হয় না। বহিরাগত মাছি মাংসে ডিম পাড়ে, এবং পরে সেই ডিম থেকেই এইরূপ পোকার জন্ম হয়।

ঐসময় নীডহ্যাম নামে এক ধর্মযাজক ছিলেন। তিনিও অ্যারিস্‌টট্‌লের মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রাণের স্বতঃস্ফুরণ সম্পর্কে তিনি একটি প্রমাণও দাখিল করেন। উনুনের উপর থেকে গরম মাংসের স্যুপ (বা, ঝোল) নিয়ে একটি বোতলে পুরলেন, এবং তার মুখ ছিপি এঁটে বন্ধ ক'রে রাখলেন। কয়েক দিন পরে পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল, স্যুপের মধ্যে নানা আকারের অসংখ্য জীবাণু কিলবিল করছে। আপনা থেকে প্রাণের আবির্ভাব আবিষ্কারের আনন্দে উচ্ছ্বসিত হলেন তিনি। কি অদ্ভুত আবিষ্কার!

এজন্যে তখন অনেকেই বলতে লাগলেন যে, ডিম থেকেই মাছির জন্ম হয়, একথা ঠিক, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক জীবের বেলায় সেরকম হয়তো না ও হতে পারে। বলা বাহুল্য, প্রাণের স্বতঃস্ফুরণ সম্ভব কিনা, তাই নিয়ে তখন বিজ্ঞানীদের মধ্যে তুমুল বাদানুবাদ আরম্ভ হয়ে গেল।

নীডহ্যামের পরীক্ষার বিবরণ অচিরেই ইতালীয় বিজ্ঞানী স্প্যালানজানির (১৭২৯-৯৯) দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রল। তাঁর মতে, নীডহ্যামের পরীক্ষায় কয়েকটি মারাত্মক ত্রুটি ছিল। যেমন, স্যুপ গরম করা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এই উত্তাপ জীবাণু ধ্বংস করার মতো যথেষ্ট ছিল না। তাছাড়া বোতলের মুখ বন্ধ করার জন্যে যে কর্ক (বা, ছিপি) ব্যবহার করা হয়েছিল, তার মধ্যে অনেক ছিদ্র ছিল। কাজেই বাইরের বাতাস থেকে বোতলের মধ্যে জীবাণু প্রবেশ করতে কোন বাধা ছিল না। নীডহ্যামের পরীক্ষা যে ত্রুটি-পূর্ণ ছিল, তা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে স্প্যালানজানি নিম্নলিখিত পরীক্ষাটি করলেন।

চিত্র ৫০। লুই পাস্তুর

ফ্লাস্কের (বা, কাচকুপীর) মধ্যে মাংসের স্যুপ নিয়ে তার মুখটি তিনি গালিয়ে বন্ধ ক'রে দিলেন। তারপর ঐ ফ্লাস্ক এক ঘণ্টা ফুটন্ত জলের মধ্যে রেখে দিলেন। কয়েক দিন পরে ঐ স্যুপ পরীক্ষা ক'রে দেখলেন, তার মধ্যে কোন জীবাণু নেই।

স্প্যালানজানির এই পরীক্ষায় নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হ'ল যে, আপনা থেকে প্রাণের স্ফুরণ সম্ভবপর নয়। পচনশীল পদার্থে প্রাণের বীজ অঙ্কুরিত হয় বাতাস থেকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফরাসী নিসর্গবিদ্ বুঁফো নীডহ্যামের ভুল তথ্যকে ভিত্তি করেই প্রাণের স্বতঃস্ফুরণ সম্পর্কে পর্বতপ্রমাণ দার্শনিক তত্ত্ব দাঁড় করালেন। ইউরোপের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরাও তাঁর বাক্‌চাতুর্যে ভুলে গেলেন। এর ফলে স্প্যালানজানির মতবাদ বিশেষ স্বীকৃতি লাভ ক'রল না। প্রায় এক-শ' বছর ধরে বুঁফোর মতবাদই প্রাধান্য বিস্তার ক'রে রইলো। একথা ভাবতেও আজ অবাক লাগে!

চিত্র ৫১। পাস্তুরের পরীক্ষায় দেখা গেল, শুধু খোলা কূপীর সুপে (C) জীবাণুর আবির্ভাব হয়েছে, অপরদিকে মুখবন্ধ কূপীগুলি (C′) অবিকৃত রয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে এ বিষয়ে পুনরায় গবেষণা শুরু করলেন ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর (১৮২২-৯৫)। তিনি প্রথমে একটি সহজ পরীক্ষা করেন। একটি কাচের নলে পরিষ্কার সাদা তুলো গুঁজে তার অন্য দিক থেকে বাতাস টেনে নিলেন। বাতাসের ধুলোবালি জমে সাদা তুলো কালো হয়ে গেল। এজন্যে পাস্তুরের মনে হ'ল, বাতাসে যদি এতো ধুলোবালি থাকে, যা খালি চোখে দেখা যায় না, তবে তার সঙ্গে জীবাণুই বা থাকবে না কেন? আর এই জীবাণু যদি কোন প্রকারে মাংসের সুপে ঢুকে পড়ে, তবে তার ক্রিয়ায় সুপের পচন হবে নিশ্চয়ই।

কিন্তু পাস্তুরের এই মতবাদ শুনে বিজ্ঞানীরা তাঁকে উপহাস করতে লাগলেন। অতএব পাস্তুর তাঁর এই মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্যে কোমর বেঁধে লাগলেন। একটি ফ্লাস্কে (বা, কাচকূপীতে) মাংসের স্যুপ নিয়ে তা ভাল ক'রে ফোটালেন। তারপর কয়েকটি কূপীর মুখ গালিয়ে বন্ধ ক'রে দিলেন, আর কয়েকটি খোলা রাখলেন। কয়েক দিন পরে দেখা গেল, শুধু খোলা কূপীর স্যুপে জীবাণুর আবির্ভাব হয়েছে, অপরদিকে মুখবন্ধ কূপীগুলি অবিকৃত রয়েছে।

কিন্তু যাঁরা প্রাণের স্বতঃস্ফুরণ সম্পর্কে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁরা পাস্তুরের এই পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তাঁরা বললেন, ফোটাবার ফলে ফ্লাস্কের (বা, কূপীর) অভ্যন্তরের আবহ (বা, বায়ু) এমন ভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে (অর্থাৎ, কূপী বায়ুশূন্য হয়ে গেছে) যে, তার মধ্যে কোন জীবের পক্ষেই আর বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আর এই কারণেই ঐসব কূপীর স্যুপে প্রাণের স্ফুরণ হয়নি।
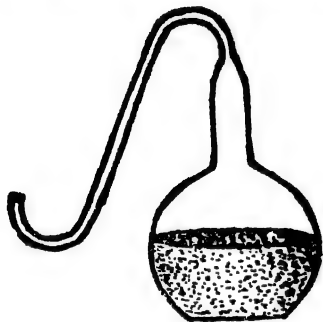
চিত্র ৫২। পাস্তুর কতকগুলি নতুন ধরনের ফ্লাস্ক (বা, কূপী) তৈরি করলেন—গলা বকের মতো লম্বা আর সরু।

বিজ্ঞানীদের এই আপত্তি খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে পাস্তুর কতকগুলি নতুন ধরনের ফ্লাস্ক (বা, কূপী) তৈরি করলেন। গলা বকের মতো লম্বা আর সরু। গলাটা প্রথমে খানিকটা নীচের দিকে নেমেছে, কিন্তু বেঁকে আবার উপর দিকে উঠে গেছে। এই সরু মুখ দিয়ে বাইরের বাতাস ঢুকবে, কিন্তু বাঁকের মুখে ধাক্কা খেয়ে ধুলোবালি সব আটকে থাকবে, কূপীর মধ্যে ঢুকতে পারবে না।

পাস্তুর এসবের মধ্যে মাংসের স্যুপ নিয়ে ভাল ক'রে ফোটালেন। স্যুপ জীবাণুশূন্য হ'ল। এরপর ছোট্ট একটি শিখার সাহায্যে কূপীর খোলা মুখ গালিয়ে বন্ধ ক'রে দিলেন। ১৮৬০ সালের গোড়ার দিকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে কূপীর মুখ খুলে আবার তখনই বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল। কিছুদিন পরে দেখা গেল, যেগুলি ভূগর্ভস্থ ভাঁড়ার ঘরে (Cellar) খোলা হয়েছিল, তাদের দশটির মধ্যে নয়টিই ভাল আছে, পচেনি। কিন্তু যেগুলি বাইরের বাগানে খোলা হয়েছিল, সেগুলি সবই পচে গেছে। তাদের মধ্যে জীবাণু কিলবিল করছে। এর ফলে পাস্তুরের দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল যে, বাতাসে ধুলোবালির সঙ্গে জীবাণুও থাকে। আর এই জীবাণু যদি কোন প্রকারে মাংসের স্যুপে ঢুকে পড়ে, তাহলেই স্যুপের পচন হয়।

এরপর পাস্তুর ভাবলেন, ধুলোবালির সঙ্গেই যদি জীবাণু থাকে, তাহলে আকাশের যত উপর দিকে ওঠা যাবে, স্যুপের পচনের সম্ভাবনাও তত কমে যাবে। এ বিষয়েও পরীক্ষা ক'রে দেখা দরকার। এজন্যে কুড়িটি স্যুপভর্তি কূপী নিয়ে তিনি পপেত পাহাড়ে উঠলেন, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮৫০ মিটার উপরে। এদের মুখ খুলে তখনই আবার বন্ধ ক'রে রাখলেন। মাত্র পাঁচটি কূপীর স্যুপ খারাপ হ'ল। এরপর কুড়িটি স্যুপভর্তি কূপী নিয়ে তিনি আল্‌প্‌স পাহাড়ে উঠলেন, মানুষের বসবাসের সীমা ছাড়িয়ে আরও অনেক উপরে। অত্যন্ত সাবধানে এদের মুখ খুলে তখনই আবার বন্ধ ক'রে দিলেন। এই কুড়িটির মধ্যে মাত্র একটির স্যুপ খারাপ হ'ল। বাতাসের ধুলোবালির মধ্যে জীবাণুর অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর মনে আর কোন সংশয় রইল না। আনন্দে আত্মহারা হয়ে তিনি ঘরে ফিরলেন।

ফ্রান্স চিরকালই সুরার জন্যে বিখ্যাত। অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ আঙুর থেকে সুরা তৈরি ক'রে আসছে। আঙুর পিষে একটি ভাটিতে রেখে দেওয়া হয়। কয়েক দিনের মধ্যেই সেই রস গেঁজে ওঠে এবং সুরায় পরিণত হয়। এর কারণ কি? পাস্তুর এ-সম্পর্কে গবেষণা শুরু করলেন।

পাস্তুর দেখলেন, আঙুর যখন পাকে, তখন তার গায়ে সাদা একরকম ছাতা পড়ে। এই ছাতার মধ্যে থাকে একরকম উদ্ভিদাণু। এর নাম খমির বা সুরাসার (Yeast)। আঙুরের সঙ্গে এদেরও পেষা হয়, ভাঁটিতে এদেরই ক্রিয়ায় আঙুরের গ্লুকোজ (বা, দ্রাক্ষা-শর্করা) সুরায় পরিণত হয়। সেই সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের বুদ্‌বুদ্‌ উঠতে থাকে ব'লে প্রচুর ফেনার সৃষ্টি হয়। মনে হয়, দ্রবণটি যেন ফুটছে। একে বলা হয় কিণ্বন-প্রক্রিয়া (Fermentation ; GK. *fervere*=to boil)।

আঙুরের গায়ে এই উদ্ভিদাণু আসে কোথা থেকে? পাস্তুর বললেন, এই উদ্ভিদাণুর বীজ ছড়ানো আছে বাতাসে। সেখান থেকেই তা আঙুরের গায়ে অঙ্কুরিত হয়। পরীক্ষার সাহায্যে একথা তিনি প্রমাণও করলেন। আঙুর পাকবার আগেই তার গায়ে তুলো জড়িয়ে বেঁধে রাখলেন। আঙুর যখন পাকলো, তখন দেখা গেল তার গায়ে কোন ছাতা নেই। এই আঙুর পিষে তার রস ভাঁটিতে রাখা হ'ল। কিন্তু তা গেঁজে উঠল না, সুরাতেও পরিণত হ'ল না। এতদিনে সুরা তৈরী হওয়ার প্রকৃত কারণ জানা গেল।

এই সময় পাস্তুরের এক ছাত্র এসে খবর দিল, তার বাবার সুরাশিল্প নষ্ট হতে

বসেছে। কারণ, ভাঁটিতে আঙুরের রস টকে যাচ্ছে, সুরায় পরিণত হচ্ছে না। পাস্তুর ভাঁটির রস এনে অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের নীচে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন, যে রস টকে গেছে, তার মধ্যে খমির নেই, তার বদলে রয়েছে খুব ছোট সরু কাঠির মতো এক-প্রকার জীবাণু। কতকগুলি একসঙ্গে দলা পাকিয়ে রয়েছে, আবার কতকগুলি নড়ছে, ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। বোঝা গেল, এদের ক্রিয়াতেই আঙুরের রস টকে যাচ্ছে। নানা রকম পরীক্ষা ক'রে পাস্তুর দেখলেন, আঙুরের রস কিছুক্ষণের জন্যে গরম ক'রে রাখলে (৫০—৬০° সে.) এই জীবাণু মরে যায়। তখন এর সঙ্গে অল্প একটু খমির মিশিয়ে রেখে দিলেই তা সুরায় পরিণত হয়, টকে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। পাস্তুরের উপদেশ অনুসরণ করায় ফ্রান্সের সুরা-শিল্প রক্ষা পেল। আর পাস্তুরের জীবাণু-তত্ত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল।

এর পর পাস্তুর দেখালেন, দুধে এক প্রকার জীবাণু থাকে, যার জন্যে দুধ টকে নষ্ট হয়ে যায়। তিনি দুধ জীবাণুমুক্ত করার একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। এই পদ্ধতিতে দুধ গরম ক'রে তার পর হঠাৎ খুব ঠাণ্ডা করা হয় (Chilled)। এর ফলে দুধ জীবাণুশূন্য হয়ে যায়। এর নাম 'পাস্তুরিতকরণ' (Pasteurization)। এইরূপ দুধ অনেক বেশী সময় ধরে অপরিবর্তিত থাকে।

১৮৬৫ সালে ফ্রান্সের রেশম-শিল্প এক গুরুতর সঙ্কটের সম্মুখীন হ'ল। মারাত্মক পেব্রিন রোগে রেশমকীট দলে দলে মারা যেতে লাগল। পাস্তুরের উপর এর প্রতিকারের ভার পড়ল। পরীক্ষার ফলে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি রোগগ্রস্ত কীটের দেহে এই রোগের জীবাণু আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন। তাঁর নির্দেশমত রোগগ্রস্ত কীটগুলি ধ্বংস করার এবং সুস্থ কীটগুলিকে তাদের সংশ্রব থেকে মুক্ত ক'রে রাখার ব্যবস্থা করা হ'ল। এইভাবে ফ্রান্সের রেশম-শিল্প নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেল। আর একথাও নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হ'ল যে, একপ্রকার জীবাণুর সাহায্যেই মারাত্মক পেব্রিন রোগ সংক্রামিত হয়। এর ফলে পাস্তুরের জীবাণু-তত্ত্ব সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হ'ল বলা যায়। সুতরাং, এই আবিষ্কারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এরপর থেকেই পাস্তুর প্রচার করতে লাগলেন যে, বায়ু-বাহিত নানাপ্রকার জীবাণু দৈবাৎ মানুষের দেহে প্রবেশ করে এবং সেখানেই বংশ-বিস্তার করতে থাকে। আর তাদের ক্রিয়াতেই নানাপ্রকার রোগের সৃষ্টি হয়। কিন্তু তখন পর্যন্ত এ-বিষয়ে কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় নি, তাই তাঁর এই মতবাদ কেউ গ্রহণ ক'রল না। তবে

পাস্তুরের গবেষণার ফলে একটি নতুন পথের সন্ধান পাওয়া গেল। সেই অন্ধকার অজানা পথে অভিযাত্রীদের আনাগোনা শুরু হ'ল। এবিষয়ে যিনি সর্বপ্রথম সাফল্য অর্জন করলেন, তিনি হলেন জার্মান বিজ্ঞানী রবার্ট কক্ (১৮৪৩—১৯১০)।

ইউরোপের দেশে দেশে তখন গরু-ভেড়ার মড়ক লেগেছে। মারাত্মক অ্যান্থ্রাক্স রোগ এক-একটি গ্রামে ঢোকে আর পালকে পাল গরু-ভেড়ার মৃত্যু হয়। এই রোগের কারণ নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে কক্ গবেষণা শুরু করলেন। একটি শক্তিশালী অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের (বা, অণুবীনের) সাহায্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে কক্ বুঝতে পারলেন যে, অ্যান্থ্রাক্স রোগে আক্রান্ত জীব-জন্তুর রক্তে সরু কাঠির মতো জীবাণু দেখা যায়। এরাই যে প্রকৃতপক্ষে অ্যান্থ্রাক্স রোগের জন্যে দায়ী তা প্রমাণ করা দরকার।
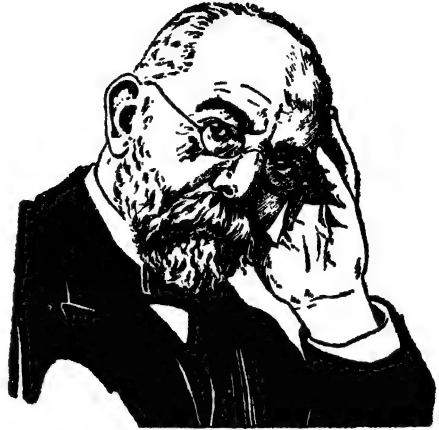
চিত্র ৫৩। রবার্ট কক্

কক্ ভাবলেন, জীবাণুভরা দূষিত রক্তের সাহায্যে যদি সুস্থ সবল পশুর দেহে এই রোগ সংক্রামিত করা যায়, তাহলেই তাঁর ধারণা সত্য ব'লে প্রমাণিত হবে। কক্ পরীক্ষা শুরু করলেন।

একটি কাচের স্লাইড গরম ক'রে জীবাণুশূন্য করলেন। এর মাঝে ছোট্ট একটি গর্ত, তার মধ্যে সদ্য বধকরা ষাঁড়ের চক্ষুরস এক ফোঁটা নিলেন। একটি সরু কাঠির সাহায্যে অ্যান্থ্রাক্স রোগে মৃত একটি পশুর রক্ত ঐ রসের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন। এরপর গর্তের চারিদিকে ভেসেলিন মাখিয়ে তার উপর আর একটি স্লাইড চাপা দিলেন। বাইরের কোন জীবাণু ঐ রসের মধ্যে ঢুকতে না পারে, তাই এতো সাবধানতা। কক্ স্লাইডখানা অণুবীনের তলায় রেখে পরীক্ষা করতে লাগলেন ঘণ্টা দু-একের মধ্যেই এক আজব কাণ্ড ঘটলো।

হঠাৎ এক সময়ে কক্ দেখতে পেলেন, কোন্ মায়াবলে যেন একটি জীবাণু ভেঙে দু'টি হ'ল, দু'টি ভেঙে চারটি হ'ল। দেখতে দেখতে সমগ্র চক্ষুরস হাজার হাজার জীবাণুতে ছেয়ে গেল। পরিষ্কার চক্ষুরস দেখতে দেখতে ঘোলাটে হয়ে গেল

চোখের পলকে এমন ভোজবাজীর খেলা দেখে তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। এক ফোঁটা চক্ষুরসে অল্পসময়ের মধ্যেই যদি এতো হাজার হাজার জীবাণুর সৃষ্টি হয়, তাহলে চব্বিশ ঘণ্টায় একটি পশুর দেহে না-জানি কত কোটি কোটি জীবাণু জন্মায়! কক্ বুঝলেন, কি জন্যে এই জীবাণুর আক্রমণে এতো তাড়াতাড়ি গবাদি পশু মরে কাঠ হয়ে যায়।

কক্ আর একটি স্লাইড তৈরি করলেন। একটি সরু কাঠির সাহায্যে ঐ ঘোলাটে রস এক ফোঁটা নিয়ে তা আর এক ফোঁটা চক্ষুরসের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন। পরদিন পরীক্ষা ক'রে দেখলেন, এই রসও ঘোলাটে হয়ে গেছে, আর তার মধ্যে রয়েছে হাজার হাজার জীবাণু। এইভাবে বার বার পরীক্ষা ক'রে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হ'তে দেখলেন। বুঝলেন, অনুকূল প্রতিবেশ পেলে, এই জীবাণু দ্রুত বংশ-বিস্তার করতে পারে।

কক্ এবারে স্লাইড থেকে একটুখানি ঘোলাটে রস নিয়ে তা একটি ইঁদুরের দেহে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। পরদিন দেখলেন, ইঁদুরটি মরে পড়ে রয়েছে। তার রক্তে দেখা গেল, হাজার হাজার জীবাণু! তিনি এরপর গিনিপিগ, খরগোস এবং ভেড়ার দেহে এই জীবাণু প্রবেশ করিয়ে দিলেন। প্রত্যেকটি প্রাণী অ্যানথ্রাক্স রোগে মারা গেল। প্রত্যেকটি প্রাণীর রক্তেই এই জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গেল। ককের অক্লান্ত সাধনার ফলে এইভাবে ১৮৭৫ সালে পাস্তুরের জীবাণু-তত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল।

ককের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে বিজ্ঞানীরা ক্রমে আরও অনেক রকম জীবাণু আবিষ্কার করলেন এবং তাদের জীবনধারা ও কার্যপ্রণালী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করতে সক্ষম হলেন। এইভাবে পৃথিবীর মানুষের কাছে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হ'ল।

বোঝা গেল যে, আপনা থেকে প্রাণের স্ফুরণ কখনই সম্ভব নয়। অতি ক্ষুদ্র জীবাণুরও জনিতা (Parent) আছে।

প্রাণের স্ফুরণ-সংক্রান্ত চিন্তাধারার বিকাশে নানা দেশের বিজ্ঞানীরা নানাভাবে গবেষণা করছিলেন। তাঁদের গবেষণার প্রধান হাতিয়ার হ'ল অণুবীক্ষণ-যন্ত্র (Microscope)। এর ফলে নিত্য নতুন বিস্ময়কর তথ্য উদ্‌ঘাটিত হতে লাগল। এ সম্পর্কে হগ্‌বেন যে মন্তব্য করেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন,—"আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর এইরূপ পরিবর্তনের উপর অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের প্রভাব ছিল প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ দু'রকমই। এটি নানাভাবে এমন সব সাদৃশ্য উপলব্ধি
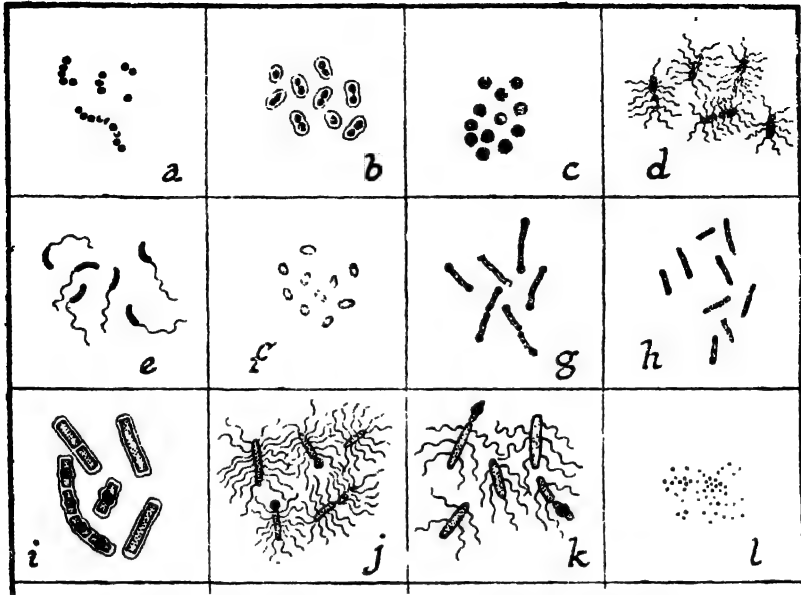
চিত্র ৫৪। কয়েক প্রকার রোগোৎপাদক ব্যাক্টিরিয়া (প্রতিটি এক হাজার গুণ বিবর্ধিত)—
a—স্ট্রেপ্‌টোকক্কাস্ (সেপ্‌টিসিমিয়া, টন্‌সিলাইটিস্ প্রভৃতি রোগের জন্য দায়ী); b—নিউমোকক্কাস (নিউমোনিয়া রোগের জীবাণু), c—ষ্ট্যাফাইলোকক্কাস (নানারকম ক্ষত, ফোঁড়া প্রভৃতির জন্য দায়ী); d—ব্যাসিলাস কোলাই (টাইফয়েড-রোগের জীবাণুও দেখতে অনেকটা এইরকম); e—ভিবরিও কলেরী (কলেরার জীবাণু), f—ব্যাসিলাস্ পেষ্টিস্ (প্লেগের জীবাণু); g—ব্যাসিলাস্ ডিফ্‌থেরিয়া (ডিফ্‌থেরিয়ার জীবাণু); h—ব্যাসিলাস্ টিউবারকিউলোসিস্ (যক্ষ্মা-রোগের জীবাণু); i—ব্যাসিলাস্ অ্যান্‌থ্রাসিস্ (অ্যান্‌থ্রাক্স-রোগের জীবাণু); j—ব্যাসিলাস্ টিটানি (ধনুষ্টংকার-রোগের জীবাণু); k—ব্যাসিলাস্ বটুলিনাস্ (খাদ্যে বিষক্রিয়ার জন্যে দায়ী); l—বসন্ত-রোগের ভাইরাস।

করতে আমাদের সহায়তা করেছে যা খালি চোখে কখনও সম্ভব হ'ত না। আয়তনের কথা বাদ দিলে, কীট-পতঙ্গের ডিম সব দিক দিয়ে ঠিক মুরগির ডিমের মতো, কিংবা হাঙ্গর, গিরগিটি, কাঁকড়া বা অক্টোপাসের ডিমের মতো। প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের ফলে যখন বোঝা গেল যে, প্রত্যেকটি প্রাণীই কমবেশি গোলাকার, বা ডিম্বাকার, একটি বস্তু থেকে জীবন শুরু করে, যার সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীটির বাহ্যিক কোন সাদৃশ্য নেই, তখন অ্যারিস্টট্‌ল প্রবর্তিত প্রাণীদের শ্রেণী-বিভাগ, যেমন—(১) যাদের জীবন শুরু হয় কীট হিসেবে, (২) যাদের জীবন শুরু হয় ডিম হিসেবে (অর্থাৎ, যারা ডিম্বজ), এবং (৩) যাদের জীবন শুরু হয় মাতৃগর্ভে ভ্রূণ হিসেবে (অর্থাৎ, যারা জরায়ুজ), তা পরিত্যক্ত হ'ল।"

আধুনিক মতবাদ অনুসারে আণুবীক্ষণিক জীবাণুদের (বা, এক-কোষী প্রাণীদের) থেকে স্বতন্ত্র প্রতিটি উদ্ভিদ্ বা প্রাণী-দেহই অসংখ্য আণুবীক্ষণিক ইষ্টক দ্বারা গঠিত, যার নাম কোষ (Cell)। আর নিষেকের (Fertilization) মূল তথ্য হ'ল এই যে, দু'টি জনন-কোষ (Gametes), যার একটি (অর্থাৎ, পুং-জনন-কোষ, বা শুক্রাণু =male gamete=sperm) উৎপন্ন করে জনক (বা, পিতা) (Male parent) এবং অন্যটি (অর্থাৎ, ডিম্ব-কোষ, বা ডিম্বাণু=female gamete=ovum=egg-cell) উৎপন্ন করে জননী (বা, মাতা) (Female parent), পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়, এবং তা-থেকেই এমন একরূপ কোষ-বিভাজন-প্রক্রিয়া শুরু হয়, যার ফলে একটি বহু-কোষবিশিষ্ট ভ্রূণ (Embryo) উৎপন্ন হয়।

এইভাবে নানা দেশের বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত সাধনার ফলে জীবের জন্ম ও বিকাশ সম্পর্কে যাবতীয় গুপ্ত রহস্যই ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে মানুষের কাছে। পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে এসব আরও বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হ'ল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

জীব-কোষ

একটি মস্ত বড় দালান যেমন অনেকগুলি ইঁট দিয়ে গাঁথা হয়, উদ্ভিদ্ বা প্রাণী যে-কোন জীবের দেহও তেমনি অসংখ্য কোষ (Cell) দিয়ে গঠিত। তবে জীব-কোষ এতো ছোট যে, খালি চোখে কিছুই বোঝা যায় না। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট হুক (Robert Hooke) নামে একজন ইংরেজ বিজ্ঞানী অণুবীক্ষণ-যন্ত্র তৈরি করেন এবং তার সাহায্যে নানারকম জিনিস পরীক্ষা করতে শুরু করলেন। একটি কর্কের প্রস্থচ্ছেদ কেটে অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের নীচে রাখলেন। কী আশ্চর্য! কর্কটি মৌচাকের মতো অজস্র ছোট ছোট গর্তে (বা, কুঠরিতে) বোঝাই। তিনি প্রকৃতপক্ষে মৃত কোষের প্রাচীর দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি এই প্রাচীর-যুক্ত ছোট ছোট মৌচাকের মতো কুঠরির নাম দেন **কোষ** (Cell)। গাজর এবং সালগমের টুকরায়ও একই রকম জিনিস তিনি দেখতে পান। পরে বিজ্ঞানী হিউগো ভন মল (Hugo Von Mohl) কোষের জীবিত অংশের প্রকৃতি বর্ণনা করেন, এবং বিজ্ঞানী পারকিন্‌জী (Purkinji) কোষের জীবিত অংশের নাম দেন **প্রোটোপ্লাজ্‌ম** (Protoplasm) বা **প্রাণপঙ্ক**। উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর আকৃতিগত (Structural) এবং কাজ সম্পর্কীয় (Functional) একক (Unit)-কে সাধারণ ভাবে **কোষ** (Cell) বলা হয়।

চিত্র ৫৫। রবার্ট হুক

উদ্ভিদ্-কোষ ঃ

উদ্ভিদ্-দেহের যে কোনো অংশ থেকে খুব পাতলা একটি প্রস্থচ্ছেদ নিয়ে অণু-বীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করলে, অসংখ্য ছোট ছোট কুঠরি দেখা যাবে, এগুলি

এক-একটি কোষ। কোষগুলির কিছু অংশ মৃত এবং কিছু অংশ সজীব বস্তু দিয়ে গঠিত। নীচে একটি আদর্শ উদ্ভিদ্-কোষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হ'ল।

(১) **কোষ-প্রাচীর**—প্রতিটি উদ্ভিদ্-কোষ নির্জীব কঠিন আবরণ দিয়ে সীমাবদ্ধ থাকে—এই আবরণকে **কোষ-প্রাচীর** (Cell-wall) বলে। কোষ-প্রাচীর সেলুলোজ (Cellulose) নামে একপ্রকার জটিল কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় জৈব পদার্থ দিয়ে তৈরি হয়। কোষের সজীব অংশের বিপাকীয় কাজের ফলেই কোষ-প্রাচীর সৃষ্টি হয়। কোষ-প্রাচীর কোষকে নির্দিষ্ট আকার দেয়, একটি কোষ থেকে আর একটি কোষকে পৃথক ক'রে রাখে। কোষের মধ্যেকার প্রোটোপ্লাজম্‌কে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে। কোন কোন নিম্ন-শ্রেণীর উদ্ভিদ্-কোষে এবং প্রজনন-সংক্রান্ত কোষে, কোষ-প্রাচীর থাকে না। প্রাচীরহীন কোষকে **নগ্ন-কোষ** বলে।

(২) **প্রোটোপ্লাজ্‌ম**—সমস্ত সজীব কোষে প্রাচীর পরিবৃত যে অর্ধস্বচ্ছ, বর্ণহীন, দানাদার জেলীর মতো চটচটে এক রকমের আঠালো পদার্থ থাকে, তাকে **প্রোটোপ্লাজ্‌ম** (Protoplasm) বা প্রাণপঙ্ক বলে। বিজ্ঞানী হাক্সলে (Huxley) প্রোটোপ্লাজ্‌মকে 'জীবনের মূল ভিত্তি' (Physical basis of life) হিসেবে বর্ণনা করেন। শতকরা ৬০ ভাগ থেকে ৯৯ ভাগ পর্যন্ত জলে, জৈব ও অজৈব নানা প্রকারের পদার্থ মিলে প্রোটোপ্লাজ্‌ম তৈরী হয়।
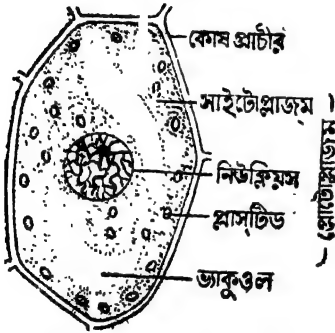
চিত্র ৫৬। একটি আদর্শ উদ্ভিদ্-কোষ

এর জৈব পদার্থগুলির মধ্যে শর্করা, প্রোটিন এবং স্নেহ-জাতীয় পদার্থ থাকে এবং অজৈব পদার্থের মধ্যে নানা রকমের ধাতু, লবণ, গন্ধক ও ফস্‌ফরাস ইত্যাদি থাকে। প্রোটোপ্লাজ্‌ম একটি জটিল যৌগিক পদার্থ। প্রোটোপ্লাজ্‌মকে নিউক্লিয়স্ ও সাইটোপ্লাজ্‌ম এই দু'টি প্রধান অংশে পৃথক করা যায়।

(ক) **নিউক্লিয়স্** বা **ন্যষ্টি**—প্রোটোপ্লাজ্‌মের সব থেকে ঘন অংশকে **নিউ-ক্লিয়স্** (Nucleus) বা **ন্যষ্টি** বলে। ইহা সাধারণভাবে গোলাকার, ডিম্বাকার বা নলাকার হয়। অপরিণত কোষে নিউক্লিয়স্ কোষের মাঝখানে থাকে। একটি ভেদ্য (বা, পারগম্য) পাতলা পর্দা দিয়ে নিউক্লিয়স্‌টি প্রোটোপ্লাজ্‌মের অন্যান্য অংশ থেকে পৃথক থাকে, এবং এই পর্দাটিকে **নিউক্লিয় মেমব্রেন** (Nuclear membrane)

বা **ন্যষ্টিক ঝিল্লী** বলে। নিউক্লিয়সের মধ্যে যে ঘন তরল পদার্থ থাকে তাকে **নিউ-ক্লিয়োপ্লাজ্‌ম** (Nucleoplasm) বলে। নিউক্লিয়োপ্লাজ্‌মের মধ্যে জড়ানো সুতোর বাণ্ডিলের মতো যে অংশ দেখতে পাওয়া যায়, তাকে **নিউক্লিয় জালিকা** (Nuclear reticulum) বলে। এই নিউক্লিয় জালিকার প্রত্যেকটি সুতোর মতো অংশকে **ক্রোমোজোম** (Chromosome) বলে। এই ক্রোমোজোমই উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর বংশগত ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে। নিউক্লিয়সের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক বা একাধিক ঘন গোলাকার চক্‌চকে বস্তু দেখা যায়, এদের **নিউক্লিওলাস** (Nucleolus) বা **নিন্যষ্টি** বলে।

মস্তিষ্ক যেমন প্রাণী-দেহের সকল কাজ পরিচালনা করে, তেমনি নিউক্লিয়স্ কোষের সকল কাজ পরিচালনা করে। নিউক্লিয়সের মৃত্যু হলে কোষেরও মৃত্যু ঘটে। উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর দেহের বৃদ্ধিতে নিউক্লিয়স্ বিভক্ত হয়ে কোষ-বিভাজনে অংশগ্রহণ করে।

(খ) **সাইটোপ্লাজ্‌ম**—প্রোটোপ্লাজ্‌মের নিউক্লিয়স ছাড়া বাকি অংশকে **সাইটোপ্লাজ্‌ম** (Cytoplasm) বলে। অপরিণত কোষে ইহা সমস্ত কোষে ছড়িয়ে থাকে। কিন্তু পরিণত কোষে সাইটোপ্লাজ্‌ম কোষ-প্রাচীরের ধারে একটি পাতলা স্তরে বিন্যস্ত থাকে। কোষের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমতা রক্ষা ক'রে সাইটোপ্লাজ্‌ম আয়তনে বাড়তে পারে না। ফলে কোষের মধ্যে ছোট ছোট গহ্বরের সৃষ্টি হয়। এইরূপ গহ্বরগুলিকে কোষ-গহ্বর (Cell-vacuole) (বা, রিক্ত গহ্বর) বলে। পরে সমস্ত ছোট ছোট কোষ-গহ্বরগুলি একসঙ্গে মিশে কোষের মাঝখানটায় একটি বড় গহ্বরের সৃষ্টি করে। নিউক্লিয়স্ সাইটোপ্লাজ্‌মসহ কোষ-প্রাচীরের ধার ঘেঁষে অবস্থান করে। কোষের এই অবস্থানকে **প্রাইমরডিয়েল ইউট্রিকৃল** (Primordial utricle) বলে। কোষ-গহ্বরে কোষ-রস (Cell-sap) থাকে। কোষ-রসে জৈব-অজৈব অম্ল, সঞ্চিত খাদ্য, রেচন-পদার্থ প্রভৃতি সঞ্চিত অবস্থায় থাকে। প্রতিটি কোষের প্রাচীর-সংলগ্ন সাইটোপ্লাজ্‌ম কম ঘন থাকে এবং এই অংশকে **এক্টোপ্লাজ্‌ম** (Ectoplasm) বলে। এক্টোপ্লাজ্‌মের পরবর্তী অংশ অপেক্ষাকৃত বেশী ঘন থাকে। একে **এণ্ডোপ্লাজ্‌ম** (Endoplasm) বলে। এণ্ডোপ্লাজ্‌মের যে অংশ গহ্বরকে ঘিরে থাকে তাকে **টোনোপ্লাজ্‌ম** (Tonoplasm) বলে। সাইটোপ্লাজ্‌ম কোষের যাবতীয় বিপাকীয় কাজ, যথা—খাদ্য পরিপাক ও শোষণ, রেচন, ক্ষরণ ও শ্বাসকার্য, ক'রে থাকে। এছাড়া উদ্ভিদ্-কোষে প্লাস্টিড, মাইটোকনড্রিয়া, ও গল্‌গি-বডিস নামে কয়েকটি জীবিত অংশ সাইটোপ্লাজ্‌মে দেখা যায়।

(i) **প্লাস্টিড**—সবুজ উদ্ভিদে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে অনেক ছোট ছোট দানাদার বা দণ্ডের মতো কতকগুলি সজীব বস্তু দেখা যায়, এগুলিকে **প্লাস্টিড** (Plastids) বলে। প্লাস্টিড বিভক্ত হয়ে নূতন প্লাস্টিড গঠন করে। উদ্ভিদের বর্ণ-বৈচিত্র্যের জন্য প্লাস্টিড-কণারাই দায়ী। উদ্ভিদ্-কোষে তিন রকমের প্লাস্টিড দেখা যায় ; যেমন—

(ক) **ক্লোরোপ্লাস্ট**—(Chloroplast) উদ্ভিদের পাতার, বা কচি কাণ্ডের, বহিস্ত্বকের কোষে ক্লোরোপ্লাস্ট, বা সবুজ প্লাস্টিড, থাকে। এরা আকারে ক্ষুদ্র, গোলাকার, উপ-বৃত্তাকার বা চাকতির মতো। নিম্ন-শ্রেণীর শৈবাল-জাতীয় উদ্ভিদে প্যাঁচানো ও তারার মতো আকৃতিরও দেখতে পাওয়া যায়। ক্লোরোফিল্ নামে সবুজ-কণার জন্যই এদের বর্ণ সবুজ। এগুলি উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষ পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ ক'রে কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে।

(খ) **ক্রোমোপ্লাস্ট** (Chromoplast)—সবুজ রঙ ছাড়া অন্য রঙের প্লাস্টিডকে ক্রোমোপ্লাস্ট বলে। এ ধরনের প্লাস্টিডের মধ্যে কমলা ও হলুদ এই দু'টি প্রধান রঙ দেখা যায়। বিভিন্ন বর্ণের পাতাবাহার গাছ, ফুলের পাপড়ির রঙ ও ফলের রঙ ক্রোমোপ্লাস্টের জন্য হয়ে থাকে।

(গ) **লিউকোপ্লাস্ট** (Leucoplast)—বর্ণহীন প্লাস্টিডকে লিউকোপ্লাস্ট বলে। উদ্ভিদের মূলে এবং ভূনিম্নস্থ কাণ্ডে বর্ণহীন প্লাস্টিড দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ বর্ণহীন প্লাস্টিড আকারে ছোট হয়। লিউকোপ্লাস্ট আকারে বড় হ'লে তাকে অ্যামাইলোপ্লাস্ট (Amyloplast) বলে। অ্যামাইলোপ্লাস্ট শ্বেতসার বিপাকে সাহায্য করে। সূর্যের আলো পেলে বর্ণহীন প্লাস্টিড বর্ণযুক্ত প্লাস্টিডে পরিণত হয়।

(ii) **মাইটোকন্ড্রিয়া**—সকল জীবিত কোষে ছোট ছোট দানাদার, বা দাঁতের মতো, অথবা সুতোর আকারে, সাইটোপ্লাজমের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে মাইটোকন্ড্রিয়া (Mitochondria) বা কন্ড্রিয়োসোম (Chondriosome) দেখা যায়। মাইটোকন্ড্রিয়া কোষের শ্বসন-ক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। তাছাড়া এটি বিপাকীয় কাজে অংশগ্রহণকারী উৎসেচক উৎপন্ন করতেও সাহায্য করে।

(iii) **গল্‌গি-বডিস্**—সকল প্রাণী-কোষে এবং কোন কোন উদ্ভিদ্-কোষে জালের আকৃতি-বিশিষ্ট প্রোটোপ্লাজমীয় সজীব বস্তু সাইটোপ্লাজমের ভিতরে দেখা

যায়। বিপাকীয় কাজের প্রয়োজনে রসনিঃসরণ করাই গল্‌গি-বডিসের (Golgi bodies) প্রধান কাজ।

সাইটোপ্লাজ্‌মের জীবিত অংশ ছাড়া হরেক রকমের জড়-পদার্থ থাকে। এদের অধিকাংশই তরল অবস্থায় কোষ-রসে থাকে, অথবা কঠিন অবস্থায় সাইটো-প্লাজ্‌মে এলোমেলো ভাবে ছড়ানো অবস্থায় দেখা যায়। এদের আরগাস্টিক-পদার্থ বলে। আরগাস্টিক-পদার্থকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন—(ক) সঞ্চিত বস্তু (Reserve food), (খ) অন্তঃক্ষরিত বস্তু (Secretory Products) এবং (গ) বর্জ্য বস্তু (Excretory Products)।

(ক) **সঞ্চিত বস্তু**—পরিশোষণের সময় প্রোটোপ্লাজ্‌ম দ্বারা গঠিত হয়, এবং ভবিষ্যতের জন্য বিশেষ কোষে কঠিন বা তরল অবস্থায় সঞ্চিত থাকে। এই সব বস্তুই গাছের খাদ্য। প্রোটিন, শর্করা ও স্নেহ-জাতীয়—এই তিন প্রকারের খাদ্য উদ্ভিদ্‌-কোষে পাওয়া যায়।

(খ) **অন্তঃক্ষরিত বস্তু**—প্রোটোপ্লাজ্‌মের বিপাকীয় কাজের সময় গঠিত হয়। অন্তঃক্ষরিত বস্তুর মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের রঞ্জক পদার্থ, উৎসেচক, মিষ্ট রস বা মধুই প্রধান।

(গ) **বর্জ্য বস্তু**—প্রোটোপ্লাজ্‌মের বিপাকীয় কাজের ফলে উৎপন্ন হয় এবং কোষের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। বর্জ্য বস্তুর মধ্যে জৈব অম্ল, উপক্ষার, গঁদ, রেসিন, রজন, ট্যানিন, তরু-ক্ষীর এবং ধাতব কেলাস প্রধান।

প্রাণী-কোষ:

উদ্ভিদ-কোষ নিয়ে আলোচনা করার পর এবার আমরা একটি প্রাণী-কোষ নিয়ে আলোচনা ক'রব। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, উদ্ভিদ্‌ ও প্রাণী-কোষের সজীব অংশের মধ্যে প্রচুর মিল থাকলেও কিছু কিছু পার্থক্য আছে। একটি আদর্শ প্রাণী-কোষের বিভিন্ন অংশের বিবরণ নীচে দেওয়া হ'ল।

প্রাণী-কোষে উদ্ভিদ্‌-কোষের মতো কোনো নির্জীব শক্ত প্রাচীর নেই। কোষের প্রোটোপ্লাজ্‌মের চারপাশে **প্লাজ্‌মালিমা** (Plasmalemma) নামে একটা স্বচ্ছ, ভেদ্য (বা, পারগম্য) সজীব পর্দা দিয়ে ঘেরা থাকে। প্লাজ্‌মালিমা প্রোটোপ্লাজ্‌ম দ্বারা নিঃসৃত জীবিত বস্তু দিয়ে তৈরী হয়, এবং এটি প্রোটোপ্লাজ্‌মেরই অংশ বিশেষ। তাই প্লাজ্‌মালিমা সজীব। প্লাজ্‌মালিমা কোষের আকার দান করে, একটি কোষ থেকে অপর কোষকে পৃথক্‌ করে এবং কোষস্থ প্রোটোপ্লাজ্‌মকে রক্ষা করে।

প্লাজ্‌মালিমার ভিতর দিয়ে ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের বিনিময় হয়।

প্লাজ্‌মালিমা দিয়ে ঘেরা কোষের মধ্যে স্বচ্ছ চটচটে আঠালো কলয়ডাল (Colloidal) বা কলিল-বস্তুকে **প্রোটোপ্লাজ্‌ম** বা প্রাণপঙ্ক বলে। প্রোটোপ্লাজ্‌মের দু'টি অংশের মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত ঘন গোলাকার বস্তুকে **নিউক্লিয়াস্‌** (Nucleus) বা ন্যষ্টি বলে, এবং নিউক্লিয়াস্‌কে বাদ দিয়ে প্রোটোপ্লাজ্‌মের বাকি অংশ, যা অপেক্ষাকৃত তরল, সেই অংশকে **সাইটোপ্লাজ্‌ম** (Cytoplasm) বলে। প্রত্যেকটি প্রাণী-কোষ প্লাজ্‌মালিমা, নিউক্লিয়াস্‌ ও সাইটোপ্লাজ্‌ম দিয়ে তৈরী হয়।
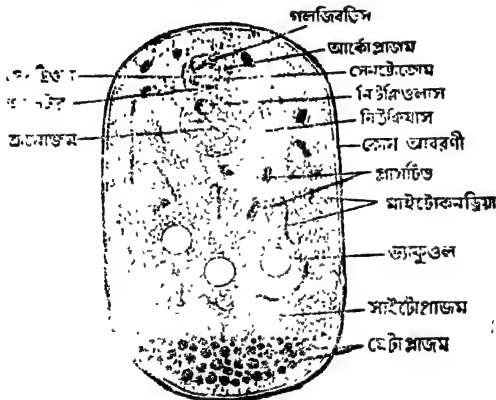
চিত্র ৫৭। একটি আদর্শ প্রাণী-কোষ

স্বাভাবিক ভাবে প্রাণী-কোষের কেন্দ্রে একটি নিউক্লিয়াস্‌ থাকে। বিভিন্ন কোষে বিভিন্ন আকৃতির নিউক্লিয়াস্‌ হয়। **নিউক্লিয় মেমব্রেন** (Nuclear membrane) নামে একটি স্বচ্ছ ভেদ্য (বা, পারগম্য) পর্দা দিয়ে নিউক্লিয়াস্‌ ঘেরা থাকে। ফলে, সহজেই সাইটোপ্লাজ্‌ম থেকে নিউক্লিয়াস্‌কে পৃথক্‌ এবং রক্ষা করে। নিউক্লিয় মেমব্রেন সাইটোপ্লাজ্‌ম থেকে বিভিন্ন জিনিসের প্রবেশ এবং বাইরে আসা নিয়ন্ত্রণ করে। নিউক্লিয়প্লাজ্‌ম নামে ঘন, স্বচ্ছ, তরল পদার্থ দিয়ে নিউক্লিয়স্‌ পূর্ণ থাকে। এক বা একাধিক ক্ষুদ্র, ঘন, গোলাকার, চকচকে বস্তু নিউক্লিয়সের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এই ক্ষুদ্র অথচ স্পষ্ট বস্তুকে **নিউক্লিওলাস্‌** (Nucleolus) বা নিন্যষ্টি বলে। নিউক্লিয়প্লাজ্‌মের মধ্যে সুতোর বাণ্ডিলের মতো জড়ানো যে অংশ দেখতে পাওয়া যায়, তাকে **নিউক্লিয় রেটিকুলাম** (Nuclear reticulum) বলে। নিউক্লিয় রেটিকুলামের প্রতিটি সুতোর মতো অংশকে **ক্রোমোসোম** (Chromosome) বলে। ক্রোমোসোমের সংখ্যা প্রতিটি প্রজাতিভুক্ত প্রাণী বা উদ্ভিদের কোষে নির্দিষ্ট থাকে। এরা বংশগত ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করে। নিউক্লিয়াস্‌ কোষের সমস্ত কাজ পরিচালনা করে। সাইটোপ্লাজ্‌ম ছাড়া নিউক্লিয়াস্‌ বাঁচতে পারে না এবং নিউক্লিয়াস্‌ ছাড়া সাইটোপ্লাজ্‌মও বাঁচতে পারে না।

নিউক্লিয়াস্ ছাড়া কোষের যাবতীয় অংশই সাইটোপ্লাজ্‌ম্ দিয়ে তৈরী। প্লাজ্‌মালিমা পর্দার নিকটের সাইটোপ্লাজ্‌ম অপেক্ষাকৃত ঘন হয়, এবং একে **এক্টোপ্লাজ্‌ম** (Ectoplasm) বলে। নিউক্লিয়স্‌কে ঘিরে যে সাইটোপ্লাজ্‌ম থাকে, তা বেশ তরল অবস্থায় থাকে। একে **এণ্ডোপ্লাজ্‌ম** (Endoplasm) বলে। এক্টোপ্লাজ্‌ম, এণ্ডোপ্লাজ্‌মকে রক্ষা করে। এণ্ডোপ্লাজ্‌ম কোষের নিউক্লিয়স্‌কে চাপ ও তাপ থেকে রক্ষা করে। অনেক সময় সাইটোপ্লাজ্‌মের মধ্যে কোষ-রস সহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বর অথবা রিক্তগোল (Vacuole) দেখা যায়।

প্রতিটি প্রাণী-কোষে এবং কোন কোন উদ্ভিদ্-কোষে প্লাজ্‌মালিমার কাছে **সেণ্ট্রোসোম** (Centrosome) নামে একটি স্পষ্ট গোলাকার ঘন বস্তু দেখা যায়। সেণ্ট্রোসোম স্বচ্ছ, তরল পদার্থ দিয়ে তৈরী হয়। ঐ স্বচ্ছ তরল বস্তুটিকে সেণ্ট্রোস্ফিয়ার (Centrosphere) বলে। কোষ-বিভাগের সময় নিউক্লিয়াস্ ভাগ হওয়ার আগে সেণ্ট্রোসোম ভাগ হয়ে দু'টি অপত্য-সেণ্ট্রোসোমে পরিণত হয়।

সমস্ত প্রাণী-কোষে এবং কোন কোন উদ্ভিদ-কোষে জালের বা সুতোর আকৃতি-বিশিষ্ট সজীব বস্তু মটর-দানার মতো সাইটোপ্লাজ্‌মের মধ্যে দেখা যায়—এদের **গল্‌গি-বডিস** (Golgi bodies) বলে। গল্‌গি-বডিস রাসায়নিক উৎসেচক ক্ষরণ ক'রে কোষের বিপাকীয় কাজের সহায়তা করে।

প্রাণী এবং উদ্ভিদ্-কোষের চারপাশে অনেকগুলি ছোট ছোট গোলাকার বা দণ্ডাকার কঠিন সজীব বস্তু দেখা যায়। এগুলিকে **মাইটোকন্‌ড্রিয়া বা কন্‌ড্রিয়োসোম** (Mitochondria or Chondriosome) বলে। কন্‌ড্রিয়োসোম কোষের শ্বাসক্রিয়া পরিচালনায়, স্নেহ-জাতীয় খাদ্য পরিপাক করতে এবং কোষের বিভিন্ন রকম বিপাকীয় কাজে সহায়তা করে।

সেণ্ট্রোসোম, গল্‌গি-বডিস এবং মাইটোকন্‌ড্রিয়োসোম নূতন ক'রে উৎপন্ন হয় না। কোষ-বিভাজনের সময় সমান ভাবে ভাগ হয়ে নিউক্লিয়াসের মতো দু'টি অপত্যকোষে প্রবেশ করে। এছাড়া কোষের বিপাকীয় কাজের ফলে সাইটোপ্লাজ্‌মের ভিতরে এলোমেলো ভাবে ছড়ানো অবস্থায় শ্বেতসার-কণা, তেল-বিন্দু ও স্নেহ-পদার্থ প্রতি কোষেই দেখা যায়।

টিস্যু বা কলা:

প্রত্যেক উদ্ভিদ্ বা প্রাণী একটি মাত্র কোষ দিয়ে তাদের জীবন শুরু করে। যদি উদ্ভিদ্ বা প্রাণী একটিমাত্র কোষ দিয়ে গঠিত হয়, তবে এ ধরনের জীবকে

এক-কোষী জীব বলা হয়। এই সব নিম্নস্তরের এক-কোষী উদ্ভিদ্ বা প্রাণীদের জীবনযাত্রা-প্রণালী খুবই সরল ব'লে একটিমাত্র কোষই তাদের প্রয়োজনীয় যাবতীয়
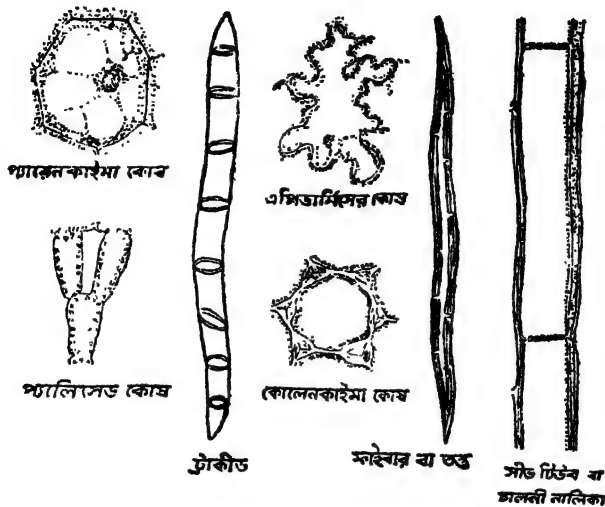
চিত্র ৫৮। উদ্ভিদ্-দেহের নানাপ্রকার টিসু বা কলায় অবস্থিত বিভিন্ন রকম কোষ।

কাজ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু উদ্ভিদ্ বা প্রাণী যদি বহু-কোষী হয়, তাহ'লে প্রারম্ভিক কোষটি (জাইগোট, বা, স্পোর) বিভক্ত হ'য়ে দু'টি অপত্য-কোষে পরিণত হয় এবং অপত্য-কোষ দু'টি পরপর বিভক্ত হয়ে বহু-কোষী প্রাণীতে বা উদ্ভিদে পরিণত হয়। সরল বহু-কোষী উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর কোষগুলি সাধারণ ভাবে একই আকৃতির বা আয়তনের হয় এবং ঐ কোষগুলি উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর প্রয়োজনীয় কাজ ক'রে দেয়। কিন্তু উচ্চ-শ্রেণীর উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর জীবনযাত্রা-প্রণালী খুবই জটিল, তাই হরেক রকম কাজ করার জন্য কোষগুলির শ্রম-বিভাগের প্রয়োজন হয়। এক-এক রকম কোষ এককভাবে বা যুক্তভাবে এক-এক রকমের কাজ করে। বিভিন্ন রকমের কাজ করার জন্য কোষগুলির বিভিন্ন রকমের আকৃতি হয়ে থাকে। কোষের উৎপত্তি, আকৃতি, গঠন এবং আয়তনও বিভিন্ন রূপ হয়। এ ভাবে দুই বা তার বেশী কোষ একই স্থান থেকে উৎপন্ন হয়ে, একই নিয়মানুসারে বিকশিত হয়ে, সংঘবদ্ধ ভাবে একই রকমের কাজ করলে কোষগুলির সমষ্টিকে কলা (Tissue) বলে।

উচ্চ-শ্রেণীর উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর দেহের কোষগুলি কতকগুলি নির্দিষ্ট কলায় সংগঠিত হয়। প্রত্যেক রকম কলা (Tissue) নিজেদের মধ্যে কাজের সমন্বয় ও সংহতি

সাধন ক'রে উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর যাবতীয় জৈবনিক কাজ সুসম্পন্ন ক'রে থাকে। যেমন, উদ্ভিদের মধ্যে আলুর বেলায় দেখা যায়, কতকগুলি কোষকে খাদ্য সঞ্চয় করতে হয়। কাজেই আলুর মধ্যে এমন কতকগুলি কোষের টিস্যু দেখা যায়, যেগুলি খাদ্য সঞ্চয় ক'রে রাখার জন্য আকারে বড় হয়েছে। উদ্ভিদের কতকগুলি কোষকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় জল বহন ক'রে নিতে হয়। এসব কোষ নলের মতো লম্বা হয়ে যায়, এদের কোষ-প্রাচীর মজবুত হয় এবং সাইটোপ্লাজ্‌ম ও নিউক্লিয়াস অন্তর্হিত হয়, যাতে জল যাতায়াতের পথ পরিষ্কার থাকে। প্রকৃত-অর্থে এই কোষ মৃত। আবার একদল কোষ প্রয়োজন হয় উদ্ভিদের কাষ্ঠাংশ গঠন করার জন্য। এসব কোষ লম্বা তন্তুর মতো, এদের কোষ-প্রাচীরে প্রচুর লিগনিন-জাতীয় পদার্থ সঞ্চিত হয়, যাতে কোষটি খুব মজবুত হয়।
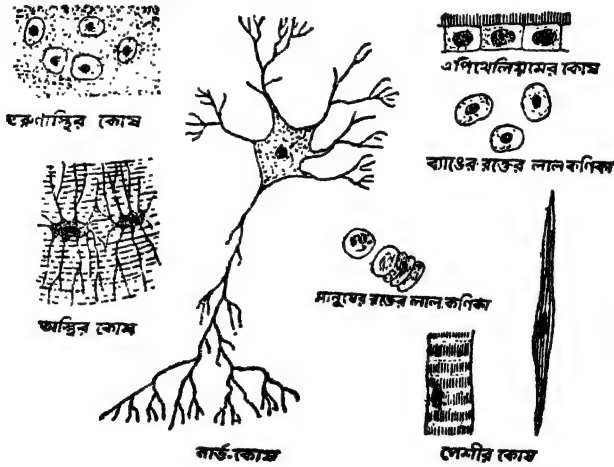
চিত্র ৫৯। প্রাণিদেহের নানাপ্রকার টিস্যু বা কলায় অবস্থিত বিভিন্ন রকম কোষ।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের বেলায়, একদল অস্থি-কোষ মিলে গঠন করে অস্থি। অস্থিকে সব সময়ই অনেকরকম চাপ ও আঘাত সহ্য করতে হয়। এজন্য প্রতিটি অস্থি-কোষের চারদিকে প্রধানতঃ ক্যাল্‌সিয়াম ফস্‌ফেট সঞ্চিত হয়ে তাকে মজবুত করে। অপরদিকে নার্ভ-কোষকে অনুভূতি বহন করতে হয়, এজন্য প্রতিটি নার্ভ-কোষ থেকে খানিকটা অংশ সুতোর মতো লম্বা হয়ে যায়, এর ফলে অনুভূতি বহন ক'রে নেওয়ার কাজে সুবিধা হয়।

উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর দেহে এরূপ আরও নানা ধরনের টিস্যুর (বা, কলার) সন্ধান পাওয়া যায়। এখানে তাদের অল্প কয়েকটির কথাই শুধু বলা হ'ল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কোষ-বিভাজন

উদ্ভিদের বা প্রাণীর বৃদ্ধি নির্ভর করে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধির উপর। কোষ কখনও নতুন ক'রে সৃষ্টি হয় না, পূর্বের কোষ থেকেই কোষ-বিভাজন (Cell-division) প্রক্রিয়ায় দু'টি অপত্য-কোষ (Daughter-cells) উৎপন্ন হয়। একই উপায়ে প্রত্যেকটি অপত্য-কোষ থেকে আবার দু'টি কোষ উৎপন্ন হয়। এমনি ক'রে উৎপন্ন নতুন নতুন কোষ দ্বারা উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর দেহ গঠিত হয়। একটি উদ্ভিদ্ বা প্রাণী যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন তার দেহে নতুন নতুন কোষের গঠন-ক্রিয়া এইভাবে চলতে থাকে। কোষ-বিভাজনের পদ্ধতি প্রধানতঃ দু'রকম।
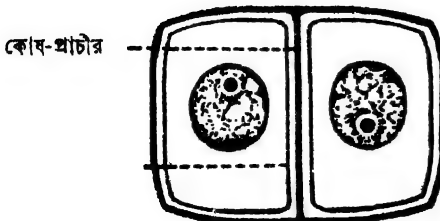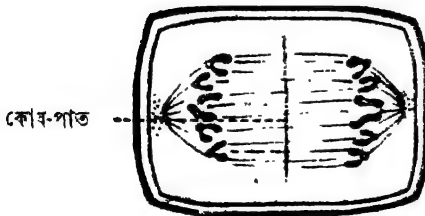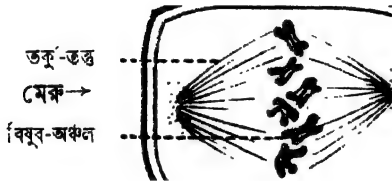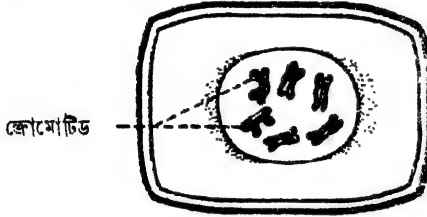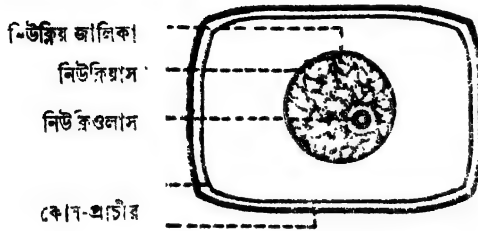
চিত্র ৬০। মাইটোসিস-পদ্ধতিতে উদ্ভিদ্-কোষের বিভাজন।
(উপর থেকে নীচে)
1. ইন্টারফেজ (Interphase),
2. প্রফেজ (Prophase),
3. মেটাফেজ (Metaphase),
4. অ্যানাফেজ (Anaphase),
এবং টেলোফেজের (Telophase)-এর সূচনা,
5. সাইটোকাইনেসিস বা কোষ-বিভাজন—সম্পূর্ণ
(Cytokinesis—complete)

(1) **মাইটোসিস (Mitosis)**—উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর দেহে সাধারণতঃ এই পদ্ধতিতে নতুন নতুন কোষ উৎপন্ন হয়।
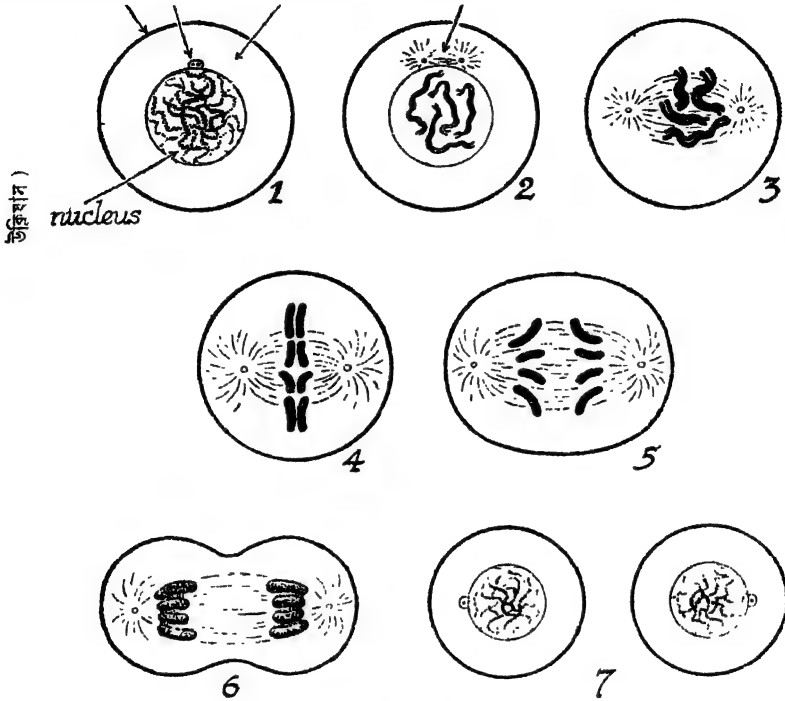
চিত্র ৬১। মাইটোসিস-পদ্ধতিতে প্রাণী-কোষের বিভাজন।
1. ইণ্টারফেজ (Interphase), 2—3. প্রফেজ (Prophase), 4. মেটাফেজ (Metaphase), 5. অ্যানাফেজ (Anaphase), 6. টেলোফেজ (Telophase), 7. সাইটোকাইনেসিস, বা কোষ-বিভাজন —সম্পূর্ণ (Cytokinesis—complete)।

কোষ-বিভাজনের ঠিক আগেই কোষটি এজন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত হয় (Interphase)। নিউক্লিয়াস (বা, ন্যষ্টি) ভাল ক'রে পরীক্ষা করলে দেখা যায়, খানিকটা অর্ধ-তরল পদার্থের মধ্যে এক রকম জালের মতো জিনিস রয়েছে। প্রথমে মনে হয়, এই জালের জট খুলে একটি সুতোর বাণ্ডিলের মতো পদার্থে পরিণত হ'ল। তারপর এই সুতো কতকগুলি ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হয়ে গেল। এগুলি দেখতে অনেকটা ইংরাজী V, U, J অথবা L অক্ষরের মতো। এদের বলা হয় ক্রোমোসোম (Chromosomes)। [প্রত্যেক প্রজাতির ক্রোমোসোম-সংখ্যা নির্দিষ্ট এবং

জোড়-সংখ্যক। তবে বিভিন্ন জীবের বেলায় ক্রোমোসোমের সংখ্যা বিভিন্ন রূপ; যেমন—মটর গাছে ১৪-টি, পেঁয়াজে ১৬-টি, ভুট্টা গাছে ২০-টি, আপেলে ৩৪-টি, ড্রসোফিলা মাছিতে ৪-টি, এবং মানুষের বেলায় ৪৬-টি।] তারপর প্রত্যেকটি ক্রোমোসোম লম্বালম্বি ভাবে চিরে দু'টি ক'রে ক্রোমাটিডে বিভক্ত হয়ে যায় (Prophase)। উল্লেখ্য যে, প্রাণী-কোষে এই সময় সেণ্ট্রোসোম দু'টি অংশে বিভক্ত হয়ে দুই প্রান্তে সরে যায়। এইবার ক্রোমাটিডগুলি কোষের মাঝ বরাবর (বিষুব-তলে) জোড়ায় জোড়ায় সজ্জিত হয় (Metaphase)। তখন কোষের দুই মেরু থেকে উদ্ভূত সূত্রাবলী দ্বারা তর্কুর আকৃতিবিশিষ্ট একটি সংস্থান গঠিত হয়। এদের বলা হয় তর্কু-তন্তু (spindle fibres)। এগুলি এক-একটি ক্রোমোসোমের এক-একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর সঙ্গে যুক্ত থাকে। এরপর প্রত্যেক জোড়া থেকে ক্রোমাটিডগুলি পৃথক হয়ে যায় ব'লে তাদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়। তখন তর্কু সক্রিয় হয় এবং সূত্রগুলি সঙ্কুচিত হয়ে ক্রোমাটিডগুলিকে দুই বিপরীত মেরুর দিকে আকর্ষণ করে। এজন্য তারা ক্রমশঃ বিপরীত মেরুর দিকে সরে যায় (Anaphase)। প্রত্যেক মেরুতে গিয়ে ওই ক্রোমোটিডগুলি আবার পরস্পরের সঙ্গে লম্বালম্বিভাবে জুড়ে যায়, এবং একটি ক'রে লম্বা সূতোর মতো পদার্থের সৃষ্টি করে। এইভাবে দুই প্রান্তে দু'টি নতুন সূতোর বাণ্ডিলের মতো পদার্থের সৃষ্টি হয়। ক্রমে এগুলি থেকে দু'টি জালের মতো জিনিসের উদ্ভব হয়, এবং তাদের থেকেই দু'টি নিউক্লিয়াস উৎপন্ন হয় (Telophase)। তখন সাইটোপ্লাজ্‌মও দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, এবং এক-একটি অংশ এক-একটি নিউক্লিয়াসকে ঘিরে থাকে।

উদ্ভিদ্-কোষে অতঃপর পূর্বতন বিষুব-তলে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সেলুলোজ-দানা সঞ্চিত হতে থাকে। এগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে একটি কোষ-পাত (Cell-plate) গঠন করে। ক্রমে এর উপরে আরও সেলুলোজ-কণা সঞ্চিত হওয়ার ফলে একটি কোষ-প্রাচীর গঠিত হয় (Cytokinesis)। এইভাবে একটি মাতৃ-কোষ থেকে দু'টি অপত্য-কোষ উৎপন্ন হয়। এদের প্রত্যেকটিতে একটি ক'রে নিউক্লিয়াস (বা, সৃষ্টি) থাকে। উল্লেখ্য যে, এই পদ্ধতিতে মাতৃ-নিউক্লিয়াসে ক্রোমোসোমের সংখ্যা যা থাকে, প্রত্যেকটি অপত্য-নিউক্লিয়াসেও ক্রোমোসোমের সংখ্যা ঠিক তাই হয়।

প্রাণী-কোষের বেলায়, তর্কুর বিষুব-তল বরাবর একটি খাঁজের সৃষ্টি হয়। এই খাঁজ ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর হয়ে সাইটোপ্লাজ্‌মকে বিভক্ত ক'রে দু'টি অপত্য-কোষের সৃষ্টি করে।

(2) **মাইওসিস (Meiosis)**—এই পদ্ধতিতে ক্রোমোসোমগুলি জোড়ায় জোড়ায় সজ্জিত হয়। প্রত্যেক ক্রোমোসোমই তার জুড়ি খুঁজে নেয়, এবং তাকে কাছে টেনে আনে। ক্রমে একটি তর্কুর মতো পদার্থ (Spindle) দেখা দেয়, আর তার মাঝখানে এই ক্রোমোসোমগুলি জোড় বেঁধে দাঁড়ায়। তার পরই তারা
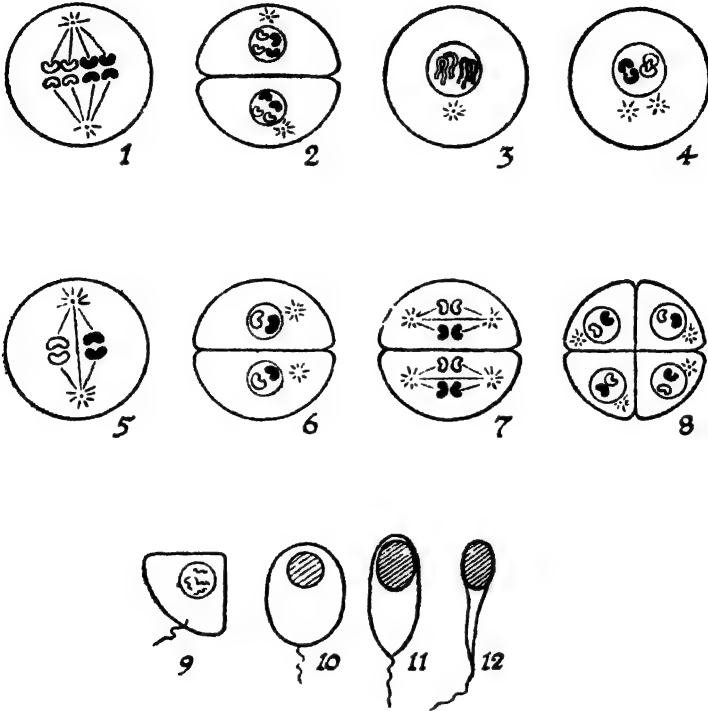
চিত্র ৬২। মাইওসিস-পদ্ধতিতে প্রাণীর শুক্রাশয়ে শুক্রাণুর উৎপত্তি (4-12)। উল্লেখ্য যে, এই প্রজাতির সাধারণ কোষে চারটি ক'রে ক্রোমোসোম থাকে, কিন্তু পুং-জনন-কোষে থাকে দু'টি ক'রে ক্রোমোসোম।

পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে। প্রত্যেক জোড়া থেকে একটি ক'রে ক্রোমোসোম এক প্রান্তে সরে যায়, তখন অন্য ক্রোমোসোমটি সরে যায় অন্য প্রান্তে। এরপর মাঝ বরাবর একটি কোষ-প্রাচীর গঠিত হয়, এবং তার ফলে দু'টি অপত্য-কোষ উৎপন্ন হয়। এই পদ্ধতির বিশেষত্ব এই যে, মাতৃ-নিউক্লিয়াসে ক্রোমোসোমের সংখ্যা যা থাকে (2 x), অপত্য-নিউক্লিয়াসে ক্রোমোসোমের সংখ্যা ঠিক তার অর্ধেক হয়ে যায় (x)। ফুলের পরাগ (বা, রেণু) ও ডিম্ব-কোষ, অথবা ফার্ন, মস্ প্রভৃতির

পুং ও স্ত্রী-জনন-কোষ, অথবা জীব-জন্তুর পুং ও স্ত্রী-জনন-কোষ গঠনে এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকে।

উপরিউক্ত পদ্ধতিতে দু'টি অপত্য-কোষ সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রত্যেকটি আবার সাধারণ পদ্ধতিতে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এর ফলে চারটি কোষের সৃষ্টি হয়। এজন্য দেখা যায়, একটি মাতৃ-কোষ থেকে সব সময়ই চারটি ক'রে পরাগ (বা, রেণু), অথবা পুং-জনন-কোষ, উৎপন্ন হয়।
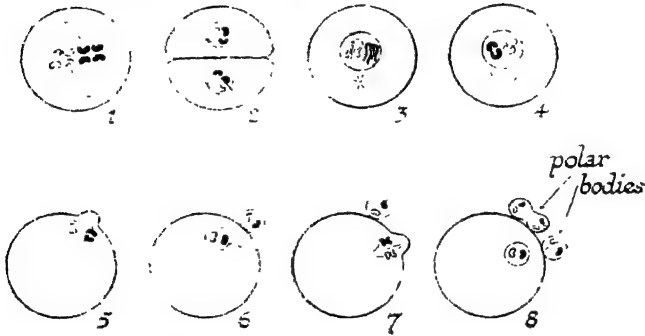
চিত্র ৬৩। মাইওসিস-পদ্ধতিতে প্রাণীর ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণুর উৎপত্তি (4-8)।

কিন্তু স্ত্রী-জনন-কোষের বেলায় যদিও নিউক্লিয়াসটি উপরিউক্ত পদ্ধতিতে দু'বার বিভক্ত হয়, তবুও সম্পূর্ণ কোষটি ঐভাবে বিভক্ত হয় না। আর এভাবে উৎপন্ন চারটি নিউক্লিয়াসের মধ্যে একটি মাত্র নিউক্লিয়াস ডিম্ব-কোষের মধ্যে থাকে, বাকি তিনটি (**Polar bodies**) ডিম্ব-কোষের বাইরে পরিত্যক্ত হয়, এবং কালক্রমে সেগুলি বিনষ্ট হয়ে যায়।

[উল্লেখ্য যে, যৌন-পদ্ধতিতে জনন-কালে, পুং-জনন-কোষ যখন স্ত্রী-জনন-কোষের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন নিষিক্ত ডিম্ব-কোষে ক্রোমোসোম-সংখ্যা আবার আগের সমান হয়ে যায় ($X+X=2X$)।]

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

জনন বা বংশ-বিস্তার

জীবমাত্রই বংশ-বিস্তার করতে পারে। জীবের জীবনকাল সীমিত। এই সীমিত জীবনকালের মধ্যেই সে জনন-প্রক্রিয়া দ্বারা অপত্য-জীব সৃষ্টি ক'রে তারই মাধ্যমে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করে। এজন্য ঐ জীবের জীবন-প্রবাহ অব্যাহত থাকে, এবং তার ফলে প্রজাতিটির বিলুপ্তি ঘটে না। বংশ-বিস্তারের পদ্ধতি সাধারণভাবে দু'রকম—(১) অযৌন-জনন (Asexual reproduction), এবং (২) যৌন-জনন (Sexual reproduction)।

(১) **অযৌন-জনন**:

দু'টি জনন-কোষের মিলন ব্যতিরেকে জনন-ক্রিয়া সম্পন্ন হলে তাকে অযৌন-জনন বলে।

(ক) **বিভাজন**—অ্যামিবার জনন-পদ্ধতি খুব সহজ। একটি কোষ পূর্ণাঙ্গ হলে তা ভেঙ্গে দু'টি কোষে পরিণত হয়ে দু'দিকে সরে যায়।

বিভাজন শুরু হয় নিউক্লিয়াস থেকে। প্রথমে নিউক্লিয়াসের মাঝখানটা ক্রমশঃ
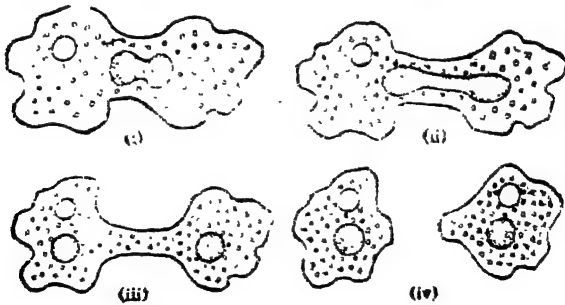
চিত্র ৬৪। বিভাজন-পদ্ধতিতে অ্যামিবার বংশ-বিস্তার

সরু হতে থাকে, যতক্ষণ না তা দু'টি অংশে বিভক্ত হয়। এভাবে নিউক্লিয়াসটি ভেঙ্গে দু'টি নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। এরপর সাইটোপ্লাজ্‌মও দু'টি অংশে বিভক্ত হয়ে যায়, এবং এক-একটি অংশ এক-একটি নিউক্লিয়াসকে ঘিরে ধরে। তারপর কোষটি এমন ভাবে ভেঙ্গে যায়, যাতে প্রত্যেক অংশে একটি ক'রে নিউক্লিয়াস থাকে।

এভাবে একটি কোষ থেকে নতুন দু'টি কোষের সৃষ্টি হয়। এর নাম বিভাজন (Fission)। হাইড্রাও বিভাজন-পদ্ধতিতে বংশ-বিস্তার করতে পারে।

(খ) **কোরকোদ্গম**—ঈস্ট-এর বংশ-বিস্তারের পদ্ধতি আরও মজার। প্রথমে দেখা যায়, ঈস্ট-এর কোষ-প্রাচীর থেকে মুকুল (Bud)-এর মতো খানিকটা অংশ স্ফীত হয়ে উঠে ক্রমশঃ বড় হতে থাকে। ইতোমধ্যে নিউক্লিয়াসের কিছু অংশ এই স্ফীত অংশের মধ্যে প্রবেশ করে। মাতৃ-কোষ এবং অপত্য-কোষের মাঝে একটি কোষ-প্রাচীর গঠিত হয়। অপত্য-কোষটি মাতৃ-কোষের গায়েই লেগে থাকে, যদিও তখন তার পৃথক অস্তিত্ব সম্ভব। অপত্য-কোষটি থেকে আবার একই উপায়ে আর একটি নতুন কোষের সৃষ্টি হয়। উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য এবং অক্সিজেন থাকলে, এভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই পরস্পর-সংলগ্ন এরূপ অনেকগুলি ঈস্ট-কোষের সৃষ্টি হয়। এর নাম কোরকোদ্গম (Budding)।
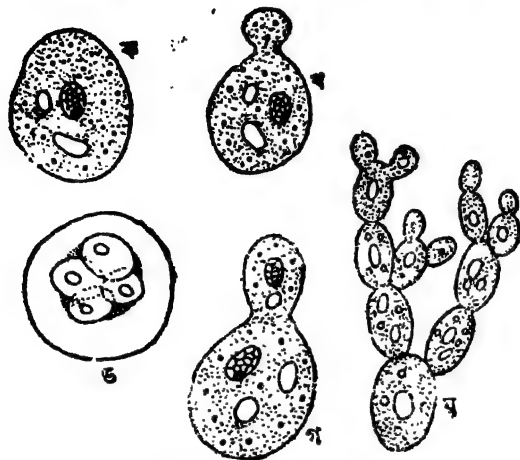
চিত্র ৬৫। কোরকোদ্গম-পদ্ধতিতে ঈস্ট-এর বংশ-বিস্তার।

হাইড্রা এই পদ্ধতিতেও বংশ-বিস্তার করতে পারে।

(গ) **স্পোর বা রেণুর সাহায্যে**—কয়েক প্রকার উদ্ভিদ্ এবং প্রাণী বংশ-বিস্তারের উদ্দেশ্যে স্পোর (Spore) অথবা সিস্ট (Cyst) উৎপন্ন করে। এদ্বারা অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বংশ-বিস্তার সুনিশ্চিত হয়। উদ্ভিদ্-জগতের মিউকর, মস্ ও ফার্ন এবং প্রাণী-জগতের মনোসিসটিস্ এবং নানা প্রকার প্রোটো-জোয়া এইরূপ অযৌন-পদ্ধতিতে বংশ-বিস্তার ক'রে থাকে।

(ঘ) **অঙ্গজ-জনন**—এমন অনেক উদ্ভিদ্ আছে যাদের বীজ হয় না, অথবা বীজ হলেও সেই বীজ থেকে গাছ জন্মে না। এরকম উদ্ভিদ্ নিজের জীবনকালে অন্যভাবে বংশ রক্ষার ব্যবস্থা ক'রে থাকে। এর নাম অঙ্গজ-জনন (Vegetative reporduction)।

অনেক জাতের কলাগাছের বীজ হয় না। আবার কোন কোন জাতের কলার বীজ হলেও সেই বীজ থেকে গাছ হয় না। কলাগাছের ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ড থেকে কয়েকটি ছোট চারাগাছ গজায়। এরপর কলাগাছের ছড়া বেরোয়। কলা পাকলে গাছটি মরে যায়। কিন্তু তার আগেই কলাগাছ তার বংশ রেখে যায়।

ওল, আদা, প্রভৃতি গাছের ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ডের মধ্যে 'চোখ' বা মুকুল (Bud) থাকে। ঐগুলি কেটে পৃথক্ ক'রে রোপণ করলে আবার তা থেকে নতুন গাছ জন্মায়।

আলুও ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ড। আলুর গায়ে কোন কোন স্থানে কুঁড়ি বা মুকুল লুকানো থাকে। মাটিতে পুঁতে দিলে, যথাসময়ে ঐ কুঁড়ি থেকে নতুন গাছের কুঁড়ি দেখা দেয়।

ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, ক্যানা বা কলাবতী প্রভৃতি গাছের ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ড থেকে নতুন চারার জন্ম হয়।

আবার, অনেক গাছের কাণ্ড বা শাখা থেকে কলম ক'রে গাছের বংশ-বিস্তার করা সম্ভব হয়। সাধারণতঃ বর্ষাকালে নানাভাবে কলম করা হয়ে থাকে ; যেমন— শাখা-কলম (Cutting), জোড়-কলম (Grafting), দাবা-কলম (Layering) ইত্যাদি। সাধারণতঃ গোলাপ, আম, জাম, লিচু, লেবু প্রভৃতি গাছের কলম করা হয়ে থাকে।

(২) যৌন-জনন :

উদ্ভিদের বেলায়, বংশ বিস্তারের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে রচিত উদ্ভিদের প্রত্যঙ্গকে ফুল (flower) বলা হয়। অনেক গাছে বোঁটার উপর শুধু একটি ক'রে ফুল ফোটে। আবার কোনো কোনো গাছে দেখা যায়, একটি দণ্ডের উপর অনেকগুলি ফুল সাজানো রয়েছে, এর নাম মঞ্জরী (Inflorescence)। বিভিন্ন গাছের মঞ্জরীতে পুষ্প-বিন্যাস বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। প্রথমে ফুলের কুঁড়ি বেরোয়, এবং নীচের দিকের কুঁড়ি আগে ফুলে পরিণত হয়।

বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন গাছে নানারকম ফুল ফোটে। বসন্তকালে পলাশ, শিরীষ, কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতি ফুল ফোটে। বেল, জুঁই, রজনীগন্ধা প্রভৃতি ফুল ফোটে গ্রীষ্মকালে। বকুল ফুল ফোটে বর্ষাকালে। শেফালী, চামেলী প্রভৃতি ফুল ফোটে শরৎকালে। আবার গাঁদা ও নানাপ্রকার বিলাতী ফুল ফোটে শীতকালে।

ফুলের প্রধান কাজ উদ্ভিদের বংশ-বিস্তারে সাহায্য করা। ফুল ফোটে ফল ও বীজ উৎপাদনের জন্য ; বীজ থেকেই নূতন চারার জন্ম হয়। ফুলের শোভা অথবা

সূর্যমুখী, জবা, অপরাজিতা, প্রভৃতি। আবার রাত্রিবেলা যে-সব ফুল ফোটে, সে-সবই প্রায় সাদা হয়। কিন্তু কীট-পতঙ্গ আকৃষ্ট করার জন্য তাতে থাকে সুমিষ্ট গন্ধ। যেমন থাকে—রজনীগন্ধা, বেল, জুঁই, গন্ধরাজ ইত্যাদি ফুলে।

ফুলের প্রধানতঃ চারটি স্তবক আছে। বোঁটার উপরে যেখানে এই স্তবক চারটি যুক্ত থাকে, তাকে **পুষ্পাধার** (Thalamus) বলা হয়। নীচে এই স্তবক চারটির বিবরণ দেওয়া হ'ল—

ফুলের সবচেয়ে নীচের স্তবককে **বৃতি** (Calyx) এবং তার অংশগুলির প্রত্যেকটিকে **বৃত্যংশ** (Sepal) বলে। কুঁড়ি অবস্থায় ফুলের কোমল অংশকে রক্ষা করাই এর কাজ।

একটি সম্পূর্ণ ফুলের গঠন
চিত্র ৬৭।

বৃতির ভিতরের স্তবককে **দলমণ্ডল** (Corolla) এবং তার প্রত্যেকটি অংশকে **দল** বা **পাপড়ি** (Petal) বলে। পাপড়ির উজ্জ্বল রং এবং সুমিষ্ট গন্ধ কীট-পতঙ্গকে প্রলুব্ধ করে এবং পরোক্ষভাবে পরাগ-সংযোগে সাহায্য করে।

ফুলের তৃতীয় স্তবককে বলা হয় **পুং-কেশর-চক্র** (Andrœcium), এর প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র অংশের নাম **পুং-কেশর** (Stamen)। যে-কোনো একটি পুং-কেশরে একটি **সূত্রের** (Filament) উপর একটি **পরাগধানী** (Anther) এবং তাতে **পরাগ** বা **রেণু** (Pollen) থাকে।
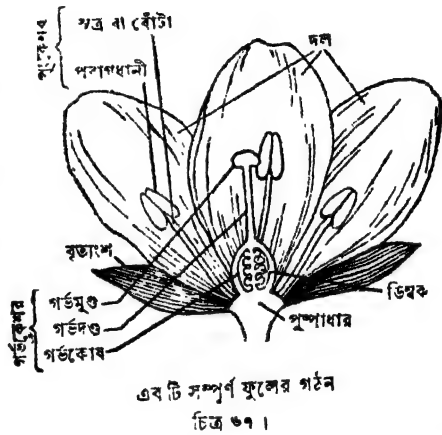
ফুলের চতুর্থ স্তবকের নাম **গর্ভ-কেশর-চক্র** (Gynœcium), এর প্রত্যেকটি অংশের নাম **গর্ভ-কেশর** (Carpel)। প্রত্যেকটি গর্ভ-কেশরের **গর্ভ-মুণ্ড** (Stigma), **গর্ভ-দণ্ড** (Style) এবং **গর্ভ-কোষ** (Ovary) থাকে। গর্ভ-কোষের মধ্যে ছোট ছোট অনেক দানা বা **ডিম্বক** (Ovule) থাকে।

যে ফুলে উপরে বর্ণিত চারটি স্তবকই থাকে, তাকে **সম্পূর্ণ ফুল** (Complete flower) বলা হয়। এর যে-কোন একটি অংশ না থাকলে, তাকে বলে **অসম্পূর্ণ ফুল** (Incomplete flower)।

যে ফুলে পুং-কেশর ও গর্ভ-কেশর দুই-ই থাকে, তাকে **উভয়লিঙ্গ ফুল** (**Bisexual flower**) বলে। সম্পূর্ণ ফুল সব সময়ই উভয়লিঙ্গ। যেমন—জবা, অপরাজিতা ইত্যাদি। কিন্তু শশা, কুমড়া প্রভৃতির ফুল নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে কোনো ফুলে হয় পুং-কেশর নয়তো গর্ভ-কেশর আছে। এরূপ অসম্পূর্ণ ফুলকে **একলিঙ্গ ফুল** (Unisexual flower) বলা হয়। অসম্পূর্ণ ফুলের যেটাতে শুধু পুং-কেশর থাকে, তাকে বলে **পুরুষ-ফুল** (Male flower), আর যেটাতে শুধু গর্ভ-কেশর থাকে, তাকে বলে **স্ত্রী-ফুল** (Female flower)।
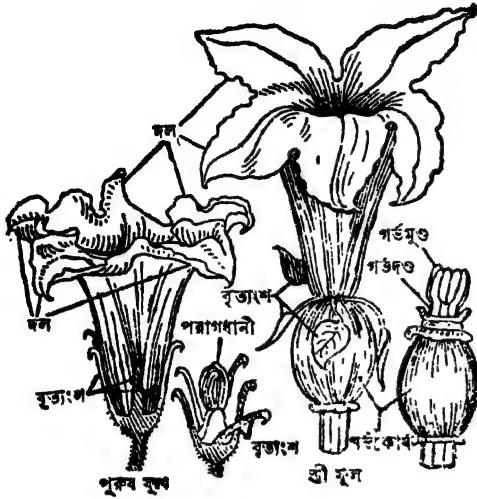
চিত্র ৬৮। মিষ্টি-কুমড়ার ফুল
(অসম্পূর্ণ ফুল, বা একলিঙ্গ ফুল)

ফুলের প্রধান কাজ উদ্ভিদের বংশ-বিস্তারে সাহায্য করা। পুং-কেশর থেকে পরাগ বা রেণু কোনো প্রকারে গর্ভ-কেশরে স্থানান্তরিত হওয়ার নাম পরাগ-সংযোগ (Pollination)। এরূপ
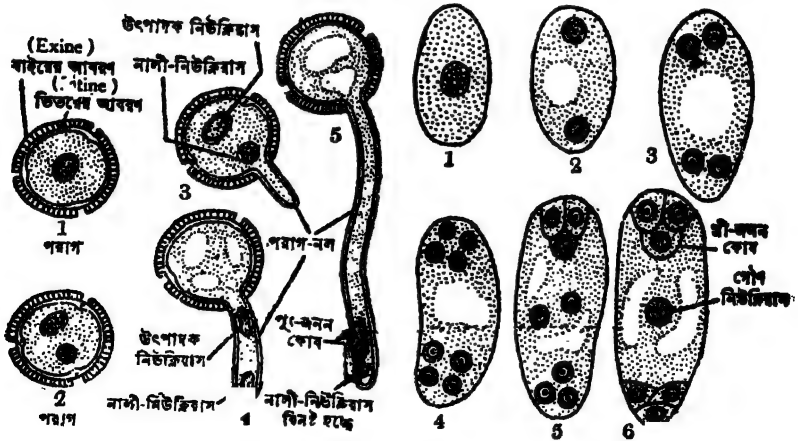
চিত্র ৬৯। পরাগের ক্রম-পরিবর্তন—পরিপুষ্ট পরাগে পুং-জনন-কোষের উৎপত্তি। | চিত্র ৭০। ডিম্বকের ক্রম-পরিবর্তন—ডিম্বকে স্ত্রী-জনন-কোষের উৎপত্তি।

হ'লে ফল ও বীজের সৃষ্টি হয়। পরাগ-সংযোগ না হ'লে ফল ও বীজ হয় না, ফুলটা শুকিয়ে ঝরে যায়। আবার এক-জাতীয় ফুলের পরাগ অন্য জাতীয় ফুলের গর্ভ-মুণ্ডে লাগলেও ফল পাওয়া যায় না। কীট-পতঙ্গ বা জীব-জন্তুর সাহায্যে এবং আরও নানাভাবে পরাগ-সংযোগ হ'তে পারে।

পরাগ বা রেণুর মধ্যে একটিমাত্র কোষ এবং তাতে একটিমাত্র **নিউক্লিয়াস** থাকে। এই কোষের বাইরে দু'টি আবরণ থাকে। পরাগ পরিপুষ্ট হ'লে এই নিউক্লিয়াস দু'ভাগে বিভক্ত হয়—এর একটিকে **উৎপাদক-নিউক্লিয়াস** (Generative nucleus) এবং অন্যটিকে **নালী-নিউক্লিয়াস** (Tube nucleus) বলা হয়। এরূপ পরিপুষ্ট পরাগই গর্ভ-কেশরের গর্ভ-মুণ্ডে স্থানান্তরিত হওয়া প্রয়োজন।

চিত্র ৭১। সপুষ্পক উদ্ভিদে নিষেকের পদ্ধতি

ডিম্বকের মধ্যে যে **ভ্রূণস্থলী** (Embryo-sac) থাকে, তার মধ্যেও একটিমাত্র কোষ এবং একটিমাত্র নিউক্লিয়াস থাকে। এই নিউক্লিয়াস প্রথমে দু'ভাগে বিভক্ত হ'য়ে কোষের দুই প্রান্তে চলে যায়। সেখানে এরা আরও বিভক্ত হ'য়ে চারটি ক'রে মোট আটটি নিউক্লিয়াস উৎপন্ন করে। এরপর প্রত্যেক প্রান্ত থেকে একটি ক'রে নিউক্লিয়াস কোষের মাঝখানে এসে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে **গৌণ-নিউক্লিয়াস** (Secondary nucleus)-এর সৃষ্টি করে। ডিম্বকের ছিদ্রের (Micropyle) দিকে যে তিনটি নিউক্লিয়াস থাকে, তাদের মধ্যে একটি একটু বড় একে বলে **স্ত্রী-জনন-কোষ** বা **ডিম্বাণু** (Female gamete, or egg-cell), অন্য দু'টি এর সহায়ক।

পরিপুষ্ট পরাগ গর্ভ-কেশরে স্থানান্তরিত হ'লে, তার বাইরের আবরণটি ফেটে যায় এবং ভিতরের আবরণটি একটি নলের মতো লম্বা হ'য়ে ক্রমশ ডিম্বকের দিকে এগিয়ে যায়। এর নাম **পরাগ-নল** (Pollen tube)। এই নলের অগ্রভাগে থাকে প্রথমে নালী-নিউক্লিয়াস এবং তার পিছনে উৎপাদক-নিউক্লিয়াস। এদের মধ্যে প্রথমটি ধীরে ধীরে নষ্ট হ'য়ে যায় এবং দ্বিতীয়টি আবার বিভক্ত হ'য়ে দু'টি **পুং-জনন-কোষে** (Male gametes) পরিণত হয়। পরাগ-নলটি এগিয়ে যেতে

নাম **নিষিক্তকরণ** (Fertilization) বা নিষেক। এর ফলে ডিম্বক একটি বীজে পরিণত হয়। এভাবে ফুল তার সর্বপ্রধান কাজটি সম্পাদন করে। এরপর ফুলের বৃতি, পাপড়ি ইত্যাদি শুকিয়ে ঝরে যায় এবং ফুল থেকে ফলের সৃষ্টি হয়। ফলের মধ্যে বীজটি সুরক্ষিত অবস্থায় থাকে।

নিষিক্তকরণের সময় গৌণ পুং-জনন-কোষটি ভ্রূণস্থলীর মাঝখানে গৌণ নিউক্লিয়াসের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে একটি **সস্য-নিউক্লিয়াসের** (Endosperm nucleus) সৃষ্টি করে। ইহাই ক্রমাগত বিভক্ত হ'য়ে বীজের **সস্য** (Endosperm) উৎপন্ন করে। বীজের অঙ্কুরোদ্গমের সময় যে খাদ্য প্রয়োজন হয়, তা এরই মধ্যে সঞ্চিত থাকে।

১৮৭৯ সালে হের্টউইগ এবং ফল নামক দু'জন জার্মান গবেষক প্রাণীর বেলায় নিষিক্তকরণের পদ্ধতি সর্বপ্রথম অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের নীচে পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁরা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পেলেন যে, সী-আর্চিন (Sea urchin)-এর ডিম্বাণুর মধ্যে একটি শুক্রাণু, এবং মাত্র একটিই, প্রবেশ করে। ডিম্বাণুটি একটি নতুন প্রাণীতে বিকাশ লাভ করার প্রথম লগ্নেই এরূপ ঘটে থাকে। এরই নাম নিষিক্তকরণ (Fertilization) বা নিষেক। আমরা এখন জানি যে, যে-সব প্রাণী যৌন-পদ্ধতিতে বংশ-বিস্তার করে, তাদের সকলের ক্ষেত্রেই একথা সত্য।
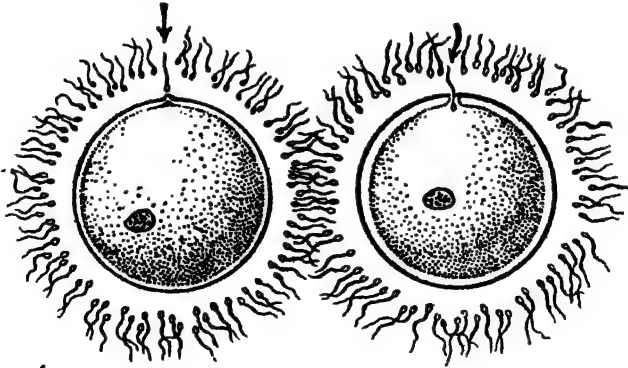
চিত্র ৭৩। জলের মধ্যে ষ্টারফিস্ (Starfish) বা তারামাছের ডিম্ব-কোষের (বা, ডিম্বাণুর) নিষেক। প্রতিটি ডিম্ব-কোষ জলের মধ্যে এমন একটি রসদ্রব্য ছড়িয়ে দেয়, যা দ্বারা অসংখ্য শুক্রাণু (Sperm) তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু একটিমাত্র শুক্রাণু ডিম্বকোষের প্রাচীর ভেদ ক'রে ঢুকতে পারে। সেই মুহূর্তে শুক্রাণু তার লেজটি হারায়। আর সঙ্গে সঙ্গে ডিম্ব-কোষের চারিদিকে এমন একটি আবরণ সৃষ্টি হয়ে যায়, যার ফলে আর কোন শুক্রাণু সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। এরপর পুং নিউক্লিয়াস স্ত্রী-নিউক্লিয়াসের সঙ্গে মিলিত হয়।

এই প্রসঙ্গে হগ্‌বেন বলেছেন,—"As we now use the terms, an animal that produces eggs is a *female*. An animal that produces sperm is a *male*. The eggs are produced in masses, which are called *ovaries*, within the body of the female. The sperm are produced in a slimy secretion, the seminal fluid, by organs known as testes. Collectively ovaries and testes are referred to as gonads.

In some animals such as snails, human beings and birds, the seminal fluid is introduced into the oviduct of the female and the egg is fertilized inside the female body. The male of many land animals has a special organ, the penis, which is used to introduce the seminal fluid into the body of the female.
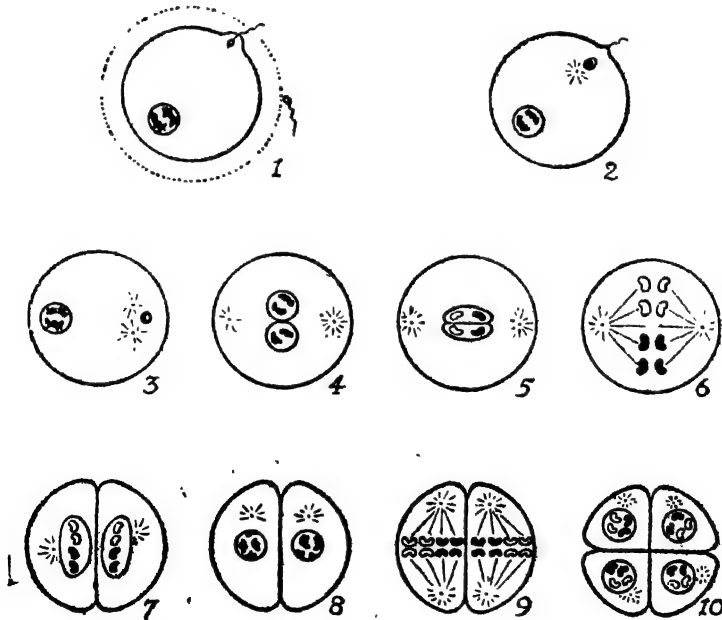
চিত্র ৭৪। ডিম্ব-কোষের নিষেক এবং প্রথম দুই দফার কোষ-বিভাজন। [উল্লেখ্য, এই প্রজাতির কোষে চারটি ক'রে ক্রোমোসোম থাকে—দু'টি পাওয়া যায় পুং-জনন-কোষ থেকে, আর দু'টি পাওয়া যায় স্ত্রী-জনন-কোষ থেকে।] 1. একটি শুক্রাণু ডিম্ব-কোষের প্রাচীর ভেদ ক'রে ঢুকে পড়ল, এবং সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি আবরণ সৃষ্টি হ'ল, যা ভেদ করা আর কোন শুক্রাণুর পক্ষে সম্ভব নয়; 2—3. পুং-নিউক্লিয়াস ক্রমশ স্ফীতকায় হয়; 4—5. পুং-নিউক্লিয়াস এবং স্ত্রী-নিউক্লিয়াসের মিলন ঘটল; 6—10. মিলনের পর প্রথম দুই দফার কোষ-বিভাজন সংঘটিত হ'ল।
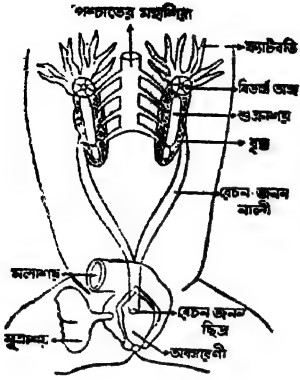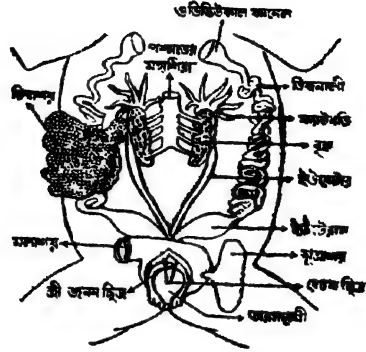
চিত্র ৭৫। ব্যাঙের রেচন-জনন-তন্ত্র

1. নিষিক্ত ডিম ; 2, 3, 4, 5, ব্যাঙাচির বিভিন্ন রূপ, 6. পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙ
[উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে জীবদেহের বাইরে (জলের মধ্যে) ।]

চিত্র ৭৬
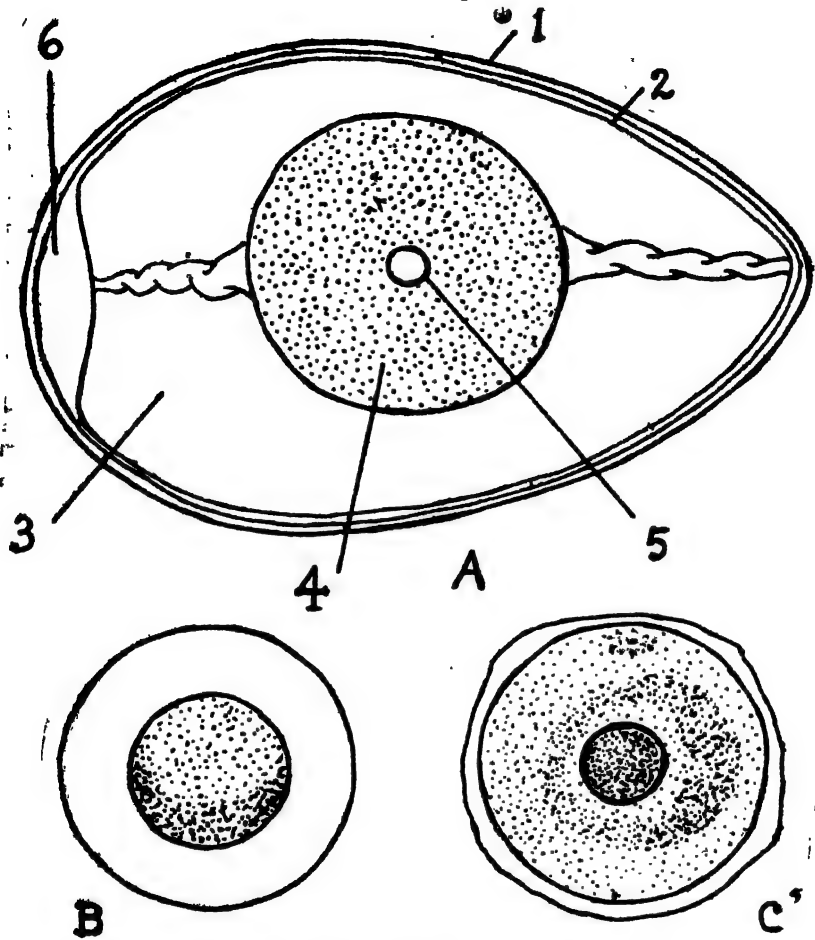
চিত্র ৭৭। কয়েক প্রকার স্ত্রী-জনন-কোষ (Egg cells) (স্কেলমত নয়)।

A. মুরগির ডিম (স্ত্রী-জনন-কোষ)—

1. চুনময় খোলক (Calcareous shell),
2. খোলক-সংলগ্ন ঝিল্লী (Shell-membrane),
3. সাদা অংশ, বা অ্যালবুমেন (Albumen),
4. হলুদ অংশ, বা কুসুম (Yolk),
5. বিকাশোন্মুখ চাকতি (Germinal disc),
6. বায়ুপূর্ণ স্থান (Air space)।

B. ব্যাঙের ডিম্ব-কোষ, বা ডিম্বাণু। C. মানুষের ডিম্ব-কোষ, বা ডিম্বাণু।

[উল্লেখ্য যে, ডিম্বাণু বৃহত্তম কোষ, পক্ষান্তরে শুক্রাণু ক্ষুদ্রতম কোষ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, মানুষের বেলায় একটি ডিম্বাণু শুক্রাণুর চেয়ে ৮০,০০০ গুণ বড়। আর মুরগির ডিম (এ ক্ষেত্রে স্ত্রী-জনন-কোষ, বা ডিম্বাণু) পুং-জনন-কোষ থেকে প্রায় এক লক্ষ গুণ বড়।]
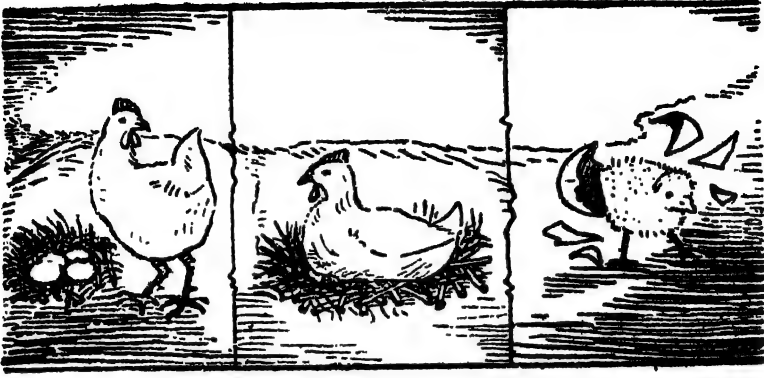
চিত্র ৭৮। স্ত্রী-মুরগি ডিম পাড়ে, তারপর ঐ ডিমের উপরে বসে তা' দেয়। নিষিক্ত ডিম হ'লে, কয়েক দিন পরে ঐ ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়।
[উল্লেখ্য, এ ক্ষেত্রে বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে জীবদেহের বাইরে (ডাঙ্গায়)।]
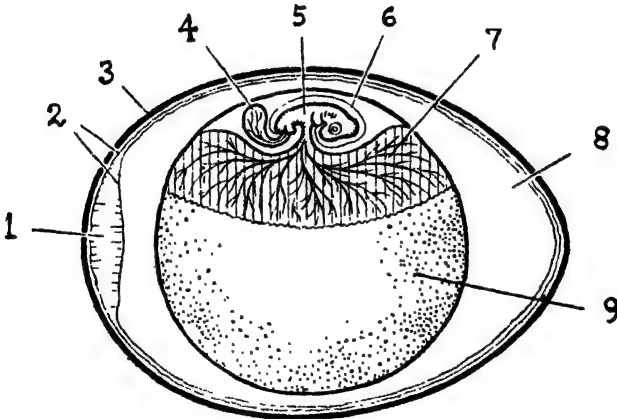
চিত্র ৭৯। মুরগির ডিম—নিষেকের পাঁচদিন পরে।

1. বায়ুপূর্ণ স্থান (Air space), 2. ঝিল্লী (Membrane), 3. খোলক বা খোলা (Shell), 4. অ্যালানটইস (Allantois), 5. ভ্রূণ (Embryo), 6. অ্যাম্নিয়ন (Amnion), 7. কুসুম থেকে খাদ্য আহরণে সক্ষম রক্তবহা নালী-সমৃদ্ধ অংশ (Area rich in blood vessels drawing from yolk), 8. শ্বেতাংশ, বা অ্যালবুমেন (Albumen), 9. হলুদ অংশ, বা কুসুম (Yolk)।
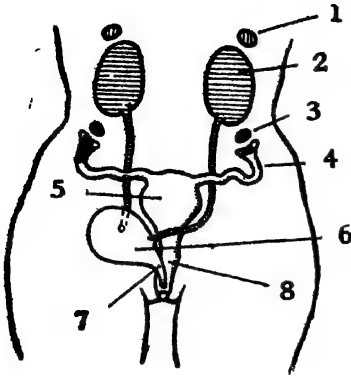
(স্ত্রী)

1. অ্যাড্রিন্যাল-গ্রন্থি (Adrenal gland),
2. বৃক্ক (Kidney),
3. ডিম্বাশয় (Ovary),
4. ডিম্বাণু-বাহক নল (Fallopian tube, or oviduct),
5. জরায়ু (Uterus),
6. মূত্রাশয় (Urinary bladder),
7. মূত্রনালী (Urethra),
8. যোনি (Vagina),

(পুরুষ)
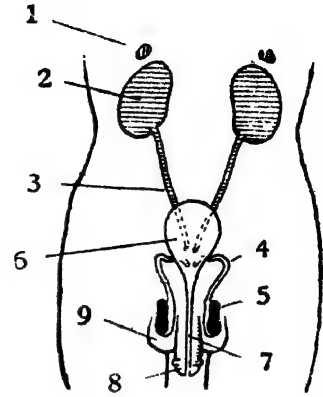
1. অ্যাড্রিন্যাল-গ্রন্থি (Adrenal gland),
2. বৃক্ক (Kidney),
3. গবিনী, বা মূত্রকা (Ureter),
4. শুক্র-বাহক নল (Vas deferens),
5. শুক্রাশয় (Testes),
6. মূত্রাশয় (Urinary bladder),
7. মূত্রনালী (Urethra),
8. শিশ্ন (Penis),
9. মুষ্ক বা অণ্ডকোষ (Scrotum) ।

চিত্র ৮০ । মানুষের রেচন-জনন-তন্ত্র ।
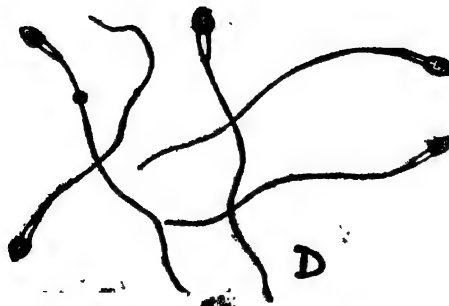
চিত্র ৮১ । মানুষের কয়েকটি শুক্রাণু ।
(বিবর্ধিত)

The frog and the fowl do not possess one. Many marine animals (e.g. oysters, star-fishes, marine worms, sea-anemones) shed both eggs and seminal fluid into the sea. There is no act of sexual union between the two parents themselves."
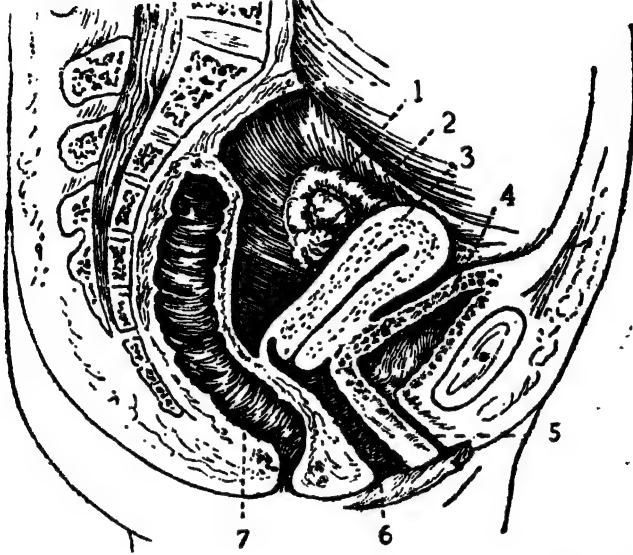
চিত্র ৮২। স্ত্রীলোকের রেচন-জনন-তন্ত্র (লম্বচ্ছেদ—এক পাশ থেকে যেমন দেখা যায়)—
1. ডিম্বাণু-বাহক নল (Fallopian tube, or oviduct), 2. ডিম্বাশয় (Ovary), 3. জরায়ু (Uterus), 4. মূত্রাশয় (Urinary bladder), 5. মূত্রনালী (Urethra), 6. যোনি (Vagina), 7. মলনালী (Rectum)।
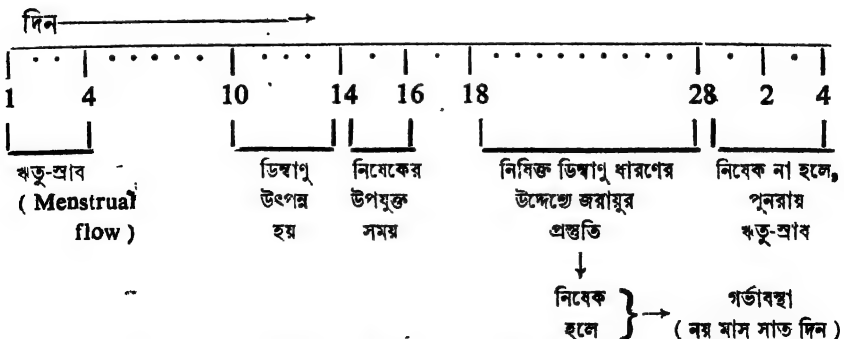
চিত্র ৮৩। **স্ত্রীলোকের ঋতু-চক্র (Menstrual cycle)**

উল্লেখ্য যে, যৌন-জননের জন্যে স্ত্রী ও পুরুষের নিকট সান্নিধ্য প্রয়োজন। তাতেই ডিম্বাণুর সঙ্গে শুক্রাণুর মিলন সুনিশ্চিত হয়। একটি ডিম্বাণুকে একটিমাত্র শুক্রাণু বিদ্ধ করে। সেই মুহূর্তে শুক্রাণু তার লেজটি হারায়। কেবলমাত্র নিউক্লিয়াস নিয়ে তা ডিম্বাণুর ভিতরে প্রবিষ্ট হয়। এইভাবে শুক্রাণুর এবং ডিম্বাণুর মিলনের ফলে যে নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষের উদ্ভব হয় তাকে ভ্রূণাণু (Zygote) বলে।
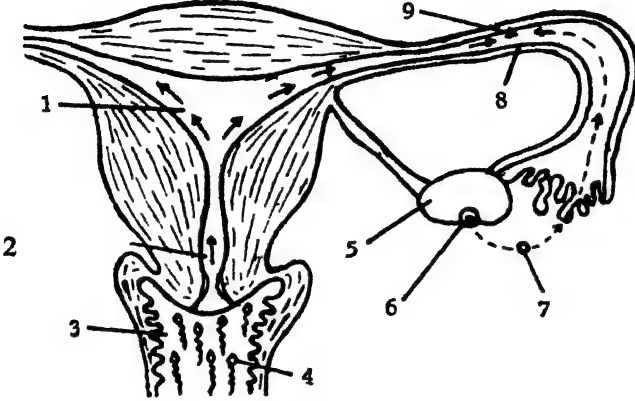
চিত্র ৮৪। স্ত্রীলোকের জরায়ুতে ডিম্বাণুর নিষেক। 1. জরায়ু (Uterus), 2. জরায়ুর গ্রীবা (Cervix), 3. যোনি (Vagina), 4. কয়েকটি শুক্রাণু (Spermatozoa), 5. ডিম্বাশয় (Ovary), 6. বিদীর্ণ গ্রাফিয়ান ফলিকল্ (Ruptured Graafian follicle)—ডিম্বাণুর নিষ্ক্রমণ, 7. একটি পরিপুষ্ট ডিম্বাণু (Ovum), 8. ডিম্বাণু-বাহক নল (Fallopian tube, or Oviduct), 9. এই স্থানে নিষেক সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ শুক্রাণু এসে ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হয়। নিষিক্ত ডিম্বাণু (বা, ভ্রূণাণু) জরায়ুতে এসে আশ্রয় নেয়।

ফুল বা অমরা

অ্যামনিওটিক গহ্বর

নাড়ী

জরায়ু
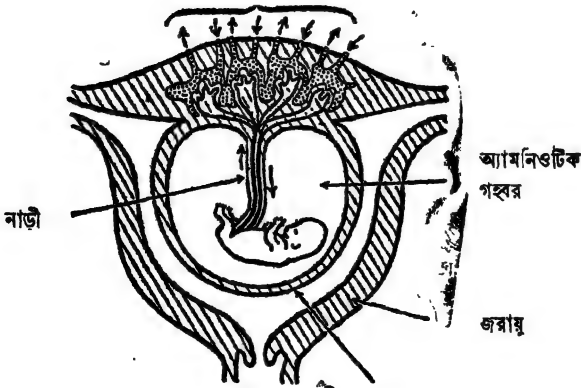
ভ্রূণ-আচ্ছাদনকারী ঝিল্লী

চিত্র ৮৫। মাতৃগর্ভে, জরায়ুর মধ্যে, ভ্রূণের অবস্থান—নিষেকের প্রায় দু'মাস পরে।

এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু এদের প্রত্যেকের ক্রোমোসোম-সংখ্যা স্বাভাবিক দ্বিগুণ সংখ্যার (অর্থাৎ, 2x-এর) ঠিক অর্ধেক (অর্থাৎ, x) থাকে। সুতরাং, উপরিউক্ত নিউক্লিয়াস দু'টি যখন পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন আবার দ্বিগুণ সংখ্যক (অর্থাৎ, x+x=2x) ক্রোমোসোমধারী একটি স্বাভাবিক কোষ উৎপন্ন হয়। নবজাত এই কোষ [একে সাধারণতঃ জাইগোট (Zygote) বা ভ্রূণাণু বলা হয়] বহুবার বিভক্ত হয়। এর ফলে একটি ভ্রূণ জন্মে, এবং কালক্রমে তা একটি পূর্ণাঙ্গ জীবদেহে পরিণত হয়।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, একটি জীবের প্রতিটি কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা অভিন্ন। সন্তানের জন্মকালে এর অর্ধেক পিতৃপক্ষ থেকে, এবং বাকি অর্ধেক মাতৃপক্ষ থেকে, পাওয়া যায়। এজন্য সন্তানের কোষের ক্রোমোসোম-সংখ্যাও পিতা বা মাতার সমান থাকে।

চিত্র ৮৬। মাতৃগর্ভে, জরায়ুর মধ্যে, ভ্রূণের অবস্থান—প্রসবের স্বল্পকাল পূর্বে।
[উল্লেখ্য, মানুষের বেলায় ভ্রূণের বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে মাতৃগর্ভে, জরায়ুর মধ্যে।]

বৃদ্ধি ও বিকাশ :

পরিস্ফুরণ বা বিকাশ ঘটে প্রধানতঃ দু'রকম ভাবে—(১) প্রাণিদেহের বাইরে এবং (২) প্রাণিদেহের মধ্যে।

মাছ, ব্যাঙ, প্রভৃতি জলের মধ্যে হাজার-হাজার ডিম পাড়ে। নিষিক্ত হওয়ার পরে, ওই ভ্রূণ প্রাণিদেহের বাইরে জলের মধ্যে বড় হয়। এসব ক্ষেত্রে অসংখ্য প্রাণীর জন্ম হলেও শৈশবেই অনেকেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হওয়ার সুযোগ পায় না। তবুও যতগুলি শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকে তাই প্রাণীটির বংশরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। এক্ষেত্রে জনিতৃ-যত্নের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

সরীসৃপ ডাঙ্গায় অল্প-সংখ্যক ডিম পাড়ে। এরূপ ডিমে শক্ত খোলস থাকে। নিষিক্ত ডিম হলে, নির্দিষ্ট সময় পরে, সেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। এক্ষেত্রেও বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে প্রাণিদেহের বাইরে। এদের বেলায়ও জনিতৃ-যত্নের বিশেষ কোনো ভূমিকা নেই। প্রকৃতিই তাদের একমাত্র সহায়।

পাখিও অল্প-সংখ্যক ডিম পাড়ে। নিষিক্ত ডিম হ'লে, সেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। কিন্তু এক্ষেত্রে ডিমগুলি নির্দিষ্ট সময় ধরে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রাখা প্রয়োজন। এজন্য নির্দিষ্ট সময় ধরে ডিমে তা' দিতে হয় (incubation), তবেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। তাছাড়া মা-পাখি বাচ্চাদের শৈশবে আহার যোগায়। এক্ষেত্রে জনিতৃ-যত্নের (Parental care) বিশেষ ভূমিকা আছে।
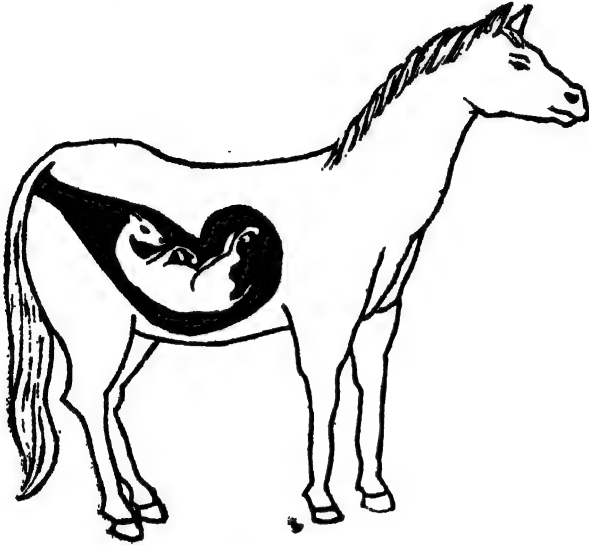
চিত্র ৮৭। ঘোটকীর জরায়ুর মধ্যে ভ্রূণের অবস্থান।
[উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রেও বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে মাতৃগর্ভে, জরায়ুর মধ্যে।]

কিন্তু স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বেলায় ভ্রূণ মাতৃগর্ভে (জরায়ুর মধ্যে) ধীরে ধীরে বড় হয়, এবং নির্দিষ্ট সময় পরে, একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাণীরূপে ভূমিষ্ঠ হয়। এর ফলে তার বৃদ্ধি ও বিকাশ সুনিশ্চিত হয়। তবে শুধু সন্তানের জন্ম হলেই তো চলবে না। শৈশবে তাকে লালন-পালন করতে হয়, আপদে-বিপদে রক্ষা করতে হয়। সুতরাং, এসব ক্ষেত্রেও জনিতৃ-যত্নের বিশেষ ভূমিকা আছে।

এইভাবে নানাদেশের বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত সাধনার ফলে জীবের জন্ম ও বিকাশ সম্পর্কে অনেক তথ্য এবং তত্ত্ব ক্রমশঃ জানা গেছে। ক্রমবিকাশের ধারায় মাছ, ব্যাঙ, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ীদের মধ্যে সন্তানের জন্ম এবং সুরক্ষার যে ক্রমোন্নতি ঘটেছে, তা উপলব্ধি ক'রে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বংশগতি

বংশগতি সম্পর্কে মেণ্ডেলের মতবাদ :

বংশগতি (বা, বংশানুসৃতি) (Heredity) সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে প্রথমেই বলতে হয়, একটি জীব তার নিজের মত জীবেরই সৃষ্টি করে। যেমন—কুকুর কুকুরের এবং বিড়াল বিড়ালেরই জন্ম দেয়, অন্য কিছু নয়। কিন্তু একটি কুকুরের যদি চারটি বাচ্চা হয়, সেগুলি সবই কুকুরের বাচ্চা হলেও তাদের মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য কিছু না-কিছু থাকেই। চারটি বাচ্চা কখনও সর্বতোভাবে একই রকম হতে পারে না। জীব-বিজ্ঞানের এই অধ্যায় সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা শুরু করেন অস্ট্রীয়ান ধর্মযাজক মেণ্ডেল (Abbe Mendel)। ১৮৬৫-৬৬ সালের মধ্যে এ বিষয়ে অনেক মূল্যবান তথ্য তিনি লিপিবদ্ধ করেন।

চিত্র ৮৮। অস্ট্রীয়ান ধর্মযাজক গ্রেগর যোহান মেণ্ডেল।

অ্যাবে মেণ্ডেল বংশগতি সম্পর্কে গবেষণার সূত্রপাত করেন মটর গাছ নিয়ে। বিজ্ঞানী মেণ্ডেল যদিও তাঁর গবেষণার ফলাফল ১৮৬৬ সালের মধ্যেই প্রচার করেন, তবু তখন পর্যন্ত এদিকে কারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নি। কারণ, বংশগতি সম্পর্কে তখন কারও কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পরে, হিউগো ড্য ভ্রিস্ (Hugo de Vries), কার্ল কোরেন্স

(Carl Correns) এবং এরিক ৎসেরম্যাক (Erich Tschermack) প্রমুখ বিজ্ঞানীরা স্বাধীনভাবে বিভিন্ন গবেষণা ক'রে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, যা মেণ্ডেল ইতিপূর্বেই বলেছিলেন। খুবই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এঁরা সকলেই গবেষণা শেষ করার পরে মেণ্ডেলের নিবন্ধ পাঠ করেছিলেন। যাই হোক, এঁদের গবেষণার বিবরণ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হ'ল। তখন এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধানের জন্যে পুঁথিপত্র ঘাঁটতে গিয়ে মেণ্ডেলের গবেষণার বিষয় সব জানা গেল। তাই এই মূল্যবান আবিষ্কারের কৃতিত্ব এবং স্বীকৃতি মিললো বিশ বছর আগে লোকান্তরিত বিজ্ঞানী মেণ্ডেল-এর। আর এই নতুন তত্ত্বের নাম দেওয়া হ'ল মেণ্ডেলবাদ (Mendelism)।†

এখানে মেণ্ডেলের মতবাদ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল।

মেণ্ডেল পরীক্ষা শুরু করেন দু'জাতের মটরগাছ নিয়ে—একটি লম্বা (Tall) এবং অন্যটি বেঁটে (Dwarf)। তিনি কিছু লম্বা এবং কিছু বেঁটে গাছের ফুল থেকে, কুঁড়ি অবস্থায়ই, তাদের পরাগধানীগুলি কেটে বাদ দিলেন। পরে লম্বা গাছের পরাগ (বা, রেণু) বেঁটে গাছের গর্ভ-কেশরে, অপরদিকে বেঁটে গাছের পরাগ (বা, রেণু) লম্বা গাছের গর্ভ-কেশরে লাগিয়ে পরাগ-সংযোগ (Pollination) ঘটালেন। এর ফলে দু'রকম গাছেই মটরশুঁটি হ'ল। এই দু'রকম গাছের মটরশুঁটি থেকে বীজ সংগ্রহ ক'রে যখন মাটিতে বোনা হ'ল, তখন দেখা গেল, সব গাছই লম্বা হয়েছে। মেণ্ডেল এই সব লম্বা গাছকে বললেন, প্রথম জনির (Generation) (বা, প্রজন্মের) গাছ (F_1)।

এবার প্রথম জনির (বা, প্রজন্মের) (F_1) দু'টি লম্বা গাছের মধ্যে একই উপায়ে পরাগ-সংযোগ ঘটানো হ'ল। কিন্তু এবারে আরও আশ্চর্যজনক ফল পাওয়া গেল। এবারের গাছকে বলা হ'ল, দ্বিতীয় জনির (বা, প্রজন্মের) গাছ (F_2)। মেণ্ডেল দেখলেন, দ্বিতীয় জনির (বা, প্রজন্মের) গাছের মধ্যে লম্বা ও বেঁটে এই দু'রকম গাছই আছে। শুধু যে আছে, তাই নয়, তারা একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে আছে। বার বার পরীক্ষা ক'রে তিনি দেখলেন, এই অনুপাত নিম্নরূপ—

লম্বা : বেঁটে = ৩ : ১

† মর্গান বলেছেন—'মেণ্ডেল মঠোদ্যানে দশ বছর উদ্ভিদ্ নিয়ে গবেষণা ক'রে যে সাফল্য অর্জন ক'রেছিলেন, জীব-বিজ্ঞানের বিগত ৫০০ বছরের ইতিহাসে তা শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কার।'
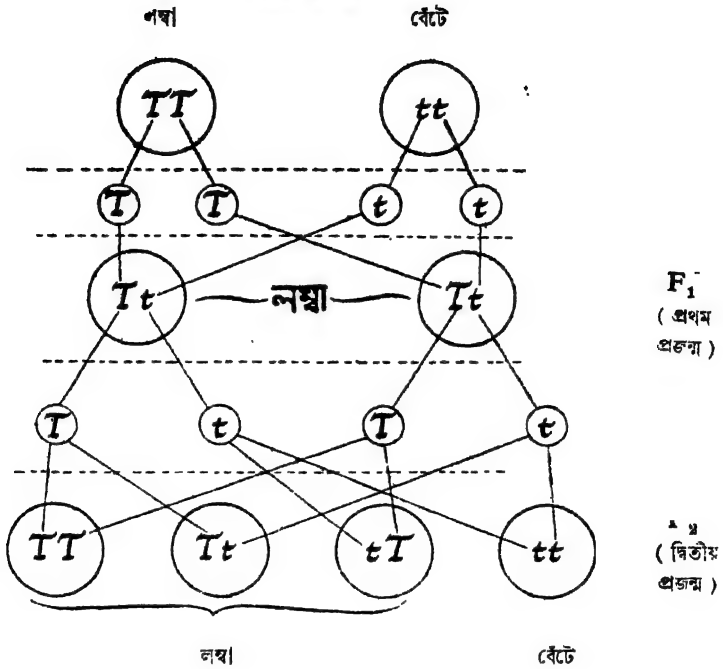
চিত্র ৮৯। মটরগাছের বেলায় বংশগতির নিয়ম। (মেণ্ডেলের পরীক্ষা)

এরূপ ফল পেয়ে তিনি প্রথম জনির (বা, প্রজন্মের) (F_1) গাছকে বর্ণ-সংকর (Hybrid) বললেন। তাঁর মতে, এদের মধ্যে লম্বা এবং বেঁটে উভয় প্রকার গুণ (বা, উৎপাদক) (Factor)-ই আছে।* কিন্তু লম্বা হওয়ার জন্যে যে গুণটি দায়ী তা প্রকট (Dominant) এবং সহজেই বেঁটের গুণকে প্রভাবাধীন ক'রে রাখে, তাই গাছটি লম্বা হয়। এর মধ্যে যে বেঁটের গুণ আছে তা প্রচ্ছন্ন (Recessive)। তবে সুযোগ পেলেই তা আবার প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে, তার উত্তর পুরুষের মধ্যে।

এই তথ্যটি বোঝাবার জন্যে তিনি বলেন, প্রতিটি গুণ প্রকাশ করার জন্যে

---

* এই গুণের জন্যে যে (gene)-ই দায়ী, তা তখন কেউই জানতেন না। মেণ্ডেল এই গুণের নাম দেন 'ফ্যাক্টর' (factor) বা উৎপাদক। পরবর্তীকালে জানা গেছে, এক-এক রকম জিন এক-এক রকম 'ফ্যাক্টর' (factor) বা উৎপাদক-এর জন্য দায়ী।

জীবদেহে দু'টি, করে নির্ধারক (Determinant) থাকে।† তিনি লম্বা ও বেঁটে গাছের নির্ধারকের নাম দিলেন যথাক্রমে TT ও tt. জীবদেহে যে জনন-কোষ (gamete) তৈরি হয়, তাতে এই নির্ধারক পৃথক হয়ে যায় (segregation= অন্তরণ), আর প্রতিটি জনন-কোষে তখন একটিমাত্র নির্ধারক থাকে। যেমন, TT বির্ধারকধারী গাছের জনন-কোষে থাকে কেবল T, আর tt নির্ধারকধারী গাছের বেলায় থাকে শুধু t. মেণ্ডেলের গবেষণার ফলাফল ৮৯নং চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যায়, দ্বিতীয় জনির (বা, প্রজন্মের) (F_2) গাছের মধ্যে শতকরা ৭৫টি লম্বা এবং ২৫টি বেঁটে। তবে এদের মধ্যে শতকরা ২৫টি প্রকৃত লম্বা, ৫০টি লম্বা কিন্তু বর্ণ-সংকর, আর ২৫টি প্রকৃত বেঁটে। এই মেণ্ডেলবাদের উপর ভিত্তি করেই বর্তমানকালের বংশগতি সম্পর্কিত বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে।

[এখানে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন। একটি জীবের (উদ্ভিদের বা প্রাণীর) আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বলতে বোঝায় তার বাহ্যসত্তা (Phenotype)। আর যে-সব জিন (Gene) বা বংশাণু দ্বারা বংশ-পরম্পরায় ঐসব বাহ্যসত্তার প্রকাশ এবং পরিবহণ নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকে বলা হয় জিনসত্তা (Genotype)।

মেণ্ডেলের পরীক্ষায়, প্রথম জনির (বা, প্রজন্মের) (F_1) বিষমভ্রূণাণুজাত (Heterozygous) গাছের জিনসত্তা Tt. সুতরাং, জিনসত্তার নিরীখে, এই গাছ সমভ্রূণাণুজাত (Homozygous) গাছ (যার জিনসত্তা TT) থেকে পৃথক্ ছিল, যদিও বাহ্যসত্তা অনুযায়ী তাদের মধ্যে সাদৃশ্য ছিল, অর্থাৎ এগুলি সবই ছিল লম্বা।

বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে T-নির্ধারকটি প্রকট (dominant) এবং t-নির্ধারকটি প্রচ্ছন্ন (recessive)।]

বংশগতি সম্পর্কে আধুনিক ধারণা :

প্রতিটি প্রাণী-বিজ্ঞানীই এখন একথা বিশ্বাস করেন যে, সন্তান তার লিঙ্গ (অর্থাৎ, সে স্ত্রী বা পুরুষ—কি হবে ?) এবং অন্যান্য গুণাগুণ সবই উত্তরাধিকার সূত্রে সে পিতামাতার কাছ থেকেই অর্জন করে। এর কারণ কি ?

---

† নির্ধারক এখন জিন (gene) বা বংশাণু নামে পরিচিত। কতকগুলি জিন সমন্বয়ে তৈরি হয় ক্রোমাটিড (chromatid). আবার দু'টি ক'রে ক্রোমাটিড (chromatid) একত্রিত হয়ে ক্রোমোসোম (chromosome) সৃষ্টি করে। ক্রোমোসোম-ই হল বংশগতির ধারক ও বাহক। এজন্যে প্রতিটি ক্ষেত্রেই অন্তত দু'টি ক'রে জিন বা নির্ধারক থাকে।

এ সম্পর্কে গবেষণার সূত্রপাত করেন নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন বিজ্ঞানী—মরগ্যান, মূলার এবং ব্রিজেস, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে। এজন্যে তাঁরা ড্রসোফিলা নামক একপ্রকার মাছি বেছে নেন।

শক্তিশালী অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে, স্ত্রী-ড্রসোফিলার কোষ-মধ্যস্থ নিউক্লিয়াসে থাকে চার জোড়া ক্রোমোসোম। এদের মধ্যে তিন জোড়া আকারে বড়, কিন্তু সে তুলনায় চতুর্থ জোড়া অনেক ছোট। প্রত্যেক
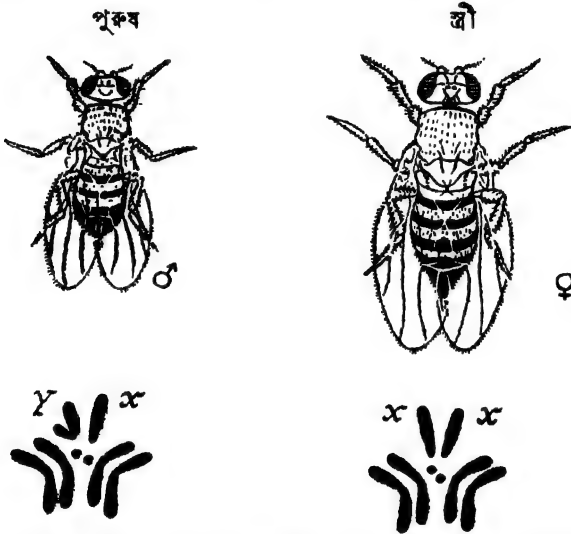
চিত্র ২০। ড্রসোফিলা মাছির কোষ-মধ্যস্থ নিউক্লিয়াসে থাকে চার জোড়া ক্রোমোসোম। যেটিতে (X, Y)-ক্রোমোসোম থাকে, সেটি পুরুষ। আর যেটিতে (X, X)-ক্রোমোসোম থাকে, সেটি স্ত্রী।

জোড়ার ক্রোমোসোম দু'টির মধ্যে সাদৃশ্য এতো বেশী যে, তাদের মধ্যে পার্থক্য বোঝা খুবই কঠিন। কিন্তু পুং-ড্রসোফিলার বেলায় তা নয়। এক্ষেত্রে তিন জোড়া ক্রোমোসোম ঐরকম। কিন্তু মাঝারি আকারের দু'টি ক্রোমোসোমের মধ্যে পার্থক্য খুব স্পষ্ট। একটি অন্যটির চেয়ে একটু লম্বা, এবং মাথার দিকে একটু বাঁকানো। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে এরকম পার্থক্য সবসময়ই লক্ষ্য করা যায়। আর বলা বাহুল্য যে, এই ক্রোমোসোমই স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে নির্ধারক (Determinant)-এর কাজ করে। সোজা ক্রোমোসোমটিকে X-অক্ষর দিয়ে এবং বাঁকাটিকে Y-অক্ষর দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। সুতরাং, যেটিতে XX-ক্রোমোসোম থাকবে, সেটি স্ত্রী হবে ; আর যেটিতে XY-ক্রোমোসোম থাকবে, সেটি পুরুষ হবে।

এখন ধরা যাক, মাতার X-ক্রোমোসোমে এমন কোন নির্ধারক (W) আছে, যা প্রকট (Dominant), এবং ওই মাছির চোখের রং নির্ণয়ে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। বলা বাহুল্য, পিতার X-ক্রোমোসোমে এই নির্ধারকটি (w) প্রচ্ছন্ন (Recessive)।
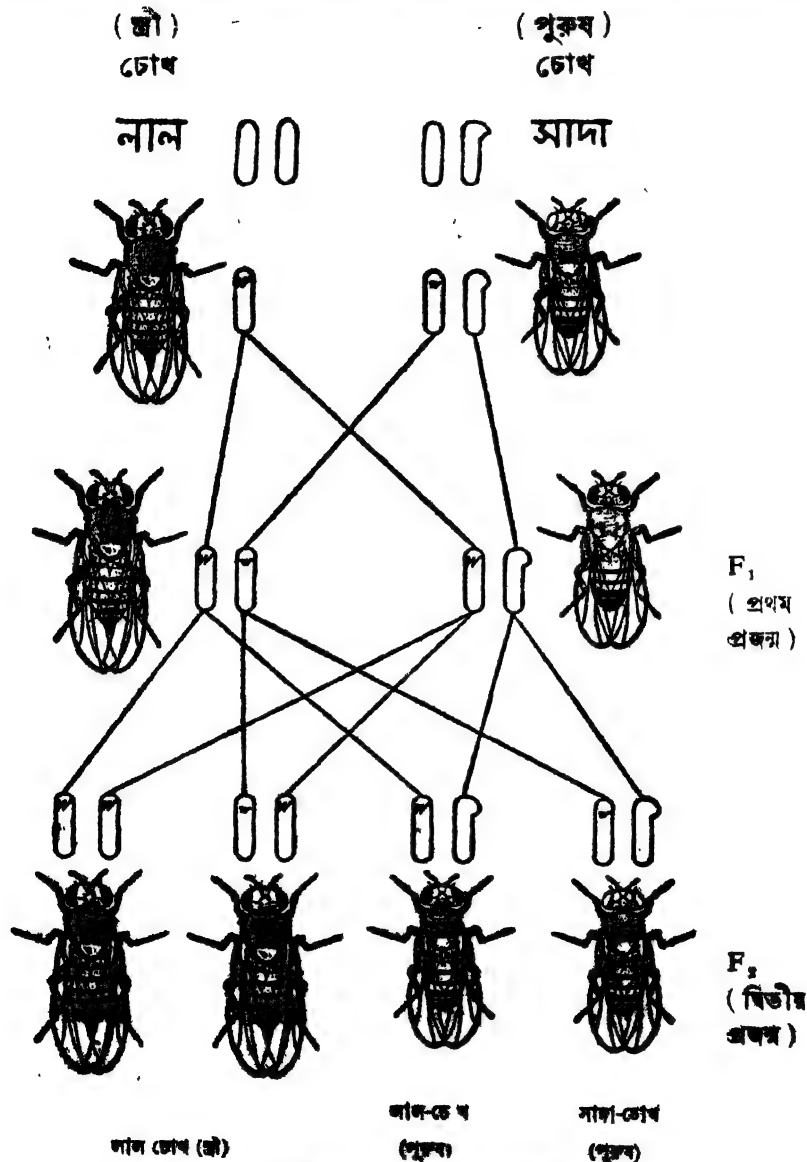
চিত্র ৯১। ড্রসোফিলা মাছির বেলায় বংশগতির নিয়ম।

লাল-চোখ স্ত্রী এবং সাদা-চোখ পুরুষ মাছির মিলনের ফলে উদ্ভূত প্রথম জনিতে (বা, প্রজন্মে) (F_1) বর্ণ-সংকর দু'রকম মাছিই (স্ত্রী ও পুরুষ) লাল-চোখ হবে। কারণ, প্রত্যেকেই লাল-চোখ মাতার নিকট থেকে প্রকট (W) নির্ধারক-সম্পন্ন K-ক্রোমোসোম পেয়েছে। এদের মিলনের ফলে উদ্ভূত দ্বিতীয় জনিতে (বা, প্রজন্মে) (F_2) চার রকম মাছি পাওয়া যাবে, তাদের মধ্যে তিনটির চোখ লাল এবং একটির সাদা। এদের মধ্যে আবার দু'টি স্ত্রী এবং দু'টি পুরুষ হবে। আর শুধু পুরুষের মধ্যেই পাওয়া যাবে সাদা-চোখ মাছি। কারণ, কেবলমাত্র এইটিই প্রকট (W নির্ধারক-সম্পন্ন X-ক্রোমোসোম পায় নি।

এইভাবে মেণ্ডেলবাদ পুরোপুরি সমর্থিত হ'ল আধুনিক প্রজননবিদ্যার (Genetics) সাহায্যে। এ থেকেই আন্দাজ করা যায়, কোন জীবের মধ্যে হঠাৎ নতুন কোন বিশেষত্বের আবির্ভাব হলে, বংশগতি অনুযায়ী তা কিভাবে উত্তর জনিতে (বা, প্রজন্মে) সঞ্চালিত হয়, এবং তাদের আকৃতি ও প্রকৃতি প্রভাবিত করে।

মানুষের বংশগতি-সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ

মানুষের বেলায় ক্রোমোসোমের সংখ্যা ৪৬; অর্থাৎ, আমাদের দেহের প্রতিটি কোষের নিউক্লিয়াসে ২৩ জোড়া ক'রে ক্রোমোসোম থাকে। এই ২৩ জোড়ার মধ্যে ২২ জোড়ার ক্ষেত্রেই স্ত্রী ও পুরুষে মোটামুটি একই প্রকার। এদের বলা হয় অটোসোমস (Autosomes)। স্ত্রীলোকের ২৩-তম জোড়ার ক্ষেত্রেও দু'টি ক্রোমোসোমই একই প্রকার, কিন্তু পুরুষের
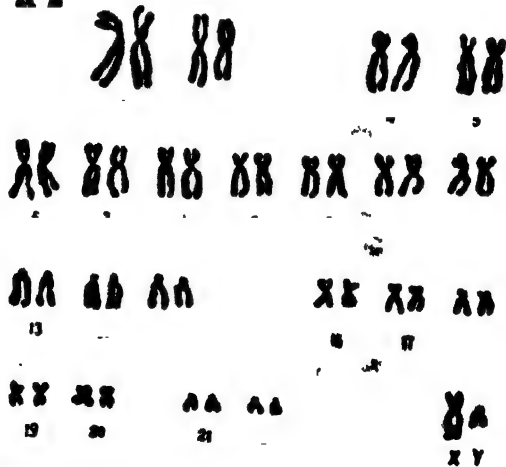
।চিত্র ৯২। মানুষের ক্রোমোসোমসমূহ—মানুষের কোষ-মধ্যস্থ নিউক্লিয়াসে থাকে ২৩ জোড়া ক্রোমোসোম। এক্ষেত্রে সমজাতীয় ক্রোমোসোম-জোড়াগুলি পরপর সাজিয়ে দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২৩-তম জোড়াকে বলা হয় লিঙ্গ-নির্ধারক ক্রোমোসোম। পুরুষের বেলায়, এই জোড়ার একটি একটু বড় (X) এবং অপরটি একটু ছোট (Y)। কিন্তু স্ত্রীলোকের বেলায় দু'টোই সমান (X, X)
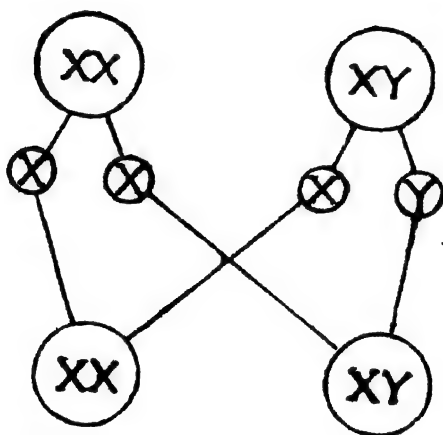
চিত্র ৯৩। মানুষের সন্তানের বেলায় লিঙ্গ-নির্ধারক ক্রোমোসোম-দ্বারা এইভাবে লিঙ্গ (স্ত্রী বা পুরুষ) নির্ধারিত হয়।

বেলায় তা নয়। পুরুষের বেলায় এই জোড়ার একটি বড়, এবং অনেকটা স্ত্রীলোকের মতই, কিন্তু এর সঙ্গীটি অপেক্ষাকৃত ছোট। এজন্যে উভয় ক্ষেত্রে এই ২৩-তম জোড়াকেই লিঙ্গ-নির্ধারক ক্রোমোসোম (Sex-chromosomes) বলা হয়। বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে, স্ত্রীলোকের বেলায় তা XX, এবং পুরুষের বেলায় XY.

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এক-এক রকম জিন (Gene) বা বংশাণু এক-এক রকম চরিত্র বা ধর্ম নির্ধারণ করে, এবং এগুলি অটোসোমে এবং লিঙ্গ-নির্ধারক ক্রোমোসোমে পর পর সাজানো থাকে। সাধারণ ভাবে বলা যায়, যে-কোন একটি ধর্ম এক জোড়া জিন (বা, বংশাণু) দ্বারা (এক জোড়া ক্রোমোসোমের প্রত্যেকটিতে একটি ক'রে অবস্থিত) নির্ধারিত হয়। প্রত্যেক জোড়ায় আবার একটি প্রকট (Dominant) এবং অন্যটি প্রচ্ছন্ন (Recessive) হওয়া সম্ভব। এরূপ এক জোড়া ক্রোমোসোমের একটি দেয় পিতা এবং অন্যটি মাতা। এজন্যে দু'টি জিন (বা, বংশাণু) প্রকট হতে পারে, অথবা একটি প্রকট এবং অন্যটি প্রচ্ছন্ন হতে পারে, অথবা দু'টিই প্রচ্ছন্ন হতে পারে। প্রথম দু'টি ক্ষেত্রে প্রকট জিন (বা, বংশাণু) বংশগত ধর্ম নির্ধারণ করে। কিন্তু তৃতীয় ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন জিন (বা, বংশাণু)-জনিত ধর্মই প্রকাশিত হয়।

স্ত্রীলোকের বেলায় দু'টি X-ক্রোমোসোম থাকে। এক্ষেত্রে প্রকট (Dominant) জিন (বা, বংশাণু) চরিত্র বা ধর্ম নির্ধারণ করে। এক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন (Recessive) জিন (বা, বংশাণু) তার নিজস্ব ধর্ম প্রকাশ করতে অক্ষম। কারণ, প্রকট জিন প্রচ্ছন্ন জিনের ধর্ম যেন দাবিয়ে রাখে। কিন্তু পুরুষের বেলায় ব্যাপারটি অন্যরকম হয়। এক্ষেত্রে X-ক্রোমোসোমে কোনপ্রকার ত্রুটিযুক্ত জিন (বা, বংশাণু) থাকলে, তার ক্রিয়া প্রতিরোধ করারমতো জিন (বা, বংশাণু) Y-ক্রোমোসোমে থাকে না। এজন্যে তার সবরকম ধর্মই প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এর ফল কিরূপ হতে পারে, তাই এখন পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক।

স্ত্রী-পুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই X-ক্রোমোসোমে একপ্রকার জিন (বা, বংশাণু) থাকে, তা এমন একপ্রকার পদার্থ উৎপন্ন করে যা রক্ত জমাট বাঁধতে সহায়তা করে। কোন কোন সময় এই জিন পরিবর্তিত হয়ে যায় (Mutation=পরিব্যক্তি)। তখন ওই প্রয়োজনীয় উৎপাদক (Factor-VIII) উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটে। এরকম হ'লে, রক্তপাতের ফলে মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই রোগের নাম হিমোফিলিয়া (Hæmophilia)। স্ত্রীলোকের একটি ক্রোমোসোমের জিনে (বা, বংশাণুতে) কোনপ্রকার ত্রুটি থাকলেও ওই স্ত্রীলোকের কোন ক্ষতি হয় না। কারণ, ওই

জোড়ার অপর ক্রোমোসোমে অবস্থিত ত্রুটিমুক্ত জিন (বা, বংশাণু) এর ক্রিয়া প্রতিরোধ করে। তবে এই স্ত্রীলোকটি (XX′) এই ত্রুটি বহন করে (Carrier)।

এরূপ স্ত্রীলোকের সঙ্গে একজন স্বাভাবিক পুরুষের (XY) বিবাহ হ'লে, চার রকম সন্তান হতে পারে; যেমন—XX, XY, X′X, X′Y, এদের মধ্যে প্রথমটি হবে ত্রুটিমুক্ত স্ত্রীলোক, দ্বিতীয়টি হবে ত্রুটিমুক্ত পুরুষ, তৃতীয়টি হবে ত্রুটিবহনকারী স্ত্রীলোক, আর চতুর্থটি হবে হিমোফিলিয়া রোগগ্রস্ত পুরুষ।
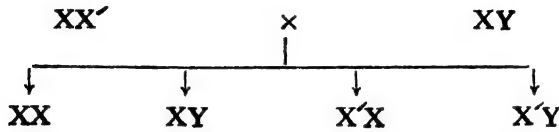
এই রোগ পুরুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, একথা সত্যি। কিন্তু ত্রুটিবহনকারী স্ত্রীলোকের মাধ্যমে তা তৃতীয় জনিতে (বা, প্রজন্মে) [অর্থাৎ, নাতির (Grandson) মধ্যে] সঞ্চালিত হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, রোগগ্রস্ত পিতার পুত্ররা এই ত্রুটি বহন করে না। তাই তার পুত্র বা কন্যার এরূপ রোগ হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু কন্যারা রোগগ্রস্ত না হলেও, এই ত্রুটি বহন করতে পারে (Carrier)। সুতরাং, তাদের সন্তানদের মধ্যে এই রোগ দেখা দিতে পারে।

ধরা যাক, এরূপ ত্রুটিবহনকারী একটি কন্যার সঙ্গে একজন স্বাভাবিক পুরুষের বিবাহ হয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের যদি দু'টি পুত্র-সন্তান হয়, তাহলে তাদের একজন রোগগ্রস্ত হবে, কিন্তু অপরজন রোগমুক্ত থাকবে। আর দু'টি কন্যা হলে, তাদের একজন এই ত্রুটি বহন করবে (Carrier), কিন্তু অপরজন ত্রুটিমুক্ত থাকবে (F_3)।
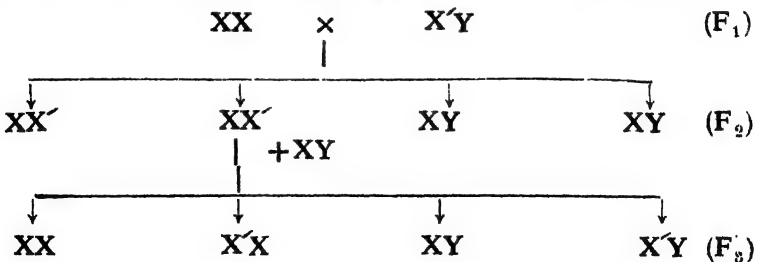
আরও অদ্ভুত ফল পাওয়া যায়, যদি একজন ত্রুটিবহনকারী (Carrier) স্ত্রীলোকের সঙ্গে একজন হিমোফিলিয়া রোগগ্রস্ত পুরুষের বিবাহ হয় (যদিও তার সম্ভাবনা খুবই কম)। এক্ষেত্রে যদি দু'টি পুত্র-সন্তান হয়, তাহলে তাদের একটি হবে রোগগ্রস্ত এবং অপরটি রোগমুক্ত। কিন্তু এক্ষেত্রে যদি দু'টি কন্যা-সন্তান হয়, তাহলে

তাদের একটি হবে রোগগ্রস্ত (Homozygous) এবং অন্যটি হবে ত্রুটিবহনকারী (Carrier)।
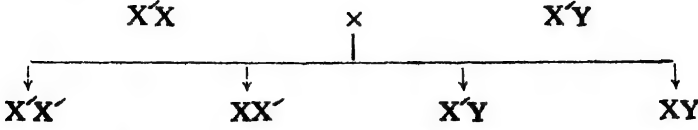
১৮৬৬ সালে সর্বপ্রথম আর এক প্রকার ত্রুটি-যুক্ত শিশুর কথা বলা হয়। এরূপ শিশুর কপাল বড়, হাঁ-করা মুখ, বর্ধিত ঠোঁট, বৃহৎ জিহ্বা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এরূপ শিশু সাধারণত জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হয়। এর নাম দেওয়া হয়েছে মঙ্গোলিজ্‌ম (Mongolism, বা Down's Syndrome)। এর সঠিক কারণ জানা গেছে অল্পদিন আগে, ১৯৫৯ সালে। পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হয়েছে, এরূপ ত্রুটিযুক্ত শিশুর কোষে ৪৬-টির পরিবর্তে ৪৭-টি ক'রে ক্রোমোসোম থাকে। আর এজন্যেই শিশুটির স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। কিন্তু এর কারণ কি ?

এখন নিশ্চিতরূপে জানা গেছে যে, মাইওসিস্‌-প্রক্রিয়ায় ডিম্ব-কোষ (Egg-cell) গঠিত হওয়ার সময়, কোন কোন ক্ষেত্রে একুশতম ক্রোমোসোম-জোড়া পৃথক হয়ে যেতে ব্যর্থ হয় (Non-disjunction)। আর সেই কারণেই তখন ডিম্ব-কোষে থাকে ২৩-টির পরিবর্তে ২৪-টি ক্রোমোসোম। (কারণ, একুশতমটির বেলায় একটিমাত্র ক্রোমোসোম থাকার কথা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে থাকে একজোড়া বা দু'টি ক্রোমোসোম।)

এরূপ ডিম্ব-কোষ থেকে যে শিশুর জন্ম হয়, তার কোষে ৪৬-টির পরিবর্তে ৪৭-টি ক্রোমোসোম (২৪+২৩=৪৭) থাকে। অর্থাৎ, একুশতমটির ক্ষেত্রে যেখানে এক-জোড়া ক্রোমোসোম থাকার কথা, সেখানে এরূপ শিশুর বেলায় থাকে তিনটি ক্রোমোসোম (Trisomy)। আর এই কারণেই শিশুটি জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে থাকে। সাধারণত বয়স্কা স্ত্রীলোকদের (৩৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সের মধ্যে) এরূপ সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। সুতরাং, বেশী বয়সে সন্তান না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

নিপুণ নির্বাচন এবং পরনিষেক-পদ্ধতি :

যাঁরা কৃষিকাজ করেন, বহুকাল ধরেই তাঁরা বিভিন্ন জাতের উদ্ভিদ্‌ ও গৃহপালিত পশু-পাখি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এদের মধ্যে যে-সব পরিবর্তন ঘটে তা-ও তাঁরা জানতেন। এঁরা নির্বাচন (selection) এবং পরনিষেক (crossing)-পদ্ধতি দ্বারা ইচ্ছানুযায়ী নিজেদের জন্য উপকারী নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভিদ্‌ ও

চিত্র ১০১। ভাল জাতের সংকর-গ
[ইউ. এস্. আই. এস্-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

আঁস-ফল (Dew-berry), গোরী-ফল (Rasp-berry), সংকর-জাম, কাঁটাহীন ক্যাক্টাস্ (Cactus) বা মনসা (বা, সিজ) প্রভৃতি গাছ উৎপন্ন ক'রে সবাইকে তাক লাগিয়েছেন।

এবিষয়ে সোভিয়েত বিজ্ঞানী ঈভান ভ্লাদিমিরোভিচ মিচুরিন (১৮৫৫—১৯৩৫)-এর নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলতেন,—"প্রকৃতির কৃপার জন্য আমরা বসে থাকতে পারি না—প্রকৃতির নিকট থেকে আদায় ক'রে নেওয়াই আমাদের কাজ।" সুদীর্ঘকালের অক্লান্ত সাধনার ফলে তিনি নিজেই প্রায় তিনশ' রকমের ফল ও জাম উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এদের মধ্যে ছিল—উত্তরের শীতপ্রধান দেশের উপযোগী আঙুর, উত্তরদেশীয় খুবানী, নতুন ধরনের আপেল, ন্যাসপাতি, জাম প্রভৃতি।

এইভাবে নিপুণ নির্বাচনের দ্বারা বর্তমান উদ্ভিদের ও প্রাণীর জাতই একেবারে আক্ষরিক অর্থেই পরিবর্তন করা সম্ভব হয়, এবং তার ফলে মানব সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। বলা বাহুল্য যে, অনুরূপ নীতি অনুসরণ ক'রেই বর্তমানে অধিক

চিত্র ১০২। সংকর-গাভীর সুন্দর সুগঠিত পালান (Udder)।
[ইউ. এস্. আই. এস্-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

ফলনশীল সংকর-জাতের ধান, গম, ভুট্টা এবং ইক্ষুর উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া নানা প্রকার উন্নত জাতের হাঁস-মুরগি, পায়রা, গরু, মোষ, ভেড়া, শুয়োর প্রভৃতির সৃষ্টি করাও সম্ভব হয়েছে। এইভাবে দেশ-বিদেশের কৃষি-খামারে বিপ্লবের সূচনা হয়েছে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ডি. এন. এ. এবং আর. এন. এ.

নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে বিজ্ঞানীরা এখন নি · তরূপে বুঝতে পেরেছেন যে, জীব-কোষের উপাদান প্রধানতঃ তিন প্রকার— ডেসক্সিরাইবো-নিউক্লিক অ্যাসিড, সংক্ষেপে ডি. এন. এ. (D.N.A.); রাইবো-নিউক্লিক অ্যাসিড, সংক্ষেপে আর. এন. এ. (R.N.A.); এবং প্রোটিন। ডি. এন. এ. সর্বদাই পাওয়া যায় জীব-কোষের নিউক্লিয়াসে। কিন্তু আর. এন. এ. থাকে প্রধানতঃ নিউক্লিয়াসের বাইরে, সাইটোপ্লাজমে।

বিভিন্ন রকম নিউক্লিক অ্যাসিড এবং প্রোটিনের মধ্যে অন্ততঃ একটি বিষয়ে খুব মিল আছে। যেমন, এরা প্রত্যেকেই এক-একটি মহাণু (Giant molecule)। উৎসবের সময় ছেলেরা রঙ-বেরঙের কাগজ জুড়ে জুড়ে কেমন সুন্দর শিকল বানায়! এসব অণুর গঠন অনেকটা সেই রকম। উল্লেখ্য যে, প্রত্যেকেরই সাধারণভাবে একটি শিরদাঁড়া (Back-bone) থাকে, তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম উপাদান দিয়ে এই শিরদাঁড়া গঠিত হয়। তাছাড়া এই শিরদাঁড়ার সঙ্গে নানাপ্রকার পার্শ্ব-পুঞ্জ (Side-groups) যুক্ত থাকে। নিউক্লিক অ্যাসিডের বেলায় এরূপ পার্শ্ব-পুঞ্জ মাত্র চার রকমের হয়।

ডি. এন. এ. (D.N.A.) ক্রোমোসোমে থাকে, এবং কেবলমাত্র ক্রোমোসোমেই তা পাওয়া যায়, অন্য কোথাও নয়। প্রত্যেক প্রজাতির (Species) বেলায় ক্রোমোসোম-প্রতি ডি. এন. এ.-র পরিমাণ একেবারে নির্দিষ্ট। এটিই বংশগত গুণাবলীর ধারক ও বাহক, অর্থাৎ এদিয়েই জিন (Gene) বা বংশাণু গঠিত হয়। আবার, অনেকগুলি জিন নির্দিষ্ট পর্যায়ে পরপর সজ্জিত হয়ে তৈরি করে এক-একটি ক্রোমোসোম।

আণবিক জীব-বিজ্ঞানীরা (Molecular Biologists) মনে করেন, প্রতিটি জীবের নিজস্ব গুণাবলী ডি. এন. এ.-র মধ্যে যেন এক বিস্ময়কর সাংকেতিক ভাষায় (Genetic code—জনি-সংকেত) লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। যেন অসংখ্য শব্দ-সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে এই ভাষা। এরূপ এক-একটি শব্দ হ'ল এক-একটি নিউক্লিওটাইড

(Nucleotide)। আর মাত্র তিনটি ক'রে অক্ষর দিয়ে তৈরী হয়েছে এরকম এক-একটি শব্দ, অর্থাৎ নিউক্লিওটাইড একক (Unit)।

১৯৬৪ সালে বিজ্ঞানী নিরেনবার্গ সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন যে, তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা মিলে এইরূপ তিন অক্ষর-বিশিষ্ট সাংকেতিক শব্দগুলি (Three letter code words) সংশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছেন, এবং প্রতিটি 'কোডন' (Codon)-কে ভাষান্তরিত ক'রে প্রতিসঙ্গ (corresponding) অ্যামিনো-অ্যাসিড তৈরি করতেও সক্ষম হয়েছেন। প্রজননবিদ্যা (বা, বংশাণুবিদ্যা) (Genetics)-সংক্রান্ত সাংকেতিক ভাষার পাঠোদ্ধারে প্রথম সূত্রের সন্ধান এই ভাবে পাওয়া গেল।

চিত্র ১০৩। হরগোবিন্দ খোরানা
[ইউ. এস. আই. এস্-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

এদিকে তখন বিজ্ঞানী খোরানা (ভারতীয় বংশোদ্ভব, কিন্তু বর্তমানে মার্কিন দেশের নাগরিক) এবং তাঁর সহকর্মীরা নির্দিষ্ট পর্যায়ক্রমে নিউক্লিওটাইড অণুগুলি জুড়ে জুড়ে সুবৃহৎ শৃঙ্খল গড়ার কাজে মনোনিবেশ করেছেন। এই ভাবে ১৯৬৮ সালের মধ্যেই তাঁরা এইসব নিউক্লিওটাইড অণুগুলি জুড়ে জুড়ে, যত রকম শৃঙ্খল গড়া সম্ভব, অর্থাৎ ৬৪ রকম শৃঙ্খলের, সবগুলিই সংশ্লেষণ করতে সক্ষম হন।

অপরদিকে আর একজন মার্কিন বিজ্ঞানী রবার্ট হোলি ১৯৬৫ সালে ঘোষণা করেন যে, ঈস্টের বেলায় ডি. এন. এ.-র বার্তাবহ আর. এন. এ. (Messenger R.N.A.)-অণুর গঠন-রহস্যের সমাধান তিনি ক'রে ফেলেছেন। অর্থাৎ, আর. এন. এ.

শৃঙ্খলের অন্তর্ভুক্ত নিউক্লিওটাইডগুলি পর্যায়ক্রমে কিভাবে পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে জুড়ে আর. এন. এ. শৃঙ্খল গড়ে তোলে, সেই তথ্য তিনি লোকসমক্ষে প্রকাশ করলেন। এজন্য সুদীর্ঘ নয় বছর ধ'রে কঠোর পরিশ্রম ক'রে তিনি ঈস্ট-এর অন্তর্গত

ADENINE

CYTOSINE

DESOXYRIBOSE

PHOSPHORIC ACID
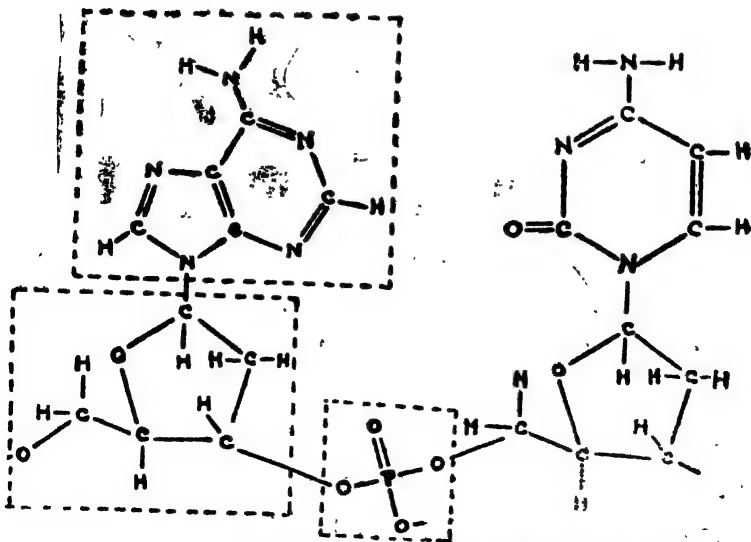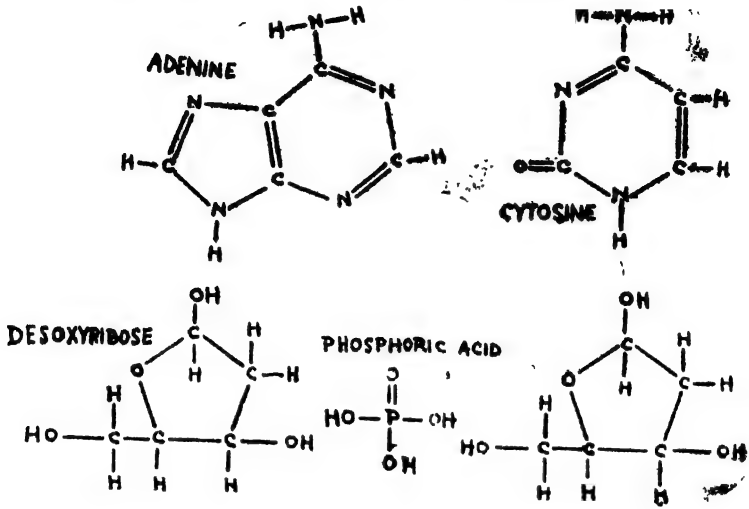
চিত্র ১০৪। ক্ষারক, শর্করা, এবং ফসফোরিক অ্যাসিড পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে এইভাবে ডি.এন.এ. শৃঙ্খল গঠন করে।

৭৭-একক (Seventy-seven-unit) আর. এন. এ. অণু বিশ্লেষণ ক'রে তা থেকে সব রকমের নিউক্লিওটাইড বিশুদ্ধ অবস্থায় তৈরি করেন। তারপর সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে জুড়ে গড়ে তোলেন আর. এন. এ. শৃঙ্খল। এ হ'ল ৭৭-টি শব্দ সাজিয়ে একটি বাক্য গড়ার সামিল। এইভাবে ঈস্ট-এর অন্তর্গত আর. এন. এ-র গঠন-রহস্যের সমাধান তিনি ক'রে ফেলেছেন।

GUANINE

THYMINE
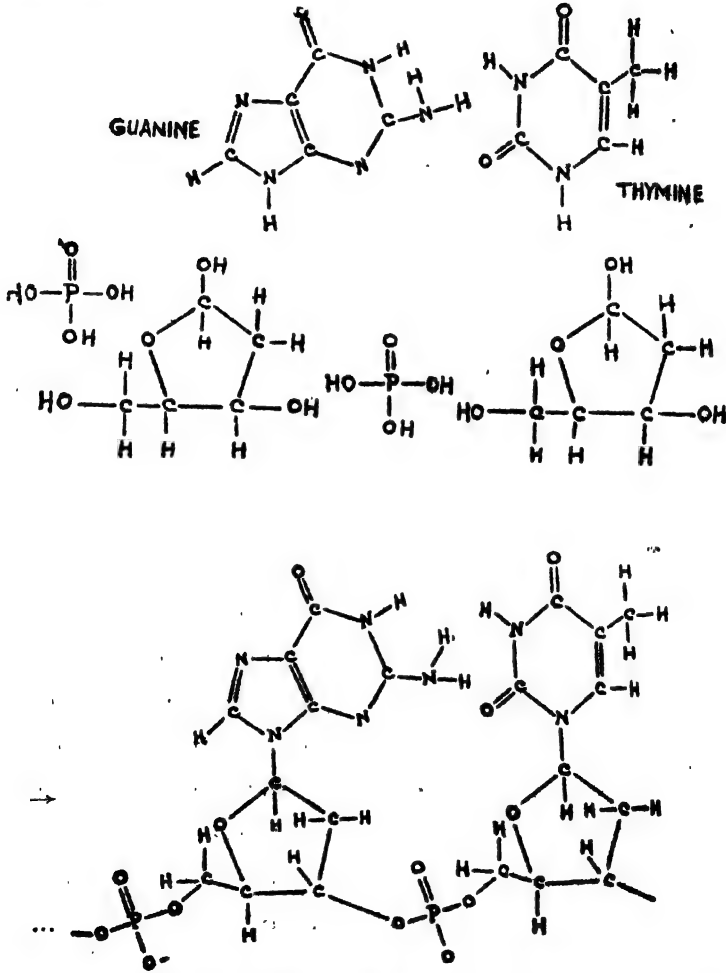
চিত্র ১০৫। কারক, শর্করা, এবং ফসফোরিক অ্যাসিড পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে এইভাবে ডি.এন.এ শৃঙ্খল গঠন করে।

এই তিনজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে প্রজননবিদ্যার (বা, বংশাণু-বিদ্যার) অনেক রহস্যই এখন আমরা বুঝতে পেরেছি। এজন্য ১৯৬৮ সালে এই তিন জনকেই বিশ্ববিখ্যাত নোবেল-পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে।

এখন সুস্পষ্টভাবে জানা গেছে যে, বহুসংখ্যক ডেসক্সিরাইবোজ (Desoxy-ribose)† (শর্করা) এবং ফস্‌ফোরিক অ্যাসিড (Phosphoric acid) পরপর সজ্জিত হয়ে, এবং পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, একটি সুবৃহৎ শৃঙ্খল গড়ে তোলে, এবং তা-ই ডি. এন. এ.-র শিরদাঁড়ার কাজ করে। আর প্রতিটি শর্করা-অংশের সঙ্গে যুক্ত থাকে একটি ক'রে ক্ষারক (Base)। এইরূপ শৃঙ্খলের অন্তর্গত, শর্করা-ফস্‌ফেট এবং ক্ষারক-দ্বারা গঠিত, প্রতিটি একক (Unit)-এর নাম নিউক্লিওটাইড (Nucleotide)।
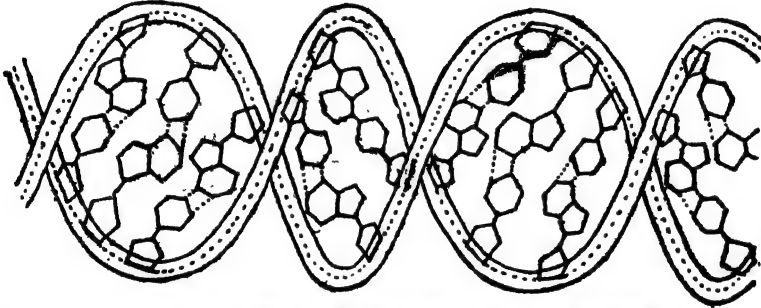
চিত্র ১০৬। প্রতিটি ডি. এন. এ. অণুতে আছে, প্রকৃতপক্ষে দু'টি ক'রে নিউক্লিওটাইড শৃঙ্খল। এরা পরস্পরকে জড়িয়ে রয়েছে ঘোরানো মইয়ের মতো। অথবা, দু'টি লতা যেন পরস্পরকে জড়িয়ে জড়িয়ে উপরদিকে উঠে গেছে (Double helix—দ্বি-সর্পিলাকার)।

এখানে উল্লেখ্য যে, শর্করা-ফস্‌ফেট শৃঙ্খলটি বেশ নিয়মিতভাবে গড়ে ওঠে, কিন্তু সমগ্র অণুটি সেরকম সুশৃঙ্খলভাবে গড়ে ওঠে না। তার কারণ, পার্শ্ব-পুঞ্জ হিসেবে থাকে চার রকমের ক্ষারক—এদের দু'টি পিউরিন-জাতীয়, যেমন—অ্যাডেনিন (Adenine) এবং গুয়ানিন (Guanine); আর দু'টি পিরিমিডিন-জাতীয়, যেমন—সাইটোসিন (Cytosine) এবং থাইমিন (Thymine)। যতদূর জানা গেছে, ওই সুবৃহৎ শৃঙ্খলে এই ক্ষারকগুলি পরপর ঠিক নিয়মিতভাবে সজ্জিত থাকে না। আর এজন্যই এক রকম ডি. এন.এ.-র সঙ্গে আর এক রকম ডি. এন. এ.-র বেশ পার্থক্য হতে দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা এখন বিশ্বাস করেন যে, এইসব ক্ষারকের পর্যায়ক্রমের উপরেই ডি. এন. এ.-র বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে।

† একে অনেক সময় ডিঅক্সিরাইবোজ (Deoxyribose) বলা হয়।

এ-থেকেই বোঝা যায়, যে-কোনরূপ ডি. এন. এ. অণুর গঠন অত্যন্ত জটিল। যেহেতু প্রতিটি ক্ষেত্রে এইসব ক্ষারকের পর্যায়ক্রম এখনও সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি, সেহেতু কোনো এক প্রকার ডি. এন. এ.-র গঠন সঠিকভাবে জানা গেছে, এমন কথা বলার সময় এখনও আসেনি। তবে ডি. এন. এ.-র গঠন-পদ্ধতি কিরূপ সে-বিষয়ে বিজ্ঞানীরা এখন অনেকখানি আন্দাজ ক'রে ফেলেছেন।

ক্রিক, ওয়াটসন এবং উইলকিন্‌স-এর কষ্টসাধ্য গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, প্রতিটি ডি. এন. এ. অণুতে আছে, দু'টি ক'রে নিউক্লিওটাইড শৃঙ্খল, একটি মাত্র শৃঙ্খল নয়। এরা পরস্পরকে জড়িয়ে রয়েছে ঘোরানো মইয়ের মতো। অথবা, দু'টি লতা যেন পরস্পরকে জড়িয়ে জড়িয়ে উপরদিকে উঠে গেছে (Double helix= দ্বি-সর্পিলাকার)। এরূপ মইয়ের প্রত্যেক ধাপে রয়েছে দু'টি ক'রে ক্ষারক (Base) উল্লেখ্য যে, একদিকের শৃঙ্খলে অবস্থিত ক্ষারকটি অপরদিকের শৃঙ্খলে অবস্থিত ক্ষারকের সঙ্গে হাইড্রোজেন-বন্ধ (Hydrogen-bond) দ্বারা যুক্ত থাকে। এজন্য একদিকের ক্ষারক অপরদিকের ক্ষারকটির পরিপূরক (complimentary) হতে বাধ্য। যেমন— একদিকে অ্যাডেনিন থাকলে, অপরদিকে থাকবে থাইমিন ; আবার একদিকে গুয়ানিন থাকলে, অপরদিকে থাকবে সাইটোসিন, এইরকম। সুতরাং, একদিকের লতাটির
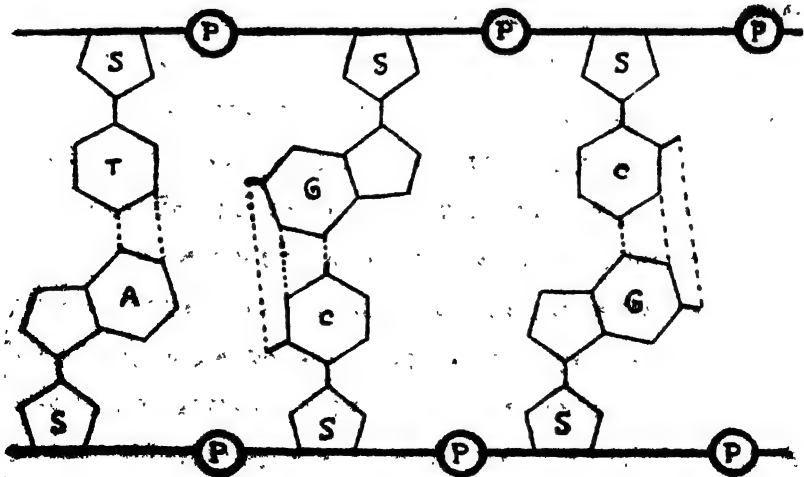
চিত্র ১০৭। এইরূপ মইয়ের প্রত্যেক ধাপে রয়েছে, দু'টি ক'রে ক্ষারক (base)। তারা হাইড্রোজেন-বন্ধ (Hydrogen-bond) দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে।
[S=Sugar, P=Phosphoric acid, A=Adenine, C=Cytosine, G=Guanine, T=Thymine.]
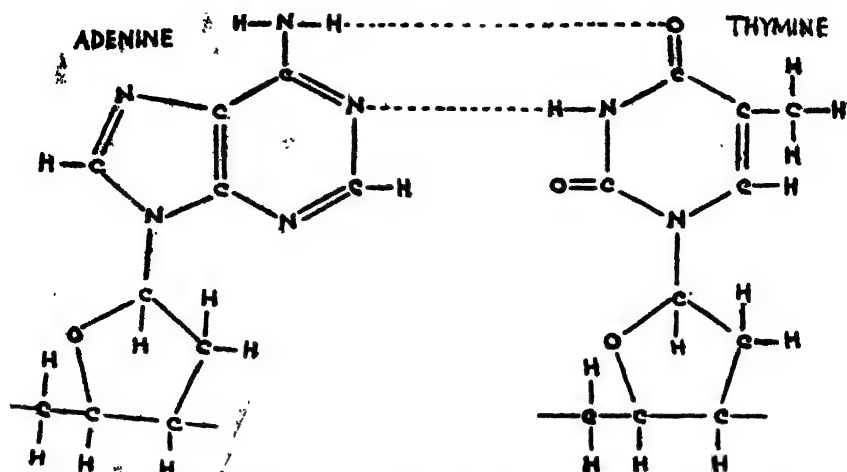
চিত্র ১০৮। একদিকের ক্ষারক অপরদিকের ক্ষারকটির পরিপূরক (Complimentary); যেমন—একদিকে অ্যাডেনিন থাকলে, অপরদিকে থাকে থাইমিন। উল্লেখ্য, হাইড্রোজেন-বন্ধ (Hydrogen-bond) দ্বারা এরা পরস্পর যুক্ত থাকে।

গঠনের উপরেই নির্ভর করে অপরদিকের লতাটির গঠন কিরূপ হবে। ডি. এন. এ.-র গঠন-রহস্য সমাধানে অপূর্ব সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে, উপরিউক্ত তিন বিজ্ঞানীকে ১৯৬২ সালের নোবেল-পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে।

বংশ-বিস্তারের মূল কথাই হ'ল নতুন ডি. এন. এ. সৃজন। ডি. এন. এ. স্বপ্রজননক্ষম। কিন্তু প্রশ্ন, ডি. এন. এ. কিভাবে ঠিক নিজের মতই আর একটি ডি. এন. এ.-র সৃষ্টি করতে পারে? এজন্য প্রথমেই ডি. এন. এ.-র দু'টি নিউক্লিওটাইড শৃঙ্খল প্যাঁচ খুলে আলাদা হয়ে যায়। তারপর প্রত্যেকটি শৃঙ্খল নিজের পরিপূরক (complimentary) আর একটি শৃঙ্খল গড়ার কাজ শুরু ক'রে দেয়।

যে-কোন একটি শৃঙ্খলের কথা এখন বিবেচনা করা যাক। এর চারিদিকে নানা-প্রকার নিউক্লিওটাইড অণু ভেসে বেড়াচ্ছে। এখন ওই শৃঙ্খলের যে-কোন একটি ক্ষারকের কাছে পরিপূরক অপর একটি ক্ষারক আসামাত্র হাইড্রোজেন-বন্ধ (Hydrogen-bond) দ্বারা তারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। এইভাবে যথোপযুক্ত নিউক্লিওটাইড অণুগুলি পরপর ওই শৃঙ্খলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পরিপূরক শৃঙ্খলটি গড়ে তুলতে থাকে। এইভাবে শেষ পর্যন্ত আধখানা থেকেই তৈরি হয় একটি সম্পূর্ণ ডি. এন. এ. অণু।
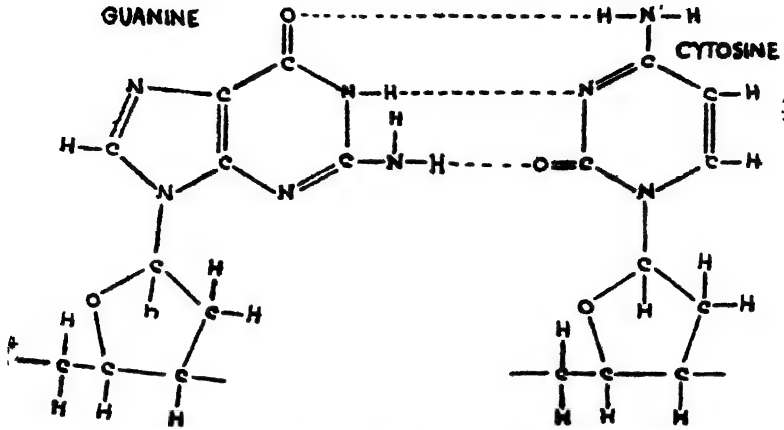
চিত্র ১০৯। একদিকের ক্ষারক অপরদিকের ক্ষারকটির পরিপূরক (Complimentary) ; যেমন— একদিকে গুয়ানিন থাকলে, অপরদিকে থাকে সাইটোসিন। উল্লেখ্য, হাইড্রোজেন-বন্ধ (Hydrogen-bond) দ্বারা এরা পরস্পর যুক্ত থাকে।

পৃথক্ হয়ে যাওয়া অপর শৃঙ্খলটির ক্ষেত্রেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে, এবং তার ফলে পাওয়া যায় আর একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ডি. এন. এ. অণু। অর্থাৎ, আগে যেখানে ছিল একটি মাত্র ডি. এন. এ. অণু, সেখানে এখন পাওয়া গেল একই প্রকার দু'টি ডি. এন. এ. অণু। অনুকূল পরিবেশে একটি ডি. এন. এ. অণু এইভাবে ঠিক নিজের মতই দু'টি অণু তৈরি করতে সক্ষম হয়, অর্থাৎ এটি বংশ-বিস্তার করতে পারে।

ধরা যাক, একজন ভাস্কর একটি মূর্তি গড়ে তার একটি ছাঁচ (mould) তৈরি করেছেন। এক্ষেত্রেও একটি আর একটির পরিপূরক। এখন ওই ছাঁচ থেকে যে মূর্তি গড়া হবে, তা যেমন ঠিক আগের মূর্তির মতই হবে ; তেমনি ওই মূর্তি থেকে নতুন ক'রে আর একটি ছাঁচ তৈরি করলে, তা-ও সবদিক দিয়ে ঠিক আগের ছাঁচটির মতই হবে। এইভাবে একটির পর একটি ক'রে ছাঁচ অথবা মূর্তি অনায়াসে তৈরি করা যাবে। ডি. এন. এ. অণুর বংশ-বিস্তার করার পদ্ধতিও অনেকটা এইরকম।

রাইবো-নিউক্লিক অ্যাসিড বা আর. এন. এ.-র গঠন-পদ্ধতিও অনেকাংশে ডি. এন. এ.-র মতো। তবে এ-ক্ষেত্রে শর্করা হিসেবে থাকে রাইবোজ (ডেসক্সিরাইবোজ নয়)। এক্ষেত্রেও চার-রকম ক্ষারক থাকে, তবে এতে থাইমিন থাকে না, তার বদলে থাকে ইউরাসিল (Uracil)। আর একটি কথা। এক্ষেত্রে এক জোড়া শৃঙ্খল (Double helix)-এর বদলে থাকে একটি মাত্র শৃঙ্খল (Single stranded chain)।

বিজ্ঞানীরা এখন নিশ্চিত বুঝতে পেরেছেন যে, একটি বিচ্ছিন্ন ডি. এন. এ. শৃঙ্খলের

P—Phosphoric acid
S—Sugar
A—Adenine
C—Cytosine
G—Guanine
T—Thymine
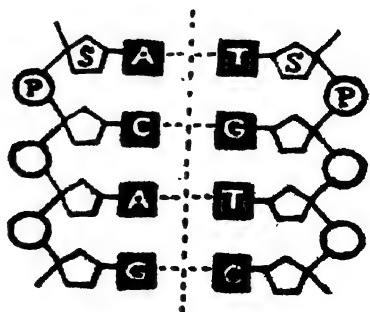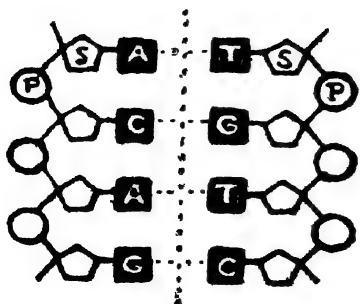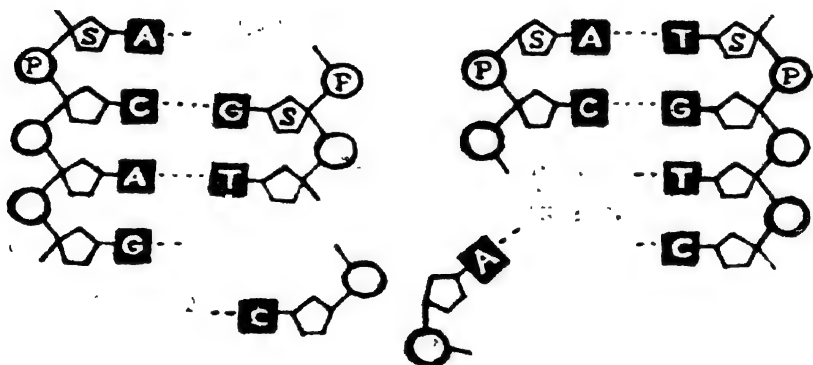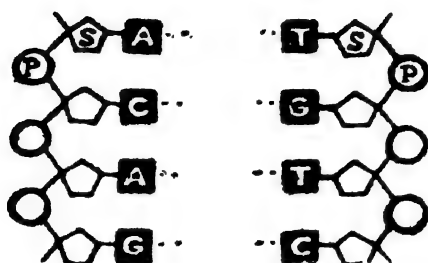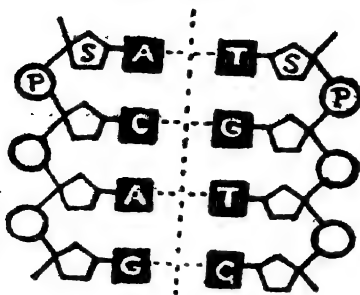
চিত্র ১১০। ডি. এন. এ. স্বপ্রজননক্রম। এজন্য প্রথমেই ডি. এন. এ.-র দু'টি শৃঙ্খল প্যাঁচ খুলে আলাদা হয়ে যায়। তারপর প্রত্যেকটি শৃঙ্খল নিজের পরিপূরক আর একটি শৃঙ্খল গঠন করার কাজ শুরু ক'রে দেয়।

ওই শৃঙ্খলের যে-কোন একটি ক্ষারকের কাছে পরিপূরক অপর একটি ক্ষারক আসা-মাত্র হাইড্রোজেন-বন্ধ দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। এইভাবে যথোপযুক্ত নিউক্লিওটাইড অণুগুলি পরপর ওই শৃঙ্খলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পরিপূরক শৃঙ্খলটি গড়ে তুলতে থাকে। এইভাবে আধখানা থেকেই তৈরি হয় একটি সম্পূর্ণ ডি. এন. এ. অণু। অর্থাৎ, আগে যেখানে ছিল একটি মাত্র ডি. এন. এ. অণু, এখন সেখানে পাওয়া যাবে একই প্রকার দু'টি ডি. এন. এ. অণু।

[ইউ. এস্. আই. এস্-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

চিত্র ১১১। বিভিন্ন রকম ডি. এন. এ.-র ইঙ্গিতে, আর. এন. এ. দ্বারা, বিভিন্ন রকম প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়ে থাকে।

1. প্রতিটি ডি. এন. এ. অণুতে আছে দু'টি ক'রে নিউক্লিওটাইড শৃঙ্খল। এরা পরস্পরকে জড়িয়ে রয়েছে ঘোরানো মইয়ের মতো (Double helix = দ্বি-সর্পিলাকার)। উল্লেখ্য যে, প্রতিটি শৃঙ্খলে নিউক্লিওটাইডগুলি নির্দিষ্ট পর্যায়ক্রমে সাজানো থাকে।
2. প্রথমে ডি. এন. এ.-র দু'টি নিউক্লিওটাইড-শৃঙ্খল প্যাঁচ খুলে আলাদা হয়ে যায়।

3. বিচ্ছিন্ন ডি. এন. এ.-শৃঙ্খলের সংস্পর্শে আর. এন. এ.-নিউক্লিওটাইডগুলি নির্দিষ্ট পর্যায়ক্রমে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে।
4. আর. এন. এ.-নিউক্লিওটাইডগুলি এইভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি বার্তাবহ আর. এন. এ.-শৃঙ্খল গড়ে তোলে।
5. এরপর বার্তাবহ আর. এন. এ.-শৃঙ্খলটি ডি. এন. এ.-শৃঙ্খল থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং নিউক্লিয়াস থেকে বেরিয়ে সাইটোপ্লাজ্‌মের রাইবোসোমের সঙ্গে যুক্ত হয়।
6. তখন পরিবাহী আর. এন. এ. এক-একটি বিশেষ অ্যামিনো-অ্যাসিডকে (7) ধরে আনে।
8. তারপর ওই অ্যামিনো-অ্যাসিড (7)-সহ পরিবাহী আর. এন. এ.-টি এসে বার্তাবহ আর. এন. এ.-র সঙ্গে যুক্ত হয়।
9. এইভাবে অ্যামিনো-অ্যাসিডগুলি, ধ্বনি-সংকেত অনুযায়ী, নির্দিষ্ট পর্যায়ক্রমে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক-একটি বিশেষ ধরনের প্রোটিন-অণু গঠন করে।
10. সবশেষে সংশ্লিষ্ট প্রোটিন-অণুটি পরিবাহী এবং বার্তাবহ আর.এন.এ.-সংঘ থেকে পৃথক্ হয়ে যায়।

সংস্পর্শে একটি আর. এন. এ. শৃঙ্খল গঠিত হয়। এ যেন এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত হওয়ার সামিল। আর. এন. এ. প্রকৃতপক্ষে ডি. এন. এ.-র বার্তাবহের (Messenger) কাজ করে, এবং ডি. এন. এ.-র ইঙ্গিতেই, আর. এন. এ. নানাপ্রকার অ্যামিনো-অ্যাসিড দিয়ে মালা গেঁথে নানা প্রকার প্রোটিন-অণু সংশ্লেষণ ক'রে থাকে। বলা বাহুল্য, প্রোটিনে বিভিন্ন অ্যামিনো-অ্যাসিডের পর্যায়ক্রম কিরূপ হবে, তা নির্ভর করে আর. এন. এ.-র, তথা ডি. এন. এ-র, প্রকৃতির উপর। এ জন্য বিভিন্ন রকম ডি. এন. এ-র ইঙ্গিতে, আর. এন. এ. দ্বারা, বিভিন্ন রকম প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়ে থাকে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মোটামুটিভাবে তিনপ্রকার আর. এন. এ. পাওয়া যায়; যেমন—

(১) বার্তাবহ আর. এন. এ. (Messenger R. N. A.),

(২) পরিবাহী আর. এন. এ. (Transfer R. N. A.), এবং

(৩) রাইবোসোম-সংশ্লিষ্ট আর. এন. এ. (Ribosomal R. N. A.)।

কোষের মধ্যে সাইটোপ্লাজ্‌মে একরকম জিনিস থাকে, তার নাম রাইবোসোম (Ribosome)। এখানেই কোষের প্রয়োজনীয় প্রোটিন তৈরি হয়। এজন্য প্রথমে ডি. এন. এ. থেকে তৈরি হয় বার্তাবহ আর. এন. এ.। এটি নিউক্লিয়াস থেকে বেরিয়ে সাইটোপ্লাজ্‌মের রাইবোসোমের সঙ্গে যুক্ত হয়। তখন পরিবাহী আর. এন. এ., বার্তাবহ আর. এন. এ.-র সংকেত অনুযায়ী, এক-একটি বিশেষ অ্যামিনো-অ্যাসিড (Amino-acid)-কে ধরে এনে, ঐ আর. এন. এ.-র সাহায্যেই, পরপর গেঁথে ফেলে। এইভাবেই গঠিত হয় এক-একটি প্রোটিন অণু (Protein molecule)।

পঞ্চম পর্ব

অভিব্যক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

অভিব্যক্তিবাদ

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সকল উদ্ভিদ্ ও প্রাণী প্রায় একই সময়ে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কশূন্যভাবে সৃষ্টি হয়েছিল। আর যে আকৃতিতে তারা সৃষ্ট হয়েছিল, অনন্তকাল ধরেই তারা সেইরূপই আছে এবং থাকবে। কিন্তু বর্তমানে কোন জীববিজ্ঞানীই একথা মেনে নিতে রাজী নন। তাঁদের মতে উদ্ভিদ্ ও প্রাণী নিয়ত পরিবর্তনশীল এবং ক্রমবিকাশী। যুগ যুগ ধরে এক বিরামহীন মন্থর ক্রম-পরিবর্তন-প্রক্রিয়ায় সরল ও নিম্নস্তরের জীব থেকে অপেক্ষাকৃত জটিল ও উচ্চ স্তরের জীবের উৎপত্তি হয়েছে। এরই নাম অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ (Evolution)।

অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত এই ধারণা একেবারে নতুন নয়। খ্রীষ্টের জন্মের কয়েক শত বছর পূর্বেও গ্রীক দার্শনিকগণ-এ বিষয়ে চিন্তা করেছিলেন। তা-ছাড়া এরিস্টটল, বুফো, ইরাস্‌মাস্ ডারউইন (ডারউইনের পিতামহ), লামার্ক প্রমুখ প্রখ্যাত নিসর্গবিদগণও (Naturalists) অভিব্যক্তিবাদের সমর্থক ছিলেন। তবে এই মতবাদের চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠাতা হলেন বিশ্ববিখ্যাত নিসর্গবিদ চার্লস্ ডারউইন।

লামার্ক-এর মতবাদ :

অভিব্যক্তি সম্পর্কে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন ফরাসী বিজ্ঞানী লামার্ক,

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে।† তিনি বলেন যে, প্রতিবেশের ক্রিয়াতেই জীবের পরিবর্তন হয়। তাঁর মতে, জীবন ধারণের অবস্থা অনুসারে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার, অথবা অব্যবহার, নির্ধারিত হয়। ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আরও পুষ্ট এবং আরও উন্নত হয়। আবার অব্যহারের ফলে তা অপুষ্ট হতে হতে শেষে একেবারে লোপ পায়। এই ভাবে অর্জিত পরিবর্তনটি বংশ-গতি অনুসারে উত্তর পুরুষে সঞ্চালিত হয়। আর কয়েক পুরুষ ধরে এইরূপ হওয়ার পরে একটি নতুন প্রজাতির (Species) উদ্ভব হয়।

চিত্র ১১২। লামার্ক
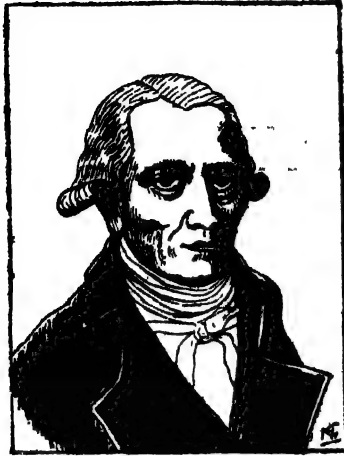
লামার্ক বলেছেন বিবর্তনের প্রধান কারণ হ'ল (১) প্রত্যঙ্গের ব্যবহার, কিংবা অব্যবহার, এবং (২) উন্নতিকামী অন্তর্লীন প্রবণতা। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, জিরাফের পূর্ব-পুরুষের গ্রীবা বর্তমান ঘোড়ার গ্রীবার মতই ছোট ছিল। কিন্তু আফ্রিকার উষ্ণ অঞ্চলের পরি-বর্তিত অবস্থায় ঐ সব প্রাণীর সুউচ্চ বৃক্ষের পাতা সংগ্রহ করবার জন্যে ক্রমাগত চেষ্টার ফলেই আধুনিক দীর্ঘগ্রীব জিরাফের উদ্ভব হয়েছে। তেমনি ক্রমাগত অব্যবহারের ফলেই আধুনিক নিষ্ক্রিয় ডানা-বিশিষ্ট উটপাখির উদ্ভব হয়েছে।
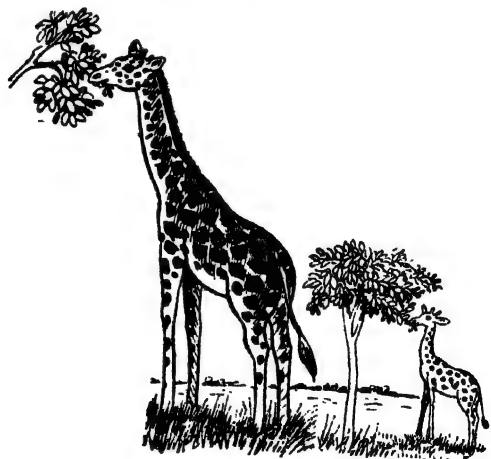
চিত্র ১১৩। লামার্কের মতে, জিরাফের পূর্ব-পুরুষের গ্রীবা ছোট ছিল, কিন্তু সুউচ্চ বৃক্ষের পাতা সংগ্রহ করার জন্যে ক্রমাগত চেষ্টার ফলে আধুনিক দীর্ঘগ্রীব জিরাফের উদ্ভব হয়েছে।

কিন্তু বিজ্ঞানী ওয়াইজম্যান পর পর বাইশ প্রজন্ম ধরে পুরুষ ও স্ত্রী-ইঁদুরের লেজ কেটে ক'রে প্রমাণ করেন,

† ১৮০৯ সালে দুই খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থের নাম—'প্রাণীবিদ্যা দর্শন'।

এই পদ্ধতিতে কখনও লেজহীন ইঁদুর জন্মায় না এজন্যে তিনি লামার্কের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন।

যাই হোক, লামার্ক তাঁর এই মতবাদের সমর্থনে বিশ্বাস উৎপাদনের উপযোগী তথ্য যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করতে না পারায়, তাঁর এই মত বিজ্ঞানীরা গ্রহণ করেন নি।

চিত্র ১১৪। ওয়াইজম্যান

ডারউইনের মতবাদ ঃ

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর ইংল্যাণ্ডের রাজকীয় নৌবহরের একটি জাহাজ বীগ্‌ল্ (Beagle) ভূপ্রদক্ষিণ ক'রে নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের কাজ চালাবার উদ্দেশ্যে যাত্রা ক'রল। যুবক চার্লস্ ডারউইন এই অভিযানে যোগ দিলেন একজন নিসর্গবিদ্ হিসেবে।

ডারউইন প্রথমে দক্ষিণ-আমেরিকায় গেলেন। ব্রেজিলের অন্তর্গত রিও ড্য জেনেরিওতে পৌছে তিনি বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের কাজ শুরু করলেন। এখানে তিনি অনেক রকম ব্যাঙ, জোনাকী, আলোক-প্রদানকারী গুব্‌রে-পোকা, সবুজ তোতা, টুকান, বিড়াল, পিপড়ে, বোল্‌তা, মাকড়সা প্রভৃতির বহু নমুনা সংগ্রহ করেন এবং তাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন। দক্ষিণ আমেরিকায় তিনি মোট ২৭ রকম ইঁদুর এবং নানা ধরনের হরিণ ও পাখির আচার-ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করেন। বাহিয়া ব্লাঙ্কায় গিয়ে তিনি অতীতের অতিকায় প্রাণীদের অসংখ্য ফসিল (Fossil) বা অশ্মীভূত কঙ্কালের সন্ধান পেলেন। এই অঞ্চলের পাখি
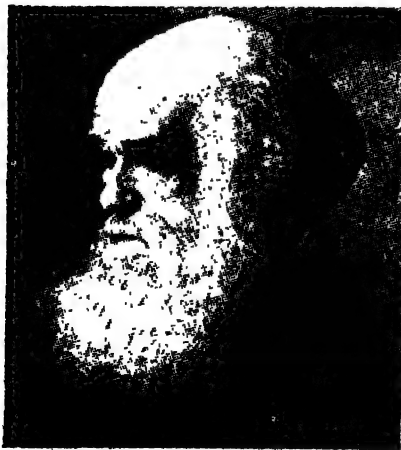
চিত্র ১১৫। চার্লস্ ডারউইন

এবং সরীসৃপদের (যেমন, কচ্ছপদের) সম্পর্কেও তিনি অনেক তথ্য আহরণ করলেন।

চিত্র ১১৬। যুবক ডারউইন রিও দ্য জেনেরিওতে পৌঁছে, বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের কাজ শুরু ক'রলেন। এখানে তিনি সবুজ তোতা, টুকান প্রভৃতির বহু নমুনা সংগ্রহ করেন এবং তাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন।

বীগ্‌লে-ক'রে সমুদ্র ভ্রমণের সময় তিনি জাল ফেলে সামুদ্রিক প্রাণীর বহু নমুনা সংগ্রহ করেন এবং তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যবেক্ষণ করেন। পাটাগোনিয়ায় গিয়ে বন্য লামার আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করেন। এই অঞ্চলেও তিনি অতীতের অতিকায় প্রাণীদের অনেক প্রস্তরীভূত কঙ্কাল (বা, জীবাশ্ম) দেখতে পান। এদের মধ্যে ছিল অতিকায় শ্লথ, লুপ্ত গ্লিপ্‌টোডন (আর্মাডিলোর আকৃতিবিশিষ্ট প্রাণী) এবং লুপ্ত প্যাকাইডার্মাটা।

অতীতের প্রাণীগুলি সব লুপ্ত হয়ে গেল কেন? এই প্রশ্নটি ডারউইনের চিন্তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে, এবং এই প্রশ্নের মীমাংসাকল্পেই তিনি পরবর্তী জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—"Certainly no fact in the long history of the world is so startling as the wide and repeated exterminations of its inhabitants,"

চিত্র ১১৭। একটি লুপ্ত প্রাণী—অতিকায় শ্লথ

একটানা পাঁচ বছর ধরে পৃথিবী পরিক্রমণ ও তথ্যানুসন্ধানের কাজ শেষ ক'রে বীগ্‌ল জাহাজ দেশের দিকে যাত্রা ক'রল, এবং ১৮৩৬ সালের ২রা অক্টোবর ইংল্যাণ্ডের ফল্‌মাউথ বন্দরে নোঙর ক'রল।

প্রখ্যাত জীবনীকার গিব্‌সন ডারউইনের এই অভিযান সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—"During the voyage of the Beagle, Darwin became impressed with certain facts which seemed to him difficult to reconcile with the idea that God had created each species separately. As the voyage proceeded and facts accumulated, Drawin was convinced that the old dogma could not be upheld. He saw quite clearly that all living things had been evolved through long ages from simpler forms of life."

সাতাশ বছর বয়সে ডারউইন দেশে ফিরলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ থেকে বিদায় নিলেন। সুদীর্ঘ পাচ বছর ধরে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে এলেন, তারই বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে আরও দু'বছর কেটে গেল। ১৮৩৯ সালে তাঁর প্রথম গ্রন্থ "A Naturalist's Voyage in the Beagle" প্রকাশিত হ'ল। আর এরই উপর ভিত্তি ক'রে তাঁর ভবিষ্যৎ গবেষক জীবনের সূত্রপাত হ'ল।
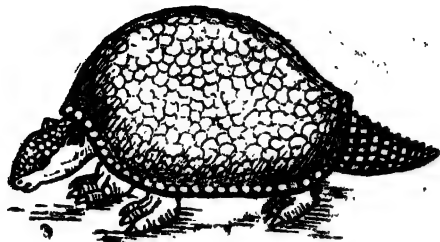
চিত্র ১১৮। আর একটি লুপ্ত প্রাণী—গ্লিপটোডন

প্রায় বিশ বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে এবং অসীম ধৈর্য-সহকারে তিনি তৎকালীন বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস উৎপাদনের উপযোগী আরও অনেক তথ্য সংগ্রহ করলেন এবং তাদেরই সাহায্যে ১৮৫৮ সালের মধ্যেই তিনি অভিব্যক্তিবাদ সম্পর্কে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। কিন্তু আরও তথ্যানুসন্ধান দ্বারা এ-বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় না হওয়া পর্যন্ত তাঁর এই মতবাদ বিজ্ঞানীমহলে প্রচার করা সমীচীন মনে করলেন না। এই সময় আল্‌ফ্রেড রাসেল ওয়ালেস, তাঁর মতামতের জন্যে তাঁর কাছে একটি গবেষণাপত্র পাঠালেন। এ-থেকেই ডারউইন সর্বপ্রথম জানতে পারলেন যে, ওয়ালেস স্বতন্ত্রভাবে গবেষণা ক'রে তাঁরই মত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এজন্যে ডারউইন আর অপেক্ষা করা সঙ্গত মনে করলেন না।

চিত্র ১১৯। আল্‌ফ্রেড রাসেল ওয়ালেস

লিনিয়ান সোসাইটির একটি সভায় ডারউইন প্রথমে ওয়ালেসের গবেষণা-পত্রটি পাঠ করলেন, তারপর এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব মতবাদ সকলের কাছে ব্যাখ্যা করলেন।

উভয়ের মতবাদের মধ্যে সাদৃশ্যের কথা যখন ওয়ালেস জানতে পারলেন, তখন ডারউইনের প্রতিভার কাছে নতি স্বীকার ক'রে সর্বপ্রকার বাদানুবাদ থেকে সরে দাঁড়িয়ে তিনি নিজের মহানুভবতারই পরিচয় দিলেন। এদিকে ডারউইন আর কালবিলম্ব না ক'রে, ১৮৫৯ সালের নভেম্বর মাসে, 'প্রজাতির উদ্ভব' (The origin of Species) নামক গ্রন্থে তাঁর নিজস্ব মতবাদ জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করলেন।

ডারউইনের মতে, বিভিন্ন রকম জীবের উদ্ভব পরস্পর থেকে স্বাধীনভাবে হয় নি। এক বিরামহীন মন্থর ক্রম-পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় সুদীর্ঘ কালপ্রবাহে তারা উদ্ভূত হয়েছে। একেই বলা হয় অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ (Evolution)। এই কালপ্রবাহ কয়েক লক্ষ, কয়েক কোটি, অথবা কোন কোনে ক্ষেত্রে শতকোটি বছর বলে হিসেব করা হয়েছে।

ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের প্রধান বুনিয়াদ হ'ল ছয়টি।

(i) **অত্যধিক বংশ-বিস্তার** (Over Production)—যে সব উদ্ভিদ্ ও প্রাণী বিরাজ করছে তাদের অনেকেরই অসংখ্য বংশধর দেখা যায়। কিন্তু সকল বংশধর শেষ পর্যন্ত বাঁচে না।

(ii) **প্রতিযোগিতা** (Competition)—এর প্রধান কারণ, যে সব সন্তান-সন্ততি জন্মায় তাদের মধ্যে খাদ্য ও বাসস্থান সংগ্রহের প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। এর ফলে অনেকেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

(iii) **জীবন-সংগ্রাম** (Struggle for existence)—জন্ম থেকেই জীব তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়, তাকেই বলা হয় জীবন-সংগ্রাম। এই সংগ্রাম তিন রকমের হতে পারে।

(ক) **অন্তঃপ্রজাতি সংগ্রাম** (Intra-specific Struggle)—খাদ্য ও বাসস্থান সংগ্রহের জন্যে, একই প্রজাতিভুক্ত জীবের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা, তাকেই অন্তঃপ্রজাতি সংগ্রাম বলা হয়।

(খ) **আন্তঃপ্রজাতি সংগ্রাম** (Inter-specific Struggle)—উপযুক্ত খাদ্য ও বাসস্থান সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে যে প্রতিযোগিতা, তাকেই আন্তঃপ্রজাতি সংগ্রাম বলা হয়। যেমন, বিড়াল ইঁদুর খায়, কিন্তু ইঁদুর পালিয়ে বাঁচে; কিংবা বাঘ হরিণ খায়, আর হরিণ ছুটে পালায়। এরা বিভিন্ন প্রজাতিভুক্ত প্রাণী, কিন্তু এদের মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক বিদ্যমান।

(গ) **প্রতিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম** (Environmental Struggle)—প্রখর রৌদ্র, অত্যধিক শীত, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি নানা প্রকার প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখার সংঘাতকেই প্রতিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম বুঝায়। প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে বেঁচে থাকাও এক কঠিন সমস্যা।

(iv) **প্রকারণ বা পরিবর্তনশীলতা** (Variation)—একই পিতামাতার সন্তান সকলে একই রকম হয় না, তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকে। এই পার্থক্যকে প্রকারণ (Variation) বলে। কিন্তু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাদের প্রজাতি যে এক —এ-কথা বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না। কেন না, তাদের মধ্যে পাথর্ক্য যেমন আছে, সাদৃশ্যও ঠিক তেমনিই আছে। অনুকূল প্রকারণ জীবন-সংগ্রামে টি'কে থাকার ব্যাপারে জীবকে সহায়তা করে।

(v) **প্রাকৃতিক নির্বাচন** (Natural Selection)—প্রকৃতিতে টি'কে থাকবার জন্যে অবিরত সংগ্রাম চলেছে (Struggle for Existence)। প্রকৃতি উপযুক্তকেই বেছে নেয়, অর্থাৎ যোগ্যতমেরই উদ্বর্তন ঘটে (Survival of the Fittest)। অনুকূল প্রকারণের কল্যাণে উপযুক্তরা বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু অনুপযুক্তরা জীবন-সংগ্রামে হেরে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে এবং অবলুপ্ত হয়।

(vi) **বংশগতি** (Heredity)—কোন একটি পরিবর্তন, বা প্রকারণ, এক পুরুষ থেকে উত্তর পুরুষে সঞ্চালিত হয়। ক্রমে তা একটি বংশগত গুণে পরিণত হয়, এবং বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হয়।

বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত বুঝতে পেরেছেন যে, এই পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব হওয়ার পর থেকে (প্রায় শতকোটি বছর) আজ পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে জীবন-ধারণের অবস্থা বারংবার পরিবর্তিত হয়েছে। যে-সব জীব জীবন-ধারণের নতুন অবস্থার সঙ্গে অভিযোজিত (Adapted) হতে পারে নি, তারা লুপ্ত হয়ে গেছে। আর যারা অভিযোজিত হতে পেরেছে, তারাই টি'কে রয়েছে। বর্তমানে জীবিত যে-সব প্রজাতি দেখা যায়, তারা সকলেই সুদূর অতীতে এই পৃথিবীতে যে-সব উদ্ভিদ্ বা প্রাণী ছিল, তাদেরই পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত বংশধর ছাড়া কিছুই নয়।

জীবদেহে পরিবর্তন না হলে অভিব্যক্তি কখনই সম্ভব হ'ত না। কোন একটি পরিবর্তন বংশগতি অনুসারে উত্তর পুরুষের মধ্যে সঞ্চালিত হতে পারে। কিন্তু তা-বলে প্রত্যেকটি পরিবর্তনই যে এইভাবে উত্তর পুরুষে সঞ্চালিত হবে তার কোন

নিশ্চয়তা নেই। জীব-জগতে কোন প্রজাতির মধ্যে একটি পরিবর্তন বংশ-পরম্পরায় স্থায়ী হলে তবেই বলা যায় যে, অভিব্যক্তি হয়েছে। কোন পরিবর্তন, তা যত কার্যকরী বা হিতকরই হোক না কেন, যদি বংশগতি অনুসারে উত্তর-পুরুষে সঞ্চালিত না হয়, তবে অভিব্যক্তি হয়েছে একথা বলা যায় না।

কোন্ পরিবর্তন হিতকর বলে স্থায়ী হবে, অথবা অহিতকর বলে বর্জিত হবে, তা প্রাকৃতিক নির্বাচন অনুসারে নির্ধারিত হয়। কোন একটি জীবের মধ্যে তার পক্ষে অহিতকর কোন নতুন বিশেষত্ব দেখা দিলে, জীবটি অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই বিশেষত্বটি যদি হিতকর হয়, তবে জীবটি পূর্ণবয়স অবধি বেঁচে থাকতে এবং বংশ-বিস্তার করতে সক্ষম হয়। তখন এই নতুন বিশেষত্বটি বংশগতি অনুসারে উত্তর-পুরুষে সঞ্চালিত হয়। এইভাবে নতুন বিশেষত্বটি প্রজাতিটির পরিবর্তনে এবং তার ফলে জীবের ক্রমবিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ডারউইনই প্রথম বিজ্ঞানী যিনি জীব-জগতের সাধারণ নিয়ম রূপে প্রাকৃতিক নির্বাচনের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। এটিই জীব-বিজ্ঞানে আবিষ্কৃত প্রথম সর্বব্যাপ্ত এবং সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সাধারণ নিয়ম।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল, বাহ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে যে-সব জীব সহজেই অভিযোজিত হয়, তাদের প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্য দিয়েই ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়াটি স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটে থাকে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। এই ব্যাপারে অলৌকিক, রহস্যময় বা ঐশ্বরিক বলে কিছু নেই। কাজেই ডারউইনের এই মতবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবের উদ্ভব-সম্পর্কিত কল্পনাশ্রিত ধর্মীয় মতগুলি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে গেল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

অভিব্যক্তিবাদের স্বপক্ষে প্রমাণসমূহ

অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশের এই কাহিনী কি শুধুই কল্পনাশ্রিত? তা নয়। এর সমর্থনে এতো ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া গেল যে, এই মতবাদ গ্রহণ করতে কারও মনে আর কোনো সংশয় রইল না। এইসব প্রমাণের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রমাণগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

(১) ফসিল বা জীবাশ্ম সম্পর্কিত প্রমাণ ঃ

এই পৃথিবীর বুকে যুগ যুগ ধরে যে-সব পলি-পাথরের স্তর সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলি যেন অতীত ইতিহাসের এক-একটি পৃষ্ঠা। আর তার মধ্যে যে-সব ফসিল (Fossil) বা জীবাশ্ম তৈরি হয়ে আছে, তাদের সাহায্যেই এক সাংকেতিক ভাষায় লিখিত হয়ে আছে, অতীতের জীবদের সম্পর্কে এক বিস্ময়কর কাহিনী। সুদূর অতীতের নানা প্রকার উদ্ভিদের অথবা প্রাণীর প্রস্তরীভূত দেহাবশেষকেই সাধারণভাবে ফসিল (Fossil) বা জীবাশ্ম বলা হয়।

পৃথিবীতে যা কিছু ঘটেছে, তারই ছাপ রয়ে গেছে অতীতের এক-একটি ভূমি-স্তরে। বই পড়ে যেমন ইতিহাসের কথা জানা যায়, আমাদের এই মাটির পৃথিবীর ইতিহাস জানতে হলেও তেমনি এইসব ভূমিস্তর অধ্যয়ন করতে হয়। পৃথিবীর ইতিহাসের বিরাট বইখানি পড়তে হলে এইসব ঐতিহাসিক চিহ্নগুলি সংগ্রহ করা দরকার, সেগুলি অধ্যয়ন করা দরকার। তবে এইসব চিহ্ন খুঁজে বের করা যেমন কঠিন, তেমনি কঠিন এইসব চিহ্নের মর্ম উপলব্ধি করা। আরও মুস্কিলের কথা এই যে, বইখানা আর আস্ত নেই। ছাড়া ছাড়া ভাবে এখানে ওখানে হয়তো দু'-একখানা ছেঁড়া-খোড়া পাতা পাওয়া গেছে, নয়তো পাওয়া গেছে ছাড়া ছাড়া দু'একটি অক্ষর। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বহু শ্রম ও সময় ব্যয় ক'রে ঐতিহাসিক দলিলপত্রের এই মূল্যবান টুকরোগুলি একত্র ক'রে গড়ে তুলেছেন এই পৃথিবীর এক বিচিত্র ইতিহাস। এই ইতিহাস যেমন রহস্যময়, তেমনি রোমাঞ্চকর।

এক যুগ ধরে যে-সব পলিমাটির স্তর জমা হয়, তাই পরবর্তী যুগে কঠিন পাথরে পরিণত হয়। সুদূর অতীতে নদী, হ্রদ বা অগভীর সমুদ্রের তলায় যে-সব জীবদেহ সঞ্চিত হয়, তাদের দেহের কোমল অংশ (মাংস) তাড়াতাড়ি পচে গলে নষ্ট হয়ে
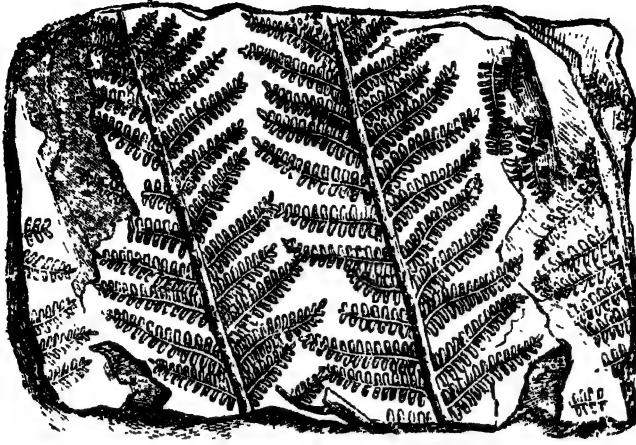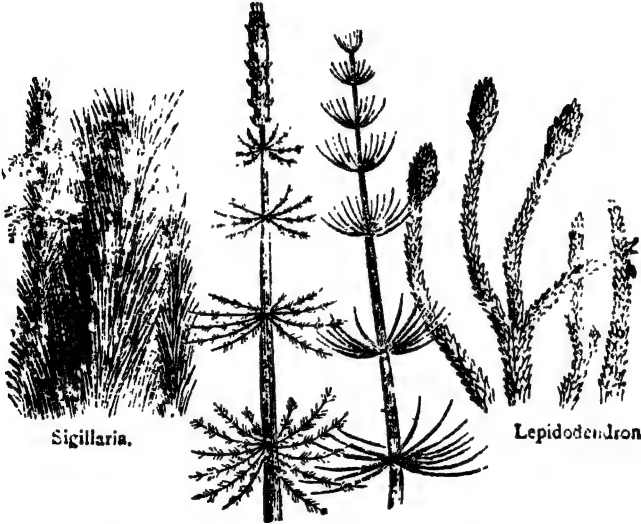
চিত্র ১২০। কয়লার স্তরে প্রাপ্ত কয়েক প্রকার জীবাশ্ম-উদ্ভিদের নমুনা।

যায়, কিন্তু দেহের কঠিন অংশ, যেমন—খোলস, কঙ্কাল, দাঁত ইত্যাদি বহুকাল ধরে অবিকৃত থাকে। এইসবের উপরে ধীরে ধীরে বালি ও মাটির স্তর সঞ্চিত হয়। এই স্তরগুলি সুদীর্ঘকাল ধরে রূপান্তরিত হয়ে শেষে নানাপ্রকার পলি-পাথরের স্তরে পরিণত হয়েছে, আর তারই মধ্যে হয়তো সংরক্ষিত হয়ে আছে এক-একটি জীবের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল। বিজ্ঞানী এরই নাম দিয়েছেন ফসিল (Fossil) বা জীবাশ্ম।

কোন কোন ক্ষেত্রে ঐসব পলি-পাথর খনিজরূপে আহরণ করা হয় তাই মাঝে মাঝে এইরূপ কোন খনি থেকে হঠাৎ হয়তো এক-একটি জীবাশ্ম বেরিয়ে পড়ে। আবার কোথাও হয়তো জল-বাতাসের ক্রিয়ায় এইসব পলি-পাথরের স্তর ক্ষয়ে যায়, আর তারই ফলে হঠাৎ হয়তো এক-একটি জীবাশ্ম অনাবৃত হয়ে পড়ে। তখন সেই জীবাশ্ম দেখেই বিজ্ঞানীরা অতীতের প্রাণীটির দেহের আকৃতি এবং তার আচার-ব্যবহার সম্পর্কে খানিকটা আন্দাজ করতে পারেন। আর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ঐ জীবাশ্মের বয়স নির্ধারণ করে তাঁরা বুঝতে পারেন, কোন্ যুগে ঐ জীবটি পৃথিবীতে বিচরণ ক'রত। ইংরেজীতে বলে, "Seeing is believing". এসব ক্ষেত্রে কল্পনা অথবা অনুমানের কোন স্থান নেই। প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসেবে সকলেই এগুলি মেনে নিতে বাধ্য হন।

চিত্র ১২১। ট্রাইলোবাইটের জীবাশ্ম।

ফসিল বা জীবাশ্মের নিদর্শন অবশ্য খুব বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় নি। কাজেই ক্রমবিকাশের ধারাগুলি সব সময় সংশয়াতীতরূপে প্রমাণিত হয় নি। অনেক ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানীদের নির্ভর করতে হয়েছে শুধু অনুমানের উপর। প্রাচীন পৃথিবীর অধিকাংশ জীবের দেহই যে জীবাশ্মে পরিণত হতে পারে নি, তার কারণ দু'টি। প্রধান কারণ, তাদের অনেকের দেহেই কঠিন অংশ (যেমন, খোলস, বা, হাড়) ছিল না। দ্বিতীয় কারণ, দেহে কঠিন অংশ থাকলেও সেগুলি হয়তো মাটি বা পাথরের নীচে ঠিক মতো ঢাকা পড়ে নি। তাই বহুকাল ধরে ভূ-পৃষ্ঠে অনাবৃত অবস্থায় পড়ে থেকে, জলবায়ুর ক্রিয়ায়, ধীরে ধীরে সেগুলি নষ্ট হয়ে গেছে।

কতকগুলি অমেরুদণ্ডী কম্বোজের (শামুক-জাতীয় প্রাণীর) চিহ্ন সংরক্ষিত হয়ে

আছে এক অদ্ভুত উপায়ে। প্রাণীটির দেহের কোমল অংশ নষ্ট হয়ে গেলেও তার শক্ত খোলসটি হয়তো পলিমাটি বা বালিদ্বারা পূর্ণ হয়। তারপর খোলসের উপরেও

চিত্র ১২২। দৈত্যাকার অ্যামোনাইট (Ammonite)-এর জীবাশ্ম। প্রকৃত আকার, এর দশ গুণ। [A Guide to the Geological Galleries of the Indian Museum—পুস্তিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত।]

পলি জমতে থাকে। এই অবস্থায় সবকিছু একসময় জমাট বেঁধে যায়। এরপর প্রাকৃতিক কোনো অ্যাসিডের ক্রিয়ায় হয়তো খোলসটিও একদিন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু পাথরের মধ্যে তার সুন্দর একটি ছাঁচ (Mould) রয়ে গেছে। ঠিক এইভাবে অনেকরকম গাছের পাতা, ট্রাইলোবাইট, ক্রুস্টেসিয়ান, সামুদ্রিক মাছ প্রভৃতির চিহ্ন সংরক্ষিত হয়ে আছে পাথরের বুকে। আবার অতীতে কাদামাটির বুকে পাখি এবং ডাইনোসরের যে-সব পায়ের ছাপ
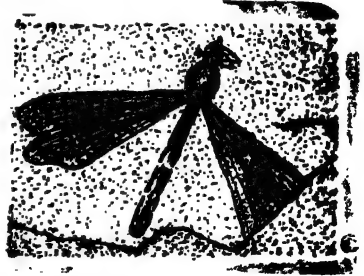
চিত্র ১২৩। জল-ফড়িংয়ের জীবাশ্ম।

পড়েছিল, কিংবা অতিকায় জল-ফড়িংয়ের ডানার ছাপ পড়েছিল, সে-সবও অনেক

চিত্র ১২৬। অতীতের অতিকায় ডাইনোসরের জীবাশ্ম। মাংসাশী প্রাণীদের মধ্যে এদের আকারই ছিল সবচেয়ে বড়। তাছাড়া এরা ছিল অত্যন্ত হিংস্র এবং দারুণ অত্যাচারী। তাই সঙ্গত কারণেই এরূপ প্রাণীর নাম দেওয়া হয় টিরানোসরাস (Tyrannosaurus)।
[নিউ-ইয়র্কের মিউজিয়ামে সংরক্ষিত।]

কারণ, এইসব চিহ্ন দেখেই জীবটির দৈহিক গঠন সম্বন্ধে অনেকখানি আন্দাজ করা যায়। এজন্য এগুলিও বিজ্ঞানীদের কাছে খুবই মূল্যবান।

আর একটি বিস্ময়কর সংবাদ এই যে, সাইবেরিয়ার এক তুষারাবৃত অঞ্চলে সুদূর অতীতের একটি ম্যামথের দেহ আবিষ্কৃত হয়েছে। খুবই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রাণীটি সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত হয়েছিল বরফ-স্তূপের মধ্যে। বরফ সরে যাওয়ায়, এটি মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়। এই ম্যামথটির গায়ের চামড়া, মাংস, এমন কি লোমগুলি পর্যন্ত, অবিকৃত রয়েছে। এটি কিন্তু ঠিক ফসিল নয়, এ যেন প্রকৃতির হিমঘরে সংরক্ষিত একটি অবিকৃত প্রাণী। সেখানকার প্রচণ্ড ঠাণ্ডার জন্য এর দেহের কোনো অংশ পচে গলে নষ্ট হতে পারে নি। বিজ্ঞানীদের কাছে এই আবিষ্কারের মূল্য অত্যন্ত বেশী। কারণ, ক্রমবিকাশের ধারায় এ একটি অত্যন্ত মূল্যবান সংযোজন।
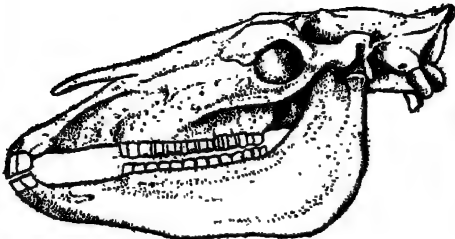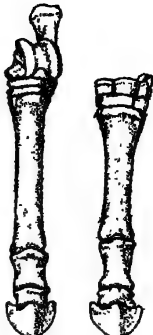
ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্তরে প্রাপ্ত জীবাশ্মগুলি পরীক্ষা করলে স্পষ্ট বোঝা যায়, যে নমুনা যত প্রাচীন সেই নমুনা তত বেশী আদিম (Primitive), অর্থাৎ কম বৈশিষ্ট্যময়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, উত্তর-আমেরিকায় কয়েক মাইল গভীর শিলাস্তরের

চিত্র ১২৭। ব্যাভেরিয়ার অন্তর্গত সোলেনহভেনে প্রাপ্ত শিলাজতু (Shale)-তে অবস্থিত আদি-পাখি আর্কিঅপ্‌তেরিক্স-এর জীবাশ্ম।

নীচে অবস্থিত হুরোনিয়ান শিলাস্তরে (Huronian formation) পাওয়া গেছে, শুধু কয়েক প্রকার সরল এককোষী সামুদ্রিক প্রাণী ও পোকার নিদর্শন, আর কিছুই নয়। এর পরবর্তীকালের শিলাস্তরে আছে মেরুদণ্ডী ছাড়া অন্যান্য প্রায় সবরকম প্রাণীর নমুনা। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল ট্রাইলোবাইট (Trilobite), যা একদিকে কীট (বা, পোকা) এবং অন্যদিকে রাজ-কাঁকড়ার (King-crab) মধ্যে সেতুবন্ধন করেছে।

আরও পরবর্তীকালের শিলাস্তরে সর্বপ্রথম ডাঙ্গার উদ্ভিদের নমুনা পাওয়া গেছে। অপরদিকে প্রবাল ও শম্বুক-জাতীয় প্রাণীর নমুনার সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়েছে।

চিত্র ১২৮। ঘোড়ার ক্রমবিকাশ। [বিভিন্ন পর্যায়ে প্রাপ্ত জীবাশ্ম অনুযায়ী।]
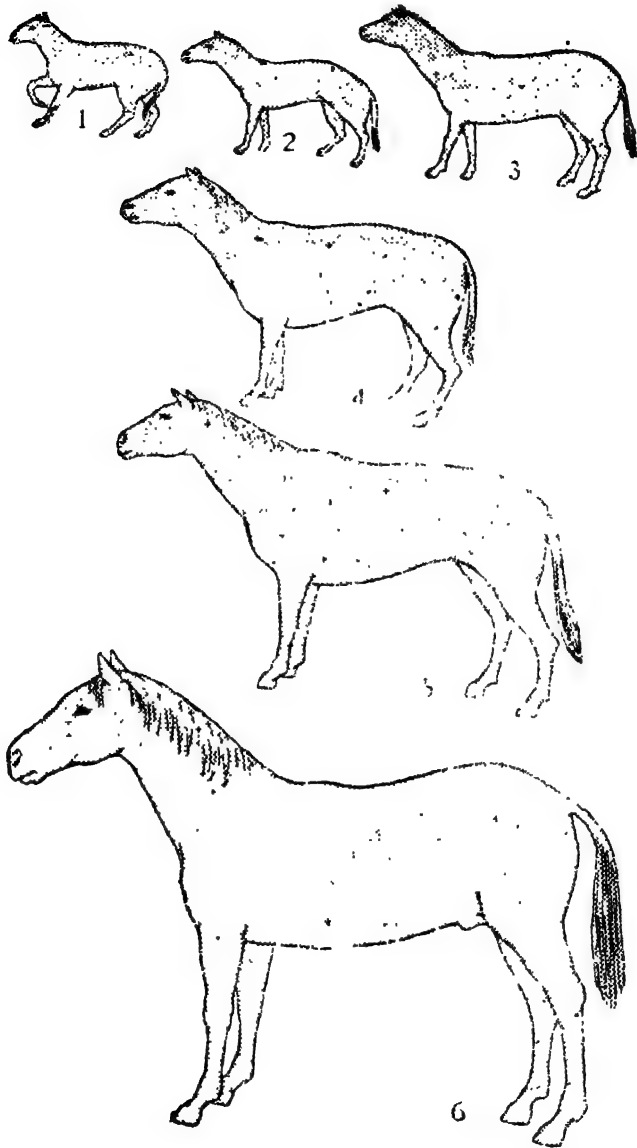
চিত্র ১২৯। ঘোড়ার ক্রমবিকাশ (প্রাপ্ত জীবাশ্ম অনুযায়ী পুনর্গঠিত)। প্রায় শিয়ালের আকারের পূর্ব-পুরুষ থেকে আরম্ভ ক'রে আধুনিক ঘোড়ার উদ্ভব এখানে দেখানো হয়েছে।

1. ইওসিন পর্যায়ের ঘোড়া—ইওহিপ্পাস্ (Eohippus)। উচ্চতা প্রায় এক ফুট। এর সামনের পায়ে চারটি ক'রে এবং পিছনের পায়ে তিনটি ক'রে পদাঙ্গুলি (toe) ছিল।

2. ওলিগোসিন পর্বায়ের ঘোড়া—মেসোহিপ্পাস্ (Mesohippus)। উচ্চতা প্রায় দু'ফুট। এর প্রত্যেক পায়ে তিনটি ক'রে পদাঙ্গুলি (toe) ছিল, আর পাশের অঙ্গুলি দু'টিও ভূমি স্পর্শ ক'রে থাকতো।

3. মাইওসিন পর্বায়ের ঘোড়া—মেরিচহিপ্পাস্ (Merychippus)। উচ্চতা প্রায় ৪০ ইঞ্চি, বা সাড়ে তিন ফুট। এরও প্রত্যেক পায়ে তিনটি ক'রে পদাঙ্গুলি (toe) ছিল, কিন্তু পাশের অঙ্গুলি দু'টি ভূমি স্পর্শ ক'রত না।

4. প্লাইওসিন পর্বায়ের ঘোড়া—প্লাইওহিপ্পাস্ (Pleiohippus)। উচ্চতা প্রায় চার ফুট। এর প্রত্যেক পায়ে মাত্র একটি ক'রে পদাঙ্গুলি (toe) ছিল। এই অঙ্গুলি খুরে পরিণত হয়েছিল।

5. প্লাইস্টোসিন পর্বায়ের ঘোড়া—ইকুয়াস্ স্কটি (Equus Scotti)। উচ্চতা প্রায় পাঁচ ফুট। এরও প্রত্যেক পায়ে মাত্র একটি ক'রে পদাঙ্গুলি (toe) ছিল, এবং তা খুরে পরিণত হয়েছিল।

6. সমকালীন ঘোড়া (Equus modern)।

মেরুদণ্ডী প্রাণীর সবচেয়ে প্রাচীন যে-সব নমুনা পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে আছে, প্রাচীন মৎস্য এবং হাঙর। আরও চার রকম যে-সব মেরুদণ্ডী প্রাণী বর্তমানে দেখা যায়, তাদের মধ্যে উভচরের আবির্ভাব হয়েছে সরীসৃপের আগে। তেমনি সরীসৃপ এসেছে পাখির আগে। আর পাখি স্তন্যপায়ীর আগে। এসব বিষয়ে বিজ্ঞানীদের মনে এখন আর কোনো সংশয় নেই।

সৌভাগ্যবশতঃ অল্প হলেও যে কয়টি জীবাশ্ম আজ অবধি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, তাদের সাহায্যেই সুদূর অতীত কাল থেকে আজ পর্যন্ত ক্রমবিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হয়েছে। শুধু তাই নয়, অন্ততঃ ঘোড়া এবং হাতির ক্ষেত্রে ক্রমবিকাশের ধারাটি সম্পূর্ণরূপে এবং নির্ভুলভাবে ধরা পড়েছে বিজ্ঞানীদের কাছে।

অতীতের জীবাশ্মগুলির সাহায্যে উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ সম্পর্কেও অনেক কথা জানা গেছে। শেওলা থেকে সপুষ্পক উদ্ভিদ্ পর্যন্ত ক্রমবিকাশের চিত্রটিও এখন বিজ্ঞানীদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

(২) অন্যান্য প্রমাণ ঃ

অভিব্যক্তিবাদের স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় প্রমাণ হ'ল ভূমিস্তরে প্রাপ্ত জীবাশ্মগুলি, একথা সত্যি। কিন্তু এসব ছাড়া আরও কতকগুলি প্রমাণ আছে, যেগুলি মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। এদের কথাও সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল।

(ক) অঙ্গ-সংস্থান সম্পর্কিত প্রমাণ (Morphological evidence) :

বেশীর ভাগ জীবেরই এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে, যার ফলে তাদের সহজেই এক-একটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন, কিছু উদ্ভিদ্ গোষ্ঠী আছে, যাদের মূল,

কাণ্ড, পাতা ও ফুলের আকৃতিতে অনেক সাদৃশ্য আছে। আবার কতকগুলি সপুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে কতকগুলি ধর্মের অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়; যেমন—মটর, শিম ইত্যাদি। তেমনি স্তন্যপায়ী মাত্রই কতকগুলি বিশিষ্ট ধর্মের অধিকারী; যেমন—কুকুর, বিড়াল, গরু, ঘোড়া, মানুষ ইত্যাদি। আবার উভচরের আকৃতি ও প্রকৃতিগত ধর্ম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এসব দেখে মনে হয় যে, ক্রমবিকাশের ফলে এক জাতীয় বিভিন্ন জীবের মধ্যেও হয়তো কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, কিন্তু তারা একই মূল থেকে উদ্ভূত ব'লে তাদের মধ্যে একটি মূল ঐক্য বজায় আছে। তাই তাদের এক-একটি পরিবারে ভাগ করা সম্ভব হয়েছে।

বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর দৈহিক গঠন তুলনা করলে দেখা যায় যে, সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের প্রাণী হলেও তাদের মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্য আছে। কোথাও কোথাও এই সাদৃশ্য প্রকটভাবেই বিদ্যমান, আবার কোথাও কোথাও প্রচ্ছন্নভাবে আছে। দু'একটি উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটি বোঝা যাবে।
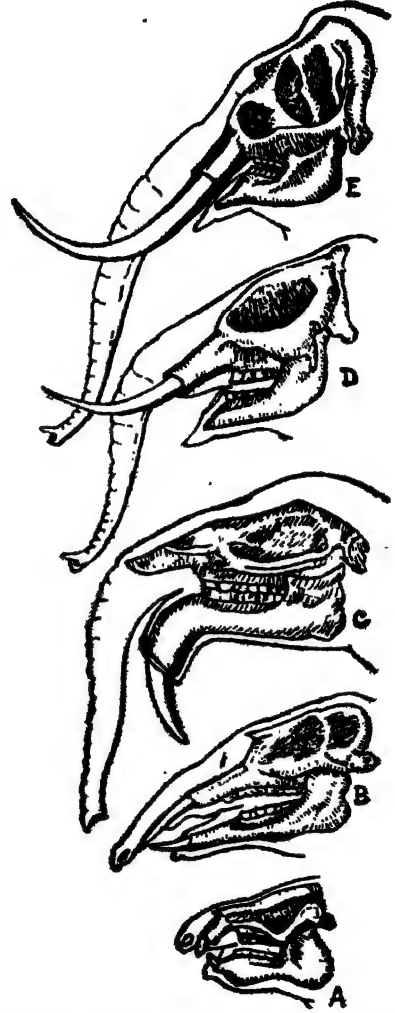
চিত্র ১৩০। হাতির পূর্ব-পুরুষদের করোটির ক্রমবিকাশ (প্রাপ্ত জীবাশ্ম অনুযায়ী)।

A. মেরিথেরিয়াম,
B. গম্‌ফোথেরিয়াম,
C. ডাইনোথেরিয়াম,
D. ষ্টেগোমাষ্টোডন,
E. মাষ্টোডন।

মাছ থেকে আরম্ভ ক'রে মানুষ পর্যন্ত প্রত্যেক প্রাণীরই মেরুদণ্ড (Vertebral column) আছে। এই মেরুদণ্ড তৈরি হয়েছে কতকগুলি কশেরুকা (Vertebra) দিয়ে। কশেরুকাগুলি মোটামুটিভাবে একই রকম। আবার সমস্ত মেরুদণ্ডী

প্রাণীরই চোখ আছে। আর এই চোখের গঠনও অবিকল একরকম। একটি মাছের চোখের গঠন ভালভাবে জানা থাকলে দেখা যাবে যে, মানুষের চোখের গঠনও জানা
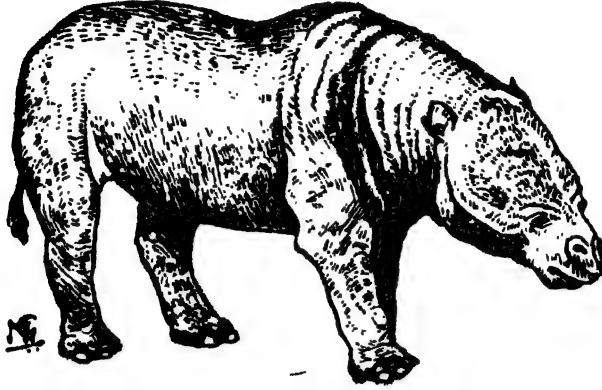
চিত্র ১৩১। হাতির সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পূর্ব-পুরুষ—মেরিথেরিয়াম (Meritherium)—ইওসিন পর্যায়। এর আকৃতি ছিল একটি বিরাট বরাহের মতো। এর শুঁড় ছিল না, প্রদন্তও ছিল না।

গেছে। একটি পাখির ডানা আর মানুষের হাত, কিংবা তিমির পাখনা, পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, সব ক'টির মধ্যে একই রকমের অস্থি আছে, আর এসব অস্থির সংস্থানও একরকম। তবে তাদের আয়তন বিভিন্ন রকম। এরূপ সাদৃশ্য কি ক'রে সম্ভব হল? জীব-বিজ্ঞানীর মতে, এরা সবাই একই পূর্ব-পুরুষ থেকে উদ্ভূত। জীবন
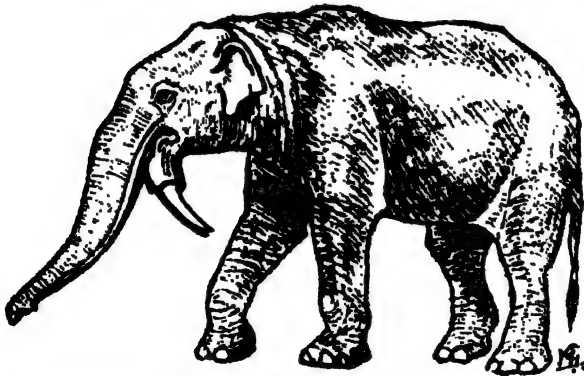
চিত্র ১৩২। ডাইনোথেরিয়াম (Deinothrium) (প্রায় আড়াই কোটি বৎসর পূর্বে)। এর আকার ছিল প্রায় সমকালীন হাতির মতো। কিন্তু এর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এর নীচের পাটির সামনের দু'টি দাঁত বৃহৎ প্রদন্তে (tusks) পরিণত হয়েছিল। এগুলি ছিল নীচের দিকে ঈষৎ বাঁকানো।

ধারণের প্রয়োজনে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করার ফলেই তাদের চেহারা বিভিন্ন রকম হয়ে গেছে।

অভিব্যক্তিবাদের স্বপক্ষে আর একটি প্রমাণ দেওয়া হয় অপুষ্ট অঙ্গ (Vestigial organ) থেকে। একটি বিশেষ অঙ্গ হয়তো একটি প্রাণীর দেহে আছে, একটি বিশেষ কাজের জন্য। সেই একই অঙ্গ অপুষ্ট ভাবে বিরাজ করছে আর একটি প্রাণীর দেহে, কিন্তু সেখানে তার কোনো কাজই নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, উটপাখি, এমু ইত্যাদির ডানার কথা। এদের ডানা এতো ছোট
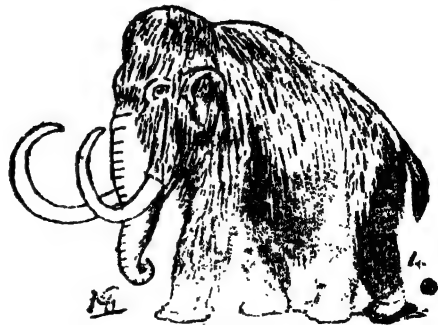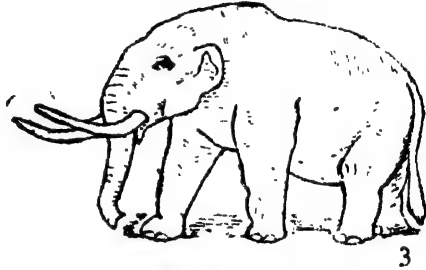
চিত্র ১৩৩। হাতির ক্রমবিকাশ (প্রাপ্ত জীবাশ্ম অনুযায়ী পুনর্গঠিত)।

1. গমফোথেরিয়াম (Gomphotherium) (এক থেকে দেড় কোটি বৎসর পূর্বে)। এর উপরের পাটিতে দু'টি এবং নীচের পাটিতে দু'টি, মোট চারটি, প্রদন্ত (tusks) ছিল।

2. ষ্টেগোমাস্টোডন (Stegomastodon) (মাইওসিন পর্যায়)। এর উপরের পাটিতে দু'টি বৃহৎ প্রদন্ত (tusks) ছিল।

3. মাস্টোডন (Mastodon) (প্লাইস্টোসিন পর্যায়)। এর আকৃতি অনেকাংশে আধুনিক হাতির মতো হয়ে উঠেছিল।

4. লোমশ ম্যামথ (Woolly mammoth)—এও ছিল অনেকাংশে আধুনিক হাতির মতো।

যে, নেই বললেই চলে। এরা পাখির স্বগোত্র, কিন্তু অন্যান্য পাখির মতো এরা উড়তে পারে না। আর ওড়ার প্রয়োজনও নেই। কারণ, ওড়ার বদলে এরা খুব

চিত্র ১৩৪। সাইবেরিয়ার এক তুষারাবৃত অঞ্চলে প্রাপ্ত ম্যামথের ফসিল বা জীবাশ্ম। সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত হয়ে ছিল। এটি কিন্তু ঠিক ফসিল বা জীবাশ্ম নয়, এ যেন প্রকৃতির হিমঘরে সংরক্ষিত একটি অবিকৃত প্রাণী।
['জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

জোরে দৌড়তে পারে। তাই ডানার বদলে এদের পা সুগঠিত। তবুও পূর্ব-পুরুষের দেওয়া ডানা দু'টি রয়ে গেছে, যদিও অকেজো হয়ে। কারণ, এগুলি অপুষ্ট। এই রকম আর একটি প্রাণী হ'ল নিউজিল্যাণ্ডের কিউই পাখি। এর ডানা এতো অপুষ্ট যে দেখাই যায় না, পালকের নীচে ঢাকা থাকে। এ উড়তে পারে না। এর সরল পালক দেখতে মোটা ও কর্কশ লোমের মতো। স্ত্রী-পাখি একবারে একটি ক'রে ডিম পাড়ে। মুরগির আকারের পাখির তুলনায় ডিমের আকার (৫×৩ ইঞ্চি) কিন্তু বেশ বড়। আবার মানুষের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ-অন্ত্রের সংযোগস্থলে আছে নিষ্ক্রিয় 'অ্যাপেন্‌ডিক্‌স' (Appendix), আর অন্যান্য তৃণভোজী প্রাণীর দেহে আছে সক্রিয় 'সিকাম' (Cæcum)। কুকুর, বিড়াল, গরু, ঘোড়া, ছাগল প্রভৃতি প্রাণীরা সহজেই তাদের কান নাড়াতে পারে। এটা সম্ভব হয় কতকগুলি মাংসপেশী থাকার ফলে। এই মাংসপেশীগুলি মানুষের কানের সঙ্গেও আছে, তবে অত্যন্ত অপুষ্ট অবস্থায়। তাই আমরা এইসব পেশীর সাহায্যে আমাদের কান নাড়াতে পারি না। মানুষের দেহে এইরূপ অপুষ্ট অঙ্গ আরও আছে। এইসব অপুষ্ট অঙ্গের উপস্থিতি কিভাবে সম্ভব
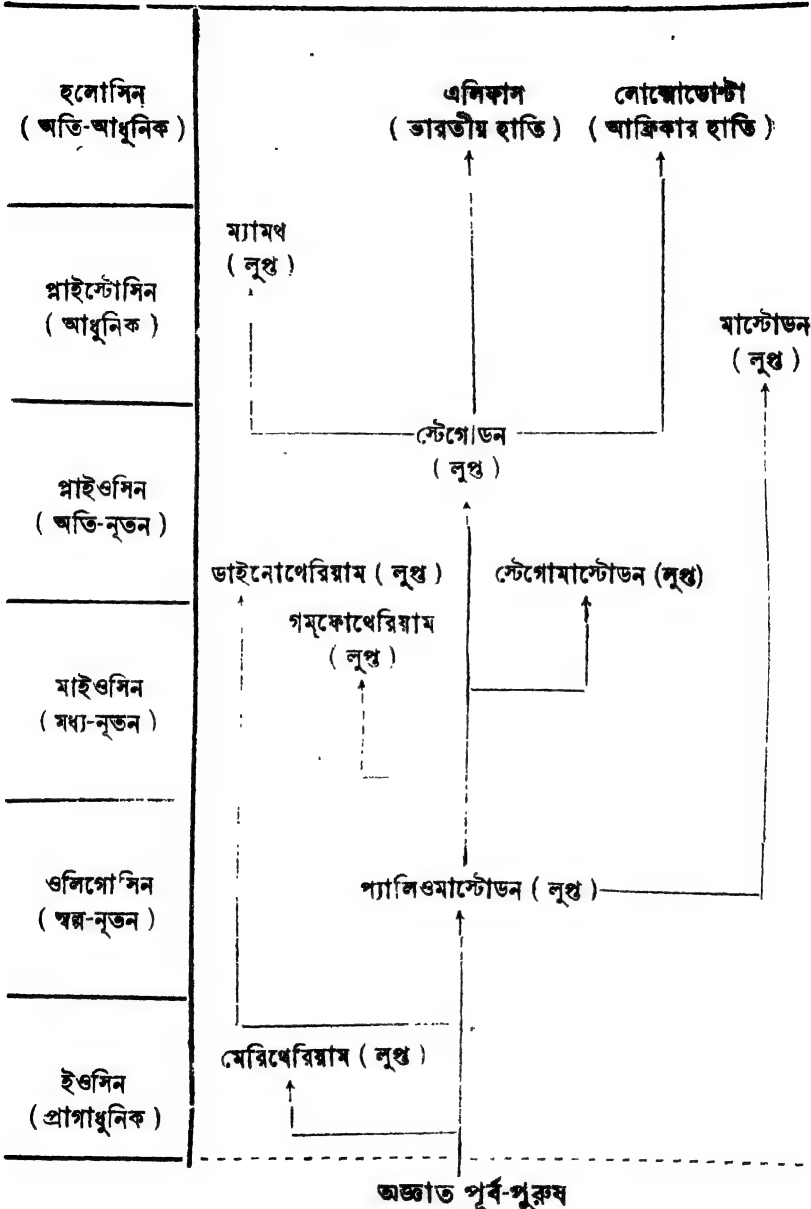
বিজ্ঞানীদের পরিকল্পিত, হাতির ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত তালিকা (Chart)।

চিত্র—১৩৫

হ'ল ? এর উত্তরে বলা যায় যে, এই প্রাণীগুলি একই পূর্ব-পুরুষের সন্তান-সন্ততি। উত্তরাধিকার সূত্রে এইসব অঙ্গ লাভ করেছে, কিন্তু ক্রমাগত অব্যবহারের ফলে সেগুলি অপুষ্ট রয়ে গেছে।

(খ) ভ্রূণ-সম্পর্কিত প্রমাণ (Embryological evidence) :

বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর ভ্রূণগুলির মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য ক'রে বিজ্ঞানীরা

চিত্র ১৪০। বিভিন্ন প্রাণীর ভ্রূণ, এবং তাদের ক্রমবিকাশ

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেছেন। এই সাদৃশ্য এতো বেশী যে, অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীর পক্ষেও একটি ভ্রূণ দেখে তাকে সনাক্ত করা একরূপ অসম্ভব বললেই চলে। কেবলমাত্র সাদৃশ্যই নয়, আরো বিস্ময়কর সংবাদ জানা যায় ভ্রূণ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করলে। যেমন, প্রতিটি অঙ্গ একইভাবে গড়ে ওঠে। আবার ভ্রূণের সূচনা থেকে পরিণতি পর্যন্ত লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, উন্নততর প্রাণীর ভ্রূণ, পরিণতির পথে, নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর ভ্রূণের বিশেষত্ব প্রকাশ করে। যেমন, মানুষের ভ্রূণাবস্থায় মাছের মতো ফুল্‌কা দেখা যায়, অবশ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়ে যায়। ভ্রূণ-গত সাদৃশ্য লক্ষ্য ক'রে গত শতাব্দীতে হেকেল এক মতবাদ প্রচার করেন (Biogenetic law)। সংক্ষেপে তা এইরূপ—ব্যক্তিজনি জাতিজনির পুনরাবৃত্তি মাত্র (Ontogeny

repeats phylogeny)। অর্থাৎ, কোনো একটি প্রাণীর গড়ে ওঠার ইতিহাস, সেই শ্রেণীর প্রাণীর গড়ে ওঠার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি মাত্র।

(গ) হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রমবিকাশ (Evolution of heart) :

অ্যাম্ফিওক্সাস-এর মতো আদিম কর্ডাটায় রক্ত-সংবহনের যন্ত্র খুবই আদিম। এক্ষেত্রে একটি সঙ্কোচনশীল রক্তবহা নালী রক্তকে সামনের দিকে ঠেলে দিতে পারে। এই সামান্য সূচনা থেকেই বিভিন্ন প্রাণীর দেহে অবস্থিত হৃদ্‌যন্ত্র ক্রমশঃ জটিল হয়ে উঠেছে, এবং এইভাবে শেষ পর্যন্ত স্তন্যপায়ীদের চার-কুঠুরি-বিশিষ্ট হৃৎপিণ্ডের উদ্ভব হয়েছে। এ থেকেই জীবের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা করা যায়।

চিত্র ১৪১। প্রাণীর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রমবিকাশ

যে-কোন হৃৎপিণ্ড প্রধানতঃ দু'রকম কুঠুরি দ্বারা গঠিত—পাতলা-দেওয়ালযুক্ত কক্ষ, যেখানে দেহের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রত্যাগত রক্ত গৃহীত হয়, এবং মোটা পেশীবহুল কক্ষ, যেখান থেকে রক্ত প্রেরিত হয়। এগুলি ভাল্‌ভ (Valve) বা কপাটিকা দ্বারা এমনভাবে পৃথক্ করা থাকে, যাতে পেশীযুক্ত কক্ষ সঙ্কুচিত হওয়ার সময় রক্ত পিছনদিকে ফিরে যেতে না পারে। পাখি এবং স্তন্যপায়ীদের হৃৎপিণ্ডে দু'রকম পাম্প কাজ করে—একরকম পাম্পের ক্রিয়ায় রক্ত ফুসফুসে গিয়ে বায়ুর অক্সিজেন গ্রহণ করে, আর একরকম পাম্পের ক্রিয়ায় অক্সিজেন-বহুল রক্ত দেহের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে পৌছায়, যাতে কোষে কোষে মৃদু-দহনক্রিয়া সম্পাদিত হতে পারে।

আদিম মেরুদণ্ডীর হৃৎপিণ্ডে তিনটি কুঠুরি দেখা যায়—একটি সাইনাস ভেনোসাস (Sinus Venosus), একটি অলিন্দ (Auricle) এবং একটি নিলয় (Ventricle)।

প্রথম কুঠুরির সাহায্যে রক্ত গৃহীত হয়, দ্বিতীয়টির সাহায্যে তা নিলয়ে পাঠানো হয়, আর নিলয়ের সাহায্যে ঐ রক্ত সামনের দিকে পাম্প ক'রে পাঠানো হয়।

মাছের হৃৎপিণ্ডের ভিতর দিয়ে শুধু শিরার রক্ত প্রবাহিত হয়। তার কারণ, হৃৎপিণ্ড থেকে যে দূষিত রক্ত পাম্প ক'রে ফুলকায় পাঠানো হয়, তা অক্সিজেনযুক্ত হয়ে সেখান থেকেই সারা দেহে প্রবাহিত হয় এবং তারপর (দূষিত রক্ত) শিরার ভিতর দিয়ে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। সেখান থেকে আবার ফুল্‌কায় যায়।

এরপর উভচর প্রাণীর দেহে ফুসফুসের আবির্ভাব হওয়ায় আর একটি নতুন এবং সংক্ষিপ্ত পথের সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে অক্সিজেন-বহুল রক্ত, সমগ্র দেহে প্রবাহিত হওয়ার পূর্বে, সোজাসুজি আবার হৃৎপিণ্ডেই ফিরে আসে। এক্ষেত্রে অলিন্দ একটি দেওয়াল দ্বারা দু'টি কক্ষে বিভক্ত। ডান অলিন্দ শিরার দূষিত রক্ত গ্রহণ করে, আর বাম অলিন্দ গ্রহণ করে ফুসফুস থেকে আগত অক্সিজেন-বহুল রক্ত। এক্ষেত্রে অলিন্দের মাঝের দেওয়ালটি সম্পূর্ণ, তা সত্ত্বেও একটি মাত্র নিলয় থাকায় সেখানে গিয়ে দু'রকম রক্ত বেশ খানিকটা মিশে যায়।

সরীসৃপের বেলায় নিলয়কে ভাগ ক'রে মাঝখানে একটি দেওয়াল দেখা যায়। এর ফলে অক্সিজেনহীন এবং অক্সিজেন-বহুল রক্ত পৃথক্‌ভাবে থাকতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ সরীসৃপের হৃৎপিণ্ডেই নিলয়ের এই দেওয়ালটি অসম্পূর্ণ। এজন্য এক্ষেত্রে দু'রকম রক্ত খানিকটা মিশে যায়।

পাখি ও স্তন্যপায়ীর ক্ষেত্রে অলিন্দ ও নিলয়ের মধ্যেকার দু'টি দেওয়ালই সম্পূর্ণ। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে পৃথক্ দু'টি অলিন্দ এবং পৃথক্ দু'টি নিলয়। এজন্য দু'রকম রক্ত মিশে যাওয়ার কোনো সম্ভবনা থাকে না। জীবের ক্রমবিকাশের দিক দিয়ে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এর ফলে পাখি ও স্তন্যপায়ীদের কোষে কোষে বেশী ক'রে অক্সিজেন সরবরাহ করা সম্ভবপর হয়েছে।

অনুরূপভাবে, মাছ, ব্যাঙ, গিরগিটি (সরীসৃপ) ও গিনিপিগের (বা, স্তন্যপায়ীর) মস্তিকের গঠনে বিবর্তনের ছাপ সুস্পষ্ট।

(ঘ) ভৌগলিক প্রমাণ (Geographical evidence) :

বর্তমান পৃথিবীতে ছ'টি মহাদেশ আছে, অ্যান্টার্কটিকা বা কুমেরু-মহাদেশকে ধরলে সাতটি। এদের মধ্যে আছে সীমাহীন সমুদ্রের দুস্তর ব্যবধান। একটি ভূখণ্ড তার গাছপালা ও প্রাণীসমূহ নিয়ে আর একটি ভূখণ্ড থেকে বিশাল সমুদ্র, পর্বতশ্রেণী বা মরুভূমি দ্বারা বিচ্ছিন্ন। তবুও সময় সময় এক দেশের গাছপালা বা প্রাণীর সঙ্গে
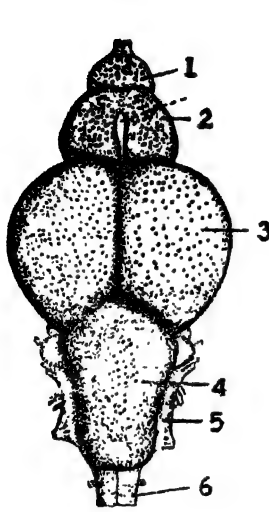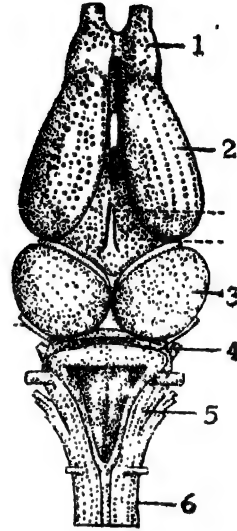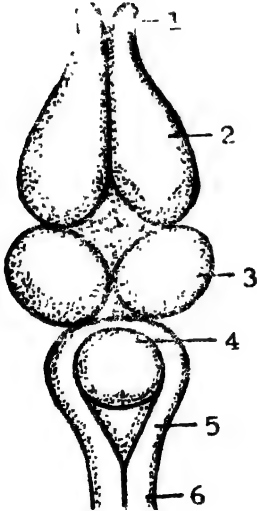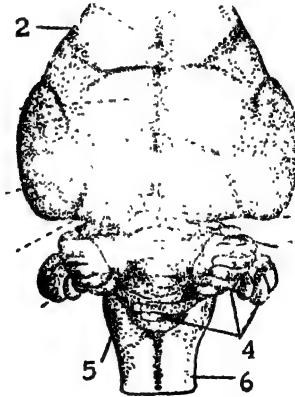
চিত্র ১৪২। কয়েকটি মেরুদণ্ডী প্রাণীর মস্তিষ্ক

1. ওল্‌ফ্যাক্টরি লোব (Olfactory lobe), বা ঘ্রাণকেন্দ্র। 2. গুরু-মস্তিষ্ক (Cerebrum), 3. অপটিক লোব (Optic lobe), বা দৃষ্টিকেন্দ্র, 4. লঘু-মস্তিষ্ক (Cerebellum), 5. সুষুম্নাশীর্ষ (Medulla oblongata), 6. সুষুম্নাকাণ্ড (Spinal cord)।
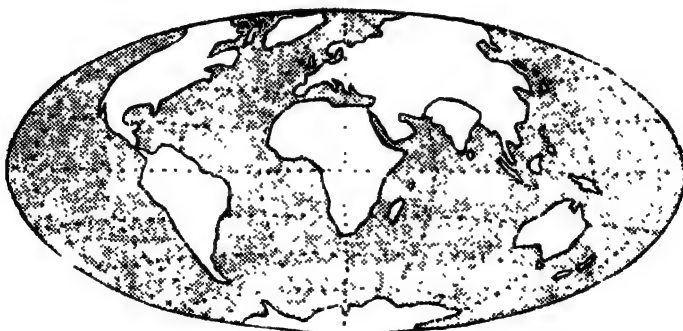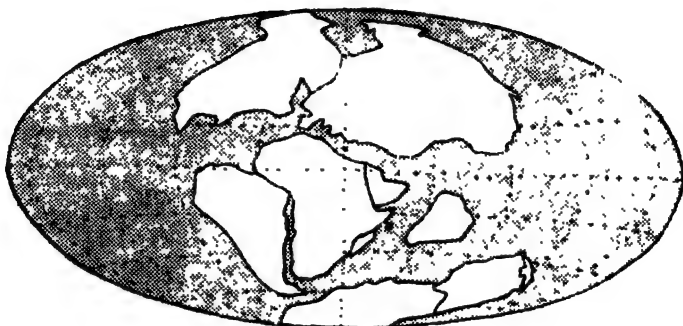
চিত্র ১৪৩। এখন আমরা ছ টি মহাদেশের কথা জানি, অ্যান্টার্কটিকা (বা, কুমেরু) মহাদেশ ধরলে সাতটি। এদের মধ্যে আছে সীমাহীন সমুদ্রের দুস্তর ব্যবধান। কিন্তু এইসব মহাদেশের শিলা, গাছপালা, জীবজন্তু প্রভৃতি অনেক জায়গায় একই রকম। এরকম মিল দেখে এখন অনেকেই মনে করেন যে, বহু কোটি বছর আগে এই মহাদেশগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কোন এক সময় সেটি খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল এবং তারপর খণ্ডগুলি একে অন্যের কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যেতে লাগল। তবে বর্তমানে এই গতিবেগ অত্যন্ত মন্থর। এই মতবাদের প্রধান প্রবক্তা হলেন জার্মান বিজ্ঞানী ভেগেনার (Wegener)।

(১) বিজ্ঞানীরা মনে করেন, প্রায় ২০ কোটি বছর আগে পৃথিবীর সব স্থলভাগ একসঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি মাত্র মহাদেশের সৃষ্টি করেছিল। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'প্যান্‌জিয়া' (Pangæa)। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, তখন অস্ট্রেলিয়া অ্যান্টার্কটিকার সঙ্গে যুক্ত ছিল, আর ভারতের অবস্থান ছিল আফ্রিকা এবং অ্যান্টার্কটিকার মাঝে।

(২) প্রায় সাড়ে তেরো কোটি বছর আগে, প্যান্‌জিয়া নিরক্ষরেখার ঠিক উপরেই পূর্ব-পশ্চিম বরাবর একটি ভ্রংস (Fault) ধরে বিভক্ত হয়ে যায়। সেই সঙ্গে উত্তর-আমেরিকা ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে, আর দক্ষিণ-আমেরিকা বিচ্ছিন্ন হতে থাকে আফ্রিকা থেকে। এদিকে ভারত উত্তরদিকে দ্রুত সরে যেতে থাকে, কিন্তু তখনও অস্ট্রেলিয়া যুক্ত ছিল অ্যান্টার্কটিকার সঙ্গে।

(৩) বর্তমান পৃথিবীতে বিভিন্ন মহাদেশের অবস্থান অনেকটা এই রকম। দুই আমেরিকা পশ্চিমদিকে সরে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়, আর পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধের মধ্যে রচিত হয় বিরাট অ্যাটলান্টিক বেসিন। এদিকে আফ্রিকা উপরদিকে সরে যায়, আর ভারত ছুটে গিয়ে এশিয়ার নিম্নভাগে ধাক্কা মারে। অস্ট্রেলিয়া অ্যান্টার্কটিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বর্তমান অবস্থানে সরে আসে, আর সেই সঙ্গে নিউগিনিকে আরও উপরদিকে ঠেলে দেয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, টেথিস সমুদ্রে যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত পদার্থ থেকে উৎপন্ন এবং স্তরে স্তরে বিন্যস্ত শিলারাশিই, আজ থেকে আনুমানিক সাড়ে তিন কোটি বছর আগে, গণ্ডোয়ানা ভূখণ্ডের চাপে সমুদ্র-তল থেকে উঠতে শুরু করে, এবং দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙ্গে-চুরে মোটামুটিভাবে বর্তমান হিমালয়ের আকার ধারণ করে, আজ থেকে প্রায় পনেরো লক্ষ বছর আগে।

পৃথিবীর মহাদেশগুলি যে ক্রমাগত ভেসে চলেছে, তার শক্তির উৎস কী? বিজ্ঞানীরা মনে করেন, পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ উত্তাপের প্রভাবেই ভাসমান মহাদেশগুলি এভাবে সরে সরে যাচ্ছে।

অপর দেশের গাছপালা বা প্রাণীর অদ্ভুত মিল দেখা যায়। ভেগেনার (Wegener) প্রমুখ বিজ্ঞানীরা এদের ভূতত্ত্ব, হিমবাহ-বাহিত উপলখণ্ডের স্তর, উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর জীবাশ্ম প্রভৃতির সাদৃশ্য লক্ষ্য ক'রে অনুমান করেন যে, কারবনিফেরাস যুগে এরা একই ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু নানাপ্রকার প্রাকৃতিক কারণে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, তারপর ধীরে ধীরে একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে।

বিজ্ঞানীদের মতে, প্রায় ২০ কোটি বছর আগে পৃথিবীর সব স্থলভাগ একসঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি মাত্র মহাদেশের সৃষ্টি করেছিল। এর নাম দেওয়া হয়েছে প্যান্‌জিয়া (Pangæa)। তখন অস্ট্রেলিয়া অ্যান্টার্কটিকার (বা, কুমেরু-মহাদেশের) সঙ্গে যুক্ত ছিল, আর ভারতের অবস্থান ছিল আফ্রিকা এবং অ্যান্টার্কটিকার মাঝে।

প্রায় ১৩½ কোটি বছর আগে, প্যান্‌জিয়া নিরক্ষরেখার ঠিক উপরেই পূর্ব-পশ্চিম বরাবর ভ্রংস (Fault) ধরে বিভক্ত হয়ে যায়। সেই সঙ্গে উত্তর-আমেরিকা ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে, আর দক্ষিণ-আমেরিকা বিচ্ছিন্ন হতে থাকে আফ্রিকা থেকে। এদিকে ভারত উত্তরদিকে দ্রুত সরে যেতে থাকে, কিন্তু তখনও অস্ট্রেলিয়া যুক্ত ছিল অ্যান্টার্কটিকার সঙ্গে।

ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে আরম্ভ ক'রে এর বিস্তার ছিল বর্তমান স্পেন পর্যন্ত, আর এর দু'পাশে ছিল দুই অতি-মহাদেশ—উত্তরে ছিল আঙ্গারাল্যাণ্ড (Angara-land), আর দক্ষিণে ছিল গণ্ডোয়ানা-ল্যাণ্ড (Gondwana-land)। সুদূর অতীতে (অর্থাৎ, সাড়ে তের থেকে সাতাশ কোটি বছর আগে) ভারত, মাদাগাস্কার, আফ্রিকা, দক্ষিণ-আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া একটি অখণ্ড অতি-মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যার নাম দেওয়া হয়েছে গণ্ডোয়ানা-ল্যাণ্ড।

টেথিস সমুদ্রে যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত পদার্থ দ্বারা গঠিত শিলারাশিই আজ থেকে প্রায় ৩½ কোটি বছর আগে, গণ্ডোয়ানা ভূখণ্ডের চাপে, সমুদ্র-তল থেকে উপরদিকে উঠতে শুরু করে এবং প্রায় ১৫ লক্ষ বছর আগেই মোটামুটি ভাবে বর্তমান হিমালয়ের আকার ধারণ করে।

পৃথিবীর মহাদেশগুলি যে, ক্রমাগত ভেসে চলেছে, তার শক্তির উৎস কী? বিজ্ঞানীরা মনে করেন, পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ উত্তাপের প্রভাবেই ভাসমান মহাদেশগুলি এভাবে সরে সরে যাচ্ছে। তবে বর্তমানে এই গতিবেগ অত্যন্ত মন্থর।
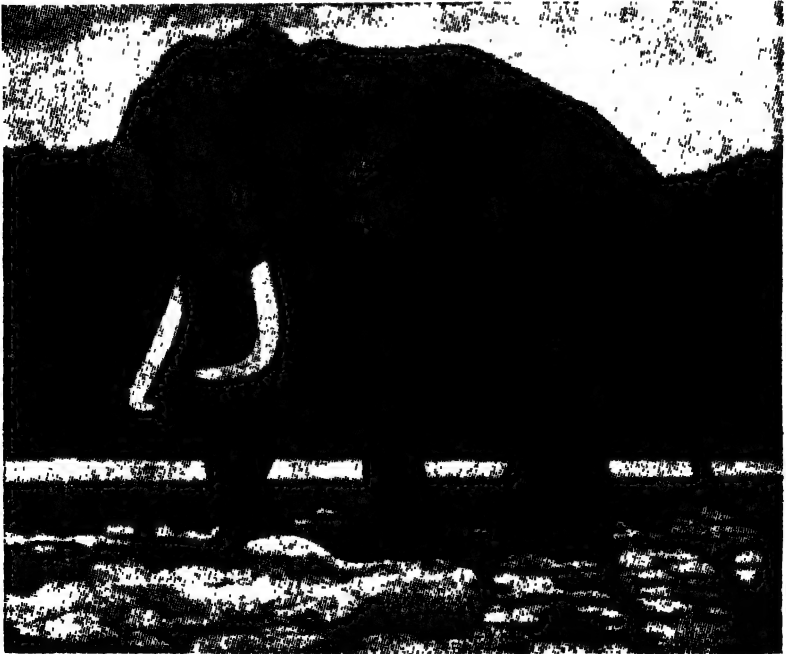
চিত্র ১৪৯। ভারতীয় হাতি।
[ইউ. এস্. আই এস-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

কারবনিফেরাস হিমযুগের প্রথম নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল দক্ষিণ ভারতে। সেজন্য দক্ষিণ ভারতের একটি প্রাচীন এবং প্রায় লুপ্ত উপজাতি গোণ্ডদের নামানুসারে এই অতিকায় ভূখণ্ডের নাম দেওয়া হয়েছে গণ্ডোয়ানা-ল্যাণ্ড বা গণ্ডোয়ানা-মহাদেশ, আর ওই জাতীয় শিলার নাম দেওয়া হয়েছে গণ্ডোয়ানা-শিলা।

কালক্রমে বিপুল প্রকারের ভূকম্পের প্রকোপ সেই অখণ্ডতাকে নানা খণ্ডে বিভক্ত ক'রে তাদের দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তাদের শিলা-গোত্রের পরিচয় আজও পৃথিবী থেকে মুছে যায় নি। উল্লিখিত বিভিন্ন দেশ, দ্বীপ ও মহাদেশের ভৌমদেহের উপাদান হয়ে এই জাতীয় শিলা আজও রয়েছে। আর তার মধ্যে পাওয়া গেছে, এবং এখনও পাওয়া যাচ্ছে, এমন সব জীবাশ্ম, যাদের মধ্যে বেশ সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন, গণ্ডোয়ানা-যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল গ্লসপ্‌টেরিস (Glossopteris) নামক জীবাশ্ম-উদ্ভিদের (অর্থাৎ, দক্ষিণ-গণ্ডোয়ানা-উদ্ভিদকুলের) আবির্ভাব। সে-যুগের হিমবাহ পরিস্থিতি বজায় ছিল প্রায় এক কোটি বছর ধরে। তারপর অবস্থা ক্রমশঃ অনুকূল হতে থাকে, এবং তার ফলে গ্লসপ্‌টেরিস উদ্ভিদকুল ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। ধীরে ধীরে অবস্থা ক্রমশঃ প্রতিকূল হয়ে ওঠে, অর্থাৎ জলবায়ু ক্রমশঃ মরুভূমির মতো হয়ে ওঠে। ফলে, এজাতীয় উদ্ভিদের সমূহ বিনাশ ঘটে। সেই সময়কার উষ্ণ এবং আর্দ্র আবহাওয়ায় টিলোফাইলাম (Ptilophyllum), অথবা উত্তর-গণ্ডোয়ানা-উদ্ভিদকুলের, বিকাশ ঘটে। তারপর ক্রমশঃ দেখা দেয় সমসাময়িক কালের মতো উদ্ভিদকুল। এসবেরই স্মৃতিচিহ্ন অঙ্কিত হয়ে আছে গণ্ডোয়ানা-শিলার বুকে।
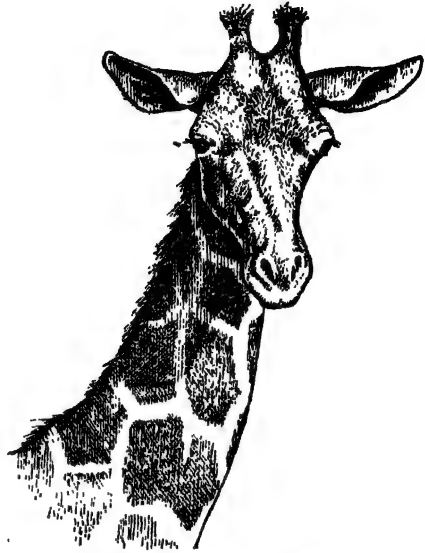
চিত্র ১০০। আফ্রিকার জিরাফ।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, হিমাচল প্রদেশ এবং হরিয়ানার উত্তরাঞ্চল নিয়ে বিস্তৃত শিবালিক পাথরের দেশে যুগ যুগ ধরে আবহাওয়ার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।
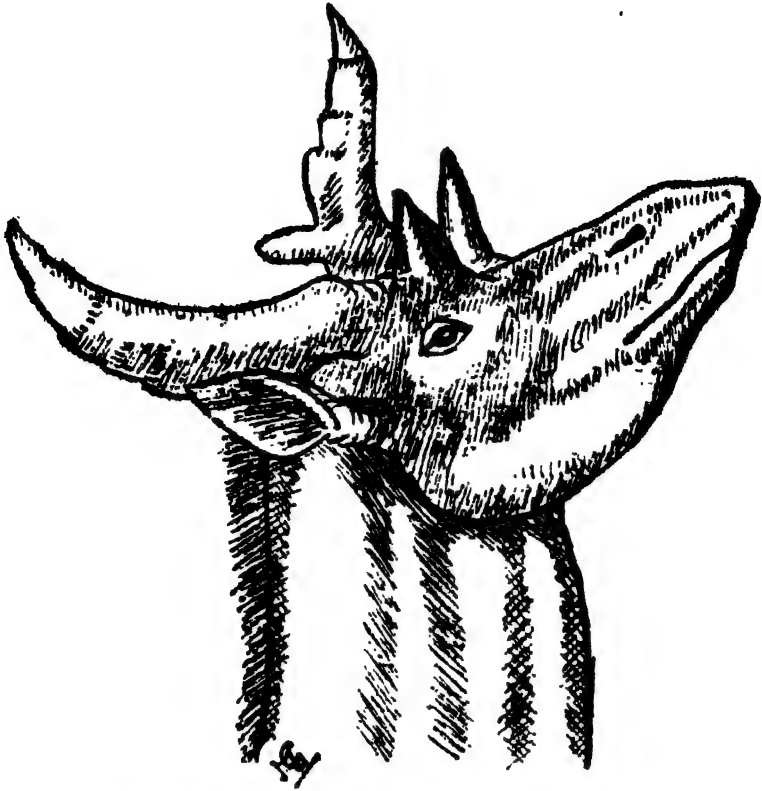
চিত্র ১৫১। বর্তমানে ভারতে জিরাফ নেই, একথা ঠিক। তবে ভারতের শিবালিক পর্বতের শিলাস্তরে (Siwalik rocks) জিরাফের মতো প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে শিবথেরিয়াম (Sivatherium)। এ থেকেই বোঝা যায় যে, সুদূর অতীতে ভারতেও জিরাফের মতো প্রাণী ছিল।

কারণ, প্রায় সাত কোটি বছর আগেও হিমালয়ের উচ্চতা ছিল অনেক কম। তাই সেখানে জলীয় বাষ্পের আনাগোনা ছিল অনেক কম। কিন্তু হিমালয় ক্রমশঃ আকাশের দিকে ঠেলে উঠতে থাকে। তাই সেখানে আর্দ্রতা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে, আর সেই সঙ্গে উষ্ণতাও। এর ফলে এইসব অঞ্চল ক্রমশঃ এক-একটি গভীর বনে ছেয়ে যায়। তখন সেখানে ধীরে ধীরে আবির্ভাব ঘটে নানা রকম প্রাণীর।

ভারত-ভূমিতেও যে একদা অতিকায় ডাইনোসররা বিরাজ ক'রত, তার অনেক প্রমাণ এদেশের বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন। এমন কি আদি-পাখির জীবাশ্মও সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

আর একটি কথা। বর্তমানে কেবলমাত্র ভারতবর্ষ এবং আফ্রিকাতেই সিংহ, হাতি ও গণ্ডার পাওয়া যায়, যদিও তাদের আকৃতি ও প্রকৃতিতে কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আবার এই দু'দেশে প্রায় একই জাতীয় বানর পাওয়া যায়। আফ্রিকার আর একটি বিশিষ্ট প্রাণী হ'ল জিরাফ। বর্তমানে ভারতবর্ষের কোথাও জিরাফ পাওয়া যায় না, একথা সত্যি। কিন্তু সুদূর অতীতের শিবালিক পর্বতের শিলাস্তরে (Siwalik rocks) জিরাফের মতো প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে শিবথেরিয়াম (Sivatherium)। এ থেকেই বোঝা যায় যে, সুদূর অতীতে ভারতেও জিরাফের মতো প্রাণী ছিল।

নানারূপ গবেষণার ফলে বিজ্ঞানীরা এখন নিশ্চিত বুঝতে পেরেছেন যে, এই দু'টি দেশ (ভারতবর্ষ এবং আফ্রিকা) সুদূর অতীতে সংযুক্ত ছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে দু'টি দেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে বিরাট আরব সাগর। তাই এ দু'টি দেশের প্রাণিকুলে আজও এরকম সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বিজ্ঞানীদের কাছে এ-জাতীয় প্রমাণ আরও অনেক আছে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

হারানো সূত্রসমূহ

কতকগুলি প্রাণী আজও পাওয়া যায়, যেগুলি অভিব্যক্তিবাদ প্রমাণ করার জন্যই যেন আজও পৃথিবীতে বিরাজ করছে। সুদূর অতীতে প্রকৃতির কারখানায় যে-সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছিল, এগুলি যেন তাদেরই এক-একটি জীবন্ত নিদর্শন।

আমেরিকার পূর্ব-উপকূলে একপ্রকার ক্রুস্টেসিয়ানের (বা, কবচীর) সন্ধান পাওয়া গেছে, এর নাম 'হাচিন্‌সনিয়েলা' (Hutchinsoniella)। এর দৈর্ঘ্য মাত্র $\frac{1}{10}$ ইঞ্চি। অতীতের লুপ্ত ক্রুস্টেসিয়ানদের এবং বর্তমানকালের চিংড়ি-জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে একটি হারানো সূত্রের (Missing link) সন্ধান এরা দিয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে, এটি সমকালীন চিংড়ি, গল্‌দা-চিংড়ি, কাঁকড়া এবং তাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের মধ্যে একটি সংযোগকারী প্রাণী বলে বিবেচিত হয়েছে।
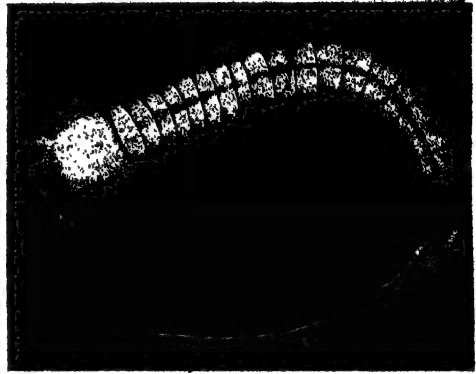
চিত্র ১০২। প্রাচীনতম ক্রুস্টেসিয়ান বা কবচী। এর নাম হাচিন্‌সনিয়েলা। সমকালীন চিংড়ি, কাঁকড়া প্রভৃতি এবং তাদের প্রাচীন পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে সংযোগকারী প্রাণী ব'লে এটি বিবেচিত হয়েছে।

১৯৩৮ সালের কথা। দক্ষিণ-আফ্রিকার উপকূলে এক জেলের জালে একটি বিরাট মাছ ধরা পড়ল। মাছটি লম্বায় ছিল পাঁচ ফুট, ওজন এক হন্দর। এরকম অদ্ভুত মাছ ইতিপূর্বে আর কেউ কখনও দেখেনি। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন 'সিলাকান্থ' (Cœlacanth)। তাঁরা মনে করেন, এই পৃথিবীতে এরূপ প্রাণীর প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল প্রায় ত্রিশ কোটি বছর আগে, কিন্তু আজও তার আকৃতি এবং প্রকৃতি প্রায় অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। এজন্য বিজ্ঞানীরা এরূপ নমুনার নাম দিয়েছেন "Living fossil", অর্থাৎ জীবন্ত জীবাশ্ম। ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে এরূপ মাছের আরও কয়েকটি নমুনা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, এবং সেগুলি সংরক্ষিত ক'রে রাখা হয়েছে বিভিন্ন দেশের যাদুঘরে।

সিলাকান্থ দেখতে সত্যি খুবই অদ্ভুত। বর্তমান কালের মাছের সঙ্গে এর বড়
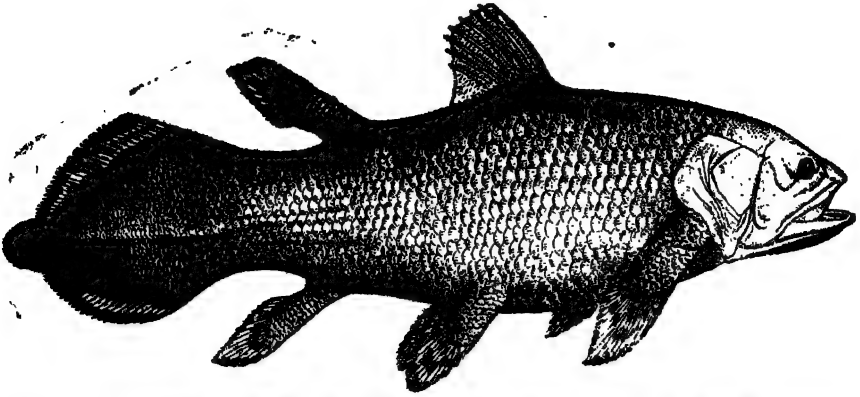
চিত্র ১৫৩। সিলাকান্থ—বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন জীবন্ত জীবাশ্ম। কারণ, এর আবির্ভাব হয়েছিল প্রায় ত্রিশ কোটি বছর আগে, কিন্তু আজও তার আকৃতি এবং প্রকৃতি প্রায় অবিকৃত রয়েছে। এর বুকের কাছে যে চারটি পাখনা দেখা যায়, সেগুলি ডাঙ্গার প্রাণীদের চারটি পায়ের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এখন অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, অতীতের এরূপ একটি প্রাণী থেকেই উভচরের উদ্ভব হয়েছিল।

বেশী মিল নেই। সবচেয়ে অদ্ভুত হচ্ছে এর পাখনাগুলি। সাধারণ মাছের পাখনা তার শরীর থেকে সোজা বেরিয়ে এসেছে, কিন্তু সিলাকান্থের পাখনাগুলি রয়েছে শরীর থেকে বেরোনো উঁচু ঢিবির মতো এক-একটি মাংসপিণ্ডের উপর। আর এই মাংসপিণ্ডের ভিতরে আছে বেশ শক্ত হাড়। সাধারণ মাছের পিঠের উপরে একটিমাত্র পাখনা থাকে, কিন্তু এর পিঠের উপরে পাখনা আছে দু'টি। তাছাড়া এর বুকের কাছে যে চারটি পাখনা দেখা যায়, সেগুলি ডাঙার প্রাণীদের চারটি পায়ের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কানকোর কাছে অবস্থিত বক্ষ পাখনা দু'টির মধ্যে এমন তিনটি হাড় পাওয়া গেছে, যার সঙ্গে মানুষের হাতের তিনখানি হাড়ের সাদৃশ্য আছে, এগুলি হ'ল প্রগণ্ডাস্থি (Humerus), বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি (Radius) এবং অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি (Ulna)। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এরাই সম্ভবতঃ জল থেকে ডাঙ্গার দিকে প্রথম অভিযান চালিয়েছিল। আর অতীতের এরূপ কোনো একটি প্রাণী থেকেই উভচর প্রাণীর উদ্ভব হয়েছিল। এই প্রাণীটি যেন মাছ এবং

চিত্র ১৫৪। প্ল্যাটিপাস বা হংসচঞ্চু।

উভচর প্রাণীর মধ্যে সংযোগ এনে দিয়েছে। মনে হয়, এ থেকেই একটি হারানো সূত্রের সন্ধান পাওয়া গেল।

এই প্রসঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার প্ল্যাটিপাসের (Platypus) বা হংসচঞ্চুর কথাও বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। এরা সরীসৃপের মতই ডিম পাড়ে। কিন্তু ডিম ফুটে যে বাচ্চা বেরোয়, তা আবার মায়ের স্তন্য পান ক'রেই বড় হয়। তাই বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এরা হ'ল সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ীর মাঝামাঝি অবস্থার একটি প্রাণী।

চিত্র ১৫৫। অস্ট্রেলিয়ার অঙ্কগর্ভ প্রাণী—ক্যাঙ্গারু।

অস্ট্রেলিয়ার ক্যাঙ্গারুও এক বিচিত্র প্রাণী। এর বাচ্চাটি যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সে খুবই ছোট এবং অত্যন্ত অসহায়। কিন্তু প্রকৃতির কী বিচিত্র ব্যবস্থা! এই অসহায় ছোট্ট বাচ্চাটি (মায়ের সহায়তায়) কোন প্রকারে গিয়ে মায়ের পেটের কাছে অবস্থিত একটি থলির মধ্যে প্রবেশ ক'রে সেখানেই আশ্রয় নেয়। ওই বাচ্চাটি সেখানে থেকেই মায়ের দুধ খেয়ে বড় হতে থাকে, যতদিন না স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করার উপযোগী হয়। এজন্য এর নাম দেওয়া হয়েছে অঙ্কগর্ভ প্রাণী (Marsupial)।†

আর একপ্রকার অঙ্কগর্ভ প্রাণী হ'ল অপোসাম (Opossum)। তবে এখন এটি পাওয়া যায় শুধু দক্ষিণ-আমেরিকায়। এ দেখতে অনেকটা ইঁদুরের মতো। এরা গাছে চড়তে পারে, এবং সাধারণতঃ গাছে বাসা বানিয়ে সেখানেই বাস করে।

এই পৃথিবীতে এইরকম বিচিত্র প্রাণী আরও অনেক আছে।

---

† জন্মকালে একটি ক্যাঙ্গারুর বাচ্চার দৈর্ঘ্য হয় মাত্র এক ইঞ্চি, বা তারও কম, আর ওজন হয় মায়ের ওজনের তিন হাজার ভাগের একভাগ মাত্র।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

অভিব্যক্তি সম্পর্কে আধুনিক ধারণা

অভিব্যক্তি সম্পর্কে আধুনিক ধারণা :

ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ কি শুধুই কল্পনা-বিলাস? তা নয়। এর সমর্থনে এত ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া গেল যে, এই মতবাদ গ্রহণ করতে কারও মনে আর কোনও দ্বিধা রইল না।

তবে লামার্কের মতবাদের মতো ডারউইনের মতবাদেরও সবচেয়ে দুর্বল অংশ হ'ল এই যে, এরূপ পরিবর্তন কিভাবে এবং কেন হয়, তার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা এ থেকে পাওয়া যায় না। ডারউইন প্রথম দিকে বংশগতি দ্বারা অর্জিত ধর্মের প্রচলন সম্পর্কে লামার্কের মতবাদ গ্রহণ করেন নি। কিন্তু পরবর্তীকালে, আর কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা না পেয়ে, নিতান্ত বাধ্য হয়ে অত্যন্ত দ্বিধার সঙ্গে তা গ্রহণ করেন।

হল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী হিউগো দ্য ভ্রীস্ সর্বপ্রথম এ বিষয়ে নতুন চিন্তাধারার প্রবর্তন করেন। ১৯০১ সালে ইনোথেরা (Oenothera) তথা 'ইভনিং প্রিম্‌রোজ' (Evening Primrose) নামক উদ্ভিদ্ সম্পর্কে গবেষণা ক'রে তিনি পরিব্যক্তিবাদ (Mutation theory) বা 'আকস্মিক ভাবে নতুন প্রজাতির উদ্ভব' নামক মতবাদ প্রচার করেন। কারণ তিনি লক্ষ্য করেন যে, সাধারণ উদ্ভিদের মধ্যে থেকে হঠাৎ একটি অসাধারণ বা নতুন বৈশিষ্ট্যযুক্ত উদ্ভিদের উদ্ভব হতে পারে। এরূপ উদ্ভিদকে মিউট্যাণ্ট (Mutant) বলা হয়। এই পরিবর্তন আকস্মিক ভাবে আসে, এবং অনেক সময় এই পরিবর্তন এমন বড় রকমের হয় যে, এর ফলে নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটে। দ্য ভ্রীসের মতে, যে কোন বৈশিষ্ট্যেরই পরিব্যক্তি হতে পারে, এবং এই পরিব্যক্তিই হ'ল অভিব্যক্তির প্রধান কারণ। বর্তমানে ক্রোমোসোমের অন্তর্গত জিন (Gene)-এর, বা বংশাণুস্থিত ডি. এন্. এ. (D. N. A.)-এর, সজ্জাক্রমে যে-কোন আকস্মিক স্থায়ী, কিংবা অস্থায়ী, পরিবর্তনকেই পরিব্যক্তি (Mutation) বলা হয়।

চিত্র ১৫৬। হিউগো দ্য ভ্রীস্

গত পঞ্চাশ বছরে প্রজননবিদ্যার (বা, বংশাণুবিদ্যার) (Genetics) প্রভূত উন্নতি হয়েছে। এর ফলে ডারউইনের মতবাদের এই দুর্বলতা অনেকাংশে দূর হয়েছে, এবং প্রকারণ ও নতুন প্রজাতির উদ্ভব সম্পর্কে অনেক জটিল রহস্যের সমাধান এখন হয়ে গেছে বলা যায়।

এখন বিজ্ঞানীরা বলেন, আসল রহস্য লুকিয়ে আছে ক্রোমোসোমের অন্তর্গত জিনের (বা, বংশাণুর) মধ্যে। বংশ-বিস্তারের সময় এই জিন (বা, বংশাণু)-গুলি নতুন ভাবে সজ্জিত হয়, এবং তার ফলেই এরূপ নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়। নিম্নলিখিত কয়েকটি উপায়ে এরূপ হতে পারে :—

(i) বংশ-বিস্তারের সময় স্বজাতীয় ক্রোমোসোমের কোন কোন অংশ (অর্থাৎ, জিন, বা, বংশাণু) দলত্যাগ করে এবং অন্য জিনের সঙ্গে মিলিত হয়ে নতুন দল গঠন করে (Crossing over)।

(ii) মাইওসিস পদ্ধতিতে কোষ-বিভাজন কালে, অনেক সময় স্বজাতীয় ক্রোমোসোমগুলি এলোমেলো ভাবে মিলিত হয়। এর ফলেও পরিবর্তন সূচিত হয়।

(iii) অনেক সময় বিভিন্ন রকম বংশগত ধর্মসম্পন্ন পুং ও স্ত্রী-জননকোষ পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়। এর নাম বহিঃপ্রজনন (Out-breeding)। এর ফলেও বংশগত ধর্মের পরিবর্তন হয়।

চিত্র ১৫৭। ক্রোমোসোমের কোন কোন অংশ (অর্থাৎ, জিন) দলত্যাগ করে এবং অন্য জিনের সঙ্গে মিলিত হয়ে নতুন দল (অর্থাৎ, ক্রোমোসোম) গঠন করে (Crossing over)।

(iv) নানারূপ প্রাকৃতিক কারণে (যেমন—মহাজাগতিক রশ্মির ক্রিয়ায়) হঠাৎ হয়তো ক্রোমোসোমের, তথা বংশাণুর, প্রকৃতি বদলে যায়। এটাই মিউটেশন (Mutation) বা পরিব্যক্তির একটি প্রধান কারণ। তার কারণ, এরই ফলে হঠাৎ একটি নতুন ধর্মের আবির্ভাব ঘটা খুবই স্বাভাবিক, তা সে ভালই হোক, আর মন্দই হোক।

এইসব কারণে প্রত্যেক প্রজন্মেই কিছু না কিছু পরিবর্তন সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এর ফলেই যে নতুন প্রজাতির উদ্ভব সুনিশ্চিত হবে—এমন কথা বলা যায় না। এরূপ পরিবর্তন যখন এমন অধিক সংখ্যক জীবের মধ্যে সাধিত হয় যে, প্রজননের দিক দিয়ে তারা স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে, একমাত্র তখনই বলা যায়, নতুন

প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে। অভিব্যক্তি যে একটি মাত্র জীবের মধ্যে না হয়ে বহুর মধ্যে হওয়ার দরকার, এই উপলব্ধিই হ'ল আধুনিক মতবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বর্তমানে জীবজগতে সংগ্রাম (Struggle) বলতে বোঝায়, বিভিন্ন 'পরিবর্তিত রূপ' বা প্রকারণ (Variants)-এর মধ্যে প্রতিযোগিতা, এবং 'উপযোগিতা' (Fitness) বলতে বোঝায়, নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় :—

(i) **অভিযোজন (Adaptation)**—যে-সব জীব জীবন ধারণের নতুন অবস্থার সঙ্গে অভিযোজিত হতে পারে, তারাই পূর্ণ বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে, এবং বংশ-বিস্তার করতে সক্ষম হয়। আর জীবের যে-সব গুণ বেঁচে থাকার সুযোগ বৃদ্ধি করে, সেগুলিই অভিযোজনে সহায়তা করে।

(ii) **সঙ্গী নির্বাচন (Sexual Selection)**—একটি জীবকে উপযুক্ত বলা হবে তখনই যখন সে সন্তান-সন্ততি রেখে যেতে সক্ষম হবে। এজন্যে জীব-জগতে সঙ্গী (অথবা, সঙ্গিনী) নির্বাচনের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে।

(iii) **পিতা-মাতার যত্ন (Parental Care)**—সব রকম অভিযোজনই অর্থহীন হয়ে যাবে, যদি সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার আগেই মরে যায়। এজন্যে নিম্নশ্রেণীর অনেক প্রাণীর বেলায়ই দেখা যায়, জীব-দম্পতি শত-সহস্র সন্তান-সন্ততির জন্ম দেয়। তাদের অধিকাংশই হয়তো মরে যায়। কিন্তু তার পরও যতগুলি বেঁচে থাকে তাই যথেষ্ট, এবং তার ফলেই ওই জীবের বংশ-বিস্তার সুনিশ্চিত হয়। এসব ক্ষেত্রে পিতা-মাতার যত্নের খুব বেশী প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যে-সব প্রাণীর অল্প কয়েকটি ডিম কিংবা সন্তান হয়, সে-সব ক্ষেত্রে পিতা-মাতা সেই সব ডিম বা সন্তানের সুরক্ষার জন্যে বিশেষ যত্ন নেয়। একেই জনিতৃ-যত্ন (Parental care) বলা হয়। এর ফলে ডিম ফুটে বাচ্চা হওয়ার, কিংবা বাচ্চা হলে তার বেঁচে থাকার, সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এসব ক্ষেত্রে পিতা-মাতা অনেক সময় নিজেদের জীবন বিপন্ন ক'রেও সন্তানকে রক্ষা করার চেষ্টা করে।

কয়েকটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যাবে। যেমন, স্ত্রী-চিংড়ি তার ডিমগুলিকে উদর-সংলগ্ন পাগুলির মধ্যে আটকে রাখে। স্ত্রী-মাকড়সা তার ভ্রূণগুলিকে একটি গুটির মধ্যে (Cocoon) রেখে, তা সবসময় পাহারা দেয়, অথবা তা বুকে আটকে বয়ে বেড়ায়। এক রকম মাছ তার ডিমগুলিকে মুখ-গহ্বরের মধ্যে রেখে দেয়, যাতে সেগুলি আর কারও পেটে না যায়। পুরুষ ধাত্রী-ব্যাঙ (*Alytes obstetricans*) স্ত্রী- ব্যাঙের কাছ থেকে ডিমগুলি সংগ্রহ ক'রে নিজের দু'পায়ের

ছিল তা নির্ধারণ করে না, নির্ধারণ করে তার পরিণতি কি হ'ল তা-ই। অর্থাৎ, অবস্থা প্রতিকূল হলেও জীবন-সংগ্রামে যে টিঁকে থাকতে পারে, সেই উপযুক্ত।

চিত্র ১৬৫। একটি বিড়াল এবং তার তিনটি বাচ্চা।
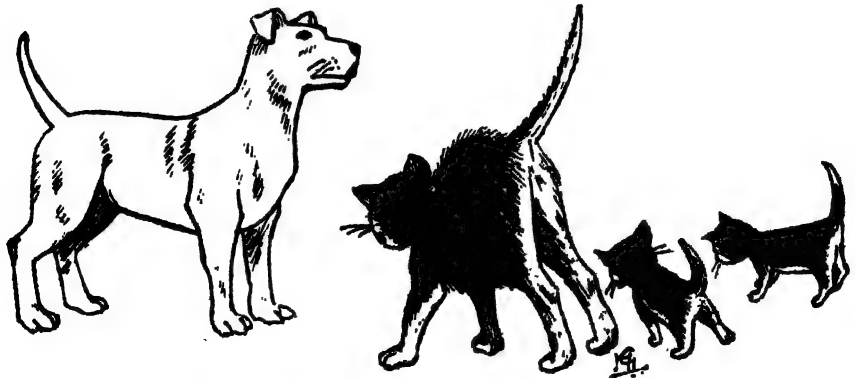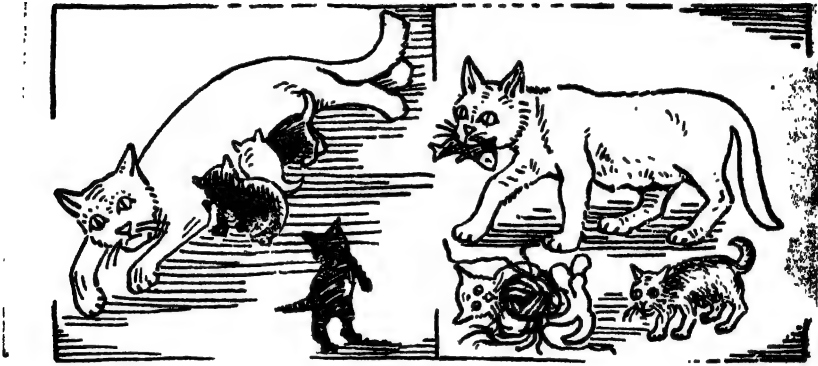
চিত্র ১৬৬। মা-বিড়াল তার বাচ্চাদের আহার যোগায় এবং আপদে-বিপদে তাদের রক্ষা করে।

Tree Finches :

1. *Camarhynchus Pallidus* (woodpecker-like finch).
2. *C. heliobates* (inhabits mangrove swamps).
3. *C. psittacula*, } (insect-eating birds).
4. *C. pauper*,
5. *C. parvulus*,
6. *C. crassirostris* (vegetarian)
7. *Certhidea*, is a single species of warbler-finch.
8. *Pinaroloxias*, is an isolated species of Cocos Island finch.

Ground Finches, mainly seed-eaters :

9. *Geospiza magnirostris*.
10. *G. fortis*.
11. *G. fuliginosa*.
12. *G. difficilis* (Sharp-beaked).
13. *G. conirostris*, } (cactus eaters).
14. *G. scandens*,

কিভাবে নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয় ?

গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের নানাপ্রকার ফিন্‌চ বা তুতি পাখি (Finches) ডারউইনের কল্পনাকে উজ্জীবিত করেছিল, এবং এ সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য তিনি রেখে গেছেন। ডারউইন এখানে এসে দেখলেন, কতকগুলি পাখি তাদের পূর্ব-পুরুষদের মতো শস্যখাদক রয়ে গেছে, কতকগুলির প্রধান খাদ্য ছোট ছোট পোকামাকড়, কতকগুলি ফণিমনসা (Cactus)-কেই প্রধান খাদ্য হিসেবে বেছে নিয়েছে, আবার কতকগুলির স্বভাব হয়েছে ঠিক কাঠ-ঠোকরার মতো। সেই অনুযায়ী প্রত্যেকেরই চঞ্চুর বা ঠোঁটের গড়ন বদলে গেছে। সেই দ্বীপে ছোট ছোট পাখিদের উপযোগী যত রকম খাদ্য পাওয়া সম্ভব, তাদের উপর নির্ভর ক'রে, বিভিন্ন গোষ্ঠীতে নিজেদের খাপ খাওয়াতে খাওয়াতে বিবর্তনের মাধ্যমে তাদের এরূপ বিকিরণ (Radiation) ঘটেছে। অভিব্যক্তি সম্পর্কিত আধুনিক মতবাদের সাহায্য নিয়ে এখন আমরা পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারি, কিভাবে ঐসব নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়েছিল।

(i) ঐসব ফিন্‌চের আদি-পুরুষ হয়তো ঝড়ের তাড়নায় দক্ষিণ-আমেরিকার মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই দ্বীপপুঞ্জে এসে পড়েছিল। এরা ফলের বীজ
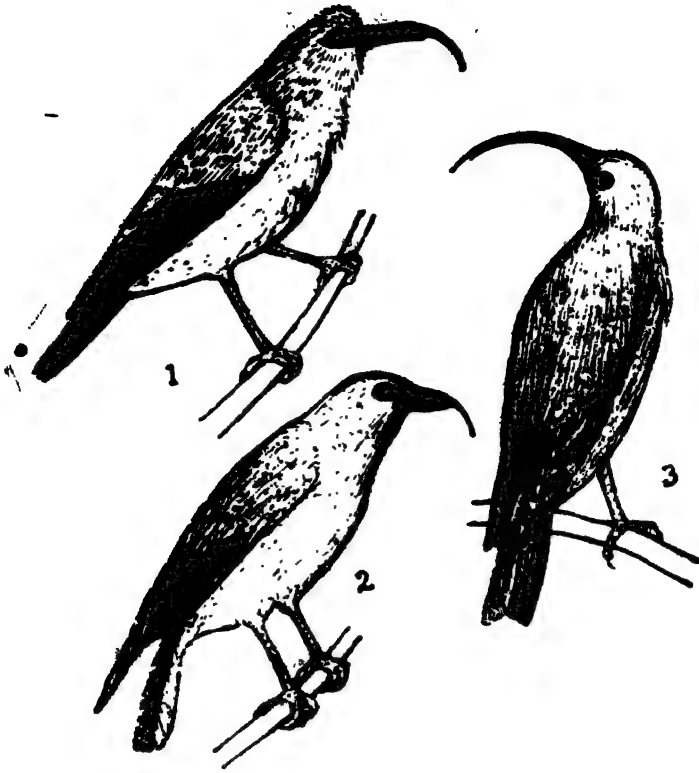
চিত্র ১৭৫। প্রকারণের আরও একটি উদাহরণ। খাদ্যাভ্যাসের উপর নির্ভর ক'রে, একই পূর্ব-পুরুষ থেকে, নানাপ্রকার পাখির উদ্ভব হয়েছে। এদের দীর্ঘ চঞ্চু বা ঠোঁট কাঠ-ঠোকরাদের মতো পোকা ধরার জন্যে, অথবা ফুল থেকে মধু আহরণ করার উদ্দেশ্যে, ব্যবহৃত হয়।

1. *Hemignathus lucidus affinis*,
2. *Hemignathus wilsoni*,
3. *Hemignathus obscurus*.

অথবা শস্য খেয়ে জীবন ধারণ ক'রত। অন্য কোন ছোট পাখি না থাকায়, এখানে এরা অন্য কোন প্রকার পাখির বা শত্রুর সঙ্গে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয় নি।

(ii) এখানকার পরিবেশ ভিন্ন হলেও যারা এই অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে বেঁচে রইলো, তারা ক্রমাগত বংশ-বিস্তার করতে লাগল, এবং কালক্রমে অনেক পরিবর্তিত রূপের (বা, প্রকারণের) ফিন্‌চ-পাখির আবির্ভাব ঘটলো। কোনরূপ প্রতিযোগিতা না থাকায়, তাদের অধিকাংশই পূর্ণ বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকে এবং

বংশ-বিস্তার করতে সক্ষম হয়। তাদের কতকগুলি আবার প্রয়োজনের তাগিদে অন্যরকম খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে থাকে।

(iii) যেহেতু সেখানে অনেকগুলি দ্বীপ আছে, সেহেতু কতকগুলি পরিবর্তিত রূপ (বা, প্রকারণ) পৃথক্ হয়ে যায় (Isolated)। বিবর্তনের আর একটি উল্লেখ-যোগ্য কারণ হ'ল অন্তরণ (Segregation)। সুতরাং, এই কারণে একই দ্বীপে বসবাসকারী নিকটবর্তী পাখিদের মধ্যেই শুধু প্রজনন হতে থাকে, এবং এরূপ অন্তঃ-প্রজননের (Inbreeding) ফলে, বহু সংখ্যক পাখির মধ্যে একটি বিশিষ্ট ধর্মের বিকাশ ঘটতে থাকে। এইভাবে মূল প্রজাতি থেকে, কিংবা অন্য দ্বীপে অবস্থিত প্রজাতি থেকে, তারা পৃথক হয়ে যায়।

(iv) এরূপ দু'রকম পাখি পরস্পরের কাছাকাছি এলেও, কিংবা কাছাকাছি থাকলেও, তারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয় না, এবং বংশ-বিস্তার করে না। তার প্রধান কারণ, একে অন্যের মধ্যে যৌন-আবেগ সঞ্চার করতে সক্ষম হয় না।

(v) পরিশেষে খাদ্য, আশ্রয় প্রভৃতির জন্যে প্রতিযোগিতার ফলে তাদের নানা রকম গুণ বা ধর্মের মধ্যে ক্রমশ আরও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হতে থাকে, এব এইভাবে কালক্রমে নানা প্রজাতির (Species) ফিন্‌চের আবির্ভাব ঘটে।

অভিব্যক্তিবাদ অনুধাবন করার ব্যাপারে গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের নানা প্রজাতির ফিন্‌চ পাখি একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ ব'লে পরিগণিত হয়।

ষষ্ঠ পর্ব

জীবের ক্রমবিকাশ

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

জীব এলো কোথা থেকে ?

এই ধরণীর বুকে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সর্বত্র অহরহ কত প্রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে, বৃক্ষ-লতা, তৃণগুল্ম কত রকমে তাদের প্রাণশক্তির পরিচয় দিচ্ছে—এসবের হিসেব কে রাখে! বিশ্বভরা এই যে প্রাণের স্পন্দন, এর মূলে কি আছে ? এই প্রশ্নের উত্তরই বা কে দিতে পারে!

গাছপালা, গরু-ঘোড়া প্রভৃতি প্রাণবন্ত বা সজীব পদার্থ। আর মাটি, পাথর, সোনা, রুপা, লোহা প্রভৃতি প্রাণহীন বা জড়-পদার্থ। জীবের বৈশিষ্ট্য কি ? জীবের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল, খাদ্য গ্রহণ এবং তারই সাহায্যে দেহের পুষ্টিসাধন, আকারে বৃদ্ধি পাওয়া, শ্বাসকার্য, বংশ-বিস্তার এবং উদ্দীপনায় সাড়া দেবার ক্ষমতা। এছাড়া জীবের জন্ম ও মৃত্যুর কথা সহজেই জানা যায়। কিন্তু জড়-পদার্থের এসব বৈশিষ্ট্য নেই। তাছাড়া এসবের জন্ম ও মৃত্যুর কথা কিছুই বোঝা যায় না।

এখন প্রশ্ন—জীবদেহে এমন কি আছে, যার শক্তি এমন বিস্ময়কর, এমন মহত্তর ?

জীব-সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হলে আমাদের প্রথমেই জীবনধারণের মূল তত্ত্বগুলি ভাল করে জানতে হবে। এই সঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখতে হবে—এই পৃথিবীতে যখন কোনও জীবই ছিল না, তখন চারদিকে ছিল নানা প্রকার রাসায়নিক পদার্থ। আবার তারও আগে, যখন এসব রাসায়নিক পদার্থেরও সৃষ্টি হয় নি, তখন চারদিকে ব্যাপ্ত ক'রে ছিল নানা রকম পরমাণু। কাজেই একথা মেনে

নিতে হয় যে, বিভিন্ন রকম পরমাণুর সমাবেশে প্রথমে তৈরী হয়েছে নানা প্রকার রাসায়নিক পদার্থের অণু, পরে তাদেরই বিচিত্র সমাবেশে হঠাৎ একদিন তৈরী হয়েছে নির্দিষ্ট আকার-বিশিষ্ট এক প্রকার জিনিস, অর্থাৎ পৃথিবীর আদিমতম জীব-কোষ। বিজ্ঞানীরা এখন নিশ্চিত জানেন যে, এক বা একাধিক জীব-কোষের সমন্বয়েই গঠিত হয়েছে এই পৃথিবীর এক-একটি জীবের দেহ।

জীবের এমন কি বৈশিষ্ট্য আছে, যার ফলে জড়-পদার্থ এবং সজীব পদার্থের মধ্যে এমন পার্থক্য সম্ভব হয়েছে? এই প্রশ্নটি বিজ্ঞানীদের ভাবিত করেছে বহুকাল ধরেই। আর এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্যে যুগ যুগ ধরে কত শত বিজ্ঞানী যে কঠোর গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছেন, তার হিসেব করাই কঠিন। আজ পর্যন্ত যে তাঁরা এই জটিল প্রশ্নের জট ছাড়াতে পেরেছেন, তা বলা যায় না। তবে তাঁদের এই সাধনা যে একেবারে ব্যর্থ হয়েছে, এমন কথাও বলা যায় না। তাঁদের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত-গুলির সঙ্গে কিছুটা কল্পনার রং মিশিয়ে জড়-পদার্থ থেকে সজীব পদার্থের সৃষ্টি সম্পর্কে একটি নির্ভরযোগ্য ছবি গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

আমাদের জীবনের ইতিহাস বলতে গেলে রসায়নের প্রক্রিয়াতেই লিপিবদ্ধ হয়েছে; অর্থাৎ আমাদের প্রাণ ধারণের জন্যে অপরিহার্য প্রক্রিয়াগুলি সবই প্রকৃত-পক্ষে কতকগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই প্রাণের মূল তত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করতে হলে প্রথমেই আমাদের রসায়নের এই ভাষা শেখা দরকার, এই ভাষায় পারদর্শী হওয়া দরকার।

আদিম পৃথিবী ঃ

প্রায় চারশ' কোটি বছর আগেকার কথা—জ্বলন্ত সূর্যদেহ থেকে খানিকটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ক্রমে তাই থেকে সৃষ্টি হয় এই পৃথিবীর। সুতরাং সৃষ্টির আদিতে পৃথিবীও সূর্যের মতই জ্বলন্ত বাষ্পের গোলক ছিল।

সূর্যদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর পৃথিবী একটি গ্রহরূপে নিজ কক্ষপথে সূর্যের চারিদিকে ঘুরতে থাকে। জ্বলন্ত পৃথিবী ক্রমশঃ শীতল ও ঘনীভূত হতে থাকে। সেই সঙ্গে যে-সব উপাদান ভারি (যেমন—লোহা, নিকেল ইত্যাদি) সেগুলি কেন্দ্রে গিয়ে জমা হ'ল, অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা উপাদানগুলি (যেমন—সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি) রইলো মাঝখানে, আর সবচেয়ে হাল্‌কা উপাদানগুলি (যেমন—হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি) গঠন ক'রল সবচেয়ে বাইরের স্তরটি। এইভাবে

বিভিন্ন উপাদান, তাদের ঘনত্ব বা ওজন অনুযায়ী, স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্তর গড়ে তুললো।

প্রথম দিকে পৃথিবী এতো উত্তপ্ত ছিল যে, পরমাণুগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিভিন্ন অণু গঠন করতে পারত না। কারণ, পরমাণুগুলির মধ্যে রাসায়নিক সংযোগ হলেও তখনকার পৃথিবীর প্রচণ্ড উত্তাপে তারা আবার পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। ক্রমে পৃথিবী অনেকটা শীতল হ'ল, তাই তখন বিভিন্ন পরমাণুর মধ্যে স্থায়ী রাসায়নিক সংযোগ সম্ভব হ'ল। তার ফলে নানারূপ পরমাণুর সংযোগে তৈরী হতে লাগল নানাপ্রকার অণু। এই ভাবে পৃথিবী থেকে মুক্ত পরমাণুগুলি ক্রমশঃ অপসারিত হতে লাগল, আর তাদের স্থান অধিকার করতে লাগল নানাপ্রকার নবগঠিত অণু। সেই থেকে জীব-সৃষ্টির ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সূচিত হ'ল।

সৃষ্টির প্রথম অধ্যায়ঃ

অনুমান করা হয়, সৃষ্টির প্রথম অধ্যায়ে পৃথিবীর আবহমণ্ডলে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং কার্বনের পরমাণু প্রচুর পরিমাণে ছিল। পৃথিবী শীতল হলে এই সব বিবিধ পরমাণুর বিচিত্র সন্নিবেশে বিবিধ পদার্থের অণু গঠিত হ'ল। হাইড্রোজেনের দু'টি পরমাণু অক্সিজেনের একটি পরমাণুর সঙ্গে মিলিত হওয়ায় জলের অণু (H_2O) গঠিত হ'ল। হাইড্রোজেনের তিনটি পরমাণু নাইট্রোজেনের একটি পরমাণু সঙ্গে মিলিত হয়ে তৈরী হ'ল অ্যামোনিয়ার অণু (NH_3)। আর হাইড্রোজেনের চারটি পরমাণু কার্বনের একটি পরমাণুর সঙ্গে মিলিত হয়ে তৈরী হ'ল মিথেনের অণু (CH_4)। এভাবে প্রথম দিকে এই তিনটি গ্যাসই ক্রমাগত সৃষ্টি হতে থাকল। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, সৃষ্টির প্রথম অধ্যায়ে পৃথিবীর আবহমণ্ডলে এই তিনটি গ্যাসই প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়েছিল। এই অনুমান যে ভুল তা বলা যায় না, যখন বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি গ্রহের আবহমণ্ডলেও এই গ্যাসগুলি প্রচুর পরিমাণে আছে বলে জানা গেছে।

সেই সময় সূর্য থেকে আলো, তাপ, অতিবেগুনী-রশ্মি প্রভৃতি পৃথিবীর উপর প্রচুর পরিমাণে বর্ষিত হ'ত। সম্ভবতঃ সূর্যের এই শক্তিই জল, অ্যামোনিয়া ও মিথেন অণু গঠনে সাহায্য করেছিল। তাছাড়া আগের চেয়ে শীতল হলেও পৃথিবী তখনও এতো উত্তপ্ত ছিল যে, সেই তাপমাত্রায় এই সব অণুর গঠন সম্ভবপর ছিল। অথচ সেই উত্তাপ এমন প্রচণ্ড ছিল না, যাতে নবগঠিত অণুগুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে পুনরায় পরমাণুতে পরিণত হতে পারে।

পৃথিবী ক্রমাগত শীতল এবং ঘনীভূত হচ্ছিল। এভাবে ঠাণ্ডা হতে হতে ক্রমে তা একটি তরল পদার্থের গোলকে পরিণত হ'ল। তখন তার উপাদানগুলির মধ্যে যেগুলি অপেক্ষাকৃত ভারি, সেগুলি কেন্দ্রে গিয়ে জমা হ'ল, আর হাল্কা পদার্থগুলি উপরে ভেসে উঠল। পৃথিবীর ঠাণ্ডা হওয়ার বিরাম নেই। শেষে উপরের হাল্কা তরল পদার্থগুলি ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বাঁধলো এবং একটা পুরু কঠিন আবরণ তৈরি ক'রল। এরই নাম ভূত্বক। একটা কাচের পাত্রে খানিকটা মোম গালিয়ে ঠাণ্ডা হতে দিলে দেখা যাবে—উপরে শক্ত একটা সর পড়েছে। একটা ছুরির ফলা দিয়ে আঘাত করলে দেখা যাবে, বাইরেটা ঠাণ্ডা হয়ে কঠিন হলেও ভিতরটা তখনও বেশ গরম ও নরম আছে। পৃথিবীর তখন সেই অবস্থা।

একটা কমলালেবু কয়েক দিন ঘরে রেখে দিলে দেখা যাবে, তা ক্রমে শুকিয়ে যাচ্ছে, আর বাইরের খোসাটা কুঁচকে উঁচু-নীচু হয়ে যাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পৃথিবী ঠাণ্ডা হ'ল। তখন ভিতরের পদার্থগুলির আয়তন কমে গেল। আর তাতে বাইরের আবরণটা কুঁচকে উঁচু-নীচু হয়ে গেল। আবার কোথাও হয়তো ভূত্বকের বিরাট অংশ চাপ ধরে নীচে বসে গেল। এর ফলে কোথাও হয়তো বিরাট উঁচু পাহাড়-পর্বত মাথা তুলে দাঁড়ালো, আবার কোথাও হয়তো দেখা দিল অতল গহ্বর!

আরও অনেক দিন পরের কথা। পৃথিবীর আবহমণ্ডলে যে জল তৈরী হয়েছিল, তা ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা ও ঘনীভূত হয়ে রাশি রাশি বাষ্পে পরিণত হ'ল। তাথেকে মেঘের সৃষ্টি হ'ল এবং পরে বৃষ্টিধারায় পৃথিবীতে নেমে এলো, কিন্তু উত্তপ্ত পৃথিবীর বুকে পৌছে তা আবার বাষ্পে পরিণত হয়ে বায়ুতে ফিরে গেল। এমনি চললো কিছুকাল ধরে। এর ফলে পৃথিবীর চারদিকে এক ঘন কুয়াশার আবরণ সৃষ্টি হ'ল। ক্রমাগত বৃষ্টির জলে খাদ-গহ্বর সব ক্রমশঃ ভর্তি হয়ে গেল। এভাবে সৃষ্টি হ'ল হ্রদ, নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর প্রভৃতি। আর উঁচু জায়গাগুলি দিগন্তবিস্তৃত মহাসাগরের উপরে মাথা উঁচু করে রইলো এক-একটি মহাদেশরূপে।

এই সময় জলীয় বাষ্পের ভাপ (Steam)-এর সঙ্গে উত্তপ্ত ধাতব কার্বাইডের বিক্রিয়া হয়। তার ফলে নানা প্রকার হাইড্রোকারবন-জাতীয় যৌগ উৎপন্ন হয়।

Al_4C_3	+	$12\,H_2O$	=	$4\,Al(OH)_3$	+	$3\,CH_4$
অ্যালুমিনিয়াম কারবাইড		জল (বাষ্প)		অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড		মিথেন (হাইড্রোকারবন)
CaC_2	+	$2\,H_2O$	=	$Ca(OH)_2$	+	C_2H_2
ক্যালসিয়াম কারবাইড		জল (বাষ্প)		ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড		অ্যাসিটিলিন (হাইড্রোকারবন)
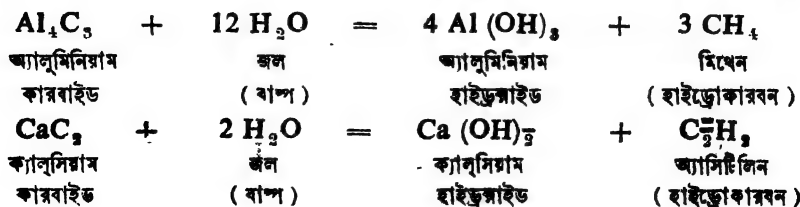
সেই সময়কার অত্যধিক উষ্ণ আবহাওয়ায় হয়তো আরও নানারকম রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়; যেমন—অ্যাল্‌কাইলেশন (alkylation), পলিমারাইজেশন (polymerisation) ইত্যাদি। আর তারই ফলে হয়তো আরও নানারকম হাইড্রোকারবন উৎপন্ন হয়। সেই সময় অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প প্রভৃতি ঘটছিল অহরহ। এর ফলে ভূগর্ভ থেকে যে সব খনিজ পদার্থ, যেমন—অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড, উৎক্ষিপ্ত হয়, সেগুলিই হয়তো এইসব বিক্রিয়ায় প্রভাবকের (বা, অনুঘটকের) কাজ করেছিল।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায় বায়ুমণ্ডলের অ্যামোনিয়া এবং মিথেন জলে দ্রবীভূত হয়ে হয়ে শেষে সমুদ্রে পৌছুল। সেই সঙ্গে ভূপৃষ্ঠের নানাপ্রকার খনিজ পদার্থও বৃষ্টির জলে ধুয়ে গিয়ে সমুদ্রের জলে মিশল। এই প্রক্রিয়া চলতে লাগল হাজার হাজার বছর ধরে। তার ফলে সমুদ্রের জল ক্রমশঃ লবণাক্ত হয়ে উঠল।

তখনও পৃথিবীর বাইরের কুয়াশা এতো ঘন ছিল যে, সেই কুয়াশা ভেদ করে সূর্যালোক পৃথিবীতে পৌছাতে পারত না। তখন দিন-রাত্রি বা ঋতুর অস্তিত্ব কিছুই বোঝা যেত না। পৃথিবীর সর্বত্রই ছিল ঊষর মরুভূমি—একদিকে দিগন্ত-বিস্তৃত মহাসাগর, অন্যদিকে ধূ ধূ বালিরাশি, আর সীমাহীন পাহাড়ের সারি। জলে, স্থলে ও আকাশে কোথাও নেই কোন প্রাণের সাড়া, এমন কি—একটি সবুজ শষ্পেরও অস্তিত্ব ছিল না সেই সুদূর অতীতে।

তারপর কত শত বছর চলে গেল। বাইরের কুয়াশা ক্রমশঃ পাত্‌লা হয়ে গেল। তারপর সূর্যদেব যেন মাতা বসুন্ধরার ঘোমটার আবরণ তুলে তাঁর প্রশান্ত মূর্তির দিকে সপ্রতিভ দৃষ্টিপাত করলেন। আর সেই শুভক্ষণে পৃথিবীর দিকে দিকে জেগে উঠল প্রথম প্রাণের স্পন্দন।

আগেই বলেছি, তখন পৃথিবীর সমুদ্রে ছিল জল, অ্যামোনিয়া এবং মিথেন। আর বিভিন্ন রূপ রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটনের জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তির উৎস ছিল সূর্য-রশ্মির অফুরন্ত ভাণ্ডার। কাজেই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তখনই জীব-সৃষ্টির পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল।

সৃষ্টির দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

সৃষ্টির এই অধ্যায়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল কয়েকটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জৈব পদার্থের উদ্ভব। রসায়ন-চর্চার প্রথম দিকে লোকের ধারণা ছিল যে, জৈব পদার্থ কেবলমাত্র প্রাণশক্তির সাহায্যেই জীবদেহের মধ্যে সংগঠিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু ১৮২৮ সালে বিজ্ঞানী ভোয়েলার প্রমাণ করেন যে, তাপের প্রভাবে অজৈব অ্যামোনিয়াম সায়ানেট—ইউরিয়া নামক জৈব পদার্থে পরিণত হয়।

অ্যামোনিয়াম সায়ানেট [NH_4CNO] ⟶ ইউরিয়া [$CO(NH_2)_2$]
(অজৈব পদার্থ) (জৈব পদার্থ)
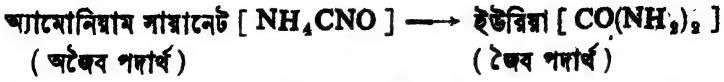
এর ফলে, প্রাণশক্তির সাহায্য ব্যতীত জৈব পদার্থ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়—এই ধারণার মূলে কুঠারাঘাত হ'ল, আর সেই থেকেই জৈব রসায়নের নবযুগ আরম্ভ হ'ল। বিজ্ঞানীরা শত শত জৈব পদার্থ রসায়নাগারে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করতে সক্ষম হলেন। কাজেই একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, সুদূর অতীতে নানাবিধ প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবেই পৃথিবীতে নানাপ্রকার জৈব পদার্থের সৃষ্টি হয়েছিল, আর সেই সব উপাদান দিয়েই গড়ে উঠেছিল পৃথিবীর প্রথম জীব।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে লাবোয়াজিয়ে প্রমাণ করেন যে, তখন পর্যন্ত যে কয়টি জৈব পদার্থের কথা জানা ছিল, তাদের প্রত্যেকটিই কার্বন-ঘটিত যৌগ। তাই ভোয়েলারের আবিষ্কারের পরেই জৈব পদার্থের নতুন সংজ্ঞা দেওয়া হ'ল। বর্তমানে জৈব পদার্থ বলতে যে-কোন কার্বন-যুক্ত যৌগ বুঝা যায়, আর কার্বন-যুক্ত যৌগসমূহের রাসায়নিক আলোচনাকে বলা হয় জৈব রসায়ন (Organic chemistry) বা কার্বন-রসায়ন।

কার্বনের একটি বিশেষ গুণ এই যে, যৌগ সৃষ্টির সময় একাধিক কার্বন পরমাণু পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে। আর এভাবে বহুসংখ্যক কার্বন পরমাণু সংযুক্ত হয়ে অণু গঠন করলেও তা বেশ স্থায়ী হয়। অন্যান্য মৌলের বেলায় সেরূপ হতে দেখা যায় না।

জীবদেহ গঠনে এবং জীবের পুষ্টি সাধনে যে-সব জৈব পদার্থ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে, তাদের প্রধানতঃ ছয়টি ভাগে ভাগ করা যায়। এদের নাম—শর্করা, গ্লিসারিন, স্নেহজ অ্যাসিড, অ্যামিনো-অ্যাসিড, পিরিমিডিন এবং পিউরিন। বিজ্ঞানীরা এই সব রকম পদার্থই রসায়নাগারে প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছেন। এজন্যে তাঁরা মনে করেন, সুদূর অতীতে নানারূপ প্রাকৃতিক ক্রিয়ার প্রভাবে সমুদ্রের জলে অবস্থিত প্রাথমিক উপাদানগুলির মধ্যে নানারূপ বিক্রিয়া ঘটে এবং তার ফলেই এই ছয় রকম অপরিহার্য উপাদানের সৃষ্টি হয়। বলা বাহুল্য, এসবের সৃষ্টি হয়েছিল বলেই পরবর্তীকালে জীবের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল।
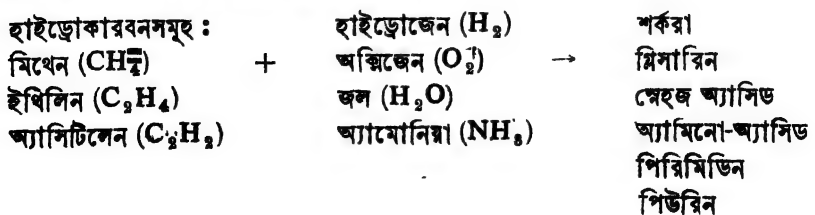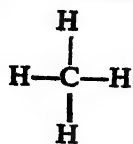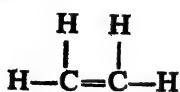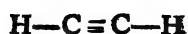
হাইড্রোকারবনসমূহ :		হাইড্রোজেন (H_2)		শর্করা
মিথেন (CH_4)	+	অক্সিজেন (O_2)	→	গ্লিসারিন
ইথিলিন (C_2H_4)		জল (H_2O)		স্নেহজ অ্যাসিড
অ্যাসিটিলেন (C_2H_2)		অ্যামোনিয়া (NH_3)		অ্যামিনো-অ্যাসিড
				পিরিমিডিন
				পিউরিন

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য যৌগ ঃ
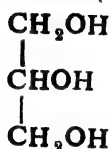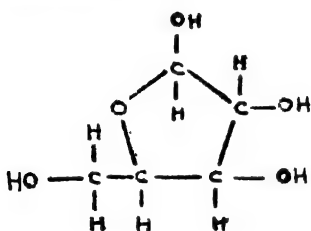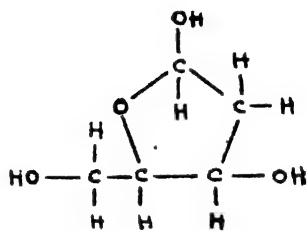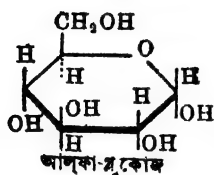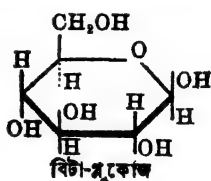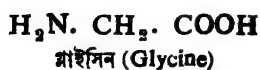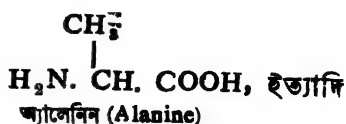
(চ) পিরিমিডিনসমূহ—
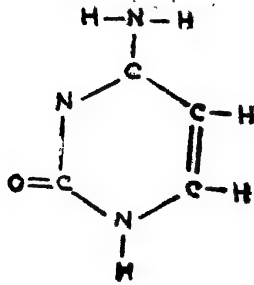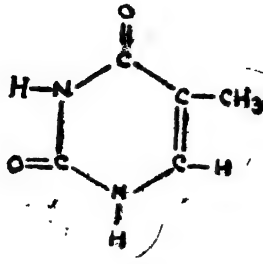
সাইটোসিন (Cytosine)　　থাইমিন (Thymine)　　ইউরাসিল (Uracil)
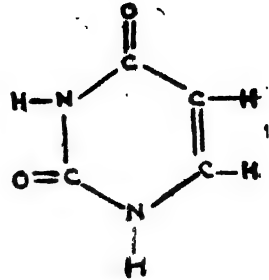
(ছ) পিউরিনসমূহ—
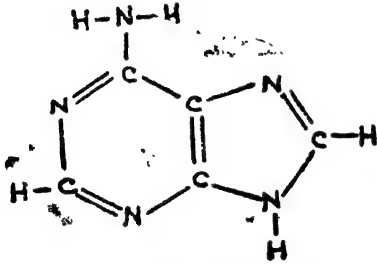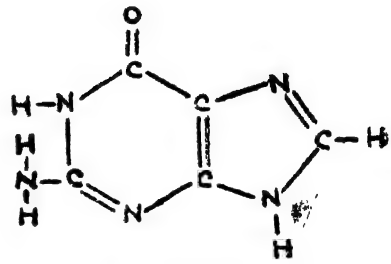
অ্যাডেনিন (Adenine)　　গুয়ানিন (Guanine)

এই প্রসঙ্গে বিশ্বাস উৎপাদনের উপযোগী কয়েকটি বিক্রিয়ার উল্লেখ করা যেতে পারে। এগুলি সবই ল্যাবরেটরীতে (বা, প্রয়োগশালায়) অনুসরণ করা সম্ভব হয়েছে।

(ক) $CH_4 \xrightarrow[\text{জারণ}]{[O]} CH_3OH \xrightarrow[\text{জারণ}]{[O]} H.CHO$

মিথেন　　মিথানল　　ফরম্যাল্‌ডিহাইড

$Ca(OH)_2$

$C_6H_{12}O_6$

গ্লুকোজ (বা, দ্রাক্ষা-শর্করা)

+KCN

↓

প্রোটিন-জাতীয় পদার্থ

(খ) C_2H_2 $\xrightarrow[+H_2O]{\text{প্রভাবক}}$ $CH_3 \cdot CHO$ $\xrightarrow[\text{জারণ}]{[O]}$ $CH_3 \cdot COOH$

অ্যাসিটিলিন — অ্যাসিট্যাল্ডিহাইড — অ্যাসিটিক অ্যাসিড (স্নেহজ অ্যাসিড)

$CH_3 \cdot CH(OH) \cdot NH_2$ $\xleftarrow{+NH_3}$ $\xleftarrow[\text{বিজারণ}]{[H]}$ $CH_3 \cdot CH_2OH$

অ্যাল্ডিহাইড-অ্যামোনিয়া (নাইট্রোজেন-ঘটিত যৌগ) — ইথানল

$+NH_3$
$+HCN$

$CH_3 \cdot CH(NH_2) \cdot COOH$

অ্যালেনিন (অ্যামিনো-অ্যাসিড)

(গ) $CH_3 - COOH$ (অ্যাসিটিক অ্যাসিড) $\xrightarrow{+Ca(OH)_2}$ $(CH_3 \cdot COO)_2Ca$ (ক্যাল্সিয়াম) $\xrightarrow{\text{পাতন}}$ $CH_3 - CO - CH_3$ (অ্যাসিটোন)

অ্যাসিটোন $\xrightarrow[\text{(বিজারণ)}]{[H]}$ $CH_3 - CHOH - CH_3$ (প্রপানল)

$CH_3 - CHOH - CH_3$ $\xrightarrow[250° \text{ সে.}]{Al_2O_3 \text{ (প্রভাবক)}}$ $CH_3 - CH = CH_2$ (প্রপিলিন) $\xrightarrow[500° \text{ সে.}]{Cl_2}$ $CH_2Cl - CH = CH_2$

$+HOCl$

$\left[CH_2Cl - CHCl - CH_2OH \text{ বা, } CH_2Cl - CHOH - CH_2Cl \right]$ $\xrightarrow{CaO}$ $CH_2Cl - CH - CH_2$ (CH ও CH_2 O দ্বারা যুক্ত) $\xrightarrow[(NaOH)]{H_2O}$ $CH_2OH - CHOH - CH_2OH$

গ্লিসারল

বায়ুমণ্ডলে তড়িৎ-ক্ষরণের ফলে জৈব পদার্থের উদ্ভব সম্ভবপর কিনা সে-বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে গবেষণাকার্য শুরু করেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী হ্যারল্ড ইউরে। তাঁর তত্ত্বাবধানে তাঁরই এক ছাত্র এস্. এল্. মিলার (S. L. Miller) একটি সহজ পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। এজন্য জলীয় বাষ্প (H_2O), মিথেন (CH_4), অ্যামোনিয়া (NH_3) এবং হাইড্রোজেন (H_2)-এর মিশ্র (সৃষ্টির প্রথম যুগে এগুলি সবই বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমানে বিদ্যমান ছিল বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস) প্রায় এক

চিত্র ১৭৬। ষ্ট্যানলী মিলার
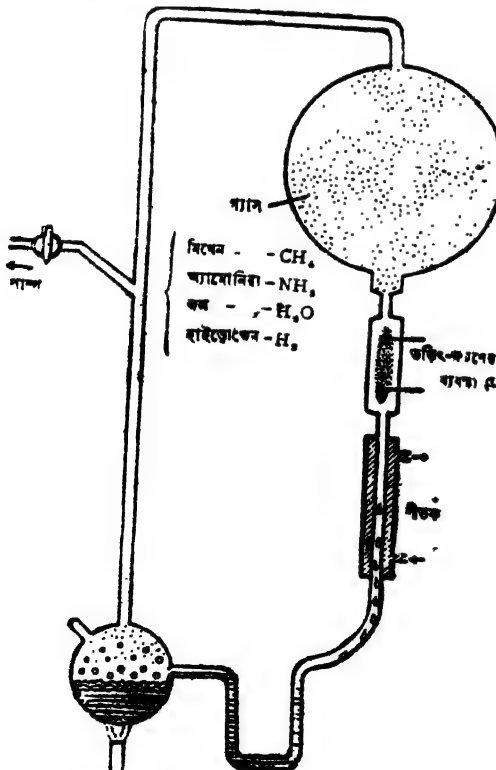
চিত্র ১৭৭। ষ্ট্যান্লী মিলার এর পরীক্ষা

সপ্তাহ ধরে ক্রমাগত তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গের ভিতর দিয়ে বারবার প্রবাহিত করা হয়। সপ্তাহ শেষে বিক্রিয়া-লব্ধ পদার্থ নিয়ে সূক্ষ্ম 'পেপার ক্রোমাটোগ্রাফী' পদ্ধতিতে পরীক্ষা ক'রে, তার মধ্যে প্রোটিনের কয়েকটি উপাদান অ্যামিনো-অ্যাসিডের (যেমন—গ্লাইসিন, অ্যালেনিন প্রভৃতির) অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব হয়। শুধু তাই নয়, এদের পরিমাণও খুবই বেশী। বিশ্বাস উৎপাদনের উপযোগী এই বিস্ময়কর পরীক্ষাটি জীব-সৃষ্টি সম্পর্কিত জল্পনা-কল্পনার উপরে এক নতুন আলোক-সম্পাত করেছে বলা যায়।

সৃষ্টির তৃতীয় অধ্যায় ঃ

সৃষ্টির তৃতীয় অধ্যায়ে এই জাতীয় রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলি অব্যাহতভাবে চলতে থাকে, আর উপরিউক্ত উপাদানগুলির নানাপ্রকার সংযোগ-সংহতির ফলেই সৃষ্টি হয় আরও কয়েক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ, যেগুলি জীবের দেহ-গঠন এবং পুষ্টি-সাধনের পক্ষে অপরিহার্য। এদের নাম—পলি-স্যাকারাইড (আরও জটিল শর্করা), ফ্যাট বা স্নেহদ্রব্য, প্রোটিন, নিউক্লিওটাইড এবং নিউক্লিক অ্যাসিড।

একাধিক শর্করার অণু পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গঠন করে পলি-স্যাকারাইডের অণু। স্টার্চ, সেলুলোজ, গ্লাইকোজেন প্রভৃতি এই জাতীয় পদার্থের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এরা জীবদেহ পুষ্টি ও বৃদ্ধির অন্যতম উপাদান। তাছাড়া এরা জীব-দেহে শক্তি উৎপাদনেও একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে।

শর্করা + শর্করা + ⋯ → পলি-স্যাকারাইড বা জটিল শর্করা

যেমন—

আল্‌ফা-গ্লুকোজ + আল্‌ফা-গ্লুকোজ + ⋯

→ ইত্যাদি

স্টার্চ (আল্‌ফা-গ্লুকোজ দ্বারা গঠিত)

বিটা-গ্লুকোজ + বিটা-গ্লুকোজ + ⋯

→ ইত্যাদি

সেলুলোজ (বিটা-গ্লুকোজ দ্বারা গঠিত)

অথবা, ইত্যাদি

সেলুলোজ (বিটা-গ্লুকোজ দ্বারা গঠিত)
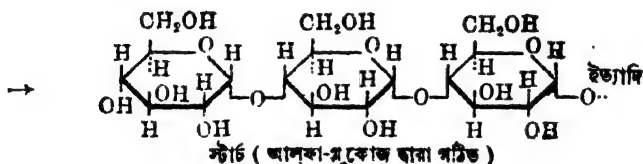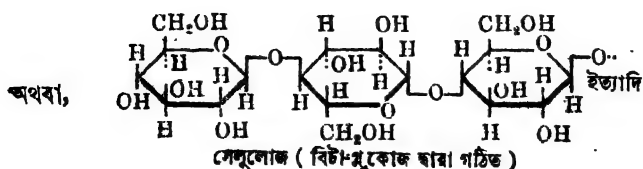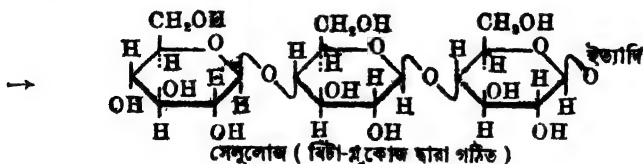
গ্লিসারিন নানাপ্রকার স্নেহজ অ্যাসিডের সঙ্গে যুক্ত হয়, তার ফলে উৎপন্ন হয় নানাপ্রকার ফ্যাট বা স্নেহদ্রব্য। এরাও জীবদেহের পুষ্টি বৃদ্ধি ও শক্তি উৎপাদনে বিশেষভাবে সহায়তা করে। উদ্বৃত্ত স্নেহদ্রব্য জীবদেহে মেদরূপে সঞ্চিত হয়।

$$\begin{array}{l} CH_2OH + HOOC.\ R \\ | \\ CHOH\ + HOOC.\ R' \\ | \\ CH_2OH + HOOC.\ R'' \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} CH_2O.\ CO.\ R \\ | \\ CHO.\ CO.\ R' \\ | \\ CH_2O.\ CO.\ R'' \end{array} + 3H_2O$$

গ্লিসারল+স্নেহজ অ্যাসিড → ফ্যাট বা স্নেহদ্রব্য
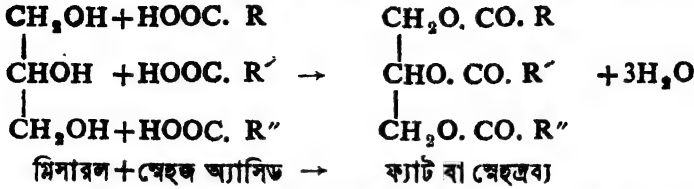
তবে এদিক দিয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল প্রোটিন। বিভিন্ন অ্যামিনো-অ্যাসিড পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রোটিন সৃষ্টি করে। প্রোটিন অতিকায় অণুর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একটি প্রোটিন অণু গঠনে অসংখ্য অ্যামিনো-অ্যাসিডের অণু (এক লক্ষ বা তারও বেশী) অংশ গ্রহণ করতে পারে। এই কারণে প্রোটিনের এক-একটি অণু যেমন অতিকায় হতে পারে, গঠন-বৈচিত্র্যের দিক দিয়েও তা তেমনি জটিল হতে পারে। জীবের দেহতন্তু ও পেশী-গঠনে এরাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

$$H_2N.\ \overset{\overset{R}{|}}{C}H.\ COOH + H_2N.\ \overset{\overset{R'}{|}}{C}H.\ COOH + \cdots$$

অ্যামিনো অ্যাসিড+অ্যামিনো অ্যাসিড+···

$$\rightarrow H_2N.\ \overset{\overset{R}{|}}{C}H.\ CO.\ NH.\ \overset{\overset{R'}{|}}{C}H.\ CO.\cdots$$ ইত্যাদি

প্রোটিন (পেপ্‌টাইড শৃঙ্খল)
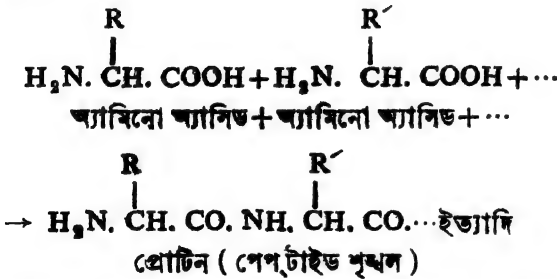
প্রোটিনের উদ্ভব আর একদিক দিয়েও উল্লেখযোগ্য হয়ে দাঁড়ালো। এমন অনেক প্রোটিন আছে, যেগুলি বিবিধ রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটনে প্রভাবকের (Catalyst) বা অনুঘটকের কাজ করে। এদের বলা হয় এন্‌জাইম। বিজ্ঞানীরা এখন নিশ্চিত বুঝতে পেরেছেন যে, জীবদেহের নানাপ্রকার জৈব প্রক্রিয়াগুলি নানাপ্রকার এন্‌জাইমের সাহায্যেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তাই কোন কোন বিজ্ঞানী বলেন, জীবনধারণ প্রকৃতপক্ষে নানাপ্রকার এন্‌জাইম-প্রভাবিত বিক্রিয়ার সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়।

সেই সময় প্রোটিনের মতই জটিল এবং বৈচিত্র্যময় আর এক জাতের অণুর সৃষ্টি হয়; পিরিমিডিন বা পিউরিন, শর্করা এবং ফস্‌ফেট-জাতীয় লবণের সহযোগিতা।

এদের বলা হয় নিউক্লিওটাইড। আবার শত-সহস্র নিউক্লিওটাইড অণু পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গড়ে তোলে অতত্যন্ত জটিল এবং অতিকায় এক-একটি নিউক্লিক অ্যাসিডের অণু। এইভাবে সৃষ্টি ক্রমাগত জটিল থেকে জটিলতর অণু-গঠনের দিকে এগিয়ে চলতে থাকে। [এখানে উল্লেখ্য যে, প্রধানতঃ তিন প্রকার রাসায়নিক পদার্থ ক্রোমোসোম গঠনে অংশ গ্রহণ করে থাকে; যেমন—ডেসক্সিরাইবো-নিউক্লিক অ্যাসিড (সংক্ষেপে ডি. এন. এ.), রাইবো-নিউক্লিক অ্যাসিড (সংক্ষেপে আর. এন-এ.) এবং প্রোটিন।]

পিরিমিডিন—(ক্ষারক) বা, পিউরিন—(ক্ষারক) } + শর্করা + ফস্‌ফেট ——→ নিউক্লিওটাইড

নিউক্লিওটাইড + নিউক্লিওটাইড +··· ——→ নিউক্লিক অ্যাসিড
(ডি. এন. এ., বা, আর এন. এ.)
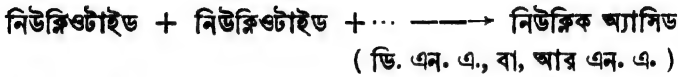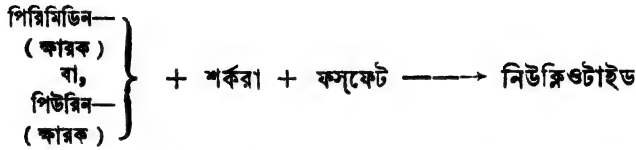
সৃষ্টির চতুর্থ অধ্যায়ঃ

সৃষ্টিতত্ত্বের দিক দিয়ে এই অধ্যায়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে এই অধ্যায়েই অজৈব বা প্রাণহীন জড়-পদার্থ থেকেই প্রথম প্রাণবন্ত পদার্থ বা জীবের উদ্ভব হয়। ঠিক কি ভাবে এই রূপান্তর ঘটেছিল, তা নিশ্চই ক'রে বলা সম্ভব হয় নি। তবে বিজ্ঞানীদের পক্ষে অনুমান করতে দোষ কি ?

বিজ্ঞানীরা বলেন, নিউক্লিক অ্যাসিড এবং প্রোটিন পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে গঠন করে নিউক্লিওপ্রোটিনের অণু। বাস্তবিক এই রকম অতিকায় এবং সেই সঙ্গে এতো জটিল আর কোন অণুর কথা আমাদের জানা নেই।

নিউক্লিক অ্যাসিড + প্রোটিন ——→ নিউক্লিওপ্রোটিন

নিউক্লিওপ্রোটিন যে কয়েকটি বিস্ময়কর ধর্মের অধিকারী হয়েছিল, এরূপ বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথমতঃ বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, নিউক্লিওপ্রোটিনের একটি অণু সমুদ্রজলে অবস্থিত উপাদানগুলির সাহায্যেই অনুরূপ আর একটি অণু গঠন করতে পারতো। এক কথায় বলা যায় যে, এরাই সর্বপ্রথম বংশ-বিস্তার করবার ক্ষমতা অর্জন করেছিল।

আপাতদৃষ্টিতে এটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন, এটা একেবারে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাঁদের মতে, প্রকৃতির বুকে হাজার হাজার বছর ধরে শত-সহস্র রকমের রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছিল।

এদের মধ্যে যে কত প্রক্রিয়া ব্যর্থ হয়েছে, তার কোন হিসেব নেই। দৈবাৎ একটি প্রক্রিয়া হয়তো সফল হয়েছিল, আর তারই ফলে হয়তো প্রথম নিউক্লিওপ্রোটিন অণুটি গঠিত হয়েছিল। এর মধ্যে খানিকটা দৈব বা আকস্মিকতার স্থান ছিল, একথা সত্য। তবে প্রথম অণুটি এইভাবে গঠিত হবার পর আরও নতুন নতুন অণু গঠনের কাজ যে অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

একটি নিউক্লিওপ্রোটিন অণু গঠনের জন্যে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সবই তখন সমুদ্রের জলে ছিল। দৈবক্রমে সংগঠিত প্রথম নিউক্লিওপ্রোটিন অণুটির সংস্পর্শে এসে উপাদানগুলি পর পর অনুরূপ ভাবে সজ্জিত হ'ল এবং সেইরকম আর একটি অণু গঠন করে তুললো। এভাবে একটি থেকে দু'টি, দু'টি থেকে চারটি ক'রে পর পর আরও অনেক অণু তৈরী হতে থাকল।

একটি সম্পৃক্ত দ্রবণের মধ্যে একটি কেলাস রেখে দিলে তাকে কেন্দ্র করেই ঐ পদার্থটি কেলাসিত হতে থাকে, একথা আমরা জানি। কেলাসিত পদার্থ মাত্রেরই এটা একটা বিশেষ ধর্ম। আবার এও আমরা জানি যে, নানারকম প্রভাবক নানা রকম বিক্রিয়ায় সহায়তা করে, যদিও তারা সেই সব বিক্রিয়ায় প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করে না। প্রভাবক মাত্রেরই এটা একটা বিশেষ ধর্ম। কাজেই নিউক্লিও প্রোটিনের আদিম অণুটি যে অনুরূপ আরও অণু গঠনে সহায়তা করেছিল, এরূপ মনে করলে খুব অযৌক্তিক হয় না। একে নিউক্লিওপ্রোটিনের একটি বিশেষ ধর্ম বলে অনায়াসে মনে করা যেতে পারে।

এভাবে নিউক্লিওপ্রোটিনের তথাকথিত বংশ-বিস্তারের জন্যে সবার আগে দরকার হ'ল, সমুদ্র-জল থেকে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সংগ্রহ করা, এবং তাদের সাহায্যে নতুন অণু গঠন করা। এই সব প্রক্রিয়াকে যে-কোন একটি জীবের খাদ্য-গ্রহণ, সেই খাদ্যের সাহায্যে দেহের পুষ্টিসাধন, বংশ-বিস্তার প্রভৃতি জৈব-ক্রিয়াগুলির সঙ্গে অনায়াসে তুলনা করা যায়।

এই প্রক্রিয়া যত এগিয়ে চলতে থাকলো, ততই নতুন নতুন নিউক্লিওপ্রোটিন অণু গঠিত হতে লাগল। এর ফলে সমুদ্র-জল থেকে উপাদানগুলি ক্রমশঃ অপসারিত হতে থাকলো। সে জন্যে উপরিউক্ত উপাদানগুলির অভাব হতে লাগল; তাই তখন প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হ'ল।

পৃথিবীর পরিবর্তিত অবস্থায় প্রয়োজনের তাগিদে নিউক্লিওপ্রোটিনের অণুতে পরিবর্তন দেখা দিতে লাগল, যাতে নতুন নতুন খাদ্য গ্রহণ ক'রে তাদের সাহায্যেই

নতুন রকম নিউক্লিওপ্রোটিন অণু গঠন করা সম্ভব হয়। প্রকৃতির বুকে এই রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকলো এবং তার ফলে নিত্য নতুন ধরনের নিউক্লিওপ্রোটিন গঠিত হতে থাকলো। অর্থাৎ, পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর ক'রে নিউক্লিও-প্রোটিনেরও 'মিউটেশন' (Mutation) বা পরিব্যক্তি, অর্থাৎ স্থায়ী পরিবর্তন, চলতে লাগল।

এই পরিবর্তন যে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই হিতকর হ'ল, তা নয়। যে-সব ক্ষেত্রে হিতকর হ'ল, সে-সব ক্ষেত্রে এরা লভ্য উপাদানগুলি সংগ্রহ ক'রেই উপরিউক্ত পদ্ধতিতে বংশ-বিস্তার করে যেতে থাকল। আর যে-সব ক্ষেত্রে তা হ'ল না, সে-সব ক্ষেত্রে নিউক্লিওপ্রোটিন নতুন কোন প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে পারলো না, কাজেই শেষ পর্যন্ত তা লোপ পেয়ে গেল। এভাবে সম্ভবতঃ নিউক্লিওপ্রোটিন অণুতেই জীবের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য 'মিউটেশন' (বা, পরিব্যক্তি) প্রথম দেখা দিয়েছিল।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে, নিউক্লিওপ্রোটিন জড়-পদার্থ হলেও তাতে জীবের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি (যেমন—খাদ্য-গ্রহণ, পুষ্টি, বংশ-বিস্তার এবং মিউটেশন) দেখা দিয়েছিল। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হ'ল এই যে, আজ থেকে প্রায় শত কোটি বছর আগেই প্রাণহীন নিউক্লিওপ্রোটিনের মধ্যেই প্রথম অভিব্যক্তি (Evolution) বা বিবর্তন-এর সূচনা হয়েছিল। এখনও বিবর্তনের ক্ষমতাকেই জীবের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা হয়।

সমুদ্র-জলে খাদ্যের যত অভাব হতে থাকলো, খাদ্য সংগ্রহের জন্যে ততই ফিকির-ফন্দি শুরু হ'ল। এজন্যে কতকগুলি নিউক্লিওপ্রোটিন অণু সঙ্ঘবদ্ধ হ'ল। এতে খাদ্য সংগ্রহের কাজ আরও সহজ হ'ল। এরূপ অনেকগুলি অণু যাতে একসঙ্গে থেকে সুষ্ঠুভাবে সব কাজ করতে পারে, সে জন্যে তাদের চারদিকে আবার প্রোটিনের আবরণ তৈরী হ'ল।

এইরকম ক'রে শেষে একদিন সৃষ্টি হ'ল পৃথিবীর আদিতম জীব, বিজ্ঞানীরা যার নাম দিয়েছেন প্রোটোভাইরাস। প্রোটোভাইরাসের সঠিক পরিচয় আমাদের জানা নেই; তবে অনেক রকম ভাইরাসের কথা আমরা জানতে পেরেছি।

অনেকেই মনে করেন যে, ভাইরাস (Virus) হ'ল প্রোটোভাইরাসেরই উন্নত সংস্করণ। ভাইরাস এতো ছোট যে, অত্যন্ত শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও এদের দেখা যায় না। (একমাত্র ইলেকট্রন-মাইক্রোস্কোপ দিয়েই এদের দেখা সম্ভব হয়।) তবে এদের ধর্ম খুবই বিস্ময়কর। ভাইরাস মাত্রেই পরজীবী। কিন্তু একটি ভাইরাস

যতক্ষণ জীবদেহের মধ্যে থাকে, ততক্ষণ শুধু এর মধ্যে প্রাণের লক্ষণগুলি সব প্রকাশিত হয়। এরা যখন জীবদেহের বাইরে থাকে, তখন এদের মধ্যে প্রাণের কোন লক্ষণই দেখা যায় না। এদের ধর্ম হয় তখন প্রাণহীন জড়-পদার্থের মতই। শুধু তাই নয়, কোন কোন ভাইরাসকে আবার রাসায়নিক পদার্থের মতো কেলাসিত অবস্থায়ও তৈরি করা গেছে। তাই বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ভাইরাসই সুস্পষ্টভাবে প্রাণহীন এবং প্রাণবস্তের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করছে। তাঁরা বলেন, নিউক্লিওপ্রোটিন থেকে প্রথমে প্রোটোভাইরাস এবং পরে তা থেকেই ভাইরাসের সৃষ্টি হয়েছিল। সুদূর অতীতে এভাবেই হয়তো প্রাণহীন জড়-পদার্থ থেকে প্রথম জীবের উদ্ভব হয়েছিল।

নিউক্লিওপ্রোটিন → প্রোটোভাইরাস → ভাইরাস

সৃষ্টির পঞ্চম অধ্যায়ঃ

ভাইরাসকে সুস্পষ্টভাবে জীব বলে মনে করা যায় না। কারণ, জীবদেহের বাইরে তার পৃথক্ অস্তিত্ব সম্ভব নয়, অর্থাৎ তখন তার মধ্যে জীবনের কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না। সম্ভবতঃ প্রয়োজনের তাগিদেই নিউক্লিওপ্রোটিনের এক-একটি দল তাদের চারিদিকে প্রচুর জলসহ নানাবিধ জৈব ও অজৈব খাদ্যের স্তর গঠন করে, আর তার চারদিকে গঠন করে মজবুত প্রাচীর। এমনি করে বিবর্তনের ধারায় সৃষ্টি হ'ল প্রথম জীব-কোষ (Cell)। একটি কোষে ছিল খানিকটা চট্‌চটে প্রাণপদার্থ প্রোটোপ্লাজ্‌ম (Protoplasm) বা প্রাণপঙ্ক, আর তার চারদিকে ছিল একটি কোষ-প্রাচীর (Cell-wall)। তবে তার মধ্যে কোন নিউক্লিয়াস ছিল না, তাই এর কাজকর্মও তেমন সুনিয়ন্ত্রিত হতে পারতো না।

আমাদের জানা নানারকম ব্যাক্টিরিয়াকে এইরূপ জীব-কোষের প্রকৃত প্রতিনিধি বলে মনে করা যায়। কারণ, জীবদেহের বাইরেও তাদের পৃথক্ অস্তিত্ব সম্ভব। আবার পোষক-মাধ্যম থেকেও তারা খাদ্যের উপাদানগুলি সংগ্রহ ক'রে বেঁচে থাকতে পারে, এবং বংশ-বিস্তার করতে পারে।

ব্যাক্টিরিয়া এতো ছোট যে, একটা আলপিনের মাথায় একসঙ্গে হাজার হাজার ব্যাক্টিরিয়া থাকতে পারে। সবচেয়ে বড় যে ব্যাক্টিরিয়ার কথা জানা গেছে, তা লম্বায় মাত্র $\frac{১}{২৫০}$ ইঞ্চি, আর সবচেয়ে ছোট যে ব্যাক্টিরিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা সম্ভব হয়েছে, তার দৈর্ঘ্য মাত্র $\frac{১}{২৫০০০}$ ইঞ্চি। ব্যাক্টিরিয়া সাধারণ-ভাবে জীবদেহে নানারূপ রোগ-সংক্রমণে অংশ গ্রহণ করে। তবে এদের সবাই

যে আমাদের শত্রু তা নয়, এদের কেউ কেউ জীবদেহে বন্ধুভাবে অবস্থান ক'রে নানাবিধ জৈব-ক্রিয়ায় সহায়তা করে। ব্যাকৃটিরিয়া পরজীবী অথবা মৃতজীবী দু'রকমই হতে পারে। আমাদের চারদিকে জল-বাতাসে সর্বদাই এতো ব্যাকৃটিরিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে যে, জীবদেহ থেকে প্রাপ্ত জৈব পদার্থ অথবা জীবের মৃতদেহ জল-বাতাসের সংস্পর্শে থাকলে, এসব ব্যাকৃটিরিয়ার ক্রিয়ায় অচিরেই তাদের পচন আরম্ভ হয়ে যায়।

বিবর্তনের ধারায় সম্ভবতঃ ব্যাকৃটিরিয়া থেকেই উদ্ভব হয়েছিল প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীব-কোষের। এরূপ প্রত্যেকটি কোষের বাইরে থাকে কোষ-প্রাচীর, আর তার মধ্যে থাকে প্রোটোপ্লাজ্‌ম বা প্রাণপঙ্ক। প্রোটোপ্লাজ্‌মের দু'টি অংশ—মাঝের অপেক্ষাকৃত ঘন অংশের নাম নিউক্লিয়াস (Nucleus) বা অষ্টি এবং বাইরের বর্ণহীন জেলীর মত চট্‌চটে পদার্থের নাম সাইটোপ্লাজ্‌ম (Cytoplasm)। জীব-কোষে নিউক্লিয়াসের উৎপত্তি ক্রমবিকাশের দিক দিয়ে অত্যন্ত মূল্যবান হয়ে দাঁড়ালো। নিউক্লিয়াসকে জীব-কোষের মস্তিষ্ক বলা হয়, কারণ এরই সাহায্যে সাইটোপ্লাজ্‌মের যাবতীয় কাজ, যেমন—পুষ্টি, বৃদ্ধি, শ্বাসক্রিয়া প্রভৃতি সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়। তাছাড়া প্রতিটি জীবের বংশগত বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে নিউক্লিয়াসের সাহায্যে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, প্রোটোজোয়াই হ'ল পূর্ণাঙ্গ জীব-কোষের প্রথম প্রতিনিধি।

ভাইরাস —> ব্যাক্‌টিরিয়া —> প্রোটোজোয়া
(জীবকোষ) (নিউক্লিয়াস-যুক্ত জীবকোষ)

এইরূপ নিউক্লিয়াস-যুক্ত কোষও কিন্তু নিজের খাদ্য নিজে তৈরি ক'রে নিতে পারতো না। অথচ ইতিমধ্যে সমুদ্র-জল থেকে মজুত খাদ্য ক্রমশঃ নিঃশেষিত হয়ে আসছিল। তাছাড়া ইতিমধ্যে পৃথিবীর আবহাওয়ায় এমন পরিবর্তন হয়েছিল যে, প্রাকৃতিক শক্তির সহায়তায় সমুদ্র-জলে খাদ্যের উপাদানগুলি আর সংশ্লেষিত হচ্ছিল না। তাই খাদ্যের জন্যে সমগ্র জীব-জগৎ এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হ'ল। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে এরও এক সুন্দর সমাধান হয়ে গেল। এই পরিবর্তিত অবস্থায় মিউটেশনের ফলে কতকগুলি জীব-কোষে দেখা দিল সবুজকণা, যার প্রধান উপাদান হ'ল ক্লোরোফিল। ক্লোরোফিলের সাহায্যেই বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জলের উপাদান দিয়ে কার্বন-ঘটিত খাদ্য প্রস্তুত করা সম্ভব হ'ল। এর ফলে জীব-জগতের খাদ্যাভাব ঘুচল। সবুজকণা-যুক্ত এসব কোষই হ'ল উদ্ভিদের পূর্ব-পুরুষ। বিজ্ঞানীদের মতে, ক্রমবিকাশের ধারায় উদ্ভিদ্‌ হ'ল এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

সৃষ্টির প্রথম দিকে জীব একটি কোষের সাহায্যেই খাওয়া ও চলাফেরা প্রভৃতি কাজ ক'রত ; কিন্তু এতে কোন কাজই সুনিয়ন্ত্রিত হ'ত না। প্রত্যেক জীবেরই খাদ্য দরকার। এক জায়গায় চুপ ক'রে বসে থাকলে সেখানকার খাদ্য শীঘ্রই ফুরিয়ে যাবে, তাই এগিয়ে চলা এবং খাদ্য সংগ্রহ করবার সুবিধার জন্যে জীবদেহে নানারূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি হ'ল, আর সে জন্যে জীবদেহে কোষের সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। এরপর একটি জীব অন্য আর একটি জীবকে আক্রমণ ক'রে উদরসাৎ করতে শিখল। আবার আক্রান্ত জীব শিখল, যাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়াচাড়া ক'রে পালিয়ে বাঁচতে পারে। এভাবে জীবদেহের জটিলতা ক্রমশঃ বেড়ে যেতে লাগল।

জীবের ক্রমবিকাশ হ'ল প্রধানতঃ দু'টি ধারায়। যাদের দেহ সবুজ হ'ল, তাদের থেকেই নানারকম উদ্ভিদের সৃষ্টি হ'ল। উদ্ভিদ্ মাটির নীচে শিকড় চালিয়ে রস সংগ্রহ করতে শিখল, আর সবুজ পাতার সাহায্যে বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জলের উপাদান দিয়ে খাদ্য তৈরি করতে শুরু ক'রল। যারা খাদ্য তৈরি করতে পারলো না, তারা প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভিদের কাছ থেকেই খাদ্য সংগ্রহ ক'রে জীবনধারণ করতে থাকল। আবার একদল জীব দেখা দিল, যারা ঐসব জীবকেই খেতে লাগল। তারা সবাই হ'ল প্রাণী। এমনি ক'রেই জীব দু-ভাগ হয়ে গেল —এক ভাগ হ'ল উদ্ভিদ, আর এক ভাগ হ'ল প্রাণী।

উদ্ভিদ্ এবং প্রাণী সকল জীবই যে একই মূল থেকে উদ্ভূত, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, যে-কোন জীবের দেহ, তা সে উদ্ভিদই হোক বা প্রাণীই হোক, প্রোটোপ্লাজ্ম (বা, প্রাণপঙ্ক) পূর্ণ অসংখ্য কোষ দ্বারা গঠিত।

উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর বৃদ্ধি নির্ভর করে তার কোষের সংখ্যা-বৃদ্ধির উপর। কোষ কখনও নতুন ক'রে সৃষ্ট হয় না, পূর্বের কোষ থেকেই কোষ-বিভাজন প্রক্রিয়ায় নতুন কোষ উৎপন্ন হয়। একই উপায়ে অপত্য-কোষ থেকে আবার নতুন কোষ উৎপন্ন হয়। এমনি ক'রে নতুন নতুন কোষ সৃষ্টি হবার ফলেই জীবদেহ গঠিত হয়। একটি উদ্ভিদ্ বা প্রাণী যতদিন বেঁচে থাকে, ততদিন তার দেহে নতুন নতুন কোষের গঠনক্রিয়া এভাবে চলতে থাকে। এই প্রক্রিয়া বন্ধ হলেই আসে জরা, তারপর আসে মৃত্যু।

বিজ্ঞানীরা নানারকম পরীক্ষা ক'রে বুঝতে পেরেছেন যে, কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, সাল্ফার ও ফস্ফরাস এই কয়টি মৌলিক উপাদানের বিচিত্র সমাবেশেই সজীব প্রোটোপ্লাজ্মের (বা, প্রাণপঙ্কের) সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু

তাঁরা শত চেষ্টা ক'রেও ল্যাবরেটরীতে সজীব প্রোটোপ্লাজ্‌ম (বা, প্রাণপঙ্ক) আজও সৃষ্টি করতে পারেন নি, যদিও তাঁরা এর গঠন-বৈচিত্র্য সম্পর্কে অনেক খুঁটিনাটি খবর ইতিমধ্যেই সংগ্রহ ক'রে ফেলেছেন। অথচ কি অপূর্ব এই সৃষ্টি! কোন্‌ সুদূর অতীতে হঠাৎ একদিন প্রাণহীন জড়-পদার্থ থেকেই প্রথম জীবের উদ্ভব হয়েছিল এবং তা থেকেই ক্রমে কত বিচিত্র উদ্ভিদ্‌, কত বিচিত্র প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে এবং অবিরত হয়ে চলেছে! এইখানেই সৃষ্টির মাহাত্ম্য। সুদীর্ঘকালের কষ্টসাধ্য গবেষণার ফলে বিজ্ঞানীরা সৃষ্টিরহস্য সমাধানের পথে অনেক দূর অগ্রসর হতে পেরেছেন—একথা সত্য, কিন্তু তাঁরা এই সমস্যার একেবারে মূলে পৌঁছাতে পেরেছেন, এমন কথা বলবার সময় এখনও আসে নি। তবে তাঁরা যেভাবে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছেন, তাতে মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতেই তাঁরা এই সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করতে সক্ষম হবেন।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

জীবের ক্রমবিকাশ

সুদীর্ঘকাল ধরে বিজ্ঞানীদের নানারূপ গবেষণার ফলে জীবের ক্রমবিকাশের চিত্রটি এখন অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারই একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হ'ল।

(১) অ্যাজোইক বা অজীবীয় যুগ (Azoic Era) :

বিজ্ঞানীরা হিসেব ক'রে দেখেছেন, সবচেয়ে প্রাচীন ভূস্তর গঠিত হয়েছে প্রায় ৪০০ কোটি বছর আগে। এই স্তরে জীবনের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি। মনে হয়, তখন কোন জীবেরই অস্তিত্ব ছিল না। বিজ্ঞানীরা তাই এর নাম দিয়েছেন অ্যাজোইক বা অজীবীয় যুগ (*Azoic*=without life)।

(২) প্রোটোজোইক বা প্রথম-জীবীয় যুগ (Protozoic Era) :

এই যুগের চিহ্ন হিসেবে কিছু সরলতম জলজ উদ্ভিদ্ এবং সরলতম মেরুদণ্ডহীন সামুদ্রিক প্রাণীর অবশেষ পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীর কল্পিত ইতিহাসের পাতায় এই হ'ল প্রথম জীবের কাহিনী। তাই বিজ্ঞানীরা এযুগের নাম দিয়েছেন প্রোটোজোইক বা প্রথম-জীবীয় যুগ (*Proto*=first, *Zoe*=life)।

খুবই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ৫০ কোটি বছরের আগেকার স্তর থেকে জীবাশ্মের নিদর্শন বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় নি, অথচ সে তুলনায় অনেক বেশী জীবাশ্ম পাওয়া গেছে অপেক্ষাকৃত নবীন স্তরগুলি থেকে। এর সবচেয়ে বড় কারণ বোধ করি এই
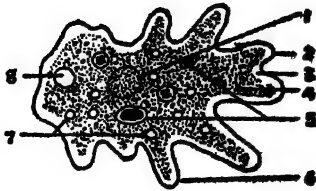
চিত্র ১৭৮। অ্যামিবা
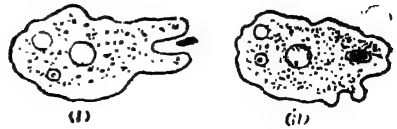
চিত্র ১৭৯। অ্যামিবার খাদ্য গ্রহণের পদ্ধতি।

যে, তখন জীবের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। আর একটি কারণ বোধ করি এই যে, সৃষ্টির প্রথম দিকে যে-সব জীব আবির্ভূত হয়েছিল, তাদের দেহ পচে গলে নষ্ট হয়ে
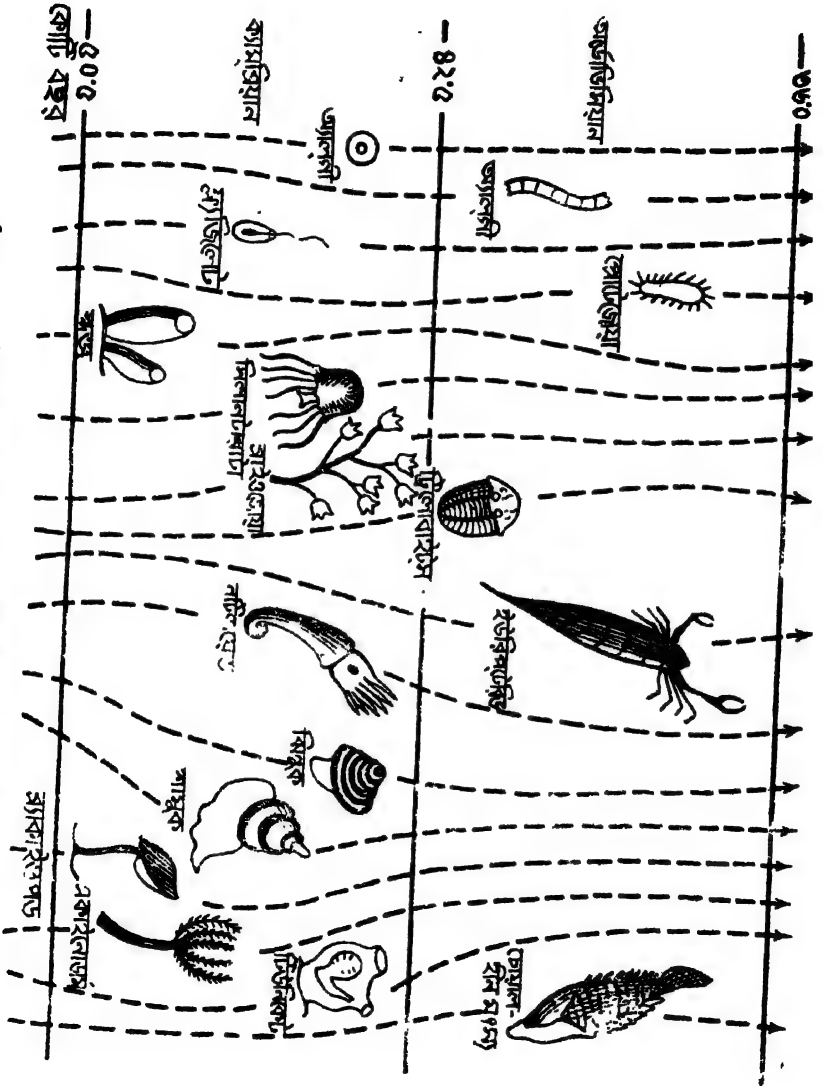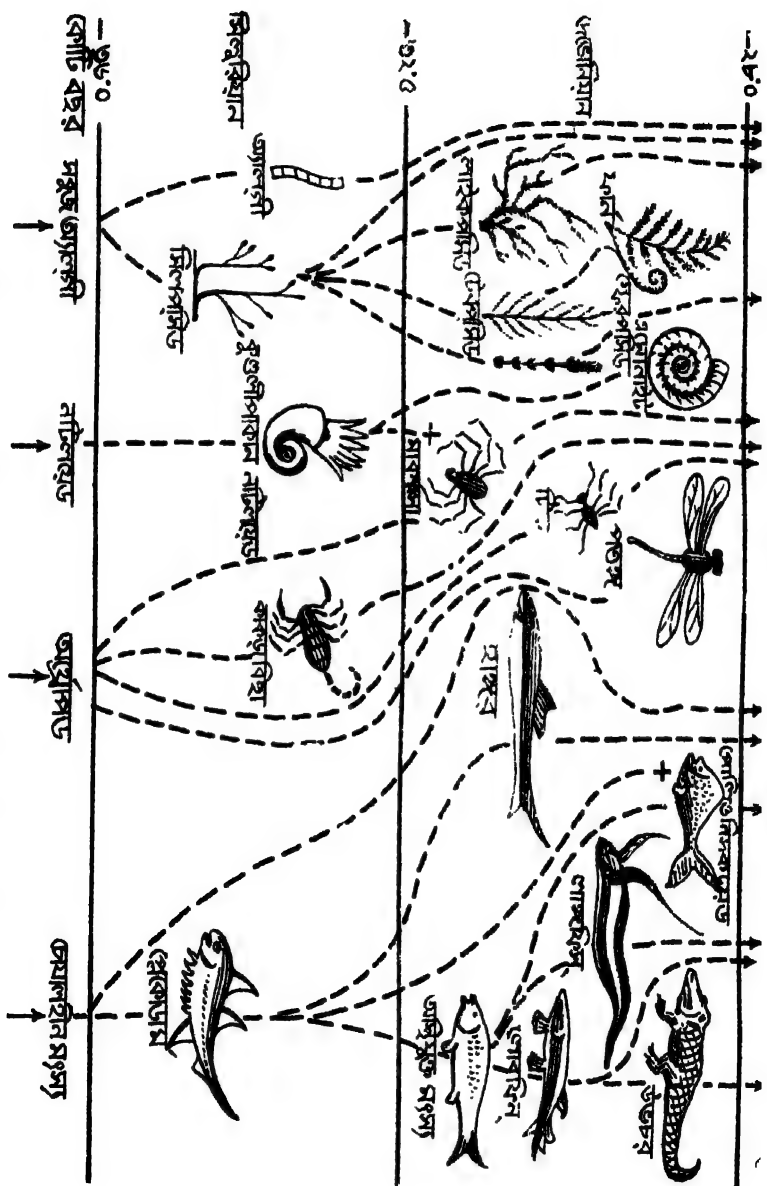
চিত্র ১৮০। জীবের ক্রমবিকাশ—৫০ কোটি থেকে ৩৬ কোটি বৎসর পূর্ব পর্যন্ত।

চিত্র ১০১। জীবের ক্রমবিকাশ—৩৬ কোটি থেকে ২ কোটি বৎসর পূর্ব পর্যন্ত।

–২০·৫
–২৩·০
–২৮·০
কোটি বছর
পারমিয়ান
কারবোনিফেরাস
সবুজশ্যাওলা
ব্রায়োফাইট্‌স
ফার্নস
ফরেস্ট ফার্নস
থেরোপসিড্‌স
সীড প্ল্যান্ট
কোন বিয়ারার্স
শামুক
স্থল শামুক
আরথোপোড্‌স
সেন্টিপেড্‌স
ইন্‌সেক্ট রেডিয়েসন
উভচর প্রানী
ল্যাবিরিনথোডন্‌স
কোটিলোসার্স
(র‍্যাপটিলিয়েন রেডিয়েসন)

চিত্র ১৮২ জীবের ক্রমবিকাশ— ৮ কোটি থেকে ২০ কোটি বৎসর পূর্ব পর্যন্ত।
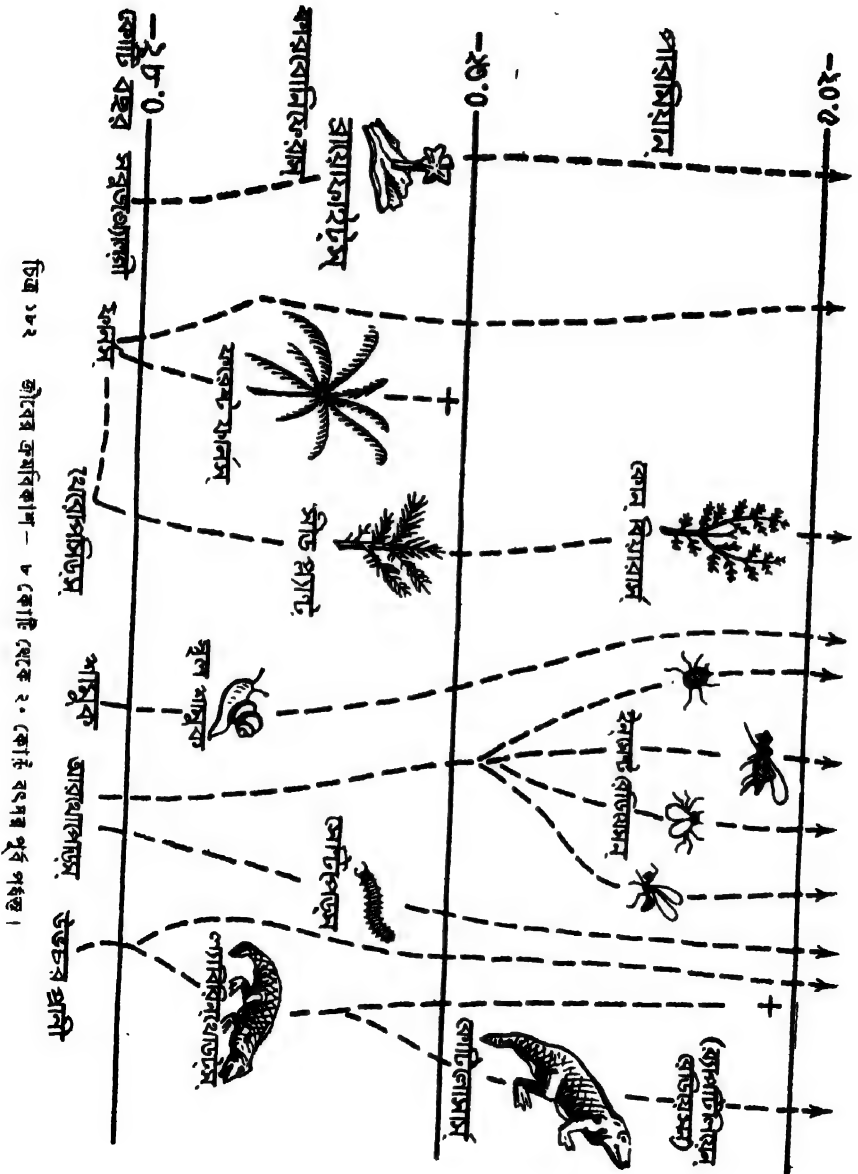
গেছে, জীবাশ্মে পরিণত হতে পারে নি। এজন্যে অতীতের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীদের বারবার শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয়েছে।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, আজ থেকে প্রায় দু-শ' কোটি বছর আগে পৃথিবীর আদিম জীবের জীবনযাত্রা শুরু হয়েছিল জলে। তার দেহে ছিল একটি মাত্র কোষ Cell), আর তার মধ্যে ছিল খানিকটা চটচটে প্রাণপদার্থ, বিজ্ঞানীরা যার নাম দিয়েছেন (Protoplasm) বা প্রাণপঙ্ক। বর্তমানে পুকুর ও ডোবায় অনেক অ্যামিবা (Amoeba) দেখা যায়। প্রয়োজন অনুসারে একটি অ্যামিবা ভেঙে দু'টি অ্যামিবায় পরিণত হয়, আর তাতেই তাদের বংশ-বিস্তার হয়। মনে হয়, অতীতের এককোষী জীবগুলি অনেকাংশে এদের মতই ছিল। এই জীব একটিমাত্র কোষের সাহায্যেই খাওয়া, চলাফেরা প্রভৃতি যাবতীয় কাজ ক'রত। কিন্তু এতে কোন কাজই সুনিয়ন্ত্রিত হ'ত না। প্রত্যেক জীবেরই খাদ্য দরকার। এক জায়গায় চুপ ক'রে থাকলে সেখানকার খাদ্য তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবে, তাই এগিয়ে চলার এবং খাদ্য সংগ্রহ করার সুবিধার জন্যে আদিম জীবের দেহে নানারূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি হ'ল, আর সেজন্যে জীবদেহে কোষের সংখ্যাও ক্রমশ বাড়তে লাগল। এইভাবে সৃষ্টি হ'ল প্রোটোজোয়া, শেওলা প্রভৃতি সরল জলজ জীব। জীবন-সংগ্রামে জয়ী হওয়ার জন্যে তাদের নানা উপায় উদ্ভাবন করতে হ'ল। ক্রমে একটি জীব অন্য আর একটি জীবকে আক্রমণ ক'রে উদরসাৎ করতে শিখল, আর আক্রান্ত জীবও শিখল যাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়াচাড়া ক'রে পালিয়ে বাঁচতে পারে। এইভাবে জীবদেহের জটিলতা ক্রমশ আরও বাড়তে লাগল।

তবে তখন জীবন সীমাবদ্ধ ছিল শুধু সমুদ্রেই, ডাঙায় ছিল না কোন প্রাণী, ছিল না কোন উদ্ভিদ, একটি সবুজ তৃণও ছিল না কোনখানে। চারিদিকে বিরাজ ক'রত শ্মশানের নিস্তব্ধতা। এই যুগ মোটামুটি প্রায় ১৫০ কোটি বছর ধরে চলেছিল।

(৩) **প্যালিওজোইক বা পুরাজীবীয় যুগ (Palaeozoic Era) :**

তারপর এলো প্যালিওজোইক বা পুরাজীবীয় যুগ। এর স্থায়িত্বকাল প্রায় ৩০ কোটি বছর। পৃথিবীর ইতিহাসের এই পৃষ্ঠাটি অনেক বেশী চমকপ্রদ। কারণ, এই যুগের নানাপ্রকার জীবাশ্মের নমুনা পাওয়া গেছে প্রাচীন শিলাস্তরে। এই যুগকে ছয়টি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে—ক্যাম্ব্রিয়ান (Cambrian), অর্ডোভিসিয়ান (Ordovician), সিলুরিয়ান (Silurian), দেভোনিয়ান (Devonian), কার্বনিফেরাস (Carboniferous) এবং পারমিয়ান (Permian)।

চিত্র ১৮৪। কার্বনিফেরাস যুগের জলাভূমি ও জঙ্গল।

এদের প্রতিনিধি হিসেবে ল্যাম্‌প্রে, হ্যাগ্‌ফিস্‌ প্রভৃতি এখনও এই পৃথিবীতে বিরাজ করছে।

সিলুরিয়ান ও দেভোনিয়ান-পর্যায়—সিলুরিয়ান পর্যায়ে (Silurian period) জলজ উদ্ভিদ্‌ ও প্রাণীর খুব বেশী পরিবর্তন হ'ল না। কিন্তু এই সময়েই

জীব প্রথম জল ছেড়ে ডাঙার দিকে এগিয়ে চললো। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, সমুদ্রের শেওলাই হয়তো সর্বপ্রথম ডাঙার জীবনে অভিযোজিত হয়েছিল। তাদের দেহের চারিদিকে একটি শক্ত আবরণ তৈরি হয়, তাই তারা অল্প সময়ের জন্যে দেহের মধ্যে খানিকটা জল সঞ্চয় ক'রে রাখতে পারত। ঢেউয়ের আঘাতে সাময়িকভাবে শুকনো ডাঙায় পড়লেও এরা সূর্যের উত্তাপে শুকিয়ে যেত না, পুনরায় সমুদ্রে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত কোনপ্রকারে বেঁচে থাকতে পারত। জোয়ারের সময় তাদের বিপদ কেটে যেত, কারণ তখন তারা জলে ফিরে যেত এবং তাদের জলের ভাণ্ডার আবার পূর্ণ ক'রে নেবার সুযোগ পেত। সেই থেকে সৃষ্টির ইতিহাসে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা হ'ল।

এই সব উদ্ভিদ্ জল ছেড়ে ডাঙার জীবনে অভিযোজিত হ'ল। কিন্তু তখনও এরা জল ছেড়ে বেশিক্ষণ থাকতে পারত না, তাই এদের আস্তানা হ'ল জলা-জায়গারই আশেপাশে। ডাঙার উদ্ভিদও ক্রমে মাটির নীচে শিকড় চালিয়ে রস সংগ্রহ করতে শিখল, সবুজ পাতার সাহায্যে বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলের উপাদান দিয়ে খাদ্য তৈরি করতে শুরু ক'রল। এইভাবে তারা ক্রমশ ডাঙার জীবনে অভিযোজিত হয়ে উঠল। স্থলজ উদ্ভিদের প্রথম প্রতিনিধি হিসেবে পাওয়া গেছে কতকগুলি সিলপ্সিড (Psilopsid)-এর নমুনা।

উদ্ভিদ্ এতকাল সমুদ্রের তলায় গভীর তমসায় জীবনযাপন ক'রছিল। ডাঙার জীবনে অভিযোজিত হওয়ার পরে সূর্য-রশ্মির অপূর্ব মহিমা উপলব্ধি ক'রে তারা যেন মুগ্ধ হয়ে গেল। এই সময় পৃথিবীর কুয়াশার ক্ষীণ আবরণটুকুও একেবারে সরে গেল, পৃথিবীর উপর সূর্য-রশ্মি পড়তে লাগল অজস্র ধারায়। আর মহামূল্য সূর্য-রশ্মি পুরোমাত্রায় গ্রহণ ক'রে উদ্ভিদও দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে লাগল।

এসময়কার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ্ হ'ল লাইকোপ্সিড, স্ফেনপ্সিড এবং টেরপ্সিড। প্রথম দু'টি প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। মাত্র দু'টি প্রতিনিধি আজও কোন-প্রকারে টিকে রয়েছে। তাদের নাম—ক্লাব-মস (Club-moss) এবং হর্স-টেইল (Horse-tail)। টেরপ্সিডের প্রথম প্রতিনিধি হল ফার্ন। সে সময়কার ফার্ন গাছ ক্রমে বৃক্ষের আকার ধারণ ক'রল, কোন-কোনটির উচ্চতা হ'ল প্রায় ১০০ ফুট। পৃথিবীর উদ্ভিজ্জ আবরণ ক্রমশঃ ঘন হতে লাগল।

উদ্ভিদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে নানাবিধ প্রাণীও ক্রমে ডাঙার দিকে এগিয়ে চললো। এই সময়কার শিলাস্তরে যেসব স্থলচর প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া গেছে,

তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল একপ্রকার কাঁকড়া-বিছে। কিছু কিছু পোড়ামাকড়ের নমুনাও অবশ্য এই স্তরে পাওয়া গেছে।
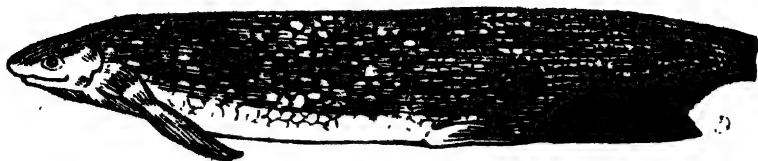
চিত্র ১৮৬। লাঙ্গ-ফিস—একে বলা হয় জীবন্ত জীবাশ্ম। কারণ, কোটি কোটি বছর ধরে এরা প্রায় একই রকম রয়ে গেছে, বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি।

দেভোনিয়ান পর্যায় (Devonian period)-কে অনেক সময় মৎস্য-যুগ বলা হয়। কারণ, সিলুরিয়ান পর্যায়ে চোয়ালহীন মৎস্য থেকেই প্রথম চোয়ালযুক্ত মৎস্যের উদ্ভব হয়, তাদের বলা হয় প্ল্যাকোডার্ম। আর দেভোনিয়ান পর্যায়ে তা থেকেই আবির্ভূত হয় নানারকম মৎস্য। এই সময় দেখা দেয় হাঙর, যার দেহের কাঠামো হাড়ের বদলে তরুণাস্থি (Cartilage) দিয়ে গড়া। আর দেখা দেয় সত্যিকারের মাছ, যার দেহ হাড়ের কাঠামো দিয়ে গড়া। তা থেকে এক দিকে দেখা দিল লাঙ্গ-ফিস (Lung-fish), অন্য দিকে দেখা দিল লোব্-ফিন মৎস্য (Lobe-finned fish)। লোব্-ফিন নাম থেকেই বোঝা যায় যে, এর দেহে পাখ্‌নার বদলে ছিল পায়ের মতো মাংসল প্রত্যঙ্গ, যাদের উপর ভর ক'রে এই প্রাণীটি ডাঙার দিকে এগিয়ে যেতে পারত। তাই এরা যে-সব জলা জায়গায় বাস ক'রত, দৈবাৎ তা শুকিয়ে গেলেও এরা মরতো না। ডাঙার উপর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে অন্য জলাশয়ে পৌছতো এবং তাতে অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে

চিত্র ১৮৭। প্রথম উভচর প্রাণী—ইক্‌থাইওস্টেগা (Ichthyostega)।

পারত। ক্রমে তারা চতুষ্পদ হয়ে উঠল। তাদের দেহে ফুস্‌ফুস হ'ল এবং তারা পুরোপুরিভাবে ডাঙার জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেল। এইভাবে সৃষ্টি হ'ল উভচর প্রাণী। এদের দেহের রক্ত শীতল ছিল, এরা বাঁচতো আর্দ্র এবং উষ্ণ আবহাওয়ায়। ডাঙায় থাকলেও এরা ডিম পাড়তো জলে। দেভোনিয়ান পর্যায়ের এই হ'ল সবচেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ ঘটনা।

উভচর প্রাণীর সবচেয়ে প্রাচীন যে নমুনাটির সন্ধান পাওয়া গেছে, তার নাম দেওয়া হয়েছে ইকৃথাইওস্টেগা। বাস্তবিক এটিই সর্বপ্রথম জল থেকে ডাঙার জীবনে অভিযোজিত হয়েছিল। সমকালীন উভচর প্রাণীর মতো এরও চারটি পা ছিল, কিন্তু এর গায়ে মাছের মতো আঁশ ছিল, আর লেজের উপরে ছিল পাখ্‌না (fin)।

কার্বনিফেরাস ও পারমিয়ান পর্যায়—পৃথিবীর ইতিহাসে আর একটি নতুন পাতা খুললো। এই সময় উদ্ভিদের সাড়ম্বর অভিযান শুরু হ'ল। ক্রমে পৃথিবীর সমস্ত জলা-জায়গাই অসংখ্য অবীজ উদ্ভিদে (যেমন—মস্, ফার্ন প্রভৃতিতে) ছেয়ে গেল। এর ফলে স্থানে স্থানে এক-একটি মহারণ্যের সৃষ্টি হ'ল।

তখন পৃথিবীর নানাদিকে আলোড়ন, ভূমিকম্প অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি ছিল দৈনন্দিন ব্যাপার। তাতে হয়তো জায়গায় জায়গায় এক-একটি বিরাট বন, গাছপালা, খাল-বিল সব সমেত মাটির নীচে তলিয়ে যায়। তারপর ধীরে ধীরে তার উপর বালি, পলিমাটি ইত্যাদি স্তরে স্তরে জমা হয়। হাজার হাজার বছর ধরে ক্রমে সে-সব উদ্ভিদের চেহারা বদলে গিয়ে শেষ অবধি কয়লায় পরিণত হয়েছে। তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে কার্বনিফেরাস পর্যায় (Carboniferous period)।

সেই সময় উদ্ভিদ-জগৎ ক্রমশঃ বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠতে লাগল। ক্রমে সবীজ উদ্ভিদের আবির্ভাব হ'ল। ঐসব উদ্ভিদ্ এখন প্রায় সবই লোপ পেয়েছে। এখন যে-সব কোনিফার দেখা যায়, তাদেরই শুধু ওই জাতীয় উদ্ভিদের প্রতিনিধি বলে মনে করা যায়।

এই যুগে জলাভূমির নিবিড় অরণ্যে কোন ফুল বা পাখি দেখা যেত না, বড় রকমের ডাঙার কোন প্রাণীও তখন ছিল না। জলার ধারে ডাঙায় তখন শামুক, কাঁকড়া-বিছে, নানা রকম পোকা-মাকড়, জল-ফড়িং প্রভৃতি ইতস্তত বিচরণ ক'রত।

পারমিয়ান পর্যায়ে (Permian period) এই কীট-পতঙ্গের আকার ক্রমশঃ আরও বড় হয়ে উঠল। এই সময় বিরাটাকার এক রকম জল-ফড়িং (dragonfly)-এর আবির্ভাব হয়। এদের দু'পাখ্‌না প্রসারিত করলে, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত

চিত্র ১৮৮। বিজ্ঞানীর কল্পিত প্রথম সরীসৃপ—সেমুরিয়া (Seymouria)।

পর্যন্ত মাপ ছিল প্রায় এক গজ। কাঁকড়া-বিছে এবং উভচর প্রাণীর সংখ্যাও তখন খুব বেড়ে গিয়েছিল।

এই সময় আর এক প্রকার নতুন ধরনের মেরুদণ্ডী প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছিল। তাদের বলা হয় সরীসৃপ। বিজ্ঞানীর কল্পিত প্রথম সরীসৃপ—সেমুরিয়া। তবে যে সরীসৃপের অস্তিত্ব নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়েছে, তার নাম কোটিলোসর। উভচর প্রাণীদের মতো এরাও ছিল চতুষ্পদ এবং অনুষ্ণ-শোণিত, অর্থাৎ এদের দেহের রক্ত শীতল ছিল এবং এরা বাঁচতো শুধু উষ্ণ আবহাওয়ায়। এরা ডিম পাড়তো ডাঙায়, কাজেই এরাই সর্বপ্রথম সম্পূর্ণরূপে ডাঙার জীবনে অভিযোজিত হয়েছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে সরীসৃপের আবির্ভাবই হ'ল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কারণ, পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তারে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের এই হ'ল প্রথম পদক্ষেপ। আর পরবর্তী যুগে, বহু কোটি বছর ধরে, পৃথিবীর আধিপত্য ছিল এদেরই হাতে।

এর পরেই পৃথিবীর আবহাওয়ায় হঠাৎ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়, তার ফলে জীবজগতেও এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত হয়। পুরাতন অনেক জীবই একেবারে লোপ পেয়ে গেল, তাদের স্থান অধিকার ক'রল নতুন ধরনের সব জীব। সমুদ্র থেকে ট্রাইলোবাইট বিলুপ্ত হয়ে গেল, নতুন ধরনের সব কম্বোজ, ক্রুস্টেশিয়ান বা কবচী (যেমন—চিংড়ি, কাঁকড়া ইত্যাদি), মাছ প্রভৃতির আবির্ভাব হ'ল। ডাঙায় ফার্নের অরণ্যের স্থান অধিকার ক'রল কোনিফারের অরণ্য। কোটিলোসরের

পূর্ব-পুরুষ লেবিরিন্থোডোণ্টস লুপ্ত হয়ে গেল। উভচর প্রাণীদের মধ্যে টিকে রইলো বর্তমান কালের মতো স্যালামাণ্ডার, সোনা-ব্যাঙ, কুনো-ব্যাঙ প্রভৃতি কয়েক রকম প্রাণীর পূর্ব-পুরুষ।

পারমিয়ান পর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে প্যালিওজোইক যুগ শেষ হয়ে গেল। সংক্ষেপে বলা যায়, এই যুগ হ'ল অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের আধিপত্যের কাল এবং যে-সব মেরুদণ্ডী প্রাণী প্রথম ডাঙার জীবনে অভিযোজিত হয়েছিল তাদের আবির্ভাবের কাল। এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, তখন উদ্ভিদ্ সম্পূর্ণরূপে স্থলভাগ অধিকার ক'রে ফেলেছিল।

চিত্র ১০১। সরীসৃপদের বিকিরণ হয়েছে নানাভাবে।

(৪) মেসোজোইক বা মধ্যজীবীয় যুগ (Mesozoic Era) :

এর পর যে যুগের সূচনা হ'ল তার নাম মেসোজোইক বা মধ্যজীবীয় যুগ। এই যুগকে আবার তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে—ট্রায়াসিক (Triassic), জুরাসিক (Jurassic) এবং ক্রিটেসিয়াস (Cretaceous)।

এই যুগ হচ্ছে সরীসৃপদের আধিপত্যের কাল। তবে এই সময় জীব-জগতে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে, যেমন—ট্রায়াসিক পর্যায়ের শেষ দিকে, অথবা জুরাসিক পর্যায়ের প্রথম দিকে, প্রথম সপুষ্পক উদ্ভিদের উদ্ভব হয়। এই সময় কীট-পতঙ্গের বৈচিত্র্য আরও অনেক বেড়ে যায়। ক্রিটেসিয়াস পর্যায়ে যে-সব মৎস্যের উদ্ভব হয়েছিল, সেগুলি সমকালীন মৎস্যের মতই। আর তখনই আবির্ভাব হয়েছিল উষ্ণ-শোণিত প্রাণীদের, অর্থাৎ পাখি এবং স্তন্যপায়ীদের। এক কথায় বলা যায় যে, এই যুগেই সমুদ্র এবং স্থলভাগের অবস্থা সব দিক দিয়ে এখনকার মতো হয়ে উঠেছিল।

পারমিয়ান পর্যায়ের সরীসৃপ কোটিলোসর থেকে মোটামুটি পাঁচটি ধারায় বিভিন্ন রকম প্রাণীর উদ্ভব হয়। প্রথম ধারায় দেখা দেয় থেকোডোণ্ট, এ থেকেই উদ্ভব

চিত্র ১৯১। এডমণ্টোসরাস (Edmontosaurus) বা হংসচঞ্চু-ডাইনোসর—বিজ্ঞানীরা মনে করেন, প্রায় ৭ কোটি বছর আগে, পৃথিবীতে এই ধরনের ডাইনোসর বিচরণ ক'রত। এ ছিল উভচর এবং তৃণভোজী, লম্বায় প্রায় ৩০ ফুট। তাছাড়া এর ঠোঁট এবং পা ছিল অনেকটা হাঁসের মতো। এরূপ ডাইনোসরের জীবাশ্ম সর্বপ্রথম পাওয়া যায় কানাডা থেকে।

হয়েছে সরিসিয়া এবং অর্নিথিসিয়া (যাদের একত্রে অভিহিত করা হয়েছে ডাইনোসর-রূপে), টেরোসর, গিরগিটি, কুমীর, সাপ এবং আদি-পাখি। দ্বিতীয় ধারায় পাওয়া যায় কচ্ছপ (Turtles), যা আজও পৃথিবীতে বিরাজ করছে। তৃতীয় ধারায় পাওয়া যায় হাঙরের মতো ইক্‌থাইওসর। চতুর্থ ধারায় পাওয়া যায় দীর্ঘগ্রীব প্লেজিওসর, আর পঞ্চম ধারায় পাওয়া যায় থেরাপ্‌সিড। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, থেরাপ্‌সিড থেকেই প্রথম স্তন্যপায়ী প্রাণীর উদ্ভব হয়েছিল, ট্রায়াসিক পর্যায়ের শেষ দিকে, অথবা জুরাসিক পর্যায়ের প্রথম দিকে।

অতীতের অতিকায় ডাইনোসরদের (*dinosaur*=terrible lizard) কথা ভাবলেও ভয় হয়। সবার আগে নাম করতে হয় ডিপ্লোডোকাস, ব্রণ্টোসরাস, অ্যাটলাণ্টোসরাস, এডমণ্টোসরাস প্রভৃতি প্রাণীর। এদের মধ্যে আবার ডিপ্লোডোকাসের ঘাড় আর লেজ ছিল সবচেয়ে লম্বা। তবে ব্রণ্টোসরাসও কম যায় না। এইরূপ এক-একটি প্রাণীর দৈর্ঘ্য ৭৫—১০০ ফুট হ'ত, আর ওজন হ'ত ২৫ থেকে ৬০ টন পর্যন্ত। কিন্তু দেহের তুলনায় এদের মাথা ছিল খুবই ছোট। এরা সবাই ছিল অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির এবং শাকাশী। বিশাল বপু নিয়ে এরা ডাঙার উপরে ভাল ক'রে চলতে পারত না। তাই এরা সাধারণত জলার ধারে বাস ক'রত, জলে গা ভাসিয়ে চলত, আর কচি ঘাসপাতা চিবিয়ে খেত। গাছপাতা খাওয়ার উদ্দেশ্যে, অথবা হিংস্র প্রাণীর তাড়া খেয়ে জলে নামলে, সময় সময় এদের বিরাট ভারি দেহ হয়তো নরম পাঁকে ডুবে যেত। কোনক্রমেই আর উঠে আসতে পারত না। তাই এদের অনেক কঙ্কাল সযত্নে সংরক্ষিত হয়ে আছে কাদা-পাথরের স্তরে।
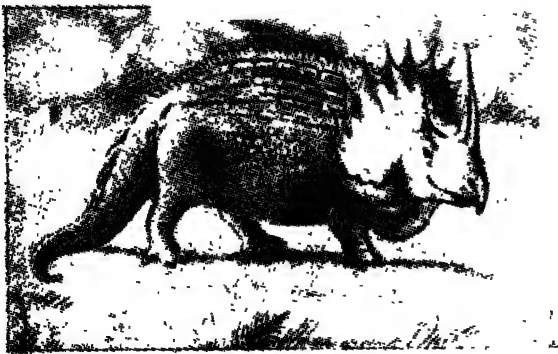
চিত্র ১৯২। ট্রাইসেরাটপ্‌স (Triceratops) [শিল্পী—শ্রীমধুসূদন গুহ]

এই সময় আরও কতকগুলি অতিকায় প্রাণীর আবির্ভাব হয়, যেমন ট্রাইসেরাটপ্‌স, স্টেগোসরাস প্রভৃতি। এরাও ছিল পুরোপুরি তৃণভোজী, তবে এরা ডাঙাতেই

চলে বেড়াত। ট্রাইসেরাটপ্‌স লম্বায় হ'ত প্রায় ২৫ ফুট। এর মাথায় ছিল ভয়ঙ্কর ছুঁচালো তিনটে শিং, শরীর মোটা চামড়া দিয়ে ঢাকা, আর এই চামড়ার উপরে ছিল হাড়ের মতো শক্ত অনেকগুলি বর্ম। ঘাড়ের উপরেও ঢালের মতো শক্ত হাড়ের বর্ম ছিল। মাথার খুলির হাড় বর্ধিত হ'য়ে এই বর্ম তৈরী হ'ত। দেখে মনে হয়, বিপদে পড়লে এরা মাথা নিচু ক'রে রুখে দাঁড়াত, আর শিং দিয়ে শত্রুর শরীর ছিঁড়ে-ফুঁড়ে ফেলত। স্টেগোসরাসের দেহও ছিল শক্ত চামড়ায় মোড়ানো। আর এই চামড়ার উপরে ছিল হাড়ের মতো শক্ত অনেকগুলি বর্ম। পিঠের উপরে ছিল দু'সারিতে পর

চিত্র ১৯৩। ষ্টেগোসরাস (Stegosaurus)—দেখে মনে হয়, এ ছিল বর্ম-শূলধারী মস্ত এক যোদ্ধা।

পর কতকগুলি হাড়ের পাটি সাজানো, আর লেজের ডগায় ছিল লম্বা ধারালো চারটি শূল। দেখে মনে হয়, এ ছিল বর্মশূলধারী মস্ত এক যোদ্ধা। কিন্তু দেহের তুলনায় এর মাথাটি ছিল খুবই ছোট, আর দেহটি ছিল এমন কিম্ভূতকিমাকার যে, বর্ম-শূলধারী হয়েও এ হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারত না।

এই সময় অনেক রকম অতিকায় মাংসাশী সরীসৃপেরও আবির্ভাব হয়, যেমন—অ্যালোসরাস, টিরানোসরাস প্রভৃতি। এদের চেহারা দেখলেই আতঙ্ক জাগে। যেমন বিশাল বলিষ্ঠ দেহ, তেমনি ভয়ঙ্কর তার পিছনের দু'পায়ের থাবা। এর পেশী-বহুল শক্ত ঘাড়ের উপর ছিল বিরাট একটি মুখ এবং তার মধ্যে দু'পাটিতে ছুরির ফলার মতো ধারালো দাঁত। এরা পিছনের দু'পা এবং লেজের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াত, লাফ-ঝাঁপেও এরা খুব পটু ছিল। তৃণভোজী কোন প্রাণী দেখলেই এরা তাকে আক্রমণ ক'রে হত্যা ক'রত এবং মহানন্দে তার হাড়-মাস চিবিয়ে খেত। এদের গায়ে জোর বেশী ছিল, অথচ বুদ্ধি ছিল কম। তাই স্বভাবতই এরা ছিল

চিত্র ১২৫। প্রথম পাখি—আর্কিঅপ্‌তেরিক্‌স (Archæopteryx)।

অত্যন্ত হিংসুটে এবং ঝগড়াটে প্রকৃতির, অত্যন্ত অত্যাচারী এবং প্রাণীকুলে আতঙ্ক-স্বরূপ। একজন আর একজনকে দেখলেই তাকে আক্রমণ ক'রত আপন-পর বিবেচনা ক'রত না।

সেই সময় টেরোডাক্‌টাইল (Pterodactyl) নামে এক প্রকার অতিকায় সরীসৃপের আবির্ভাব হয়। এরা আকাশে উড়তে পারত, কিন্তু এদের ঠিক পাখি বলা চলে না। এরা ছিল উড়ন্ত সরীসৃপ। এর সরু লম্বা মুখ ছিল, আর তার মধ্যে ছিল দু-সারি ধারালো দাঁত। বাদুড়ের মতো পাতলা চামড়ার ডানা ছিল, তারই সাহায্যে প্রাণীটি আকাশে উড়তে পারত। ডানায় আঁকশির মত নখ ছিল, তাদের সাহায্যে প্রাণীটি গাছের ডালে বা পাহাড়-চূড়ায় ঝুলে থাকত। এর পিছন দিকে আবার গিরগিটির

চিত্র ১২৬। বর্ম-শূলধারী হয়েও ষ্টেগোসরাস কিন্তু হিংস্র টিরানোসরাস-এর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারত না। [শিল্পী—ওয়াণ্ট ডিস্নে (ডিস্নেলাণ্ড)]

মতো লম্বা একটি লেজ ছিল। সেই সময় টেরানোডন (Pterandon) নামে আর একরকম উড়ন্ত সরীসৃপের আবির্ভাব হয়, তার লম্বা লেজ ছিল না। তবে আকারে সে ছিল আরও বড়। এইরূপ একটি প্রাণীর ডানার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের মাপ ছিল প্রায় ৩০ ফুট।

কালক্রমে সরীসৃপদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই আবির্ভূত হ'ল আদি-পাখি। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন আর্কিঅপ্‌তেরিক্স (Archæopteryx) বা আদি-পাখি। এ দেখতে ছিল অনেকটা কাক বা কোকিলের মতো। এখনকার পাখির মতই এর ডানা ছিল পালকযুক্ত এবং সর্বাঙ্গ পালকে আবৃত। এই ডানার সাহায্যে এরা বেশ দ্রুতবেগে উড়তে পারত। এই পাখির দু'টি লম্বা লম্বা পা ছিল। এই পায়ের সাহায্যে এরা স্বচ্ছন্দে হেঁটে বেড়াত কিন্তু তা সত্ত্বেও এর আকৃতি ছিল খুবই অদ্ভুত। এখনকার পাখিদের ঠোঁট থাকে, কিন্তু তাতে দাঁত থাকে না। কিন্তু আদি-পাখির ঠোঁটের মধ্যে দাত ছিল। একথা এখন আমরা ভাবতেও পারি না। এদের ডানাও ঠিক এখনকার পাখিদের মতো ছিল না। আদি-পাখির ডানায় নখর-বিশিষ্ট আঙুল ছিল। এছাড়া মেরুদণ্ড পুচ্ছমধ্যে বিস্তৃত ছিল। এর সঙ্গে এখনকার পাখির

চিত্র ১৯৭। দু'টি ডাইনোসর মরণপণ লড়াইয়ে লিপ্ত। [শিল্পী—শ্রীমৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ]

চেয়ে গিরগিটিরই সাদৃশ্য ছিল বেশী। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, প্রাণীটি ছিল গিরগিটি এবং পাখির মাঝামাঝি। আর এতেই প্রমাণ হয় যে, বিবর্তনধারায় সরীসৃপ থেকেই প্রথম পাখির উদ্ভব হয়েছে।

এই সময় সমুদ্রের জলেও নানাপ্রকার ভয়ঙ্কর সরীসৃপ বিচরণ ক'রত, যেমন—প্লাইওসরাস, আদিম কচ্ছপ ইত্যাদি। এদেরকে বর্তমান যুগের তিমি, হাঙর, কুমীর ও কচ্ছপের পূর্ব-পুরুষ বলে মনে করা যায়।

এর অনেক কাল পরে হঠাৎ একসময় অতীতের অতিকায় প্রাণীগুলি সব এক-যোগে লোপ পেয়ে গেল। পণ্ডিতেরা মনে করেন, এই যুগের শেষদিকে ভূপৃষ্ঠে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে, যার ফলে হিমালয়, আল্পস, অ্যাণ্ডিস্ প্রভৃতি পর্বতমালা মাথা তুলে দাঁড়ায়। এর ফলে ইউরোপ এবং এশিয়ার উত্তরাংশের আবহাওয়া হঠাৎ বদ্‌লে যায়। ক্রমে ঐসব অঞ্চলে একটি হিমযুগের আবির্ভাব হয়। আর গরমপ্রিয় অতিকায় সরীসৃপগুলি অত্যধিক শীতের প্রকোপ সহ্য করতে না পেরে সব একযোগে মারা যায়। কিংবা তখন হয়তো আবহাওয়া হঠাৎ খুব শুষ্ক হয়ে উঠেছিল এবং দারুণ জলকষ্ট দেখা দিয়েছিল। এর ফলে গাছপালা, তৃণগুল্ম সব শুকিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তাই খাদ্যাভাবে প্রথমে তৃণভোজী সরীসৃপগুলি সব মারা গেল। তারপর মাংসাশী প্রাণী যে-সব ছিল, তারা তৃণভোজীদের না পেয়ে নিজেদের মধ্যেই মারামারি কামড়াকামড়ি আরম্ভ ক'রল এবং শেষ পর্যন্ত এরা সকলেই ধ্বংস হয়ে গেল। অপরদিকে কেউ কেউ মনে করেন, অতীতের সেই পরিবর্তিত আবহাওয়ায় এমন সব উদ্ভিদের উদ্ভব হয়, যাদের দেহমধ্যে সঞ্চিত ছিল এক প্রকার বিষ (যেমন, অ্যাল্‌কালয়েড বা উপক্ষার)। এইরূপ উদ্ভিদ্ আহার ক'রে তৃণভোজী ডাইনোসররা দলে দলে মারা যায়। আবার ঐসব বিষাক্ত তৃণভোজী ডাইনোসরদের আহার ক'রে মাংসাশী ডাইনোসরেরাও হয়তো দলে দলে মারা পড়ে। তবে এসবই অনুমান। সঠিক কি হয়েছিল, এতকাল পরে তা আন্দাজ করা খুবই কঠিন।

চিত্র ১১৮। বিজ্ঞানীর কল্পিত প্রথম স্তন্যপায়ী—মর্গ্যানুকোডন (Morganucodon)

(৫) টারসিয়ারি বা তৃতীয় যুগ (Tertiary Era) :

এরপর অতীতের ইতিহাস থেকে অনেকগুলি পাতা হারিয়ে গেছে। পরের যে পাতাটি পাওয়া গেছে, তার নাম দেওয়া হয়েছে টারসিয়ারি বা তৃতীয় যুগ। এই যুগকে মোট চারটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে ; যেমন—ইওসিন (Eocene) বা প্রাগাধুনিক, ওলিগোসিন (Oligocene) বা স্বল্প-নূতন, মাইওসিন (Miocene) বা মধ্য-নূতন, এবং প্লিওসিন (Pliocene) বা অতি-নূতন। এই যুগের সূচনা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় সাত কোটি বছর আগে। তখন পৃথিবীর যেরূপ আবহাওয়া ছিল, তা অনেকাংশে বর্তমান কালের আবহাওয়ার মতই। এখন আমরা যে-সব ঘাস, গাছপালা, লতাপাতা, ফুলফল প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত, সে-সবই তখন ছিল।

পৃথিবীর পরিবর্তিত আবহাওয়ায় সরীসৃপ থেকে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কতকগুলি প্রাণীর আবির্ভাব হ'ল। এরা উষ্ণ-শোণিত প্রাণী, অর্থাৎ সরীসৃপদের মতো এদের রক্ত শীতল ছিল না। তাই এরা পৃথিবীর পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়ে বেঁচে থাকতে পারল। এদের ক্রমবিকাশ হ'ল প্রধানত দু'টি শাখায়—একটি শাখায় হ'ল পাখি, আর অন্য শাখায় হ'ল স্তন্যপায়ী প্রাণী।
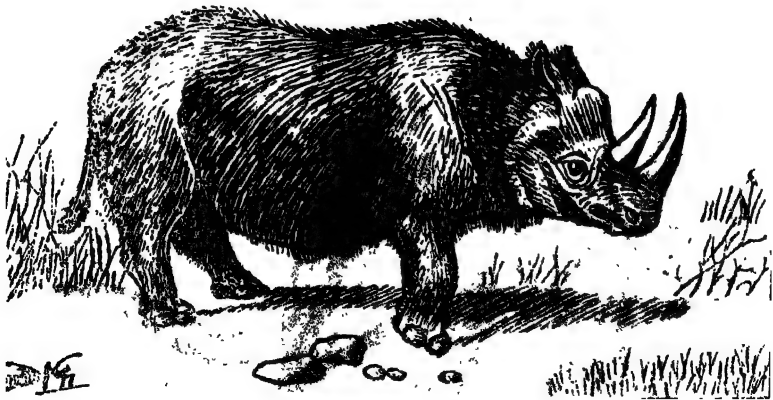
চিত্র ১১৯। প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী—লোমশ গণ্ডার (Woolly Rhinoceros)।

টেরোসরের পরিবর্তে বাদুড় এবং পাখি আকাশে আধিপত্য বিস্তার ক'রল।

ডাঙায় ডাইনোসরদের স্থান অধিকার ক'রল স্তন্যপায়ী প্রাণীরা। আর সমুদ্রে ভয়াল শিকারী প্রাণী প্লেজিওসর এবং ইক্‌থাইওসরের স্থান অধিকার ক'রল তিমি এবং হাঙর।
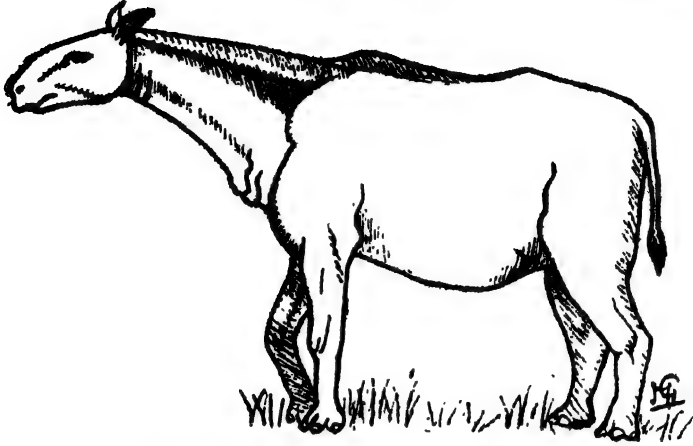
চিত্র ২০০। প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী বেলুচিথেরিয়াম (Beluchitherium), ঘোড়া ও গরুর মাঝামাঝি একটি প্রাণী।
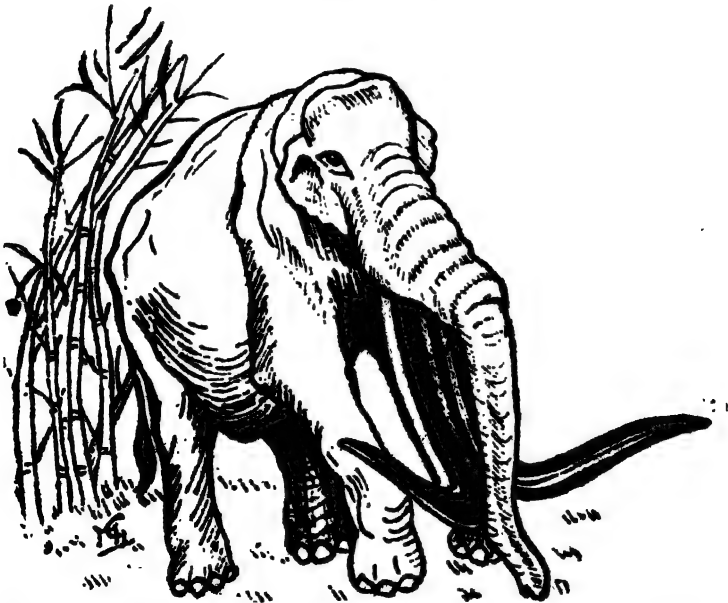
চিত্র ২০১। প্রাগৈতিহাসিক হাতি—ষ্টেগোডন গণেশ (Stegodon ganesa)। বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন যে, সুদূর অতীতে ভারতের বনভূমিতে এরূপ প্রাণী বিচরণ ক'রত।

এই সময়েই প্রকৃত পাখির আবির্ভাব ঘটে। পাখি ডিম পাড়ে, ডিমে তা দিলে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। প্রায় সব রকম পাখিই আকাশচারী। উড়বার জন্যে এদের হাত দু'খানি ডানায় পরিণত হয়েছে, লেজ নেই বললেই চলে। প্রকৃত লেজের বদলে কিছু পালকের সাহায্যে নকল লেজ উৎপন্ন হয়েছে। এই নকল লেজটিও উড়তে সাহায্য করে। সমস্ত শরীর পালকে ঢাকা থাকায়, শরীর বেশ হাল্‌কা হয় এবং দেহের তাপ-নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। ঘ্রাণশক্তি খুব ক্ষীণ, কিন্তু সে তুলনায় দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রখর।

সবচেয়ে প্রাচীন (প্রায় ১৬ কোটি বছর পূর্বে আবির্ভূত) স্তন্যপায়ী দেখতে ছিল অনেকটা ছুঁচো বা ইঁদুরের মতো। এর নাম মরগ্যানুকোডন। এদের বাচ্চা হ'ত, আর সেই বাচ্চা মায়ের স্তন্য পান ক'রে বড় হয়ে উঠত। এদের বংশধররাই ক্রমে পৃথিবীর অধিকর্তা হয়ে বসল। তারা সবাই ছিল ডাঙার জীবনে সম্পূর্ণ অভ্যস্ত।

পৃথিবীর পরিবর্তিত আবহাওয়ায় দেখা দিল প্রায় আজকালকার মতো আকৃতি-বিশিষ্ট বিড়াল, কুকুর, হায়না, নেকড়ে বাঘ, ভালুক প্রভৃতি স্তন্যপায়ী প্রাণী। হাতি, গণ্ডার, জিরাফ প্রভৃতির পূর্ব-পুরুষেরও আবির্ভাব তখন হয়েছে। ক্রমে ঘোড়ার পূর্বপুরুষ ইওহিপ্পাসেরও আবির্ভাব হ'ল।
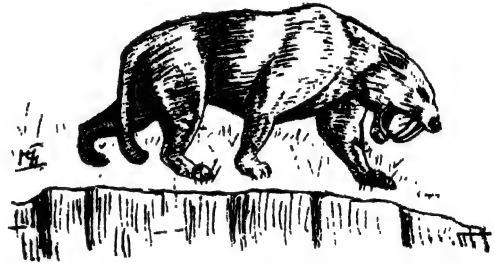
চিত্র ২০২। প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী—খড়্গ-দন্ত বাঘ (Sabre-toothed Tiger)। এর সামনের দিকে দু'টো খড়োর মতো দাঁত ছিল, তাই এর এরূপ নামকরণ হয়েছে। এরা প্রধানতঃ হাতি ও গণ্ডার শিকার ক'রে খেত। তবে বিজ্ঞানীরা মনে করেন, কালক্রমে এদের দাঁত এতো বড় হয়ে যায় যে, এদের পক্ষে আহার করাই কঠিন হয়ে পড়ে। তাই প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও এরা অনাহারে মারা যায়।

বিবর্তনের ধারায় একদল স্তন্যপায়ী প্রাণী ক্রমশঃ বৃক্ষারোহী হয়ে উঠল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রাণী হ'ল—বৃক্ষারোহী শ্রু, লেমুর, টারসিয়ার এবং বানর। বানরের বিকাশ হ'ল প্রধানতঃ দু'টি ধারায়—পূর্ব গোলার্ধের বানর এবং পশ্চিম গোলার্ধের বানর। প্রাচীন বানরের অন্য একটি ধারায় আবির্ভাব হয়েছে গিবন, ওরাংওটাং, সিম্পাঞ্জি এবং গরিলার।

(৬) কোয়াটারনারি বা চতুর্থ যুগ (Quaternary Era):

টারসিয়ারি (বা, তৃতীয়) যুগ শেষ হ'লে, আজ থেকে প্রায় দশলক্ষ বছর আগে, শুরু

হয় কোয়াটারনারি বা চতুর্থ যুগ। এর সূচনা হয় প্লাইস্টোসিন (বা, আধুনিক) পর্যায় (Pleistocene period) থেকে। বিশাল হিমযুগ (Great ice age) দিয়ে এই পর্যায়টি চিহ্নিত। উত্তর ভারতের এক বিরাট অংশ তখন সুদীর্ঘকাল ধরে হিমবাহ দ্বারা আবৃত ছিল। তাই তখন সমগ্র ভারতেই শীতের প্রকোপ ছিল অত্যন্ত প্রবল। এর ফলে টারসিয়ারি বা তৃতীয় যুগের অনেক মেরুদণ্ডী প্রাণীরই সমূহ বিনাশ ঘটে। এ যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল মানুষের উদ্ভব এবং স্থলভাগে তার আধিপত্য বিস্তার। বিজ্ঞানীদের মতে, অতীতের বানর-জাতীয় একপ্রকার স্তন্যপায়ী প্রাণী থেকেই মানুষের উদ্ভব হয়েছে। এখনকার মানুষের তুলনায় তার শারীরিক শক্তি ছিল বেশী, আর বুদ্ধি ছিল অনেক কম। কিন্তু ঐ সামান্য বুদ্ধির জোরেই মানুষ ছিল জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তারপর অনেক দিনের অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্রমে আজকের সুসভ্য ও বুদ্ধিজীবী মানুষের উদ্ভব হয়েছে।
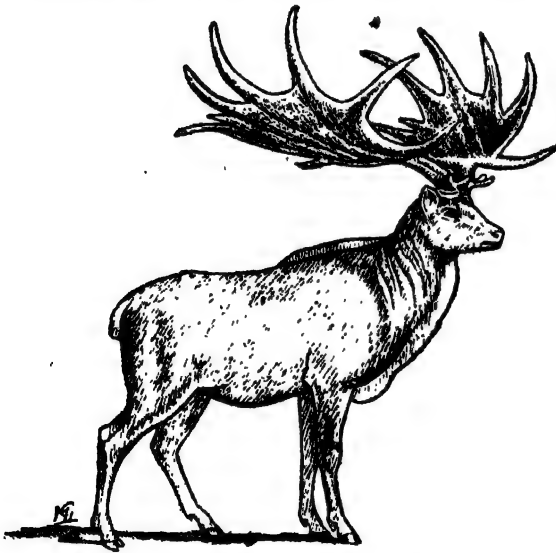
চিত্র ২০৩। আইরিশ এল্ক (Irish Elk)—প্রথম হিমযুগের পরে এ জাতীয় বহু হরিণ আয়ারল্যাণ্ডে বিচরণ ক'রত। এর শিঙের মাপ, এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত, কোন কোন ক্ষেত্রে বারো ফুট পর্যন্ত হ'ত। আর তার ওজন হ'ত প্রায় এক হন্দর। দুঃখের বিষয়, প্রকৃতির এই অপূর্ব সৃষ্টিটি এখন একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে।

এইভাবে বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত সাধনার ফলে জীবের ক্রমবিকাশের একটি মোটামুটি হিসেব এখন পাওয়া গেছে। এই হিসেবে সবচেয়ে প্রাচীন যে জীবের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে, তার আবির্ভাব হয়েছিল প্রায় পঞ্চাশ কোটি বছর আগে। প্রায় চল্লিশ কোটি বছর আগে জন্মায় ডাঙার উদ্ভিদ্। প্রায় ষোল কোটি বছর আগে প্রথম পাখির উদ্ভব ও প্রথম স্তন্যপায়ীর হয়েছে। আর সে তুলনায় আদিম মানবের আবির্ভাব হয়েছে সেদিন মাত্র, অর্থাৎ প্রায় দশ লক্ষ বছর আগে।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

অভিযোজন

আমরা জানি সকল জীব—তা সে মানুষই হোক, জীবজন্তুই হোক, অথবা উদ্ভিদই হোক—নানা কারণেই প্রতিবেশ-নির্ভর। অনুকূল প্রতিবেশ যেমন জীবদের সুষ্ঠু জীবন যাপনের উপযোগী করে। প্রতিকূল প্রতিবেশে তেমনি জীবন ধারণ হয় কষ্টকর, নয়তো একেবারে অসম্ভব হয়ে ওঠে। প্রতিকূল প্রতিবেশের প্রভাবে কত জীব যে একেবারে ধুয়ে-মুছে গেছে, আবার প্রতিবেশের আনুকূল্যে কত নতুন জীবনের আবির্ভাব হয়েছে! উদ্ভিদ্ ও প্রাণীদের যেমনি, মানুষের ক্রমবিকাশের ইতিহাসও তেমনি, এই ধারা' অনুসরণ করেই এগিয়ে এসেছে। দেশে দেশে মানুষের যে পার্থক্য তাও যেমন প্রতিবেশ-নির্ভর, একই দেশের, একই সময়ের, এমন কি একই পরিবারের বিভিন্ন মানুষের মধ্যেও যে পার্থক্য লক্ষ্য করি, তাও আংশিকভাবে প্রতিবেশের প্রভাবেরই ফলশ্রুতি।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান ক'রে চলতে না পারলে জীবগণ বাঁচতে পারে না। তাই জীবগণ সব সময় চেষ্টা করে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান ক'রে চলতে। কোন জীবের আংশিক কিংবা সামগ্রিক দৈহিক পরিবর্তন দ্বারা বিশেষ কোনো প্রাকৃতিক প্রতিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোকেই **অভিযোজন** (Adaptation) বলা হয়।

যে-সব উদ্ভিদ্ ও প্রাণী পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে অভিযোজিত হতে পারে, তারাই জীবন-সংগ্রামে বেচে থাকতে পারে। অন্যরা ধ্বংস হয়ে যায়।

এ সম্পর্কে ডারউইনের বক্তব্য, যারা রুগ্ন যারা দুর্বল কিংবা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে অক্ষম, মরবার সময় তারাই আগে মরে। যারা বাইরের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আপনাকে বাঁচিয়ে রাখতে পেয়েছে, তারাই এখনও টিকে রয়েছে। কারও গায়ে জোর বেশী, সে লড়াই ক'রে বেঁচেছে। আবার কেউ নখ, দাঁত ও শিঙের সাহায্যে আত্মরক্ষা করেছে। কেউ খুব ছুটতে পারে, সে দৌড়ে পালিয়ে বেঁচেছে। কারও চামড়া মোটা আর তাতে ঘন লোমের আবরণ, সে দুরন্ত শীতের কামড় অগ্রাহ্য ক'রে বেঁচে রয়েছে। আবার কারও গায়ের রং এমন যে, বনে-জঙ্গলে গাছপাতার মধ্যে এমনভাবে আত্মগোপন ক'রে থাকতে পারে যে, তার

অস্তিত্বই বোঝা যায় না। সে লুকিয়ে বাঁচে। বাঁচবার মতো গুণ যার নেই, সে সহজেই মারা পড়ে। অপরপক্ষে বাঁচবার মতো গুণ যার আছে, সেই বেঁচে থাকে এবং বংশবৃদ্ধি করে। এইভাবে আপনাকে বাঁচাবার তাগিদে, বাইরের নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সংগ্রাম করতে করতে, প্রত্যেকটি জীবের চেহারা নানাভাবে গড়ে উঠেছে। সেই যে হুকোর গল্প আছে না—যার খোল-নল্‌চে দুইই বদল হয়েছিল! এক-একটি প্রাণীও তেমনি খোল-নলচে বদল ক'রে একেবারে নতুন মূর্তি ধারণ করেছে। তাই এখন তার সঙ্গে পুরণোটির আর কোনো সাদৃশ্যই খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে বিজ্ঞানীর দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে বোঝা যায়, তাদের মধ্যে কিছু-না-কিছু মিল অবশ্যই আছে।

উদ্ভিদের অভিযোজন :

(১) **জলজ উদ্ভিদের অভিযোজন** (**Adaptation of Hydrophytes**)—এইসব উদ্ভিদ্ জলাশয়ের কিনারায় আর্দ্র ভূমিতে, অথবা জলে নিমজ্জিত, আংশিকভাবে নিমজ্জিত কিংবা ভাসমান অবস্থায় জন্মায়।
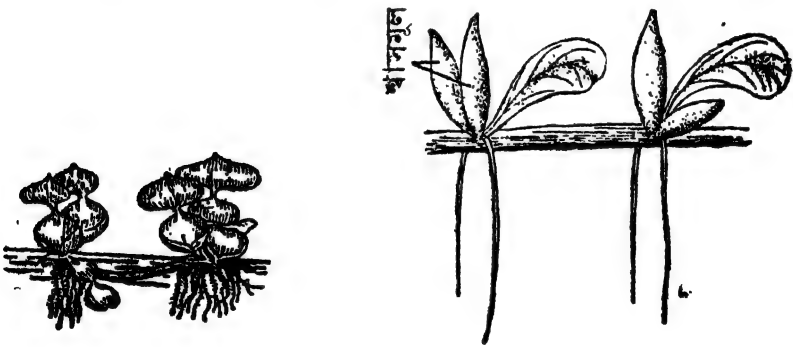
চিত্র ২০৪। কচুরি-পানা

চিত্র ২০ কেশরদাম

বড় পানা, কচুরি-পানা প্রভৃতি জলের উপরে ভেসে বেড়ায়। এদের মূলতন্ত্র অত্যন্ত দুর্বল এবং অপুষ্ট। কোন কোন ক্ষেত্রে অস্থানিক মূল পরিবর্তিত হয়ে ভাসমান শ্বাসমূলে পরিণত হয়; যেমন—কেশরদাম। এদের দেহ নরম ও ফাঁপা হয়, আর বাতাবকাশে (Air-chamber) বায়ু সঞ্চিত থাকে ব'লে এরূপ উদ্ভিদ্ বা তার দেহাংশ সহজেই জলে ভেসে থাকতে পারে।

জলে নিমজ্জিত উদ্ভিদের পাতা সাধারণতঃ সরু এবং পাতলা ফিতার মতো হয়

ব'লে জলস্রোতে ছিঁড়ে যায় না; যেমন—পাতা-শেওলা। পাতার উপরে কোনো কিউটিকলের আবরণ থাকে না, তাই এরা সর্বাঙ্গ দিয়ে জল শোষণ করতে পারে। কাণ্ড ও পাতার উপরে মিউসিলেজ-জাতীয় পদার্থের আবরণ থাকে। এজন্য জল থেকে ওঠালেই এসব গাছ শুকিয়ে যায়।

চিত্র ২০৬। পদ্ম গাছ—আংশিকভাবে নিমজ্জিত উদ্ভিদ্।

পদ্ম, শালুক প্রভৃতি আংশিকভাবে নিমজ্জিত উদ্ভিদ্। এইসব গাছের মূল ও কাণ্ড জলের নীচে থাকে, কিন্তু পাতা ও ফুল থাকে জলের উপরে। এসব উদ্ভিদের রাইজোম-জাতীয় কাণ্ড কর্দমাক্ত মাটিতে বর্ধিত হয়। পাতা ও ফুলের বোঁটা সরু ও লম্বা হয়, আর তার মধ্যে অসংখ্য বায়ুপূর্ণ নালী থাকে। পাতা বেশ বড় হয় এবং পাতার উপর-পিঠে রন্ধ্র থাকে। আর পাতার উপরে যাতে জল দাঁড়াতে না পারে, সেজন্য উপর-পিঠে মোম-জাতীয় পদার্থের আবরণ থাকে। তাছাড়া পাতার মধ্যে অনেক বায়ু-গহ্বর থাকে ব'লে এরকম পাতা সহজেই জলের উপরে ভেসে থাকতে পারে। পদ্মফুল ভারতের জাতীয় পুষ্প রূপে স্বীকৃত হয়েছে।

পানিক বা তিরকুট, পানিফল প্রভৃতি উদ্ভিদের নিমজ্জিত ও বায়ব—এই দু'রকম পাতা থাকে। এজন্য এদের বিবিধপত্রী উদ্ভিদ্ (Heterophyllous plants) বলা হয়। এদের বায়ব পাতাগুলি দেখতে সাধারণ পাতার মতো, কিন্তু নিমজ্জিত পাতাগুলি অসংখ্য সরু সরু অংশে বিভক্ত, কিংবা চ্যাপ্টা ফিতার মতো।

কতকগুলি উদ্ভিদ্ জলাশয়ের কিনারায় আর্দ্রভূমিতে জন্মায়; যেমন—সুষনি, হেলেঞ্চা, কচু, ফার্ন প্রভৃতি। জলাশয়ের জল শুকিয়ে গেলেও এরা আর্দ্র ভূমিতে বেশ কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারে।
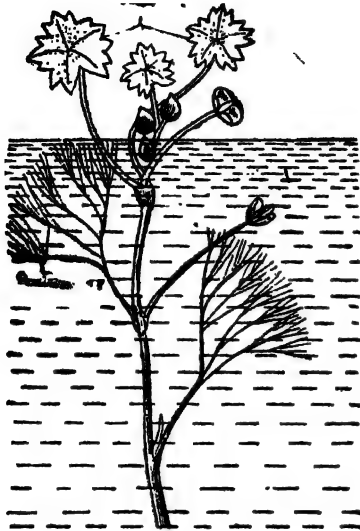
চিত্র ২০৭। পালিক বা তিরকুট

চিত্র ২০৮। পানিফল

(২) **সাধারণ স্থলজ উদ্ভিদের অভিযোজন (Adaptation of Mesophytes)**—উদ্ভিদ্ মূলের সাহায্যে মাটিতে আবদ্ধ থাকে ব'লে পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে তার দেহ গঠিত হয়। উদ্ভিদ্‌কে প্রধানতঃ আলো এবং জলের উপর নির্ভর করতে হয়। তাই তাকে সর্বদাই প্রয়োজন মত আলো এবং জল পাওয়ার জন্যে সচেষ্ট থাকতে হয়। এজন্য উদ্ভিদের মূল মাটির নীচে জলের দিকে এবং কাণ্ড আলোর দিকে এগিয়ে যায়।

সাধারণ স্থলজ উদ্ভিদ্ পরিমিত জল এবং আলো-বাতাস পেয়ে থাকে। দ্বি-বীজপত্রী উদ্ভিদে শাখা-প্রশাখাযুক্ত প্রধান মূল এবং এক-বীজপত্রী উদ্ভিদে গুচ্ছমূল থাকে। মাটি থেকে জল শোষণের জন্যে এদের শিকড়ে প্রচুর মূলরোম থাকে। এদের কাণ্ড সাধারণতঃ কঠিন ও শাখা-প্রশাখাযুক্ত হয় এবং তাতে স্তম্ভক-কলা ও সংবহন-কলা থাকে। বিষম-পৃষ্ঠ-পত্রের নীচের দিকে এবং সমাঙ্গ-পৃষ্ঠ-পত্রের উভয়-দিকে রন্ধ্র থাকে।

(৩) **জাঙ্গল উদ্ভিদের অভিযোজন (Adaptation of Xerophytes)**—এসব গাছ মরুভূমিতে বা অনুরূপ শুষ্ক ভূমিতে জন্মায়। জলাভাব, প্রখর সূর্যালোক,

বেগবান ও শুষ্ক বায়ু প্রভৃতি চরম আবহাওয়া উপেক্ষা ক'রেও এরা বেঁচে থাকতে পারে।

মরুভূমিতে জল থাকে মাটির অনেক নীচে। তাই সেখানকার উদ্ভিদের মূল খুব লম্বা হয় এবং মাটির গভীরে প্রবেশ ক'রে সেখান থেকে জল সংগ্রহ করে। জল ধারণ ক'রবার জন্যে কোন কোন ক্ষেত্রে শিকড় স্থূল ও মিউসিলেজ-পূর্ণ হয়। তাছাড়া দেহের মধ্যেও এরা ভবিষ্যতের জন্য জল সংগ্রহ ক'রে রাখতে পারে। কোন কোন উদ্ভিদের কাণ্ড স্থূল কিউটিকুলযুক্ত ত্বক দ্বারা, আবার কারও দেহ বায়ুপূর্ণ কোষ দ্বারা, আবৃত থাকে। এজন্য কাণ্ড স্থূল হয় এবং তাতে জলকলা ও মিউসিলেজ থাকে। দেহের জল যাতে সহজে বেরিয়ে যেতে না পারে, সেজন্য পাতা সংখ্যায় কম এবং আকারে ছোট হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে পাতা কাঁটায় রূপান্তরিত হয়। সেক্ষেত্রে সবুজ ক্লোরোফিলযুক্ত কাণ্ড পাতার মতো সালোক-সংশ্লেষ করে। এরূপ কাণ্ডকে পর্ণকাণ্ড (Phylloclade) বলে; যেমন—নানারকম ক্যাক্টাস বা মনসাজাতীয় গাছ।
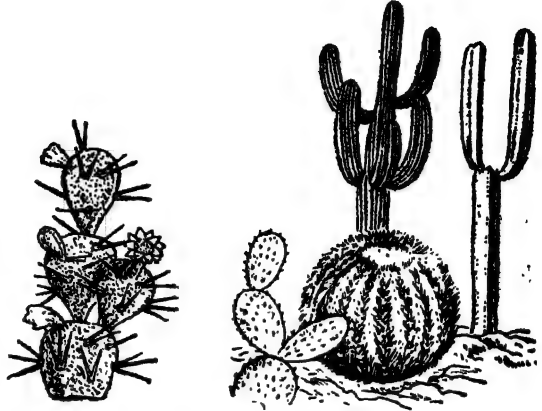
চিত্র ২০৯ মরুভূমির উদ্ভিদ—নানাপ্রকার ক্যাক্টাস বা মনসা-জাতীয় উদ্ভিদ্।

(৪) **লবণাম্বু উদ্ভিদের অভিযোজন (Adaptation of Halophytes)**—এসব উদ্ভিদ্ সাধারণতঃ সমুদ্রতীরবর্তী কর্দমাক্ত ও লবণাক্ত স্থানে জন্মায়। এদের ম্যান্‌গ্রোভ বা গরাণজাতীয় উদ্ভিদ্ বলে। যেমন—সুঁদরি, গরাণ ইত্যাদি। এরকম উদ্ভিদের কাণ্ড থেকে উৎপন্ন ঠেসমূল (Stilt root) প্রধান কাণ্ডের ভার বহন করে এবং উদ্ভিদকে খাড়া হয়ে থাকতে সাহায্য করে। এই অঞ্চলের কর্দমাক্ত মাটিতে বাতাস বা অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকে ব'লে, মূল থেকে কতকগুলি শাখামূল খাড়াভাবে মাটি ভেদ ক'রে উপরে উঠে আসে। এদের শ্বাস-মূল বা নাসিকা-মূল (Pneumatophores) বলা হয়। এইসব নাসিকামূলের অগ্রভাগে অবস্থিত রন্ধ্রের সাহায্যে এরা বায়ুমণ্ডল থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে।

চিত্র ২১০। লবণাম্বু উদ্ভিদের অভিযোজন।

চিত্র ২১১। জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম।

এখানকার লোনা জায়গায় উদ্ভিদের বীজ পড়লে তার ভ্রূণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এজন্য এসব গাছের বীজ গাছে থাকতেই তার অঙ্কুরোদ্গম হয়। এর নাম জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম (Viviparous germination)। এই চারাগাছের মূল গদার মতো মোটা ও লম্বা হয়ে বেরিয়ে আসে এবং তার অগ্রভাগ বেশ সুচালো হয়। এজন্য চারাগাছটি যখন বড় গাছটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে, তখন তার মূলটি অনায়াসে কর্দমাক্ত মাটিতে পুঁতে যায়। এর ফলে চারাগাছটি সহজেই উদ্ভিদে পরিণত হ'তে পারে।

(৫) পরাশ্রয়ী উদ্ভিদের অভিযোজন (Adaptation of Epiphytes) —রাস্না প্রভৃতি পরাশ্রয়ী গাছের মূল বাতাসে ঝুলে থাকে এবং বায়ু থেকে জলীয় বাষ্প শুষে নেয়। এদের বলা হয় বায়বীয় মূল (Aerial roots)। সবুজ-পাতার সাহায্যে এরা প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রস্তুত করে। আবার স্বর্ণলতা (বা, আলোকলতা) প্রভৃতি গাছ অন্য গাছকে আশ্রয় ক'রে থাকে। এদের পাতা থাকে না। এদের কাণ্ড থেকে ছোট ছোট একরকম মূল জন্মায়, সেগুলি আশ্রয়দাতা গাছের দেহে প্রবেশ ক'রে সেখান থেকে খাদ্য শুষে নেয়। এদের বলা হয় শোষক-মূল (Sucking roots)।

অনুরূপভাবে, ভবিষ্যতের জন্য জল সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ডিস্‌কিডিয়া নামক পরাশ্রয়ী উদ্ভিদের পাতার কলসী আকৃতি ধারণ এবং অস্থানিক মূলের সাহায্যে সেই জল গ্রহণ, অভিযোজনের এক চমৎকার উদাহরণ।
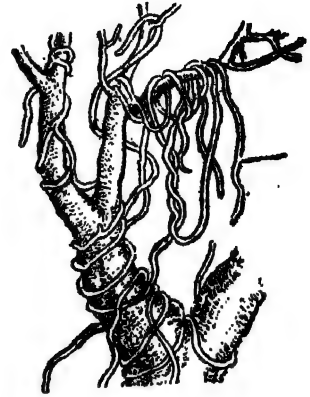
চিত্র ২১২। পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ্—রাস্না। চিত্র ২১৩। পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ্—স্বর্ণলতা।
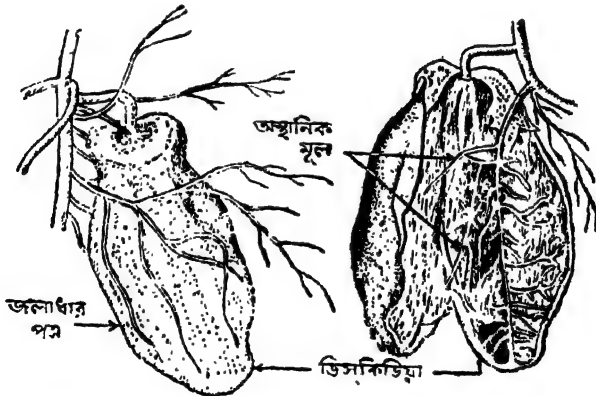
চিত্র ২১৪। জল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ডিসকিডিয়া উদ্ভিদের পাতার কলসাকৃতি ধারণ এবং অস্থানিক মূলের সাহায্যে সেই জল গ্রহণ, অভিযোজনের এক চমৎকার উদাহরণ।

(৬) আরোহণের উদ্দেশ্যে অভিযোজন (Adaptation for climbing plants)—সবুজ উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষের জন্য সূর্যলোকের প্রয়োজন। তাই দুর্বল লতাগাছ কোন অবলম্বনকে জড়িয়ে ধরে আলোর দিকে এগিয়ে যায়। এই উদ্দেশ্যে উদ্ভিদের নানারকম অভিযোজন দেখা যায়। অপরাজিতা, শিম প্রভৃতি অন্য উদ্ভিদ্ বা আশ্রয়কে বেষ্টন ক'রে উপরে ওঠে। আবার কোন কোন উদ্ভিদে এজন্য

আকর্ষ, কণ্টক প্রভৃতি দেখা যায়। মটর গাছের উপরের পত্রকগুলি এজন্য আকর্ষে পরিণত হয়। এছাড়া বচ, পিপুল প্রভৃতি গাছের অস্থানিক মূল আশ্রয়কে অবলম্বন ক'রে ওঠার ব্যাপারে উদ্ভিদকে সাহায্য করে।
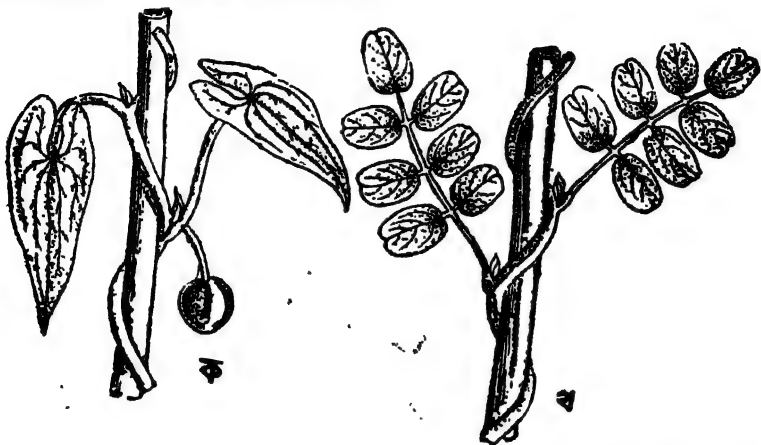
চিত্র ২১৫। দক্ষিণাবর্তী রোহিণী (খাম-আলু) চিত্র ২১৬। বামাবর্তী রোহিণী (অপরাজিতা)

(৭) আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে অভিযোজন (Adaptation for self-defence)—নানাপ্রকার প্রাণীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য বিভিন্ন উদ্ভিদ্ বিভিন্ন রকম ব্যবস্থা করেছে। এজন্য কারও দেহে শক্ত পুরু ছাল হয়েছে, কারও ছাল হয়েছে তেতো (যেমন—নিম), আবার কারও গায়ে কটু গন্ধ (যেমন—গাঁদাল)। উচ্ছে অত্যন্ত তেতো, আবার কুচিলা, কলকে প্রভৃতির ফল বা বীজ বিষাক্ত। এজন্য পশু-পাখিরা এদের খায় না। এমন অনেক উদ্ভিদ আছে, যাদের শিকড়ে, ছালে, পাতায় বা ফলে নানা রকম অ্যাল্‌কালয়েড (Alkaloid) বা উপক্ষার থাকে। এদের অনেকেই অত্যন্ত বিষাক্ত, এবং প্রাণিদেহে নানাপ্রকার প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এজন্য এসব জিনিস ঐসব উদ্ভিদের আত্মরক্ষায় বিশেষভাবে সহায়তা করে। মানুষ এইসব গাছপাতা, ফুল-ফল বা উপক্ষার সযত্নে আহরণ করে, এবং এসব দিয়ে
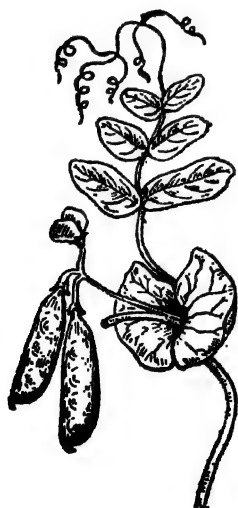
চিত্র ২১৭। আরোহণের উদ্দেশ্যে, মটর গাছের উপরের পত্রকগুলি আকর্ষে পরিণত হয়েছে।
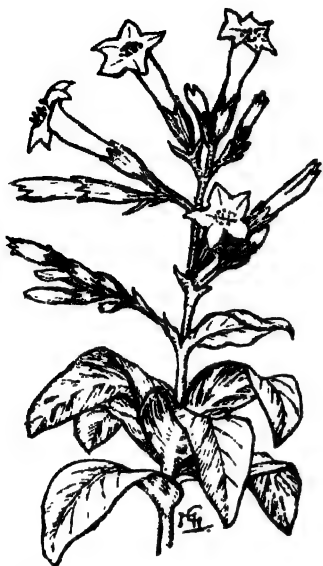
চিত্র ২১৮। তামাক গাছ—এ থেকে পাওয়া যায় নিকোটিন নামক উপক্ষার।
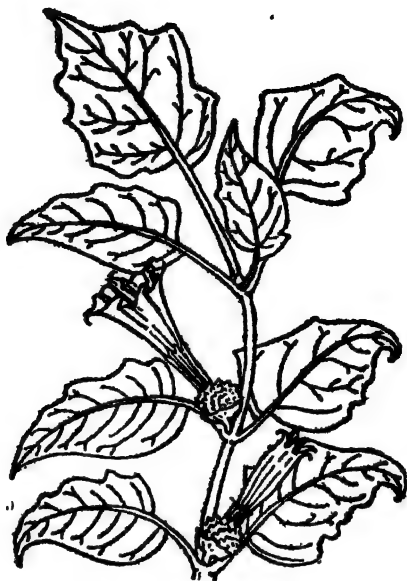
চিত্র ২১৯। ধুতুরা গাছ—এ থেকে পাওয়া যায় হায়োসিন এবং হায়োসায়ামিন নামক দু'টি উপক্ষার (Alkaloid)।

চিত্র ২২০। নিমপাতা—অত্যন্ত তেতো।

চিত্র ২২১। বিছুটি গাছ—এই গাছের সংস্পর্শে এলে সেই জায়গা ভয়ানক চুলকায়

নানারকম নেশার জিনিস অথবা মূল্যবান ওষুধ বানায়। অধিক-মাত্রায় তীব্র বিষ হলেও, স্বল্প মাত্রায় এদের অনেকই উত্তেজক পদার্থ (Stimulant) অথবা মহত্বপ্রকারী ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উত্তেজক পদার্থ বা নেশার জিনিস হিসেবে চা, তামাক, গাঁজা, আফিং, কোকেন ইত্যাদি, এবং ওষুধ হিসেবে ক্যাফীন, নিকোটিন,

চিত্র ২২২। বাগান-বিলাস গাছের শাখা-কণ্টক

চিত্র ২২৩। বেলগাছের শাখা-কণ্টক

চিত্র ২২৪। গোলাপ-গাছের গাত্র-কণ্টক

চিত্র ২২৫। মেহেদী-গাছের শাখা-কণ্টক
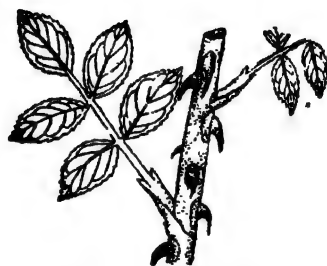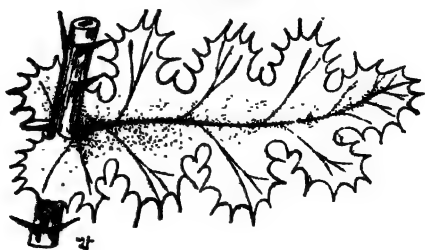
চিত্র ২২৬। শিয়ালকাঁটা-গাছের গাত্র-কণ্টক ও পত্র-কণ্টক

মরফিন, কোকেন, অ্যাট্রোপিন, কুইনিন, স্ট্রীকনিন, ব্রুসিন ইত্যাদির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বেলগাছের শাখা-কণ্টক, শিয়ালকাঁটার গাত্র-কণ্টক ও পত্র-কণ্টক (Spine) এবং মেহেদীর শাখা-কণ্টক (Thorn) প্রভৃতি উদ্ভিদের আত্মরক্ষার বিশেষ অঙ্গ। আবার কারও দেহ বিষাক্ত দ্রব্যে পূর্ণ রোমে আবৃত। পল্লীগ্রামে যেখানে-সেখানে বিছুটি গাছ জন্মায়। অসাবধানতার ফলে দেহের কোন অংশ এই গাছের সংস্পর্শে
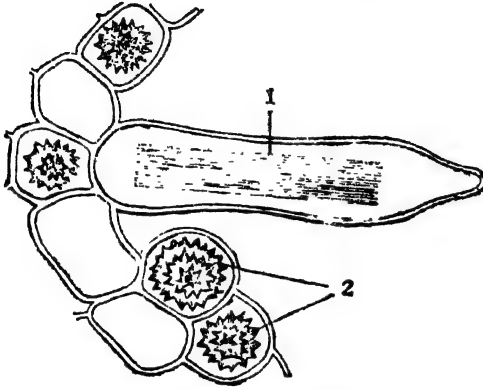
চিত্র ২২৭। কচুগাছের বোঁটার প্রস্থচ্ছেদ। 1. র‍্যাফাইড্‌স্, 2. স্ফির‍্যাফাইড্‌স্
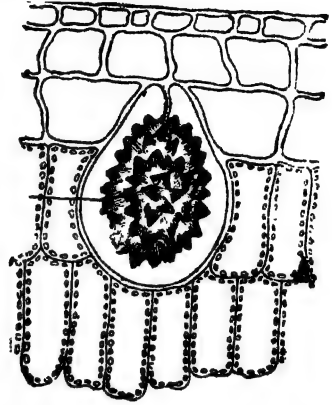
চিত্র ২২৮। বটপাতার প্রস্থচ্ছেদ। শূন্য-গহ্বরের মধ্যে দ্রাক্ষাগুচ্ছের মতো সিস্টোলিথ্।

চিত্র ২২৯। অ্যারিসিমা বা সর্প-উদ্ভিদ্
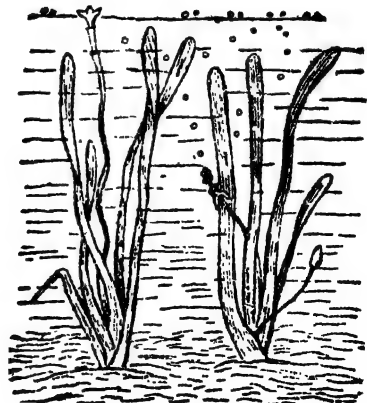
চিত্র ২৩০। পাতা-শেওলা

এলে সে জায়গা ভয়ানক চুলকায় এবং জ্বালা করে। কারণ, এরূপ রোমের মধ্যে থাকে ফরমিক অ্যাসিড। এজন্য বিছুটি গাছ দেখলে সকলেই তাকে এড়িয়ে চলে।

অনুকৃতি (Mimicry) শাকাশী প্রাণীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আর একটি উপায়। অ্যারিসিমা নামক একপ্রকার কচুগাছ আছে। তাকে দূর থেকে অনেকটা সাপের মতো দেখায় (চিত্র ২২৯)। তাই প্রাণীরা তার ধারে কাছেও ঘেঁষে না। আবার রেঙ্গুন-আলু দেখতে ঠিক মাটির ঢেলার মতো। তাই তৃণভোজী প্রাণীরা তাকে খাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না।

(৮) **পরাগ-সংযোগের উদ্দেশ্যে অভিযোজন (Adaptation for Pollination)**—পাতা-শেওলা গাছ জলের নীচে থাকে। এ গাছে দু'রকম ফুল থাকে। স্ত্রী-ফুলের বোঁটা খুব লম্বা, কিন্তু তা স্প্রিংয়ের মতো জড়ানো থাকে। পুরুষ-ফুল গাছের গোড়ায় ফোটে তারপর ফুলটা বোঁটা থেকে খসে গিয়ে জলের উপরে ভেসে ওঠে। এইসময় স্ত্রী-ফুলের বোটার পাক খুলে যায় এবং জলের উপরে পুরুষ ফুলটার কাছাকাছি গিয়ে পরাগ (বা, রেণু) সংগ্রহ ক'রে আবার স্বস্থানে ফিরে আসে (চিত্র ২৩০)। পরাগ-সংযোগের উদ্দেশ্যে এ এক বিস্ময়কর অভিযোজন।

চিত্র ২৩১। কয়েক প্রকার পতঙ্গভুক্

(৯) **খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অভিযোজন (Adaptation for collecting Food)**—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ ধরে খাওয়ার জন্যে কলস-উদ্ভিদ্ (Pitcher plant) বা ঘটপত্র, সূর্য-শিশির (Sun-dew) বা রৌদ্র-শিশির, ঝাঁঝি প্রভৃতি উদ্ভিদের পাতা এক-একরকম ফাঁদে রূপান্তরিত হয়েছে। এরূপ ফাঁদের সাহায্যে এরা কীট-পতঙ্গ ধরে জারক-রসের সাহায্যে জীর্ণ ক'রে ফেলে। এইভাবে তারা প্রোটিন-জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন মেটায়।
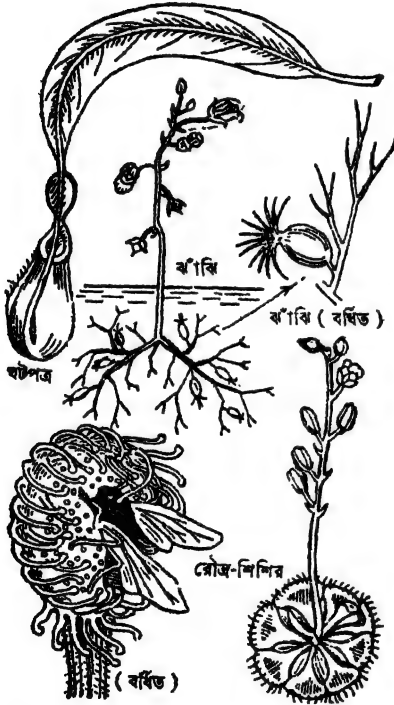
প্রাণীর অভিযোজন :

জলে, স্থলে এবং আকাশে সর্বত্রই কতরকম প্রাণী দেখা যায়! কিন্তু জলের প্রাণী, আর স্থলের প্রাণী, অথবা আকাশের প্রাণীর মধ্যে কত পার্থক্য! এর কারণ প্রাণীর প্রতিবেশ (Environment)।

সাধারণভাবে প্রাণীদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, সারা জীবন ধরেই তারা গৃহ-নির্মাণ, বংশ-বিস্তার, সন্তান-পালন, খাদ্য-সংগ্রহ, আপদ-বিপদ এড়িয়ে চলা, কিংবা আত্মরক্ষা করা প্রভৃতি কাজে ব্যাপৃত থাকে। আর এইসব উদ্দেশ্যে তারা যে কত বিচিত্র উপায় অবলম্বন করে তা ভেবে অবাক হতে হয়!

যে কোন প্রাণীর প্রধান কাজ খাদ্য-সংগ্রহ, কিন্তু সেই সময় সে যাতে অপরের খাদ্যে পরিণত না হয়, সে বিষয়েও তাকে সতত সতর্ক থাকতে হয়। অবশ্য এজন্য প্রকৃতিই তার সহায় হয়েছে। অনেকেই প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে এমনভাবে মিশে যেতে পারে যে, অপরে সহজে তাকে দেখতে পায় না, কিংবা তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারে না।

অনেক প্রাণী আবার নানারকম রক্ষাকর (Defensive) অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত; যেমন—দাঁত, নখ, ঠোঁট, বিষ, হুল ইত্যাদি। সাধারণতঃ খাদ্য-সংগ্রহ এবং আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই এগুলি ব্যবহৃত হয়। তবে অধিকাংশ প্রাণীই স্রেফ ধাপ্পা দিয়েই আত্মরক্ষার প্রয়াস পায়, যেমন—বিপদ দেখলে অনেকেই নিজেকে গুটিয়ে নেয় এবং মড়ার মতো ভান করে। আবার অনেকেই খুব চেঁচামেচি করে, সবাই মিলে সোরগোল তুলে, শত্রুকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করে। যদিও সত্যি সত্যি আক্রান্ত হলে, তাদের পক্ষে আত্মরক্ষা করার কোন উপায়ই থাকে না। টিকটিকি আত্মরক্ষার চেষ্টা করে এক অদ্ভুত উপায়ে। আক্রান্ত হলেই এর লেজটা

চিত্র ২৩২। একরকম গিরগিটি আছে, খুবই নিরীহ। কিন্তু বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই এরা কলার ফুলিয়ে ভীষণ আকার ধারণ করে, এবং শত্রুকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করে।

খসে পড়ে এবং নড়তে থাকে। এজন্য সাময়িকভাবে আক্রান্তকারীর দৃষ্টি সেদিকে চলে যায়, আর সেই অবসরে টিকটিকি পালিয়ে বাঁচে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, শত্রুর সম্মুখীন হ'লে, অধিকাংশ প্রাণীই পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করে। তবে আক্রান্ত হলে অনেকেই মরীয়া হয়ে রুখে দাঁড়ায় এবং ভীষণ মূর্তি ধারণ করে, কেউ ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ করে ভয় দেখায়, কিংবা শত্রুকে আক্রমণ করে। তাই ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে—Even the worm turns.' এই ভাবেই অনেকেই হয়তো শত্রুকে ঘায়েল ক'রে নিজের প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়, কিন্তু কেউ কেউ শত্রুর হাতে মৃত্যু বরণ করে। তবে তা হয় বীরের মৃত্যু! এই বিষয়ে আলোচনার সময় আমাদের মনে রাখা দরকার যে, অধিকাংশ প্রাণীই শান্তিপ্রিয়, নিতান্ত প্রাণরক্ষার তাগিদেই তারা অপরকে আক্রমণ করে, এবং তখন এইসব রক্ষাকর অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করে। তবে কদাচিৎ তার প্রয়োজন হয়।

(১) **জলচর প্রাণীদের অভিযোজন**—মাছ আদর্শ জলচর প্রাণী। জলের মধ্যে চলবার সুবিধার জন্যে হস্তপদাদির পরিবর্তে তার পাখনা আছে। আর শ্বাসকার্যের জন্যে, জল থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে, ফুস্ফুসের পরিবর্তে ফুলকার সৃষ্টি হয়েছে। দেহ-গহ্বরে গ্যাসপূর্ণ পটকা (Swim-bladder) থাকায় এরা জলের মধ্যে যে কোন গভীরতায় গিয়ে চলাফেরা করতে পারে। আবার গতিবেগ অব্যাহত রাখার জন্যে, তার আকৃতি হয়েছে টর্পেডোর (বা, পটলের) মতো। অর্থাৎ, তার
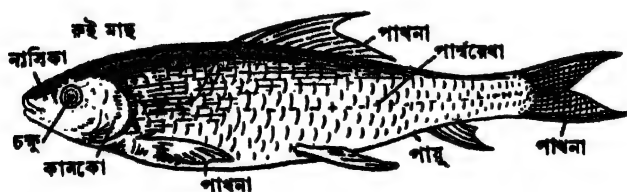
চিত্র ২৩৩। রুই মাছ—জলের মধ্যে গতিবেগ অব্যাহত রাখার জন্যে এর আকৃতি হয়েছে টর্পেডোর (বা, পটলের) মতো।

মাথা ও লেজের অংশ ক্রমশঃ সরু হয়ে গেছে, আর দেহ আড়াআড়ি ভাবে চেপ্টা; যেমন—রুই মাছ। যে সব মাছ বেশী স্রোতের ভিতর দিয়ে চলে, তাদের দেহ আরও চেপ্টা; যেমন—ইলিশ, চিতল, বোয়াল প্রভৃতি। শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে দেহ সাধারণতঃ আঁশে ঢাকা এবং তা সব সময়ই পিচ্ছিল থাকে। এজন্য ধরতে গেলে, মাছ সহজেই পিছলে পালিয়ে যেতে পারে।

গভীর সমুদ্রের মাছের দেহ খুব বেশী জলের চাপের জন্ত চেপ্টা হয়ে যায়। তেমনি সমুদ্রের গভীরতম অন্ধকারময় স্থানে বসবাসকারী প্রাণীর দেহে আলোক-বিচ্ছুরণকারী অঙ্গের অবস্থান এক অভিনব অভিযোজন। কই, মাগুর, শিঙি প্রভৃতি মাছের ফুলকা ছাড়াও অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র আছে। জলের মধ্যে যে পরিমাণ অক্সিজেন দ্রবীভূত আছে, শুধু তার সাহায্যে এদের শ্বাসকার্য সম্পূর্ণরূপে চলে না। তাই এরা মাঝে মাঝে জলের উপরে ভেসে উঠে, অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রের সাহায্যে বাতাস থেকে অক্সিজেন নিয়ে শ্বাসকার্য চালায়। জল থেকে ডাঙ্গায় তোলার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য মাছ প্রাণ হারায়, কিন্তু এইসব মাছ ডাঙ্গায় এসেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে।
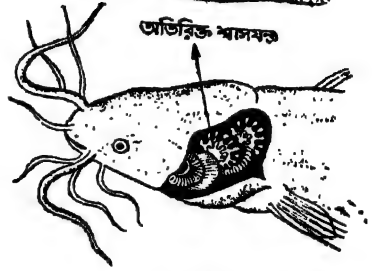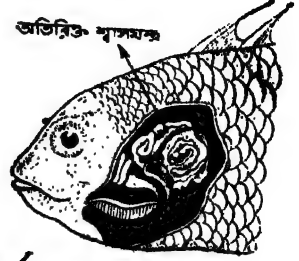
চিত্র ২৩৪। কই, মাগুর, শিঙি প্রভৃতি মাছের ফুলকা ছাড়াও অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র আছে।

জলে সাঁতার কাটার উদ্দেশ্যে অন্যান্য জলচর প্রাণীর পাখনার (Fins) আবির্ভাব, কিংবা অগ্র ও পশ্চাৎ-পদের দাঁড়ের মতো (Paddle-like) আকৃতি ধারণ, নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য অভিযোজন। সুদূর অতীতের সরীসৃপ ইকৃথাইওসরাস, আর বর্তমান কালের হাঙর (তরুণাস্থি বিশিষ্ট নীচুজাতের মাছ), কিংবা স্তন্যপায়ী ডল্‌ফিন, এরা সবাই জলের প্রাণী। জলের মধ্যে চলাফেরার সুবিধার জন্ত এদেরও সবার দেহের গড়ন হয়েছে ঠিক মাছের মতো।

তিমি উষ্ণ-শোণিত জলচর স্তন্যপায়ী প্রাণী। একে জল-দানব ছাড়া আর কী বলা চলে? পৃথিবীতে এতো বড় জন্তু আর কখনও দেখা যায়নি। তবে এগুলি এখন প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে। সবচেয়ে বড় হ'ল নীল তিমি, এই তিমি লম্বায় নব্বই থেকে একশ ফুট পর্যন্ত হয়। দেহের ওজন প্রায় দু'শো টন, অর্থাৎ একটি তিমি প্রায় ত্রিশটি হাতির সমান।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, সুদূর অতীতে একপ্রকার লোমশ চারপেয়ে স্তন্যপায়ী প্রাণী ডাঙায় বাস ক'রত। কিন্তু খাবার বা আশ্রয়ের খোঁজে তারা জলে নামতে বাধ্য

হয়েছিল। বহুকাল জলে বাস করতে করতে তারা ক্রমশঃ জলের জীবনে অভিযোজিত হয়ে গেছে। পিছনের পা দু'টি লেজে পরিণত হয়েছে। তবে তিমির লেজ মাছের লেজের মতো খাড়া নয়, শোয়ানো। এই লেজ ডাইনে-বাঁয়ে নাড়ানো যায় না, তবে উপরে-নীচে নাড়ানো চলে। তেমনি সামনে হাতের বদলে গজিয়েছে মাছের মতো পাখনা। তিমি পাখনা ও লেজের সাহায্যে ঠিক মাছের মতই সাঁতার কাটতে পারে।
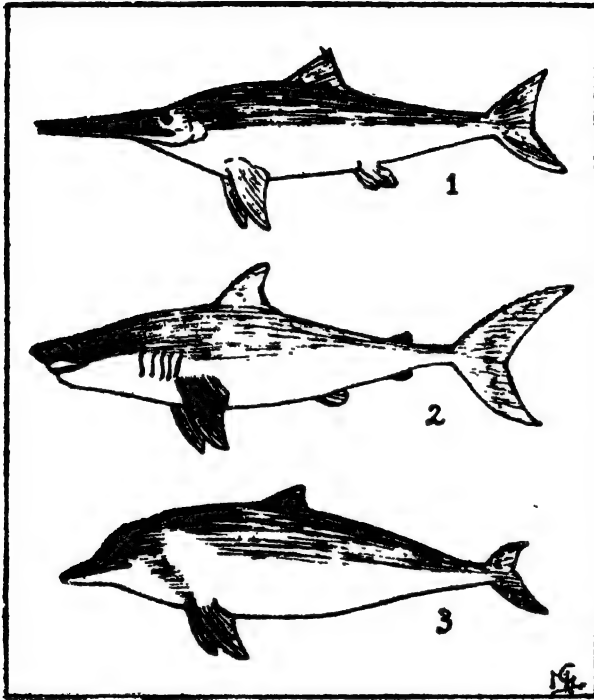
চিত্র ২৩৫। সুদূর অতীতের সরীসৃপ ইক্‌থাইওসরাস, বর্তমান কালের হাঙর এবং স্তন্যপায়ী ডলফিন—জলের মধ্যে চলাফেরার সুবিধার জন্য এদেরও সবার গড়ন হয়েছে ঠিক মাছের মতো।

স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে নিয়ে তিমির সংসার। গ্রীষ্মকালে মেরু-অঞ্চলে যখন বরফ গলে, তখন খাবারের খোঁজে এরা সেখানে গিয়ে হাজির হয়। আর সেখানেই এদের বাচ্চা হয়। বাচ্চা মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়। শীত পড়লে, উষ্ণতর অঞ্চলে তারা চলে আসে। উষ্ণ-শোণিত প্রাণী হয়েও তিমিকে সব সময় বরফ-গলা ঠাণ্ডা জলে বাস করতে হয়। তাই শীতের কামড় থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এর চামড়ার নীচে

পুরু চর্বির আস্তরণ থাকে। এর নাম 'ব্লাবার' (Blubber), গলালে খুব ভাল তেল পাওয়া যায়।

মাছের সঙ্গে তিমির আর একটি বড় রকমের পার্থক্য এই যে, তিমি ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া চালায়। তবে জলে থাকার দরুন নাকের ফুটো দু'টি মাথার উপরে সরে গেছে। তিমি জলের নীচে ডুব দিয়ে অনেকক্ষণ থাকতে পারে। শ্বাস
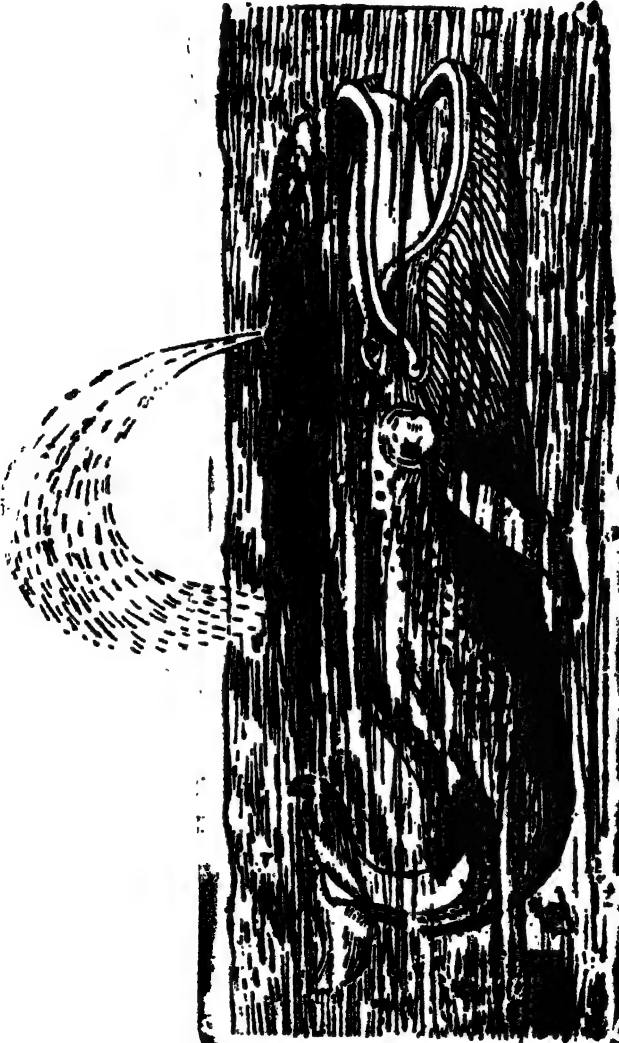
চিত্র ২৩৬। তিমি হ'ল জলচর স্তন্যপায়ী প্রাণী। একে জল-দানব ছাড়া আর কী বলা চলে ! পৃথিবীতে এতো বড় জন্তু কখনও দেখা যায় নি। সবচেয়ে বড় হ'ল নীল তিমি, এই তিমি লম্বায় নব্বই থেকে একশ' ফুট পর্যন্ত হয়।

চিত্র ২৩৭। তিমি উষ্ণ-শোণিত স্থলচর স্তন্যপায়ী প্রাণী। এ আমাদের মতই বায়ুমণ্ডল থেকে বাতাস নিয়ে ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়। তবে তিমির নাক থাকে মাথার উপরে।

1. নাসারন্ধ্র দু'টি খোলা—তিমি নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে (পিছন দিক থেকে যেমন দেখা যায়)।
2. একটি নাসারন্ধ্রের লম্বচ্ছেদ (খোলা—তিমি নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে)।
3. জলের নীচে, নাসারন্ধ্র দু'টি বন্ধ থাকে (উপর থেকে যেমন দেখা যায়)।

নেবার জন্য সে মাঝে মাঝে জলের উপর মাথা তোলে। তখন নিঃশ্বাস ছাড়লে মাথার উপরে ২০।২৫ ফুট উঁচু পর্যন্ত ফোয়ারার মতো দেখা যায়। বিজ্ঞানীদের মতে, এর মধ্যে জলের ভাগ বেশী নয়। শীতের ভোরে কথা বললে আমাদের মুখ থেকে যেমন ধোঁয়া বেরোয়, অনেকটা সেইরকম।

সীল (Seal) সামুদ্রিক প্রাণী, কিন্তু এরও পূর্ব-পুরুষ নিঃসন্দেহে ডাঙ্গার প্রাণী ছিল। কিন্তু এরা সমুদ্রের জীবনে অভ্যস্থ হ'ল কেন? ডাঙ্গার শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য, না, ডাঙ্গায় তাদের খাদ্যাভাব হয়েছিল? এদের যে কোন একটি, অথবা উভয় কারণেই, তারা হয়তো সমুদ্রের জীবনে অভিযোজিত হতে বাধ্য হয়েছিল। তবে ডাঙ্গার প্রাণীর অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যই তার মধ্যে রয়ে গেছে। তারা উষ্ণ-শোণিত প্রাণী এবং ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া চালায়। এদের বাচ্চা হয়, এই বাচ্চা মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়। কিন্তু অনেকগুলি বিষয়ে এরা জলের জীবনে অভিযোজিত হয়েছে। যেমন, এর সামনের পা দু'টি পাখনায় রূপান্তরিত হয়েছে। এই পাখনা ব্যাঙের পায়ের মতো চামড়া দিয়ে জোড়া, তাতে আছে পাঁচটি ক'রে নখরবিশিষ্ট আঙুল। সামনের এই পা দু'টির সাহায্যে জলে সাঁতার কাটার যেমন সুবিধা হয়, তেমনি এদের সাহায্যেই সীল অনায়াসে ডাঙ্গায়ও চলাফেরা করতে পারে। পিছনের পা দু'টি পিছন দিকে ফেরানো, এবং সে দু'টি একত্রিত হয়ে সৃষ্টি করেছে একটি লেজ। নৌকোর হালের মতো কাজ হয় তা

চিত্র ২৩৮। দলপতি পুরুষ-সীল যেন একটি ক্ষুদে বাদশা। তার হারেমে থাকে অনেকগুলি বেগম; এইসব স্ত্রী-সীল এবং তার বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে সে গড়ে তোলো এক বিরাট সংসার। [ইউ. এস. আই. এস-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

চিত্র ২৩৯। একটি পুরুষ-সীল হেঁকে বলছে,—"খবরদার! আমার এলাকায় কেউ প্রবেশ করবে না। তাহলে বিপদ ঘটবে"। [ইউ. এস্. আই. এস-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

দিয়ে। এই লেজের সাহায্যে জলের মধ্যে বিচরণ করতে সুবিধা হয়, এ কথা ঠিক, কিন্তু ডাঙায় চলবার সময় এই লেজ বিশেষ কাজে লাগে না। নাকের ছেঁদা দিয়ে যাতে জল ঢুকতে না পারে, তাই সেখানে গজিয়েছে দু'টি পর্দা। বরফ-গলা ঠাণ্ডা জলে টিঁকে থাকার জন্যে, তিমির মতো এরও চামড়ার নীচে আছে চর্বির পুরু আস্তরণ। এতে তার দেহ গরম থাকে এবং জলে সাঁতার কাটতে খুব সুবিধা হয় (প্লবতার দরুন)। দলপতি পুরুষ সীল যেন একটি ক্ষুদে বাদশা। তার হারেমে থাকে অনেকগুলি বেগম। এইসব স্ত্রী-সীল এবং

চিত্র ২৪০। দু'টি স্ত্রী-সীল—আরাম ক'রে রোদ পোহাচ্ছে।
[ইউ. এস. আই. এস-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

তাদের বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে সে গড়ে তোলে এক বিরাট সংসার। সেখানে আর কোনো পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই। স্ত্রী-সীল ডাঙায় বাচ্চা প্রসব করে। কিন্তু এই বাচ্চা প্রথমেই জলে সাঁতার কাটতে পারে না। প্রায় এক মাস বয়স হ'লে, তার বাবা-মা তাকে সাঁতার কাটতে শেখায়।

খাদ্যের সন্ধানে সাঁতার কেটে সীল যখন হয়রান হয়ে পড়ে, তখন ডাঙায় উঠে এসে রোদে গা এলিয়ে দিয়ে রোদ পোহাতে সে খুব ভালবাসে।

উভচর প্রাণীর (যেমন-ব্যাঙের) নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফুসফুসের সাহায্যে চলে। তাই জলের মধ্যে থাকলেও শ্বাস নেবার জন্য তাকে জলের উপরে আসতে হয়। এরা ডিম পাড়ে জলে। জলের মধ্যে চলাফেরার জন্য তার পায়ের আঙুলগুলি, পাতলা চামড়ার পর্দা দিয়ে জোড়া। এই পায়ের সাহায্যে সে সহজেই সাঁতার কাটতে পারে।
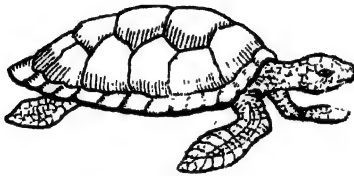
চিত্র ২৪১। কাছিম
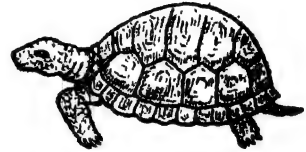
চিত্র ২৪২। কচ্ছপ

সরীসৃপের মধ্যে কাছিম, কচ্ছপ, কুমীর প্রভৃতি জলে থাকে। এদের নাসারন্ধ্র মাথার উপরে থাকে ব'লে এরা সহজেই কেবল মাত্র নাকটুকু জলের উপরে জাগিয়ে রেখে শ্বাসকার্য চালাতে পারে। এদের চোখও থাকে মাথার উপর দিকে, পেরিস্কোপের মতো। ডিম পাড়ার জন্যে এদের ডাঙায় চলে আসতে হয়। এদের পায়ের আঙুল ব্যাঙের পায়ের মতো পর্দা দিয়ে জোড়া (**Webbed foot**=লিপ্তপদ)। তাই এরা অনায়াসে জলে সাঁতার কাটতে পারে। তাছাড়া কুমীরের লেজটি সাঁতারে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

চিত্র ২৪৩। কুমীর

(২) স্থলচর প্রাণীদের অভিযোজন—প্রয়োজন অনুযায়ী স্থলচর প্রাণীর দেহের গঠন বিভিন্ন রকম হয়েছে। যেসব প্রাণী শীতপ্রধান দেশে বাস করে, তাদের দেহ ঘন লোমে ঢাকা থাকে। বাঘ, সিংহ, শিয়াল, কুকুর প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণীদের
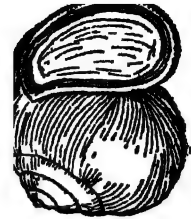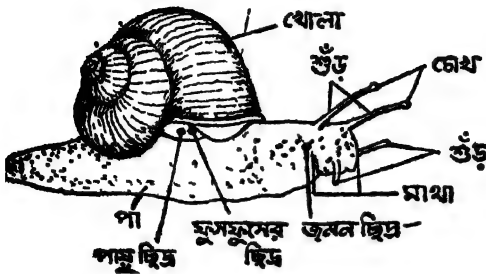
চিত্র ২৪৪। শামুক—বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই, শামুক খোলসের মধ্যে ঢুকে কপাট বন্ধ ক'রে দেয়। এইভাবে সে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে।

চিত্র ২৪৫। কাঁকড়া বিছে—এ হুল ফুটিয়ে বিষ ঢেলে দিতে পারে।
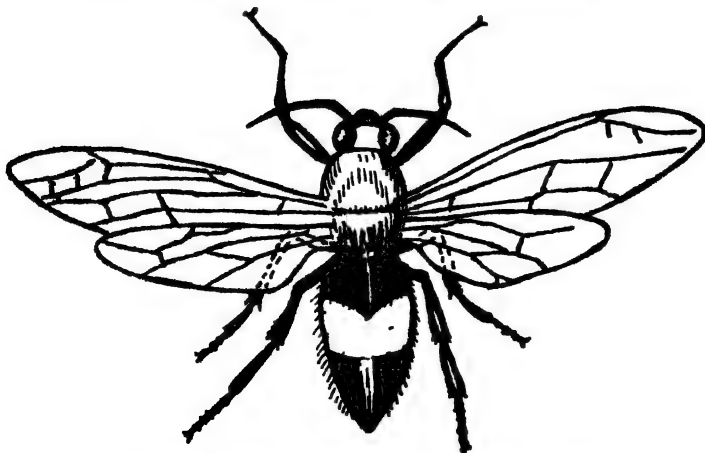
চিত্র ২৪৬। ভীমরুল—এও হুল ফুটিয়ে বিষ ঢেলে দিতে পারে

মাংস কেটে খেতে হয়, তাই তাদের দাঁত খুব তীক্ষ্ণ। তা ছাড়া শিকারের সুবিধার জন্য এদের পায়ে থাকে ধারালো নখর। শাকাশী প্রাণীদের খাদ্য পেষণ ক'রে খেতে হয়, তাই তাদের দাঁত হয় ভোঁতা। জিরাফ সাধারণত উঁচু গাছের কচিপাতা খেয়ে

কয়েক প্রকার কীট-পতঙ্গ—পিঁপড়ে, বোলতা, মৌমাছি প্রভৃতির হুলে থাকে ফরমিক অ্যাসিড। এরা হুল ফুটিয়ে এই অ্যাসিড ঢেলে দেয়। এজন্য সে জায়গায় প্রদাহ বা যন্ত্রণা হয়।
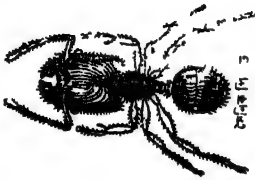
চিত্র ২৪৮। বোলতা
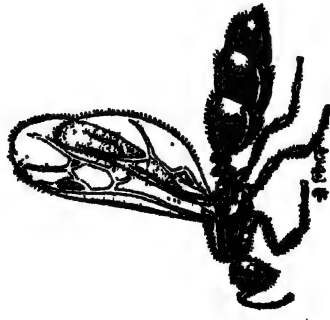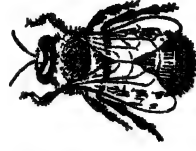
চিত্র ২৪৭। নানারকম পিঁপড়ে

চিত্র ২৪৯। নানারকম মৌমাছি
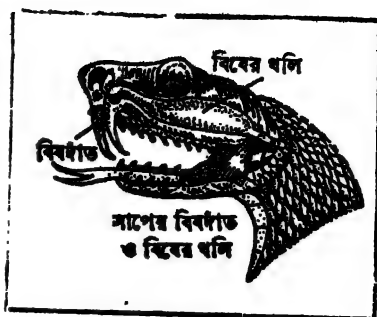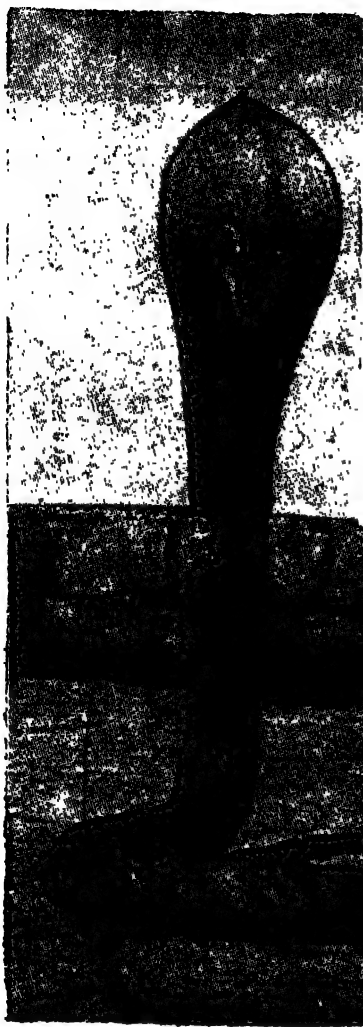
চিত্র ২৫০

চিত্র ২৫১। গোখুরা সাপ ফণা তুলে রয়েছে। এ ছোবল মেরে দংশন ক'রে বিষ ঢেলে দেয়। [ইউ. এস্. আই. এস-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

জীবন ধারণ করে। তাই তার গলাটা খুব লম্বা হয়, যাতে সে অনায়াসে গাছের মগডাল থেকে কচিপাতা সংগ্রহ ক'রে খেতে পারে।

প্রাণীদের জীবন-সংগ্রাম খুবই ভয়ংকর, তাই তারা আত্মরক্ষার জন্ম অনেক বিচিত্র ব্যবস্থা করেছে। শামুক, ঝিনুক, কাছিম, কচ্ছপ ইত্যাদি শক্ত খোলসের মধ্যে ঢুকে আত্মরক্ষা করে। সাপ ছোবল মেরে দংশন ক'রে বিষ ঢেলে দেয়। আর কোন

কোন কীট-পতঙ্গ (যেমন—পিঁপড়ে, বোল্‌তা, মৌমাছি, ভীমরুল প্রভৃতি), তেঁতুলে-বিছে, কাঁকড়া-বিছে প্রভৃতি হুল ফুটিয়ে বিষ ঢেলে আত্মরক্ষার প্রয়াস পায়।

ডাঙায় শুষ্ক, শক্ত ও বন্ধুর ভূমির উপর দিয়ে দ্রুতবেগে দৌড়াবার উদ্দেশ্যে যে পরিবর্তন হয়েছে, তাকে কারসোরিয়াল অভিযোজন (Cursorial adaptation) বলে। এগুলি নিম্নরূপ—

১। **দেহাকৃতি (Body-contour)**—দৌড়াবার সময় বায়ুর বাধা যাতে যথাসম্ভব কম হয়, সেজন্য দ্রুতগামী প্রাণীদের দেহের গঠন হয়েছে তারই উপযোগী (Stream-lined form); যেমন—হরিণ, ঘোড়া, চিতাবাঘ প্রভৃতি প্রাণীর দেহ।

২। **পায়ের পাতার রূপান্তর (Change of foot-posture)**—প্রথম দিকে চতুষ্পদ প্রাণীরা পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে চলতো। এদের প্ল্যান্টিগ্রেড (Plantigrade) বলা হয়। যেমন, ভল্লুক অঙ্গুলি, পদতল ও গোড়ালির উপর ভর দিয়ে ধীরগতিতে চলে। এ থেকে দৌড় অভিযোজনের জন্যে তিনরকম রূপান্তর হয়েছে, যেমন—

(ক) পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে চলা—কেবলমাত্র আঙুলের উপর ভর ক'রে চললেই দ্রুতগতিতে চলা সম্ভব। এজন্য দেখা যায়, চিতাবাঘ, বাঘ, শিয়াল, কুকুর, উটপাখি প্রভৃতি প্রাণীরা পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে অত্যন্ত দ্রুতবেগে চলতে অভ্যস্ত। এদের ডিজিটিগ্রেড (Digitigrade) বলে। মাটির আঘাত সহ্য করার জন্য এদের পায়ের তলায় নরম মাংসপিণ্ড থাকে।
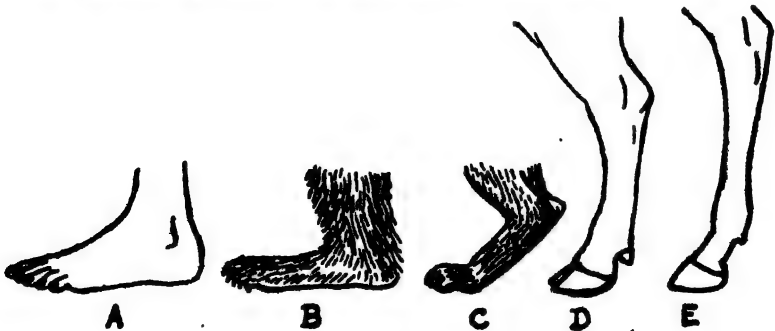
চিত্র ২০২। বিভিন্ন প্রাণীর পা— A. মানুষ, B. ভল্লুক, C. বিড়াল, D. গরু, E. ঘোড়া।

(খ) খুরের উপর ভর দিয়ে চলা—গরু, মোষ, হরিণ, ঘোড়া, জেব্রা প্রভৃতি তৃণভোজী প্রাণী আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলতে সক্ষম। এদের

পায়ের নীচে খুর থাকে—কারও জোড় (যেমন—গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া, হরিণ, শূয়োর, ইত্যাদি), আবার কারও বিজোড় (যেমন—ঘোড়া, জেব্রা, গণ্ডার ইত্যাদি)। এদের অঙ্গুলিগ্রেড (Unguligrade) বলা হয়। এই ব্যবস্থা দ্রুত দৌড়াবার পক্ষে খুবই কার্যকরী হয়েছে।

(গ) **আঙ্গুলের সংখ্যা বিলোপ**—দ্রুতবেগে দৌড়াবার সুবিধার জন্যে ঘোড়ার প্রত্যেক পায়ে কার্যতঃ একটি মাত্র খুরযুক্ত আঙ্গুল থাকে, আর হরিণ, অ্যান্টিলোপ প্রভৃতি দ্রুতগামী প্রাণীদের পায়ে কার্যতঃ দু'টি ক'রে খুরযুক্ত আঙ্গুল থাকে।

৩। **আল্‌না বা অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি এবং ফিবুলা বা অণুজঙ্ঘাস্থির অপুষ্টতা**—দ্রুতগামী প্রাণীদের বেলায়, অগ্রপদের অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি (Ulna) এবং পশ্চাদ্‌পদের অণুজঙ্ঘাস্থি (Fibula), এই দু'টি ক্ষুদ্র ও নিষ্ক্রিয় অঙ্গ হিসেবে বিরাজ করে। সে তুলনায় রেডিয়াস (Radius) বা বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি এবং টিবিয়া (Tibia) বা জঙ্ঘাস্থি বেশ বড় ও পুষ্ট হয়।

৪। **চলন-অঙ্গের অবাধ সঞ্চালনের বিলোপ**—দ্রুতগামী প্রাণীদের অগ্রপদ ও পশ্চাদ্‌পদের অস্থিগুলি পরস্পর পুলি (Pully)-র মতো এমনভাবে যুক্ত থাকে যে, পাগুলি দোলকের মতো একতলে সঞ্চালিত হতে পারে। অর্থাৎ, শুধু-মাত্র সামনে-পেছনে এইভাবে সঞ্চালিত হতে পারে, কিন্তু দুই পাশে সঞ্চালিত হতে পারে না। এর ফলে দ্রুতবেগে চলা আরও সহজসাধ্য হয়েছে।

৫। **চলন-অঙ্গের নিম্নাংশের বৃদ্ধি**—ঘোড়ার পা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, উপরের অংশের তুলনায় নীচের অংশ অনেক বড়। এজন্য ঘোড়ার পাগুলি বেশ লম্বা, এবং তাতে দ্রুতবেগে দৌড়াবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, মানুষ শুধু দুই পায়ের উপর ভর ক'রে খাড়াভাবে চলতে অভ্যস্ত। মানুষ সাধারণতঃ পদতল ও গোড়ালির উপর ভর ক'রে ধীরগতিতে হেঁটে চলে। কিন্তু যখন খুব দ্রুতবেগে চলার প্রয়োজন হয়, তখন কেবলমাত্র অঙ্গুলি ও পদতলের অগ্রভাগের উপর ভর দিয়ে সে দ্রুতবেগে দৌড়াতে পারে।

দ্রুতগামী চতুষ্পদ প্রাণীদের মধ্যে ঘোড়াই হ'ল আদর্শ প্রাণী। ঘোড়ার পদতল ও গোড়ালি মাটি ছেড়ে উপরদিকে উঠে গেছে, পায়ের আঙ্গুল খুরে রূপান্তরিত হয়েছে, এবং পায়ের উপরের অংশের তুলনায় নীচের অংশের দৈর্ঘ্য বেশী হয়েছে। এইসব কারণে ঘোড়া অত্যন্ত দ্রুতবেগে দৌড়াতে সক্ষম।

বিড়াল-জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে বাঘ এবং সিংহ উভয়েই একই গণ (Genus)-এর অন্তর্ভূক্ত (যেমন, প্যান্থেরা)। তাই তাদের আকৃতি ও প্রকৃতিতে অনেক মিল আছে। পুরুষ সিংহের মতো সম্ভ্রম-উদ্রেককারী প্রাণী আর একটিও নেই। নাক থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত ন' ফুট দৈর্ঘ্য। ওজনে প্রায় ৫০০ পাউণ্ড, কোমর সরু, ঘাড়ে দীর্ঘ কেশর, লেজের ডগায় এক গুচ্ছ চুল—সব মিলিয়ে এমন মহিমময় রূপ যে, মানুষ স্বভাবতই তাকে পশুরাজ-রূপে বরণ ক'রে নিয়েছে।

সিংহের সারা গা কোমল লোমে ঢাকা। রং ফ্যাকাসে বাদামী, কিন্তু কেশর গাঢ় বাদামী, অথবা কালো। লেজের ডগার চুলগুলি প্রায়ই কালো হয়। সিংহীর কেশর হয় না। এই গণের অন্যান্য প্রাণীর মতো এরও আছে তীক্ষ্ণ দাঁত, খসখসে জিভ এবং ধারালো নখর। তবে এ জাতীয় অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে সিংহের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য এই যে, এর গায়ে চাকা চাকা কিংবা ডোরা-কাটা দাগ থাকে না। উল্লেখ্য যে, বাচ্চার গায়ে থাকে চাকা চাকা দাগ। তবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই দাগ ক্রমশঃ মিলিয়ে যায়। বয়স্ক পুরুষের কেশর হয়, আর লেজের ডগায় থাকে এক গুচ্ছ চুল।

বর্তমানে কেবল আফ্রিকায় এবং ভারতে সিংহ আছে। আবার, ভারতে গুজরাটের গির অরণ্য ছাড়া অন্য কোথাও সিংহ পাওয়া যায় না। সিংহ বাস করে এমন বনে এবং প্রান্তরে, যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল, ছোট ছোট গাছ, বাঁশ-ঝাড় এবং নানারকম ঝোপ-ঝাড় সমৃদ্ধ শুষ্ক তৃণভূমি। সিংহের গায়ের রং এমন যে, শুষ্ক তৃণ-ভূমির সঙ্গে সে বেমালুম মিশে থাকতে পারে, সহজে কারও নজরে পড়ে না। সিংহের প্রধান খাদ্য হ'ল নানারকম হরিণ, জেব্রা, গরু-মোষ, শুয়োর প্রভৃতি তৃণভোজী প্রাণী। সন্ধ্যা সমাগমে সিংহ এবং সিংহী জোড় বেঁধে একসঙ্গে শিকারে বেরোয়। আর যে-সব জায়গায় ঐসব প্রাণীরা জল খেতে আসে (Water-hole) তারই কাছাকাছি কোনো জায়গায় এরা ওৎ পেতে থাকে। উপযুক্ত সময়ে সিংহ মাটির কাছে মুখ নিয়ে সমগ্র বন কাঁপিয়ে গর্জন ক'রে ওঠে। এতে ঐসব প্রাণী ভয় পেয়ে ইতস্ততঃ ছুটতে থাকে। আর সুযোগ বুঝে সিংহী শিকারের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যে-কোন একটিকে ধরে ঘাড় মটকে টেনে নিয়ে যায়।

সিংহের সংসারে থাকে এক বা একাধিক সিংহী, আর কয়েকটি বাচ্চা। সিংহ সাধারণতঃ সারাজীবনের জন্যে ঘর-সংসার পাতে। প্রতি বছর শীতের শেষে সিংহীর বাচ্চা হয়, সাধারণতঃ দু'টি ক'রে, তবে কখনও কখনও চারটিও হয়। সিংহ

ও সিংহী উভয়েই যত্ন সহকারে সন্তানদের লালন-পালন করে। এইভাবে গড়ে ওঠে একটি সুন্দর ও সুখী পরিবার।

সিংহ বা সিংহী এমনিতে কিছু করে না। কিন্তু যদি বোঝে যে, কেউ ওদের আক্রমণ করছে, কিংবা ওদের বাচ্চাদের অনিষ্ট করতে চাচ্ছে, তাহলে ওরা খুব রেগে যায়, এবং ভীষণভাবে আক্রমণ করে।

চিত্র ২৫৩। কুকুর-জাতীয় শিকারী প্রাণী (যেমন—নেকড়ে, শেয়াল, কুকুর ইত্যাদি)। এরূপ প্রাণীর বৃহৎ শ্বা-দন্ত (Caninee) দ্রুতগামী শিকার কামড়ে ধরে রাখার ব্যাপারে খুবই কার্যকরী হয়।

বাঘ বনের রাজা। বাঘের মতো শক্তিমান, চতুর, ক্ষিপ্র আর হিংস্র প্রাণী পশু-জগতে বিরল।

এতকাল স্বাভাবিক কারণেই পশুরাজ সিংহই ছিল ভারতের জাতীয় পশু। কিন্তু বর্তমানে সিংহের সংখ্যা অনেক কমে গেছে এবং একমাত্র গির অরণ্যের মধ্যেই কিছু এখনও রয়েছে। অপরদিকে ভারতের প্রায় সব বনাঞ্চলেই বাঘের সন্ধান পাওয়া যায়। এজন্য বাঘকেই এখন ভারতের জাতীয় পশুর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

মজবুত মাংসপেশী দিয়ে গড়া বিরাট বলিষ্ঠ দেহ। নাকের ডগা থেকে সোজা লেজের ডগা পর্যন্ত মাপলে প্রায় দশ ফুট লম্বা, এবং ওজনে প্রায় ৭০০ পাউণ্ড হয়। বাঘের দেহ ছোট ছোট লোমে ঢাকা। গায়ের রং গাঢ় হলদে বা বাদামী, তার উপরে কালো-কালো ডোরা। ডোরাগুলি একটানা নয়, ভাঙ্গা-ভাঙ্গা। তবে বুকের

চিত্র ২৫৪। বিড়াল-জাতীয় শিকারী প্রাণী (যেমন—বাঘ, চিতাবাঘ, বিড়াল ইত্যাদি)। চিতাবাঘ ধারালো দাঁত এবং ধারালো নখের অধিকারী। তাছাড়া সে অত্যন্ত দ্রুতগামী। এজন্য তার পক্ষে শিকার ধরা খুব সহজ হয়।

পেটের এবং হাত ও পায়ের ভিতরের দিকে লোম সাদা। বাঘের গায়ের রং এমনি যে ঘাসবনের সঙ্গে সে বেমালুম মিশে থাকতে পারে। বিরাট হাঁড়ির মতো মাথায় বেশ বড় বড় গোলাকার দু'টি চোখ। রাত্রে এই চোখ যেন আগুনের মতো জ্বলে। মুখে বড় বড় গোঁফ। প্রত্যেক চোয়ালে অন্যান্য দাঁত ছাড়াও, দু'পাশের দু'টি লম্বা

চিত্র ২৫৫। গির অরণ্যের একটি সিংহী—একটি মহিষ শিকার ক'রে তাকে অনায়াসে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।
[ইউ. এস্. আই. এস-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

ধারালো দাঁত। এতে মাংস ছিঁড়ে খেতে সুবিধা হয়। বাঘের থাবায় প্রচণ্ড শক্তি। নখগুলি লম্বা এবং বাঁকানো, আর ইস্পাতের ছুরির মতো ধারালো। বাঘ নখগুলি ইচ্ছামত পায়ের থাবার মধ্যে লুকিয়ে রাখতে পারে। তাই সে সন্তর্পণে ও নিঃশব্দে চলাফেরা করতে পারে। বাঘের কান খুব সজাগ। সামান্য চলাফেরার শব্দ কিংবা শুকনো পাতার ক্ষীণতম মর্মরধ্বনিও বাঘের কান এড়ায় না। তেমনি প্রখর এর ঘ্রাণশক্তি। বাঘের মতো সজাগ এবং সন্দেহপরায়ণ জন্তু আর নেই। বাঘ যেমন সুন্দর, তেমনি ভয়ংকর!

বাঘ রাত্রিবেলা শিকারে বের হয় এবং বনভূমি কাঁপিয়ে গর্জন ক'রে ওঠে। এতে বন্য-প্রাণীরা ভয় পেয়ে ছুটতে থাকে। বাঘ ওৎ পেতে থাকে এবং সুযোগ পেলেই থাবার আঘাতে শিকারকে ধরাশায়ী করে। নয়তো তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে, আর শক্তিশালী চোয়াল দিয়ে কামড়ে ধরে তার ঘাড় মটকে দেয়।

বর্ষার পরে জুলাই-আগস্ট মাসে বাঘিনীর বাচ্চা হওয়ার সময়। তখন সে অন্যের সঙ্গ ছেড়ে গভীর বনের মধ্যে চলে যায়। সেখানে কোনো নিরিবিলি জায়গায় ঘাসের বনে কিংবা কোনো গুহার মধ্যে তার বাচ্চা হয়। একসঙ্গে একাধিক বাচ্চা

নানারকম শিঙের বাহার ঃ
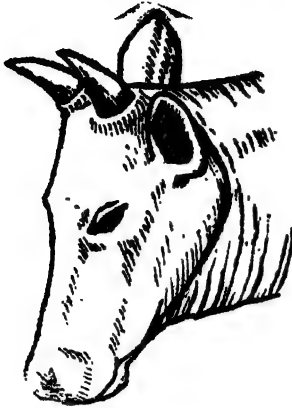
চিত্র ২৫৬। গরু
(Cow)
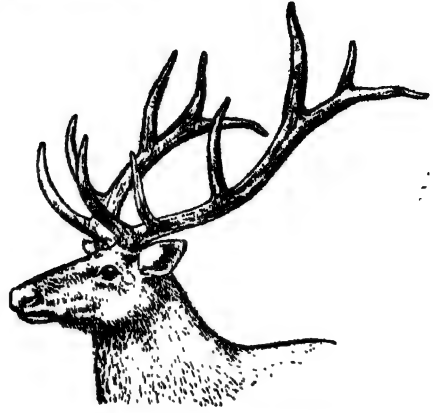
চিত্র ২৫৭। ওয়াপিতি হরিণ
(Wapiti—an American elk)

চিত্র ২৫৮। প্রংহর্ন হরিণ
(Pronghorn antelope)
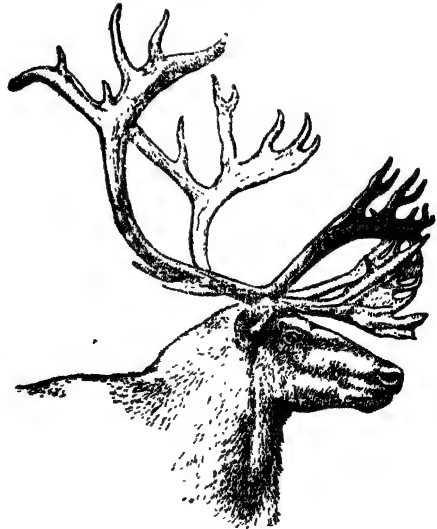
চিত্র ২৫৯। ক্যারিবো হরিণ
(Caribou—North-American equivalent of reindeer)

নানা রকম শিঙের বাহার ঃ

চিত্র ২৬০। মহিষ
(Buffalo)

চিত্র ২৬১। মফ্লন
(Mouflon)

চিত্র ২৬২। স্প্রিংবক হরিণ
(Springbok)

চিত্র ২৬৩। কুডু ভেড়া
(Kudu ram)

হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দু'টোর বেশী বাচ্চা বেঁচে থাকতে দেখা যায় না। জন্মাবার কয়েকদিন পরে বাচ্চার চোখ ফোটে। বাঘিনী তার সন্তানদের অত্যন্ত স্নেহ করে এবং সর্বদা কাছে কাছে থাকে। সব সময় তার ভয়, কেউ বুঝি তার বাচ্চাদের
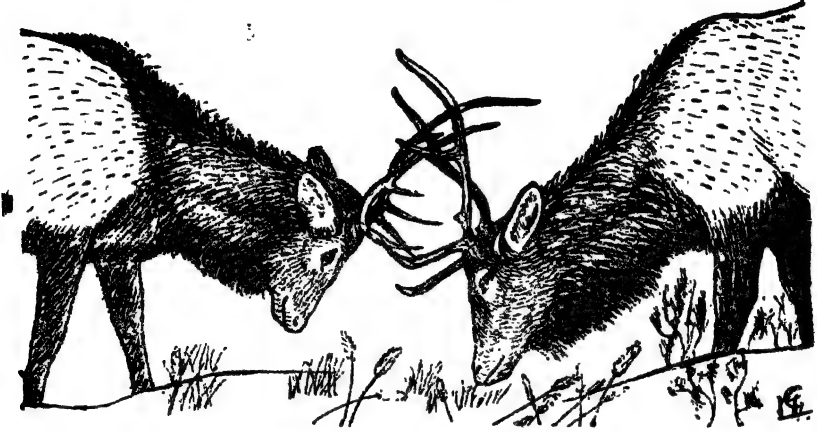
চিত্র ২৬৪। মার্কিন দেশের দু'টি পুরুষ এল্‌ক (Elk) মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত। শিং আত্মরক্ষার এক প্রধান অস্ত্র। কোন নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে আধিপত্য রক্ষার উদ্দেশ্যে, অথবা সঙ্গিনী নির্বাচনের উদ্দেশ্যে, দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের সময় জয়-পরাজয় নির্ধারণের জন্যে, অস্ত্র হিসেবে শিং ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে।

চিত্র ২৬৫। দু'টি ষাঁড়ের লড়াই—কে হারে কে জেতে! [ষ্টেট্‌সম্যান পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত]

ক্ষতি ক'রল। আর বাঘকেই তার ভয় সবচেয়ে বেশী, কারণ সুযোগ পেলেই সে বাচ্চাদের খেয়ে ফেলবে।

চিত্র ২৬৬। গণ্ডারকে দেখে মনে হয়, সে-যেন বর্মপরা খড়্গধারী এক সৈনিক। এমনিতে নিরীহ, কিন্তু উত্তেজিত হ'লে, হাতিকেও ভীষণ ভাবে আক্রমণ করে। তখন তাকে দেখে ভয় পায় না, এমন প্রাণী খুব কমই আছে।

চিত্র ২৬৭। দাঁত'ল শুয়োর এক ভয়ংকর প্রাণী। খড়্গের মতো ধারালো দাঁত দিয়ে যে-কোন প্রাণীকে সে চিরে ফেলতে পারে।

তৃণভোজী প্রাণীদের অনেকেরই শিং আছে। শিং আত্মরক্ষার এক অমোঘ অস্ত্র। কারণ, শিং দিয়ে গুঁতিয়ে আত্মরক্ষা করা বেশ সহজ। সাধারণতঃ একটি নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে আধিপত্য রক্ষার উদ্দেশ্যে, অথবা সঙ্গিনী নির্বাচনের উদ্দেশ্যে, দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের সময় জয়-পরাজয় নির্ধারণের জন্যে, অস্ত্র-হিসেবে শিং ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আফ্রিকার বুনো মোষ বড় ভয়ঙ্কর জন্তু। পূর্ণদেহ মোষের ওজন প্রায় পঁচিশ মণ। বিশাল দু'টি শিং। শিঙের গোড়া মানুষের উরুর সমান, আর আগাটা ছোরার মতো ছুঁচালো। মোষের আক্রমণে এমন হিংস্রতা থাকে যে, এ বিষয়ে সে গণ্ডার এমন কি হাতির চেয়েও সাঙ্ঘাতিক: শোনা যায়, শিং দিয়ে গুঁতিয়ে সে সিংহকেও ঘায়েল করতে পারে। অনেক সময় বিনা কারণেই সে আক্রমণ ক'রে বসে। এজন্য বুনো মোষকে সকলেই সমীহ ক'রে চলে।
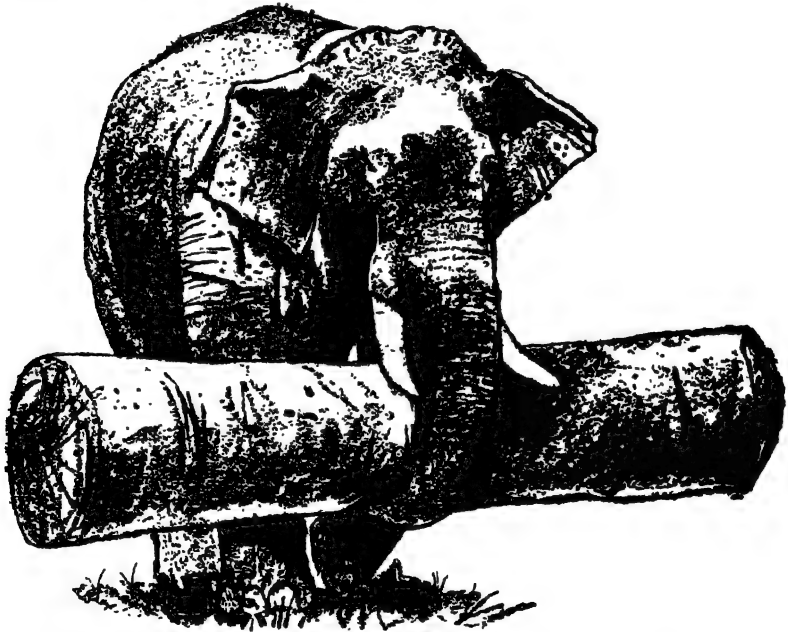
চিত্র ২৬৮। হাতি শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে বড় বড় কাঠের গুঁড়ি অনায়াসে বহন করতে পারে।

গণ্ডারকে দেখে মনে হয়, সে যেন বর্মপরা খড়্গধারী এক সৈনিক। দেহ মোটা চামড়া দিয়ে আবৃত, স্থানে স্থানে ভাঁজ পড়েছে। নাকের ডগায় আছে শিং— ভারতীয় গণ্ডারের একটি, কিন্তু আফ্রিকার গণ্ডারের দু'টি। প্রকৃত অর্থে এ কিন্তু শিং নয়, চামড়া থেকে উৎপন্ন অসংখ্য লোমের মতো জিনিস একসঙ্গে জমাট বেঁধে

এই শিং সৃষ্টি করেছে। গণ্ডার শক্তিশালী প্রাণী হলেও নিরীহ, সহসা কাউকে আক্রমণ করে না। কিন্তু উত্তেজিত হ'লে, হাতিকেও ভীষণভাবে আক্রমণ করে, তখন তাকে দেখে ভয় পায় না এমন প্রাণী খুব কমই আছে।

দাঁতাল শূয়োর খড়্গের মতো ধারালো দাঁত দিয়ে যে-কোন প্রাণীকে চিরে ফেলতে পারে। তাছাড়া খুরপির মতো তুণ্ডের (Snout) সাহায্যে সে সহজেই মাটি খুড়ে গাছের মূল সংগ্রহ ক'রে খেতে পারে। নাসিকার অগ্রভাগে অবস্থিত শক্ত কার্টিলেজ (বা, তরুণাস্থি) এরূপ খননকার্যে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

চিত্র ২৬৯। খাদ্য সংগ্রহ করার ব্যাপারে হাতির শুঁড়টি তাকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। কারণ, শুঁড়টি সে ঠিক হাতের মতই ব্যবহার করতে পারে।

বর্তমানে স্থলচর প্রাণীদের মধ্যে হাতিই সবচেয়ে বড় এবং ভারি। এরা সাধারণতঃ দল বেঁধে থাকতে ভালবাসে। পুরুষ বলিষ্ঠ দাঁতাল হাতি দশ-এগারো ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। সেই হয় দলের সর্দার। পুরুষ হাতির দীর্ঘ প্রদন্ত বা গজদন্ত (Tusk) হয়। গজদন্ত একটি মূল্যবান সামগ্রি। থামের মতো চার পায়ে ভর ক'রে এরা নিঃশব্দে চলাফেরা করতে পারে। পায়ে নখ আছে চারটি ক'রে। কোন শব্দ শুনলে, কিংবা কোন কিছুর ঘ্রাণ পেলে, এরা খাওয়া বন্ধ ক'রে বুঝতে চেষ্টা করে, বিষয়টা কি। তারপর হয় ছুটে পালায়, নয়তো ভীষণভাবে আক্রমণ করে। হাতি তৃণভোজী প্রাণী, কিন্তু এক জোড়া গজদন্তের সাহায্যে সে বাঘের ও মোকাবিলা করতে পারে। খাদ্য সংগ্রহ করার ব্যাপারে হাতির শুঁড়টি (Proboscis) তাকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। কারণ, শুঁড়টি সে ঠিক হাতের মতই ব্যবহার করতে পারে

হাতি শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে বড় বড় কাঠের গুঁড়ি বহন করতে পারে, আবার ছোট্ট একটি পয়সাও সে অনায়াসে মাটি থেকে তুলে নিতে পারে।

চিত্র ১৭০। হিপ্পোপটেমাস (Hippopotamus) বা জলহস্তী—এর বিরাট হাঁর মধ্যে নীচের পাটিতে এক জোড়া বড় বড় দাঁত দেখা যায়। খাদ্য সংগ্রহ করার ব্যাপারে এই দাঁত বিশেষ কাজে লাগে না। কিন্তু আক্রান্ত হ'লে, আত্মরক্ষার ব্যাপারে, এই দাঁত খুবই কার্যকরী হয়।

হিপ্পোপটেমাস (Hippopotamus) বা জলহস্তী সাধারণতঃ জলজ উদ্ভিদ্ খেয়ে জীবন ধারণ করে। কখনও কখনও, বিশেষতঃ রাত্রিবেলা, ডাঙ্গায় উঠে ঝোপঝাড়ে গিয়ে গাছপাতা খায়। এর বিরাট হাঁর মধ্যে নীচের পাটিতে একজোড়া বড় বড় দাঁত দেখা যায়। খাদ্য সংগ্রহ করার ব্যাপারে এই দাঁত বিশেষ কাজে লাগে না। কিন্তু আক্রান্ত হলে, আত্মরক্ষার ব্যাপারে, এই দাঁত খুবই কার্যকরী হয়।

ভালুক বড় ভীষণ জানোয়ার। এর ছুঁচালো মুখ মধু খাওয়ার পক্ষে খুবই উপযোগী। এই প্রকাণ্ড দেহ, গা ভর্তি কালো কালো লম্বা লোম, অন্ধকারে দেখায় যেন যমদূত! হঠাৎ সামনে পড়লে আর রক্ষা নেই। দু' পায়ে খাড়া

চিত্র ২৭১। শ্লথ ভালুক—এর ছুঁচালো মুখ মধু খাওয়ার পক্ষে খুবই উপযোগী। এই প্রকাণ্ড দেহ, গা ভর্তি কালো কালো লোম। দেখায় অন্ধকারে যেন যমদূত!

হয়ে যায়, দু' থাবা তুলে আর মুখ হাঁ ক'রে জড়িয়ে ধরে। তারপর ধারালো নখ দিয়ে চিরে ফালা ফালা ক'রে দেয়। আক্রান্ত মানুষটি মাটিতে পড়ে গেলেও ছাড়ে না। তার হাত-পা আখ চিবানোর মতো চিবিয়ে একেবারে থেতো করে দেয়।

শজারুর গায়ে অনেক কাঁটা থাকে। আক্রান্ত হ'লে সে কাঁটাগুলি খাড়া ক'রে আক্রমণকারীর দিকে পিছন ফিরে ধেয়ে যায়। এই অবস্থায় আক্রমণকারী শজারুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে তার গায়ে কাঁটা ফুটে যায়। এইভাবে শজারু শত্রুকে ঘায়েল করে।

চিত্র ২৭২। শজারু

বৃক্ষবাসী প্রাণীর (যেমন—টিকটিকি, গিরগিটি, কাঠবিড়ালী ইত্যাদির পায়ের নখ খুব ধারালো। নখের সাহায্যে এরা অনায়াসে গাছের ডাল বেয়ে ওঠানামা করতে পারে। টিকটিকির পায়ের গঠন বিশেষ ধরণের তাই সে অনায়াসে খাড়া দেওয়াল বেয়েও উঠতে পারে।

বিবরবাসী প্রাণীদের মধ্যেও নানাপ্রকার অভিযোজন দেখা যায় (Fossorial adaptation)। স্তন্যপায়ীদের মধ্যে অনেকেই (যেমন—ইঁদুর, ছুঁচো ইত্যাদি) গর্তে বাস করে। মাটির নীচে গর্তে প্রবেশের সুবিধের জন্য এদের মুখ ছুঁচালো হয় এবং এদের দেহ হয় অনেকটা তর্কুর মতো (Spindle-shaped)। এদের অভিযোজনের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় সামনের পায়ের নখ। যেমন, ছুঁচোর

পায়ের নখগুলি বেশ বড় এবং গর্ত খোঁড়ার উপযোগী এর দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ

সরীসৃপদের মধ্যে সাপ গর্তে বাস করে। এরা গর্ত খুঁড়তে পারে না, তাই সাধারণতঃ ইঁদুর বা ছুঁচোর গর্তে বাস করে। পায়ের ব্যবহার নেই, তাই পা-ও নেই। চোখ পাতলা আবরণে ঢাকা। নাক ছোট এবং তাতে ঢাকনা আছে।
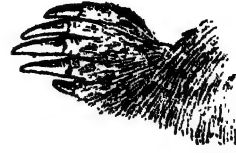
চিত্র ২৭৩। ছুঁচোর পা—গর্ত খোঁড়ার পক্ষে খুবই উপযোগী।

প্যাঙ্গোলিন (Pangolin) নামে একরকম পিপীলিকাভুক প্রাণী আছে, তার দেহ গোসাপের মতো লম্বা, মাথা ছোট, মুখ
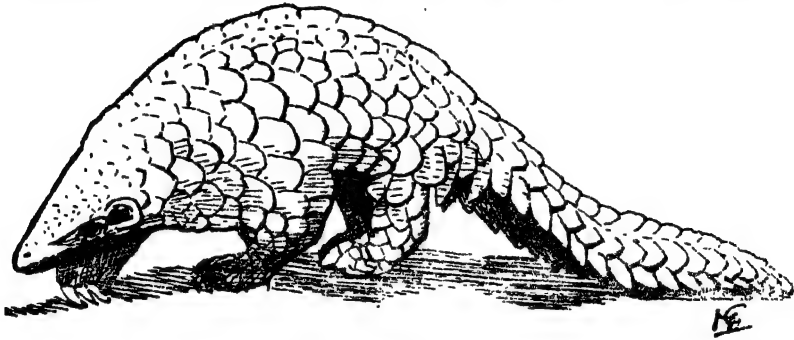
চিত্র ২৭৪। পিপীলিকাভুক প্রাণী প্যাঙ্গোলিন (Pangolin)। এর শরীর বড় বড় আঁশে ঢাকা এবং সামনের পায়ে বড় বড় নখ থাকে।
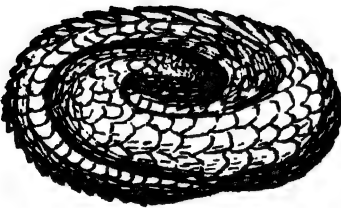
চিত্র ২৭৫। বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই প্যাঙ্গোলিন নিজেকে এমন ভাবে গুটিয়ে নেয় যে, তার চারদিকে থাকে শক্ত আঁশের আবরণ। এই অবস্থায় শত্রু তাকে সহজে ঘায়েল করতে পারে না।

চিত্র ২৭৬। বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই অপোসাম একেবারে মড়ার মতো নিস্পন্দ হয়ে পড়ে থাকে। এইরকম মড়ার মতো ভান ক'রে সে আত্মরক্ষার প্রয়াস পায়।

শুঁচালো, আর জিভ লম্বা এবং আঠালো। এর শরীর বড় বড় আঁশে ঢাকা এবং সামনের পায়ে বড় বড় নখ থাকে। এই নখের সাহায্যে উইঢিপী ভেঙে এবং লম্বা

ও আঠালো জিভের সাহায্যে উইপোকা শিকার ক'রে খায়। যখন অনেকগুলি উই একসঙ্গে বেরিয়ে আসে, তখন দেহের আঁশগুলি খাড়া ক'রে উইঢিপির উপর গড়াগড়ি দেয়। ফলে অনেক উই এর দেহের উপর উঠে আসে। তখন সে এই আঁশগুলি বন্ধ ক'রে দেয়। এভাবে বন্দী উইসহ প্রাণীটি জলের মধ্যে নেমে আঁশগুলি আবার খাড়া ক'রে দেয়। এর ফলে উইপোকাগুলি জলে ভেসে ওঠে, তখন প্রাণীটি মহানন্দে সেই অসহায় উইপোকাগুলি খেতে থাকে। বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই সে নিজেকে এমন ভাবে গুটিয়ে নেয় যে, তখন তার নরম দেহের চারিদিকে থাকে শক্ত আঁশের আবরণ। এই অবস্থায় শত্রু তাকে সহজে ঘায়েল করতে পারে না। পিপীলিকাভুক্ প্রাণী আর্মাডিলো (Armadillo) বর্মধারী হলেও নিজের জীবনরক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত অসহায়। বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই সে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে একটি বলের মতো হয়ে যায় এবং নিশ্চল জড়-পদার্থের মতো চুপচাপ পড়ে থাকে। তখন তার চারিদিকে থাকে একটি শক্ত আবরণ। এইভাবে অনেক সময় সে আত্মরক্ষা করতে পারে। অঙ্কগর্ভ প্রাণী অপোসাম, বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই একেবারে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে থাকে। এইরকম মড়ার মতো ভান ক'রে সে আত্মরক্ষার প্রয়াস পায়।
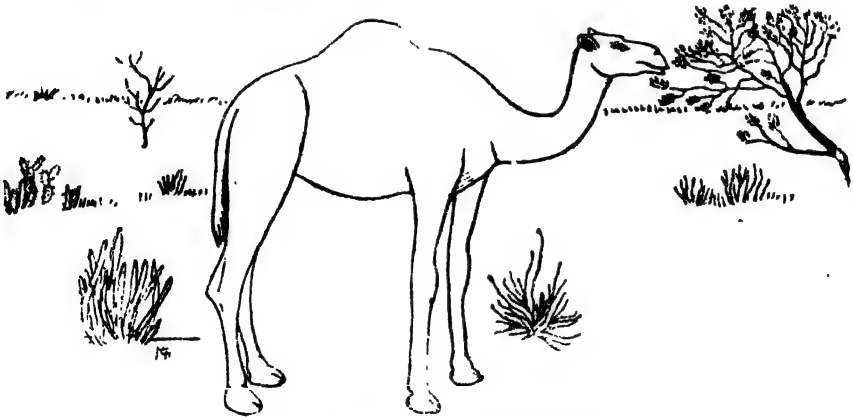
চিত্র ২০৯। উটকে বলা হয় "মরুভূমির জাহাজ"।

মরুভূমির প্রকৃতি অত্যন্ত রুক্ষ, বৃষ্টিপাত বিশেষ হয় না, তাই জলাশয় নেই বললেই চলে। মরুভূমির রুক্ষ প্রকৃতিতেও উট অনায়াসে বাস করতে পারে এবং সুদীর্ঘ পথ চলতে পারে। এজন্য উটকে বলা হয় "মরুভূমির জাহাজ"। এর কারণ, উটের দেহ মোটা চামড়া দিয়ে ঢাকা। তাছাড়া উট তার শরীরে ভবিষ্যতের

জন্ত খাদ্য ও জল সঞ্চয় ক'রে রাখতে পারে। পা চ্যাপ্টা, আর পায়ের তলায় আছে পুরু মাংসের গদি। এজন্ত বালির উপর দিয়ে চলার খুব সুবিধা হয়। নেত্রপল্লবের লম্বা লোম সূর্যতাপ ও বালি থেকে চোখ রক্ষা করে। নাকের ঢাকনা আছে, বালুকা-ঝড়ের সময় এই ঢাকনা নাসিকা-ছিদ্র রক্ষা করে।

মরু-অঞ্চলে একপ্রকার শিংওয়ালা ব্যাঙ (Horned toad) দেখা যায়। (আকৃতিগত সাদৃশ্যের জন্য তার এই নাম দেওয়া হয়েছে, তবে এটি একটি সরীসৃপ)। এরা সুযোগ পেলেই, চোষ-কাগজের মতো, জল শুষে নেয়।

(৩) আকাশচারী প্রাণীদের অভিযোজন—প্রায় সবরকম পাখিই আকাশ-চারী। পাখি কেমন সুন্দর ডানা মেলে আকাশে উড়ে যায়! উড়বার জন্যে পাখির
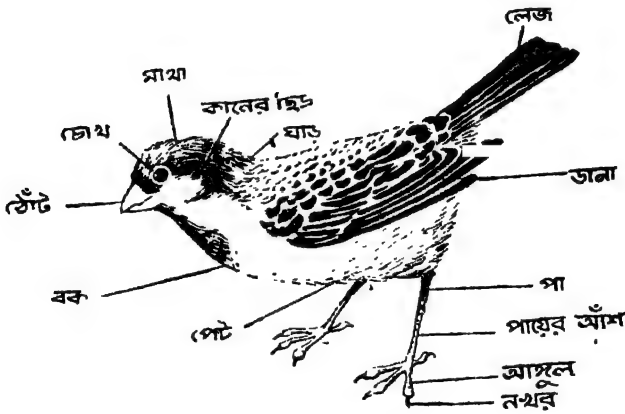
চিত্র ২৮০। একটি পাখি।

হাত দু'খানি ডানায় পরিণত হয়েছে। আর ডানা-সংলগ্ন পেশীগুলি উড়বার পক্ষে সহায়ক হয়েছে। পাখির সমস্ত শরীর পালকে ঢাকা থাকে ব'লে শরীর বেশ হালকা হয়। তাছাড়া এতে দেহের তাপ-নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। লেজ নেই বললেই চলে। প্রকৃত লেজের বদলে কিছু পালকের সাহায্যে নকল লেজ উৎপন্ন হয়েছে। ডানার পালক সাধারণভাবে উড়তে, আর লেজের পালক গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং এদিক-সেদিক ঘুরতে-ফিরতে, সাহায্য করে।

পাখি যাতে সহজে উড়তে পারে, সেজন্য তার দেহ খুব হালকা হওয়া প্রয়োজন। এজন্যে পাখির দেহের বড় বড় হাড়গুলি বাঁশের মতো ফাঁপা। তাই এগুলি বেশ হালকা, কিন্তু সে তুলনায় বেশ শক্ত। এর ফুসফুসের সঙ্গে যুক্ত আছে বেলুনের মতো

কতকগুলি বায়ুস্থলী। এগুলি উত্তপ্ত বায়ু দ্বারা পূর্ণ থাকে ব'লে পাখির দেহ আরও হালকা হয়। এজন্য উড়তে আরও সুবিধা হয়।

যে-সব পাখির ডানা সবল বা সুগঠিত নয়, তারা উড়তে পারে না; যেমন—উটপাখি, কিউই ইত্যাদি।

চিত্র ২৮১। পাখি কেমন সুন্দর ডানা মেলে আকাশে উড়ে যায়

চিত্র ২৮২। গাংচিলের উড়বা'র নানারকম কায়দা।

চিত্র ২৮৩। কলহংস (Dabbling duck)। এ জল থেকে লাফিয়ে উঠে সঙ্গে সঙ্গে উড়ে যেতে পারে। এজন্য এর পক্ষে ছোটখাট জলাশয়ে বাসা বাঁধা সম্ভব হয়।

চিত্র ২৮৪। ডুবুরী হাঁস (Diving duck)। আকাশচারী হওয়ার জন্য একে জলের উপর দিয়ে বেশ খানিকটা দৌড়ে যেতে হয়। এজন্য অপেক্ষাকৃত বড় জলাশয়ে এদের বাসা বাঁধতে হয়।
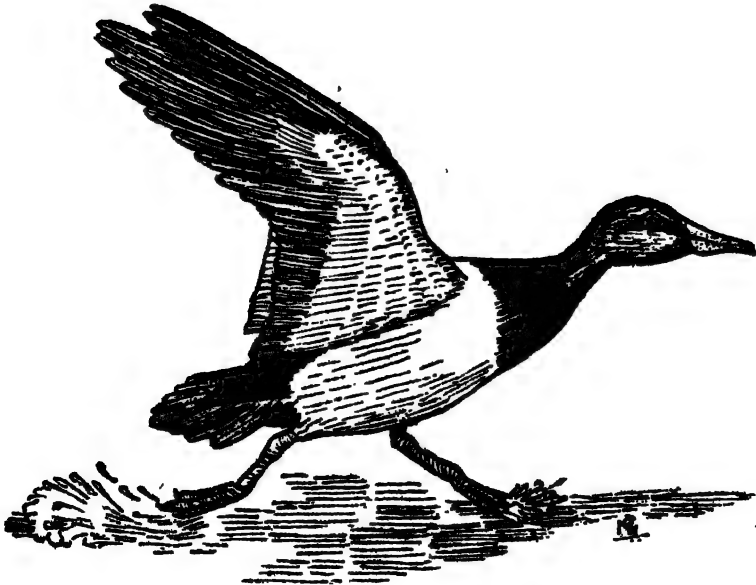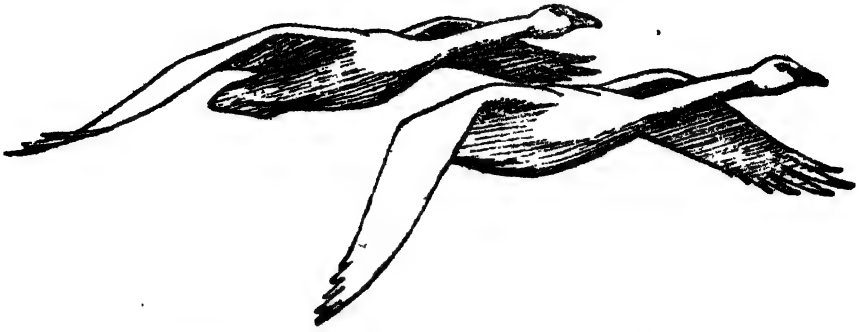
২৮৫। ভেরীবাদক (The trumpeter)—আমেরিকার রাজহাঁসদের মধ্যে এরাই সবচেয়ে বড়। জলের উপর দিয়ে অনেকটা দৌড়ে গিয়ে তবে এ আকাশচারী হতে পারে। তাই খুব বড় বড় জলাশয়ে এদের বাস করতে হয়
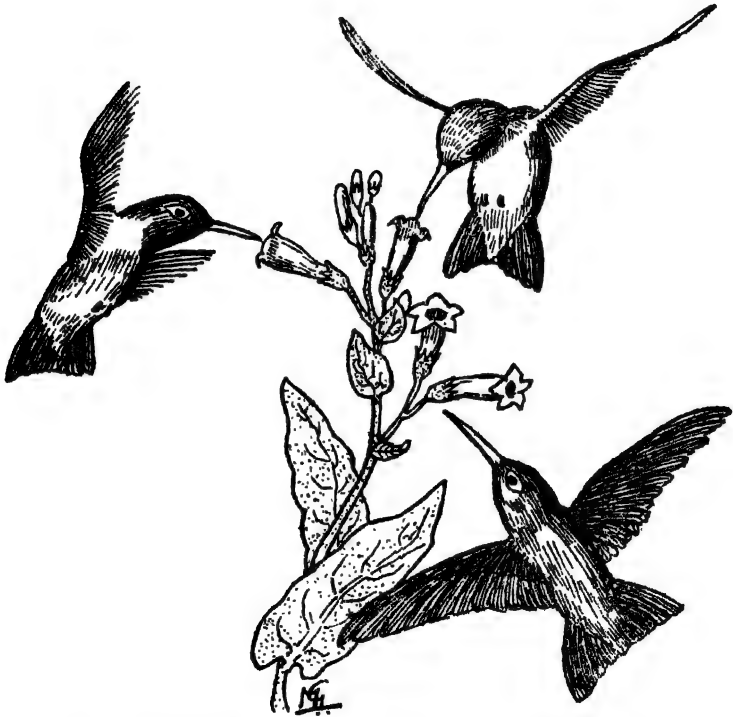
চিত্র ২৮৬। হামিং বার্ড (Humming bird) বা গুঞ্জনকারী পাখি। মানুষ হেলিকপ্টার আবিষ্কার করেছে এইতো সেদিন, আর এদের উদ্ভব হয়েছে হাজার হাজার বছর আগে। মানুষের যন্ত্র কিন্তু এর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। এই পাখি দ্রুত ডানা নাড়িয়ে (সেকেণ্ডে ২০০ বার) স্থির হয়ে এক জায়গায় ভেসে থাকতে পারে এবং অনায়াসে ফুলের মধু পান করতে পারে।

চিত্র ২৮৭। কাঠঠোকরা—বাটালির মতো ধারালো ঠোঁঠ দিয়ে ঠুকে ঠুকে কীট-পতঙ্গের সন্ধান করছে।

চিত্র ২৮৮। বক—যেন বক-ধার্মিক। একপায়ে ভর ক'রে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে—যেন পাথরের মূর্তি। কোন অসতর্ক মাছ কাছাকাছি এলেই তাকে খপ্ ক'রে ধরে গিলে ফেলবে।
[ইউ. এস. আই. এস-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

চিত্র ২৯০। পেঙ্গুইন।

চিত্র ২৮৯। সারস।

চিত্র ২৯১। ফ্লেমিঙ্গো।
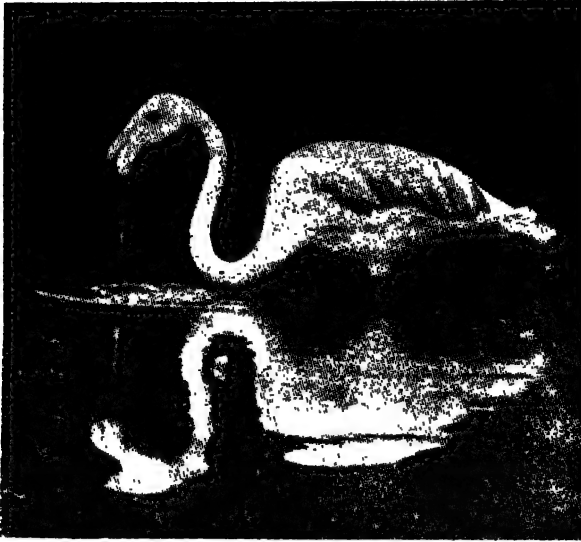
পেঙ্গুইন পাখির ডানা খুব শক্তিশালী, কিন্তু তাতে পালক নেই। এই ডানার সাহায্যে সে উড়তে পারে না, কিন্তু জলের মধ্যে খুব ভাল সাঁতার কাটতে পারে।

পাখির পায়ের গড়ন বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এদের পায়ে চারটি ক'রে আঙ্গুল, আর তাতে ধারালো নখর আছে। পায়ের তিনটি আঙ্গুল সামনের দিকে এবং একটি পিছনে থাকে ব'লে পাখি গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে সেখানে বসে থাকতে পারে।

পাখি অনেক সময় গাছের ডালে বসে ঘুমোয়, কিন্তু পড়ে যায় না কেন? এর কারণ, পাখির পায়ের মাংসপেশী এমনভাবে তৈরি যে, মাংসপেশীর টানে আঙুল মুড়ে বন্ধ হয়ে যায়। নিজে থেকে পা সোজা বা খাড়া না করলে, আঙুল কিছুতেই খোলে না। এজন্যই ঘুমন্ত অবস্থায় পাখির পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে না।

কাঠঠোকরা আঙুলের নখ দিয়ে গাছের গুঁড়ি আঁকড়ে ধরে থাকে, এবং বাটালির মতো ধারালো ঠোঁট দিয়ে ঠুকে ঠুকে গাছের বাকলে গর্ত করে, এবং সেখান থেকে পোকা বের ক'রে খায়।

উটপাখি উড়তে পারে না, কিন্তু এর পা দু'টি খুব মজবুত এবং সুগঠিত। এজন্য সে খুব ভাল দৌড়াতে পারে।

যে-সব পাখি জলের ধারে থাকে এবং শামুক, গুগলি, মাছ প্রভৃতি খেয়ে বাঁচে,
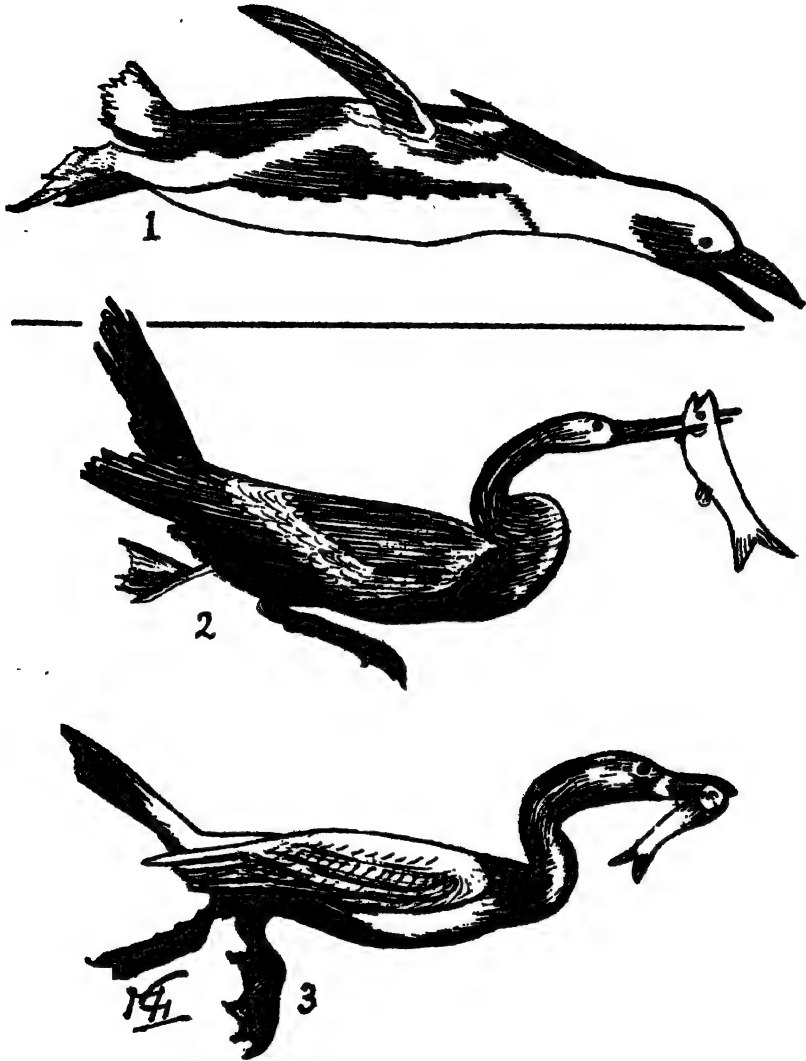
চিত্র ২৯২। এমন কতকগুলি মৎস্যভুক্ পাখি আছে, যারা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে দ্রুত ডুব-সাঁতার দিতে অভ্যস্ত।

1. একটি পেঙ্গুইন (Penguin) জলের নীচে শিকারের সন্ধানে ছুটে চলেছে।
2. গয়ার (Darter) তার লম্বা ঠোঁট দিয়ে-একটি মাছ গেঁথে ফেলেছে।
3. পানকৌড়ি (Cormorant) জলের তলায় একটি মাছ ধরে ফেলেছে।

তাদের দেহের বিচিত্র গঠন। এদের পা খুব লম্বা, আর ঠোঁটও বেশ লম্বা। ঝিলের জলে কিংবা পাঁকাল জমিতে এদের লম্বা লম্বা পা ফেলে চলা, এবং খাদ্য-সংগ্রহ, দেখবার মতো; যেমন—বক, সারস, ফ্লেমিঙ্গো প্রভৃতি।

জলপিপির পায়ের আঙুল অস্বাভাবিক রকম লম্বা। এরা শাপলা-ঢাকা জলাশয়ে ভাসমান পাতার ওপর দিয়ে হালকা-পায়ে চলাফেরা ক'রে সহজেই শিকার ধরতে পারে।

ঈগল, বাজ, পেঁচা প্রভৃতি শিকারী-পাখির পায়ে থাকে ধারালো নখর। এরা পা দিয়ে শিকার চেপে ধরে ঠোঁট দিয়ে ছিঁড়ে খায়। আবার তোতা, টিয়া প্রভৃতি পাখি পা দিয়ে, ঠিক মানুষের হাতের মতো, খাদ্যবস্তু তুলে মুখে দিতে পারে।

হাঁস জলে চরে বেড়ায়। সাঁতার দেওয়ার জন্যে এর পায়ের আঙুল পাতলা
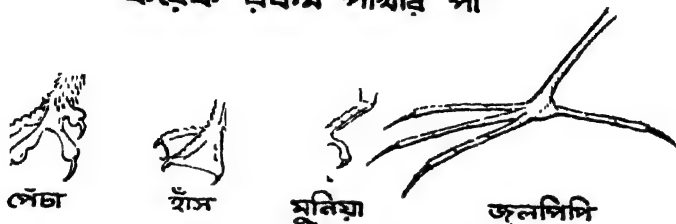
চিত্র ২৯৩। কয়েক রকম পাখির পা।
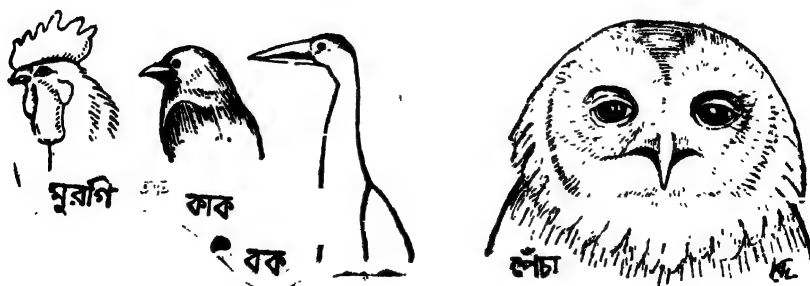
চিত্র ২৯৪। কয়েক রকম পাখির ঠোঁট।

চিত্র ২৯৫। নানারকম ঠোঁটের বাহার—1. দাঁড়কাক, 2. শকুন, 3. সারস, 4. ঈগল, 5. পেলিকান, 6. কিউই, 7. ধনেশ, 8. মাছরাঙা।

পর্দা দিয়ে জোড়া (Web-foot=লিপ্তপদ)। পানকৌড়ি, গয়ার প্রভৃতির পা-ও অনেকটা হাঁসের ম'তো। এরাও জলের মধ্যে ভাল সাঁতার দিতে পারে, এবং সহজেই মাছ শিকার ক'রে খেতে পারে।

পাখির ঠোঁটের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাখির কাছে ঠোঁটের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। কারণ, ঠোঁটই হ'ল তার প্রধান হাতিয়ার। এদিয়ে সে কি না করে? এদিয়ে সে খাদ্য লোফে, শস্য খুঁটে খায়, ফল ঠুকরে খায়, আবার মাংস ছিঁড়ে খায়। ঠোঁট কখনও ছেনি, কখনও বাটালি, কখনও বাদাম ভাঙ্গার কল, কখনও চামচ, আবার কখনও মাছ রাখার থলি—কি নয়? দেহ-বিন্যাস, বাসা বানানো, বাচ্চাদের খাওয়ানো, আত্মরক্ষা—সবরকম কাজই সে করে ঠোঁটের সাহায্যে। প্রত্যেক প্রজাতির পাখিরই ঠোঁটের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন, মাছরাঙার ঠোঁট দেহের তুলনায় বেশ লম্বা এবং মাছ ধরার পক্ষে খুবই উপযোগী। শিকারী-পাখিদের ঠোঁট খুব ধারালো এবং ঈষৎ বাঁকানো; যেমন—চিল, শকুন, বাজ, ঈগল, প্যাঁচা প্রভৃতি। পায়ের ধারালো নখর দিয়ে শিকার ধরে, এরা ধারালো

চিত্র ২৯৬। দোয়েল
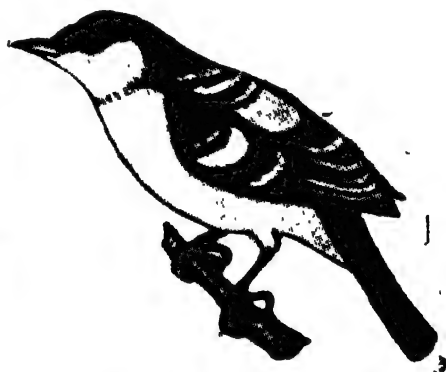
চিত্র ২৯৭। ফটিক-জল

চিত্র ২৯৮। শ্যামা

চিত্র ২৯৯। ভরত-পক্ষী

চিত্র ৩০০। ময়না—মানুষের মতো কথা বলতে পারে।

ঠোঁট দিয়ে মাংস ছিঁড়ে খেতে পারে। আবার, ফুলের ভিতর থেকে মধু সংগ্রহ করার জন্যে সরু ও লম্বা ঠোঁট মৌটুসির এক উল্লেখযোগ্য অভিযোজন।

পাখির ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ, কিন্তু সে তুলনায় দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রখর। পাখির চোখের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন বিচিত্র এই চোখের গড়ন, তেমনি অদ্ভুত এর মাংসপেশীর কলা-কৌশল। পাখি যে শুধু দূরের জিনিস স্পষ্ট দেখে, তা নয়, কাছের জিনিসও সে খুব ভাল দেখতে পারে। তার কারণ, পাখি চোখ দিয়ে দূরবীনের কাজ করতে করতে অল্প সময়ের মধ্যে তাকে লেন্স বা বিবর্ধক কাচে পরিণত করতে পারে।

ছোট্ট একটি পাখি গাছের ডালে বসে একদিকে যেমন নজর রাখে, দূর থেকে কোনো শিকারী-পাখি, যেমন—চিল, বাজ কিংবা ঈগল, তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে কিনা, তেমনি আর একদিকে তার চোখের সামনে অবস্থিত ছোট্ট পোকাটির উপরেও সে লক্ষ্য স্থির ক'রে অনায়াসে তাকে ধরতে পারে। শিকারী বাজ বা

চিত্র ৩০১। কোকিলের কুহু কুহু ডাক শুনে বোঝা যায়, বসন্ত এসে গেল।

চিল খেত-খামার বা মাঠের উপর দিয়ে উড়তে উড়তে খুঁজতে থাকে, কোথায় একটা মেঠো-ইঁদুর বা ছোট্ট খরগোস ঘুরে বেড়াচ্ছে। বহু উঁচু থেকে দেখে, ঝড়ের বেগে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সময়, দূরত্ব অনুপাতে, চোখের লেন্স-এর ফোকাস সে ক্রমাগত বদলাতে থাকে। এজন্য সে অনায়াসে শিকার ধরতে পারে, সহজে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। তেমনি পানকৌড়ি অথবা গয়ার যখন জলের তলায় ছোট্ট একটি মাছের পিছনে ছোটে, তখন জলের ভিতরেও সে সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পায়। এজন্যে শিকার ধরতে তার কোনো অসুবিধা হয় না।

আর একটি কথা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, পুরুষ-পাখির রূপ-লাবণ্য স্ত্রীর তুলনায় অনেক বেশী। পুরুষের তুলনায় স্ত্রী-পাখি যেন অনেক নিষ্প্রভ।

প্রজননকালে দেখা যায়, পুরুষটি স্ত্রী-পাখির মনোরঞ্জনের জন্যে বিশেষভাবে সচেষ্ট। স্ত্রীর সামনে গিয়ে, ঘুরে-ফিরে, ছ'দিকের ডানা নামিয়ে, লেজটাকে একটু তুলে, মধুর কণ্ঠে শিস্ দিয়ে, মনোনীতাকে যেন জিজ্ঞেস করে—আমাকে পছন্দ হয়েছে তো? তখন সে কি প্রেমিকের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারে! এরপর তারা বাসা বাঁধে, অর্থাৎ সুখের নীড় গড়ে তোলে। স্ত্রী-পাখিটি সেখানে ডিম পাড়ে।

পল্লীগ্রামে সবুজের মেলায় কত বিচিত্র বর্ণের ফুল ফোটে, ফুলের বনে রঙ-বেরঙের

চিত্র ৩•২। গায়ক-পাখি—নাইটিংগেল।

চিত্র ৩•৩। ময়ূর পেখম তুলে নাচছে। [স্টেট্‌সম্যান পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত।]

কত প্রজাপতির আনাগোনা! পাখি গান গেয়ে চলে অবিশ্রান্ত। এখানে নির্জন দুপুরে ঘুঘুর ডাক, নিশুতি রাতে প্যাঁচার ভুত-ভুতুম আওয়াজ। ফাগুনে কোকিলের কুহু কুহু ডাক শুনে বোঝা যায় যে, বসন্ত এসে গেল। বসন্ত সমাগমে, গায়ক-পাখিদের

চিত্র ৩০৬। কয়েক রকম শিকারী পাখি—1. বাজপাখি, 2. চিল, 3. স্বর্ণ-ঈগল, 4. পাতি-কাক, 5. কেরানী-পাখি, 6. শকুন।

1. উড়ুক্কু ব্যাঙ

2. উড়ুক্কু মাছ

3. উড়ুক্কু গিরগিটি

4. বাদুড়
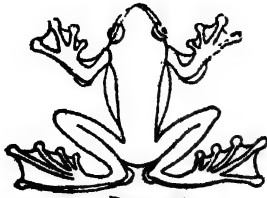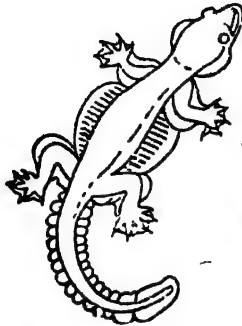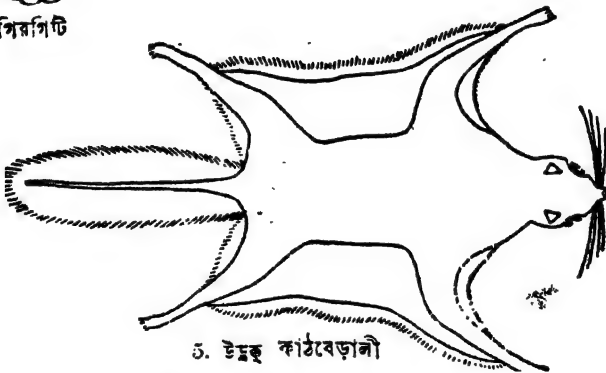
5. উড়ুক্কু কাঠবেড়ালী

চিত্র ৩০৭। কয়েক প্রকার উড়ুক্কু প্রাণী।

সুমধুর গানে ও শিসে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। দোয়েল, শ্যামা, বুলবুল, ফটিক-জল, ভরত-পক্ষী, নাইটিংগেল্ প্রভৃতির গান শুনে মুগ্ধ হয় না, এমন মানুষ কে আছে? পাপিয়া, 'বউ-কথা-কও' প্রভৃতি মিষ্টি ডাকিয়ে পাখিদের কথা কি কেউ ভুলতে পারে!

শহরে কিন্তু কাক, চিল, শালিক আর চড়াই ছাড়া অন্য পাখি বিশেষ দেখা যায় না। তবে পল্লীগ্রামেও যেমন, শহরেও তেমনি, ভাগাড়ের কাছাকাছি থাকে শকুনের আস্তানা। শহরের মানুষ অনেকেই শখ ক'রে পায়রা পোষেণ, আর পায়রা ওড়ান। আবার অনেকেই সখ ক'রে পোষেণ ময়না, টিয়া, তোতা

আর কাকাতুয়া। কারণ, তারা মানুষের মতই কথা বলে আনন্দ দেয়।

ময়ূর আমাদের জাতীয় পক্ষী। ময়ূর এবং ময়ূরীর পার্থক্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। ময়ূরীর লেজ হয় সাধারণ পাখির মতো। কিন্তু পুরুষ-ময়ূরের লেজের উপর থেকে গজায় অতিরিক্ত কতকগুলি রঙীন পুচ্ছ। একটি পুচ্ছ-পালক পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, এটি খুব হালকা, এবং লম্বায় প্রায় এক মিটার। একটি সাদা কাঠির দু'পাশে ঝালরের মতো নীলাভ-সবুজ মিহি পালক একটির পর

চিত্র ৩০৮। বাদুড়

চিত্র ৩০৯। বাদুড়ের উড়বার কায়দা।
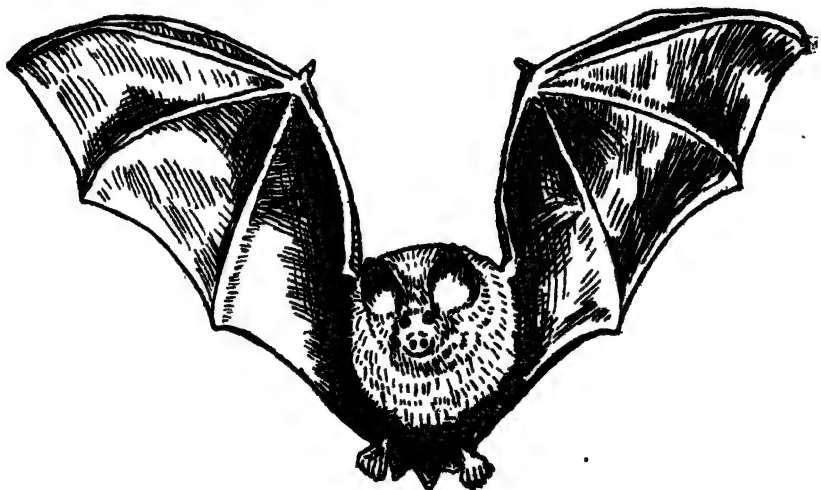
আর একটি এইভাবে সারিবদ্ধভাবে সাজানো থাকে। আর ওই কাঠির আগায় থাকে চওড়া সবুজ পালক-পাতা। তার উপরে দেখা যায়, সোনালী রঙের মধ্যে উজ্জ্বল নীল রঙের চোখের মতো গোলাকার দাগ।

আনন্দ হ'লে, ময়ুর লেজের ঐ পুচ্ছ-পালকগুলি উপরদিকে তুলে মেলে দেয়, ভাঁজ করা জাপানী পাখার মতো ক'রে, এবং ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে। ঐ ছড়ানো লেজকে বলে পেখম। পেখম-ধরা ময়ুরের সৌন্দর্যের কোনো তুলনা নেই।

পাখি ছাড়া আরও কতকগুলি প্রাণী আকাশে উড়তে পারে। উড়ুক্কু মাছের সামনের পাখনা দু'টি খুব বড় হয়। দেহের তুলনায় বিরাট এই পাখনার সাহায্যে এরা অনায়াসে কয়েকশ' ফুট পর্যন্ত উড়ে যেতে পারে। তাই সহজেই জলচর শত্রুর আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। উভচরের মধ্যে একপ্রকার উড়ুক্কু ব্যাঙ খানিকটা উড়তে পারে। এদেরও পাতলা চামড়ার উপাঙ্গ আছে, এই ডানার সাহায্যেই এরা উড়তে পারে। সরীসৃপের মধ্যে উড়ন্ত গিরগিটি (Flying lizard) কিছুটা উড়তে পারে। এদের পেটের দু'পাশে পাতলা ডানার মতো উপাঙ্গ আছে, এই ডানার সাহায্যেই এরা উড়তে পারে। স্তন্যপায়ীদের মধ্যে এক প্রকার উড়ুক্কু কাঠবিড়ালী আছে, তারও পেটের দু'পাশে পাতলা চামড়ার ডানার মতো আছে। এই ডানার সাহায্যে কাঠবিড়ালীটি খানিকদূর পর্যন্ত উড়ে যেতে পারে।
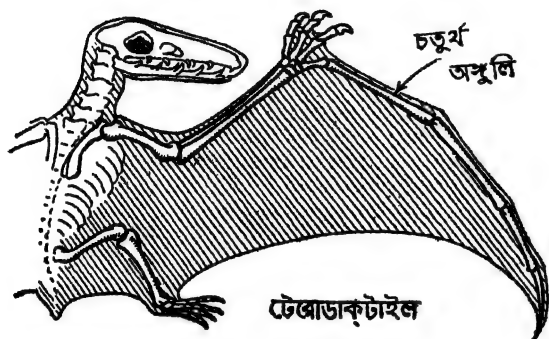
চিত্র ৩১০। তিন রকম আকাশচারী প্রাণীর তুলনা।
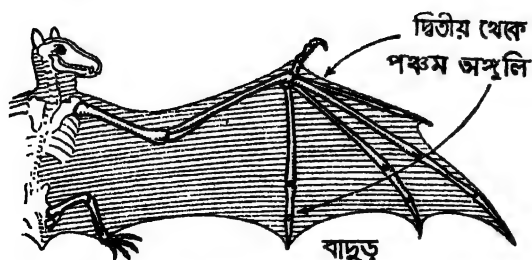
স্তন্যপায়ীদের মধ্যে চামচিকা ও বাদুড়ের অভিযোজন খুবই অদ্ভুত। এদের হাত ডানায় রূপান্তরিত হয়েছে, তবে

এই ডানা পাতলা চামড়া দিয়ে তৈরী, ঠিক পাখির ডানার মতো নয়। এই ডানা হাতের বিভিন্ন হাড়ের সঙ্গে যুক্ত। পায়ে নখ আছে, তাই এই পা দিয়ে সে গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে ঝুলে থাকতে পারে। পাখির মতো উড়তে পারলেও

চিত্র ৩১১। কালিমা (Kallima) বা পাতা-প্রজাপতি—ডান পাশের পাতাটির সঙ্গে বাঁ পাশের প্রজাপতিটির মিল এতো বেশী যে, এর অস্তিত্ব বোঝা খুবই কঠিন।

চিত্র ৩১২। কাঠি-ফড়িং—গাছের ডালপালার সঙ্গে এ এমন সুন্দরভাবে মিশে থাকতে পারে যে, শত্রুরা এর অস্তিত্ব সহজে বুঝতে পারে না।

চিত্র ৩১৩। সচল পাতা—পাতার মতো এরও গায়ের উপরে শিরা-বিন্যাস দেখা যায়। তাই হঠাৎ দেখলে, একে একটি শুকনো পাতা বলেই ভ্রম হয়।

এরা পাখি নয়, স্তন্যপায়ী প্রাণী। এদের বাচ্চা হয়, আর সেই বাচ্চা মায়ের স্তন্য পান ক'রে বড় হয়।

চিত্র ৩১৪। জিরাফের চিত্র-বিচিত্র দেহ। গাছের নীচের আলো-ছায়ার সঙ্গে জিরাফের বেমালুন মিশে যাওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা, এ যেন প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিরাপত্তার এক চমৎকার ব্যবস্থা।

(৪) অনুকৃতি বা বর্ণাশ্রয় গ্রহণ (Mimicry)—প্রাণীদের অভিযোজনের আর একদিক হ'ল অনুকৃতি বা বর্ণাশ্রয় গ্রহণ (Mimicry), অর্থাৎ নকল করা। বর্ণাশ্রয় গ্রহণের প্রচেষ্টা কীট-পতঙ্গের মধ্যেই বেশী দেখা যায়। এদের মধ্যে কারো রং গাছের মতো, আবার কারো রং হয়তো মাটির মতো। সে যেখানে থাকে, সেখানকার রঙের সঙ্গে এমনভাবে মিশে থাকে যে, তার অস্তিত্ব সহজে বোঝা যায় না।

কালিমা (Kallima) বা 'পাতা-প্রজাপতি' (Dead-leaf butterfly) যখন গাছের ডালে বসে থাকে, তখন তাকে একটি পাতার মতো দেখায়। গাছের পাতার সঙ্গে এর মিল এতো বেশী যে, হঠাৎ একে চেনা খুব শক্ত হয়। একরকম পতঙ্গ আছে, তার নাম 'সচল পাতা' (Walking leaf)। পাতার মতো এরও গায়ের উপরে শিরা-বিন্যাস দেখা যায়। আবার কাঠি-ফড়িং দেখতে ঠিক একটি কাঠির মতো। গাছের ডালপালার সঙ্গে সে এমন সুন্দর ভাবে মিশে থাকতে পারে যে, শত্রুরা সহজে তার অস্তিত্ব বুঝতে পারে না।

প্রজাপতির ডানায় নানারঙের চোখের মতো দাগ থাকে। এর ফলে অনেক সময় তাকে ভীষণ দেখায়। তাই অন্যান্য প্রাণীরা তাকে এড়িয়ে চলে। নির্বিষ সাপও যে বিষধর সাপের মতো ফণা ধরে, তা শুধু ভয় দেখিয়ে আত্মরক্ষার জন্যই। আবার, কোনো কোনো প্রাণী আক্রান্ত হ'লে, নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে, কিংবা মড়ার মতো পড়ে থেকে, আত্মরক্ষার প্রয়াস পায়।

মরুভূমির বালুকারাশির রং ব্রাউন বা বাদামী। এজন্য যেসব প্রাণী মরুভূমির বাসিন্দা, যেমন—উট, তাদের গায়ের রং হয়েছে ব্রাউন বা বাদামী। সিংহও প্রায়

মরুভূমির মতো রুক্ষ প্রতিবেশে শুকনো ঘাসবনে বিচরণ করে, তাই তারও গায়ের রং হয়েছে ব্রাউন বা বাদামী। এজন্য সে অনায়াসে ঘাসবনে আত্মগোপন ক'রে থেকে শিকারকে অনুসরণ করতে পারে।

চিত্র ৩১৫। জেব্রা—বনের আলো-ছায়ার মধ্যে দিব্যি আত্মগোপন ক'রে থাকতে পারে। তাছাড়া জেব্রার গায়ের দাগ এমন অদ্ভুত যে, হঠাৎ আক্রান্ত হ'লে, সে ডানদিকে না বাঁদিকে কোন্‌দিকে ছুটবে, তা আন্দাজ করা যায় না। এজন্য জেব্রা শিকার করা এক কঠিন সমস্যা।

প্রতিবেশের প্রভাব আরও স্পষ্ট হয় যখন দেখি, জীব-জগতের অনেক প্রাণী বাঁচার তাগিদে প্রতিবেশের সঙ্গে নিজেদের কেমন খাপ খাইয়ে নিয়েছে। শ্বেত-ভল্লুকের তুষার-বর্ণ, চিতাবাঘের গায়ের চাকা চাকা দাগ, জিরাফের চিত্র-বিচিত্র দেহ, জেব্রা বা সুন্দরবনের বাঘের ডোরাকাটা শরীর, গিরগিটির নিমেষে নিমেষে রঙ

চিত্র ৩১৬। মেরু-শিয়াল (Arctic Fox) এক অদ্ভুত প্রাণী। শীতকালে চারদিক যখন বরফে ঢেকে যায়, তখন এর গায়ের রং একেবারে সাদা হয়ে যায়। এ তখন অনায়াসে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে বরফের উপর দিয়ে চলাফেরা করতে পারে।

বদলানো, এ সবই প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার এক-একটি সফল প্রয়াস। বরফের দেশের শ্বেত-ভল্লুক প্রায় বরফের মতই সাদা। গাছের ডালপালার নীচের আলো-ছায়ার সঙ্গে জিরাফের বা চিতাবাঘের, কিংবা বাঁশবনের ও ঘাসবনের আলো-ছায়ার সঙ্গে ডোরাকাটা বাঘের বা জেব্রার বেমালুম মিশে যাওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা, আর বনে-জঙ্গলে সবুজ আর হলুদ রঙের পটভূমিতে সতত সতর্ক গিরগিটির তড়িঘড়ি রঙ বদলানো, এসবই যেন প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিরাপত্তার এক চমৎকার ব্যবস্থা।

চিত্র ৩১৯। একরকম বক (Bittern) আছে, বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই সে ঠোঁট উঁচিয়ে একেবারে স্থির হয়ে থাকে, যেন পাথরের মূর্তি! জলজ গাছপালার পটভূমিতে সে এমন বেমালুম মিশে যায় যে, তার অস্তিত্বই বোঝা যায় না। এইভাবে অধিকাংশ সময়েই সে শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়।

একরকম বক (Bittern) আছে, বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই সে ঠোঁট উঁচু ক'রে একেবারে স্থির হয়ে থাকে, যেন পাথরের মূর্তি। জলজ গাছপালার পটভূমিতে সে এমন বেমালুম মিশে যায় যে, তার অস্তিত্বই বোঝা যায় না। এইভাবে অধিকাংশ সময়েই সে শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়।

এমনি ক'রে প্রাণী-জগতে একদিকে খাদ্য আহরণ এবং খাদ্য গ্রহণের জন্যে যেমন চলেছে নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নব নব রূপায়ন, অপরদিকে তেমনি চলেছে আত্মরক্ষার জন্যে এবং জীবন-সংগ্রামে টিকে থাকার জন্যে নব নব উপায় উদ্ভাবন।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

মানুষের উদ্ভব

জীবের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ডারউইনের মতবাদ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁর 'প্রজাতির উদ্ভব' (The Origin of Species) নামক গ্রন্থে। এই গ্রন্থের শেষে তিনি মন্তব্য করেন,—"In the future, I see open fields for far more important researches. Much light will be thrown on the origin of man and his history."

মানুষের উদ্ভব সম্পর্কে ডারউইনের অনুসন্ধানকার্য শুরু হ'ল। সুদীর্ঘকাল ধরে তিনি এ সম্পর্কে এমন সব প্রমাণ সংগ্রহ করলেন যাতে সম্যক প্রতীতি জন্মে। গবেষণার ফলাফল তিনি বিশদভাবে বিবৃত করলেন ১৮৭১ সালে 'মানুষের উদ্ভব' (The Descent of Man) নামক গ্রন্থে। এতে তিনি সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করেন যে, প্রাগৈতিহাসিক কোন উচ্চতর বানর থেকেই মানুষের উদ্ভব হয়েছে।

বিভিন্ন শ্রেণীর বানরের মধ্যে সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় হ'ল চার রকম উচ্চ শ্রেণীর বানর; যেমন—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও মালয় দ্বীপপুঞ্জের গিবন (উল্লুক), বোর্ণিও ও সুমাত্রার ওরাং-ওটাং এবং নিরক্ষীয় আফ্রিকার শিম্পাঞ্জী ও গরিলা। এদের মধ্যে আবার গরিলার সঙ্গেই মানুষের সাদৃশ্য সবচেয়ে বেশী। এদের সাধারণভাবে 'এপ্‌' (Apes), বা 'মানবসদৃশ বানর' (Anthropoid or Man-like Apes), বলা হয়।

চিত্র ১২০। উচ্চতর বানরের লেজ নেই। এদের কঙ্কাল সাধারণভাবে মানুষের মতো।

উচ্চতর বানরের লেজ নেই। এদের কঙ্কাল সাধারণভাবে মানুষের মতো। প্রত্যেকের ৩২-টি ক'রে দাঁত থাকে। দাঁতের গঠন মোটামুটিভাবে মানুষের মতই।
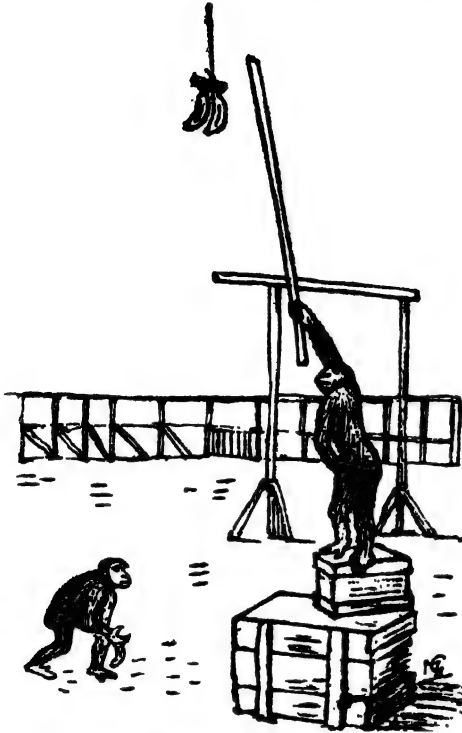
চিত্র ৩২১। খাদ্য আহরণের উদ্দেশ্যে শিম্পাঞ্জী বুদ্ধি খাটিয়ে নানা উপায় অবলম্বন করে; যেমন—উপরে ঝুলানো কলা পাড়বার জন্যে সে লাঠি বা ঐ রকম অন্য কোন হাতিয়ার ব্যবহার করে।

এরা সবাই দু'পায়ে হাঁটতে পারে; যদিও একটু কুঁজো হয়ে হাঁটে, মানুষের মতো ঠিক সোজা হয়ে হাঁটতে পারে না। হাতে বা পায়ে পাঁচটি ক'রে আঙ্গুল, এবং আঙ্গুলে নখ থাকে। এছাড়া অন্তঃযন্ত্রাদি, পেশী, রক্তবহা-নালী, নার্ভ প্রভৃতির পার্থক্যও খুবই কম। বানর সাধারণতঃ একটি এবং কদাচিৎ দু'টি শাবক প্রসব করে। এদের গর্ভকাল এবং আয়ু প্রায় মানুষের মতই।

মানবসদৃশ বানরের বুদ্ধিবৃত্তিও যথেষ্ট উন্নত। এদের মস্তিষ্কের সঙ্গে মানুষের মস্তিষ্কের যথেষ্ট মিল আছে। এরা প্রায় মানুষের মতই হাসে, কাঁদে এবং ক্রোধ প্রকাশ করে। এদের স্মৃতিও বেশ দীর্ঘস্থায়ী। তাছাড়া অনুকরণ-ক্ষমতাও বেশ উন্নত ধরনের। সারকাসে অথবা চিড়িয়াখানায় বন্দী অবস্থায়, শিম্পাঞ্জী অনেক রকম কাজ করতে শেখে; যেমন—বুরুশ দিয়ে দাঁত মাজা, টেবিলে বসে কাঁটা-চামচ দিয়ে খাওয়া, সাইকেল চালানো, জল ঢেলে আগুন নেভানো এবং এইরূপ আরও নানা রকম কাজ করতে সে দ্রুত অভ্যস্ত হয়ে যায়। এছাড়া খাদ্য আহরণের উদ্দেশ্যে বুদ্ধি খাটিয়ে সে নানা উপায় অবলম্বন করে; যেমন—উপরে ঝুলানো কলা পাড়বার জন্যে লাঠি বা ঐরকম অন্য কোন হাতিয়ার ব্যবহার করে। এ থেকেই বোঝা যায় যে, মানুষের চেয়ে এদের বুদ্ধি কম হলেও অন্য জন্তু-জানোয়ারের চেয়ে অনেক বেশী।

এই সব কারণে ডারউইন অনিবার্যভাবে সিদ্ধান্ত করেন যে, মানবসদৃশ বানরের মধ্যেই মানুষের নিকটতম আত্মীয়ের খোঁজ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি যে মন্তব্য করেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,—"It is probable that Africa was formerly inhabited by extinct apes, closely allicd to the gorilla and chimpanzee ; and as these two species are now man's nearest allies, it is somewhat more probable that our early proginators lived on the African continent than elsewhere."

চিত্র ৩২২। পূর্ব-গোলার্ধের বানর (Rhesus monkey)।

চিত্র ৩২৩। বানরের বাচ্চা জন্মের অব্যবহিত পর থেকেই চার পায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করে। এটাই তার জন্মগত প্রবৃত্তি (Natural instinct)।

কিন্তু ডারউইনের এই মতবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক বাদানুবাদ শুরু হয়ে গেল। অনেকেই তাঁর এই মতবাদের ভুল ব্যাখ্যা করলেন। তাই অনেকের ধারণা হ'ল, তিনি বলেছেন যে, মানুষের উদ্ভব হয়েছে বানর থেকে, অর্থাৎ মানুষের পূর্ব-পুরুষ ছিল বানর। যদিও ডারউইন ঠিক একথা বলেন নি। তিনি বলেছেন, সুদূর অতীতে বানর এবং মানুষের পূর্ব-পুরুষ এক ছিল (Common ancestor)। অভিব্যক্তিবাদের নিয়ম অনুসারে, সুদীর্ঘ কাল-প্রবাহে তা থেকে একদিকে সৃষ্টি হয়েছে নানা জাতের বানর, আর অন্যদিকে সৃষ্টি হয়েছে নানা জাতের মানুষ।

ধর্মযাজকগণ বুঝলেন, ডারউইনের এই মতবাদ খ্রীষ্টধর্মের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। তাই তাঁরা ডারউইনকে অত্যন্ত তীব্র ভাষায় আক্রমণ করতে লাগলেন। তাঁরা প্রচার করতে লাগলেন যে, ডারইন বাইবেলকে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু ডারউইন এজন্যে হতাশ হলেন না, বা ধৈর্য হারালেন না। প্রকৃত বীরের মতো উপযুক্ত সময়ের জন্যে ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, অবিশ্বাসী জনসাধারণ একদিন না একদিন তাঁর এই মতবাদ গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। সৌভাগ্যবশতঃ আর একজন ইংরেজ বিজ্ঞানী টমাস হেন্‌রি হাক্‌স্‌লিও গবেষণার ফলে অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কাজেই তিনি ডারউইনের মতবাদের

চিত্র ৩২৪। ওরাং-ওটাং এইভাবে হাত-পায়ে ভর দিয়ে চলতে অভ্যস্ত।
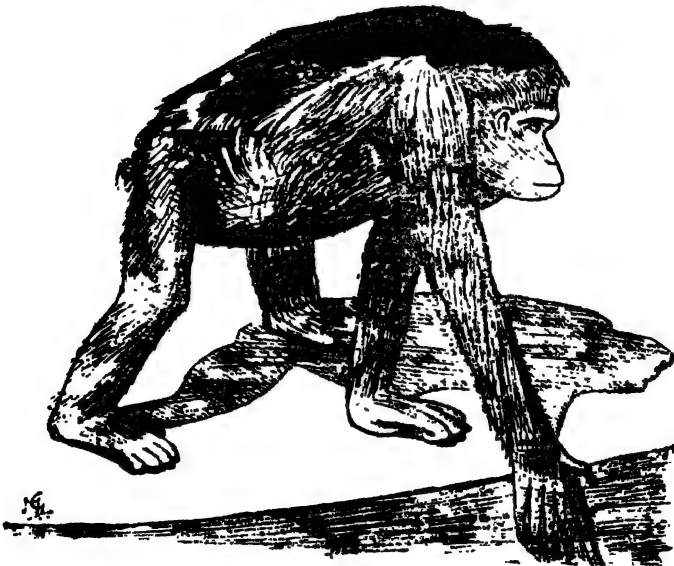
সবচেয়ে বড় সমর্থক হলেন। তাঁরই ঐকান্তিক চেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যেই সভ্যসমাজে এই মতবাদটি সত্য বলে স্বীকৃত হ'ল।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ডারউইন যখন মানুষের উদ্ভব সম্পর্কে গবেষণা-কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন তখন পর্যন্ত উচ্চতর বানর ও সমকালীন মানুষের অন্তর্বর্তী প্রাণীদের সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা ছিল না। কিন্তু অপূর্ব প্রতিভাধর এই বিজ্ঞানী জীবের ক্রমবিকাশের সম্পূর্ণ চিত্রটি যেন মানসচক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন। তাই ক্রমবিকাশের ধারায় কোন্ প্রাণীর পরে কোন্ প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেছে তা বলতে তাঁর কোন দ্বিধা হয় নি। ক্রমবিকাশের ধারা যে সর্বত্র অবিচ্ছিন্ন রয়েছে তা নয়। কিন্তু এই সব হারানো সূত্র যে একদিন খুঁজে পাওয়া যাবে, এবিষয়ে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। সবচেয়ে প্রাচীন মানুষ 'পিতেকানত্রোপাস'-এর (Pitekos—বানর, anthropos—মানুষ) জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয় ১৮৯১ সালে, অর্থাৎ ডারউইনের
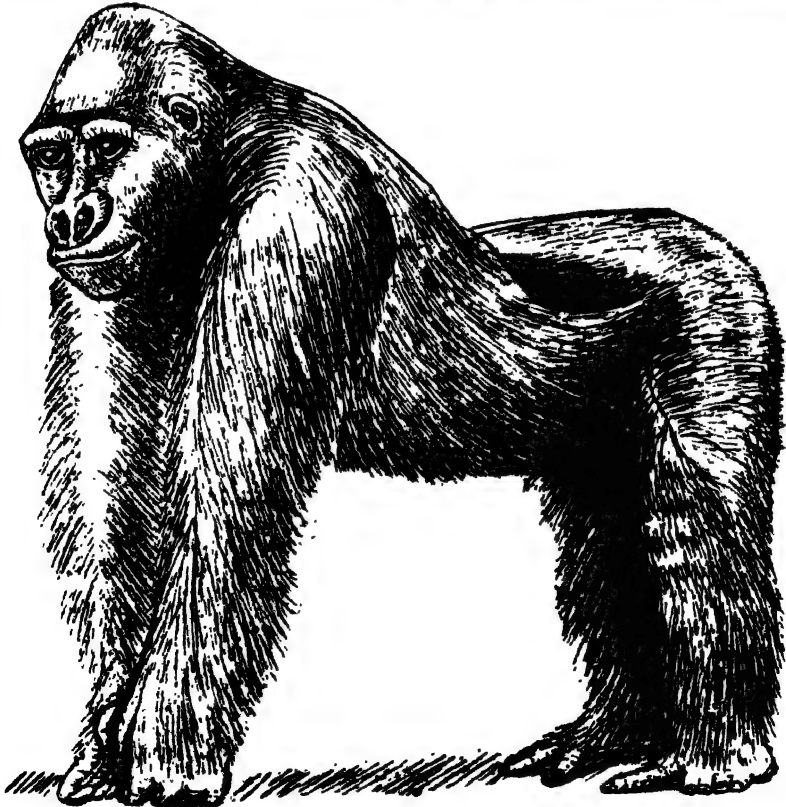
চিত্র ৩২৫। গরিলা এইভাবে চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে চলতে অভ্যস্ত।

মৃত্যুর আরও নয় বছর পরে। ক্রমে আরও কতকগুলি জীবাশ্ম-করোটি আবিষ্কৃত হওয়ায়, যেমন—অস্ট্রালোপিতেকাস (১৯৫৯), সিনান্‌থ্রোপ বা পিকিং-মানুষ (১৯২৭), হাইডেলবার্গ মানুষ (১৯০৭) প্রভৃতি, ডারউইনের অনুমান সত্য বলে
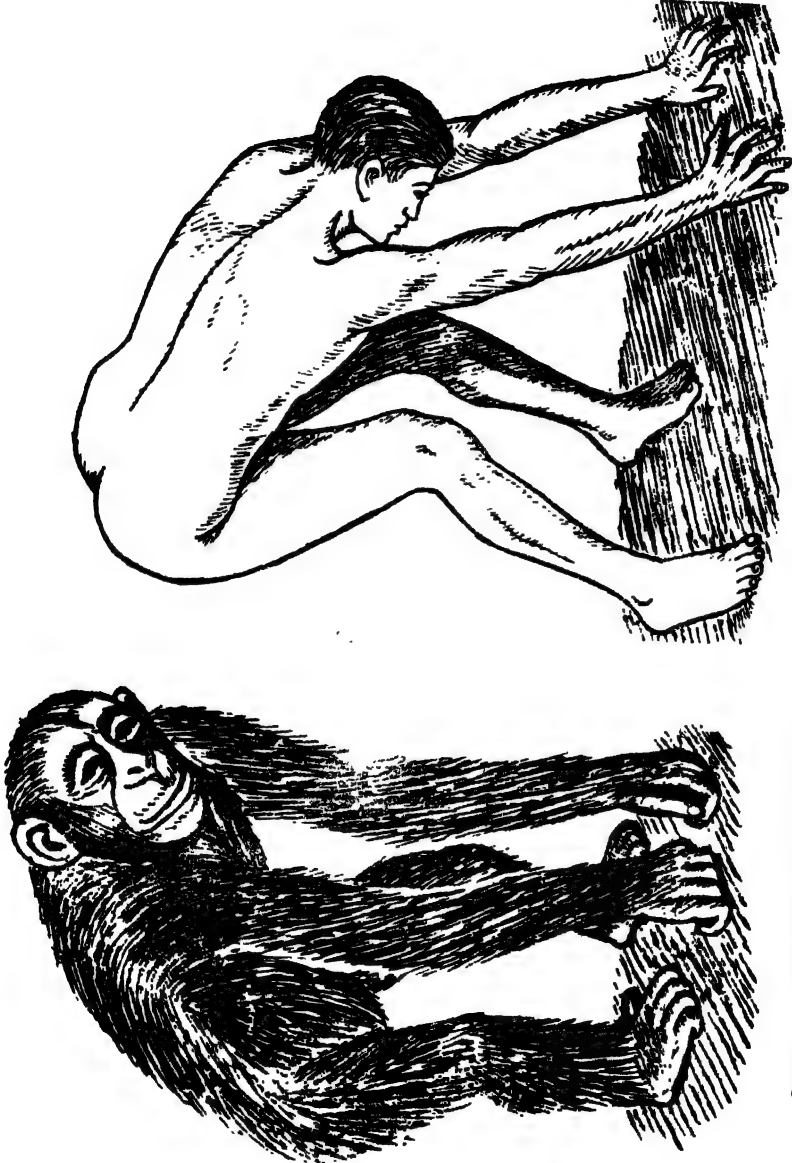
চিত্র ৩৩৬। শিম্পাঞ্জীর হাত লম্বা, কিন্তু পা খাটো। তাই সে চার হাত-পায়ের উপর ভর ক'রে অনায়াসে চলাফেরা করতে পারে। অপরদিকে, মানুষের পা বড়, কিন্তু হাত ছোট। তাই তার পক্ষে চার হাত-পায়ে ভর ক'রে চলা কঠিন, আর তাতে সে অভ্যস্তও নয়।

প্রমাণিত হয়েছে। এ থেকেই ডারউইনের অপূর্ব প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

মানব-জীবাশ্মগুলি বিচার বিশ্লেষণ ক'রে দেখা গেছে, ক্রমবিকাশের ধারায় স্পষ্ট তিনটি পর্যায় আছে। প্রথম পর্যায় হ'ল বানর-মানুষ (Ape-man), তার পরে পুরানো-পাথর যুগের মানুষ (Palaeolithic man) এবং সবশেষে নতুন-পাথর যুগের মানুষ (Neolithic man)।

ডারউইন প্রমাণ করেছেন, প্রাগৈতিহাসিক উচ্চতর বানর থেকেই মানুষের উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু কি পরিস্থিতিতে এবং কেন এই পরিবর্তন ঘটল, তা তিনি বলেন নি। এসব প্রশ্নের সঠিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন ফ্রেডরিক এঙ্গেল্‌স। তিনি বলেছেন, প্রাগৈতিহাসিক মানবসদৃশ বানর ছিল পশু, কিন্তু সচেতন শ্রমই তাকে মানুষে রূপান্তরিত করেছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে বানরের সঙ্গেই মানুষের মিল সবচেয়ে বেশী, কিন্তু তবুও পার্থক্যও আছে অনেক। যেমন, কোন প্রাণীই, এমন কি বানরও, শ্রম-সহায়ক কোন যন্ত্র তৈরি করে নি। তেমনি মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীই উচ্চারণ-বিন্যাস-বিশিষ্ট ভাষার সাহায্যে নিজের মনোভাব প্রকাশ করতে পারে না। অন্যান্য জীবজন্তুর সঙ্গে মানুষের পার্থক্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য হ'ল সচেতন শ্রম। যে-জন্যে সে প্রয়োজনীয় সব কিছু করতে পারে, এবং ভাবের আদান-প্রদান করতে পারে।

এখন প্রশ্ন, শ্রমের শুরু হ'ল কিভাবে? মানুষ যাতে কাজ করতে পারে সেজন্যে
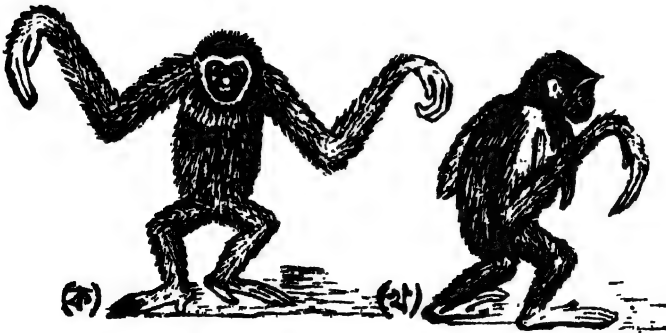
চিত্র ৩২৭। গিব্বন ইাটে কতকটা কুব্জ ভঙ্গীতে— কখনও লম্বা হাতের উপর ভর ক'রে, আবার কখনও কখনও দেহের ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্যে হাত দু'টি দুলিয়ে দুলিয়ে চলে।

তার প্রয়োজন দু'টি মুক্ত হাত। বৃক্ষবাসী মানবসদৃশ বানর যখন মাটিতে নেমে এলো, এবং মাটির জীবনে অভিযোজিত হ'ল, তখনই এই সুযোগটি সুনিশ্চিত হ'ল। আর এজন্য ঋজুভাবে হাঁটবার অভ্যাসটিও অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ল। তবে এই পরিবর্তন অল্পদিনে হয় নি।

সুদূর অতীতে বৃক্ষবাসী মানবসদৃশ বানরের ঊর্ধ্ব ও নিম্ন প্রত্যঙ্গগুলি বিশেষ কার্যসাধনের উপযোগী করতে হয়েছিল। বাস্তবিক, এক গাছ থেকে অন্য গাছে যাওয়া-আসার ব্যাপারে, এদের ঊর্ধ্ব ও নিম্ন প্রত্যঙ্গগুলি হাত ও পায়ের কাজ ক'রত। গাছের ডালের উপর দিয়ে হাঁটবার সময় পিছনের প্রত্যঙ্গের উপর দেহের ভার পড়ত, আর সামনের প্রত্যঙ্গ দিয়ে গাছের ডাল আঁকড়ে ধরতে হ'ত। ক্রমাগত অভ্যাসের ফলে প্রত্যঙ্গগুলি নিজ নিজ কাজে আরও নিপুণ হয়ে উঠল।

মানুষের দেহে সবচেয়ে উন্নয়নশীল ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হ'ল হাত ও মস্তিষ্ক। অস্ট্রালোপিতেকাস বানর-মানুষের ঋজুভাবে হাঁটবার অভ্যাসের ফলে এই দু'টি অংশ সমভাবে ক্রমবিকশিত হওয়ার সুযোগ হ'ল।

চিত্র ৩২৮। গরিলা প্রয়োজন হ'লে দাঁড়ায়, হাত দিয়ে গাছের ডাল কিংবা ঐরূপ অন্য কোন অবলম্বনকে আশ্রয় ক'রে।

মানবসদৃশ বানর তার জীবনযাত্রা প্রণালী বদল ক'রল কেন? বিজ্ঞানীরা মনে করেন, পৃথিবীর আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে (হিমযুগের দরুন) ইউরোপ ও এশিয়ার উত্তর ভাগে বিশাল অরণ্যানী আর আগের মতো ঘন রইল না। কাজেই যে-সব বানর অপ্রচুর বনাকীর্ণ অঞ্চলে বা স্তেপ্‌-ভূমিতে ছিল, তারা জীবনযাত্রা প্রণালী পরিবর্তন করতে বাধ্য হ'ল। তাঁরা বলেন, মনুষ্যাকৃতি বানর ড্রাইও-পিতেকাস মাঝে মাঝে গাছ থেকে মাটিতে নেমে আসত এবং বনের ধার দিয়ে খাবার খুঁজে বেড়াত। এর ফলে তারা ক্রমশঃ নতুন অবস্থায় সঙ্গে অভিযোজিত হয়ে উঠল।

কিন্তু যে-সব বানর নিরক্ষীয় অঞ্চলের নিবিড় অরণ্যে বৃক্ষাদির প্রাচুর্যের মধ্যে

ছিল, তারা বৃক্ষেই বাস করতে লাগল। তাই তাদের মধ্যে বানরের বিশেষত্বগুলিই ক্রমবিকশিত হতে লাগল। এজন্যে তাদের দেহ ক্রমশঃ বৃক্ষ আরোহণে আরও উপযোগী হয়ে উঠল।

যারা মাটিতে চলাফেরা করতে শুরু ক'রল, তারা ক্রমশঃ সোজা হয়ে হাঁটতে

(ক) মানুষ

(খ) শিম্পাঞ্জী (গ) গরিলা (ঘ) গিবন (বা, উলুক)
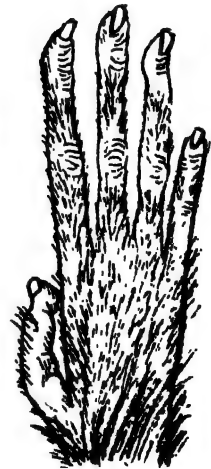
চিত্র ৩২৯। মানুষের হাতের সঙ্গে কয়েক রকম উচ্চতর বানরের হাতের তুলনা। (স্কেলমত নহে)
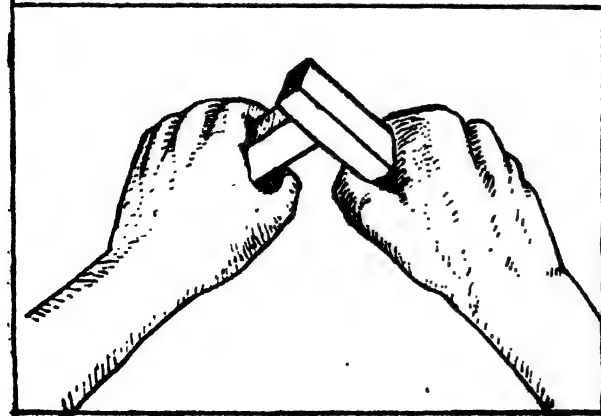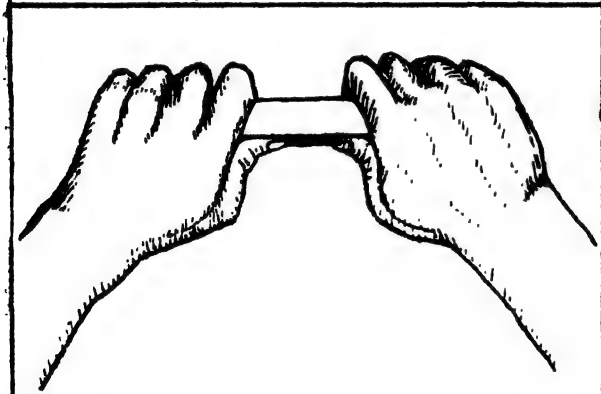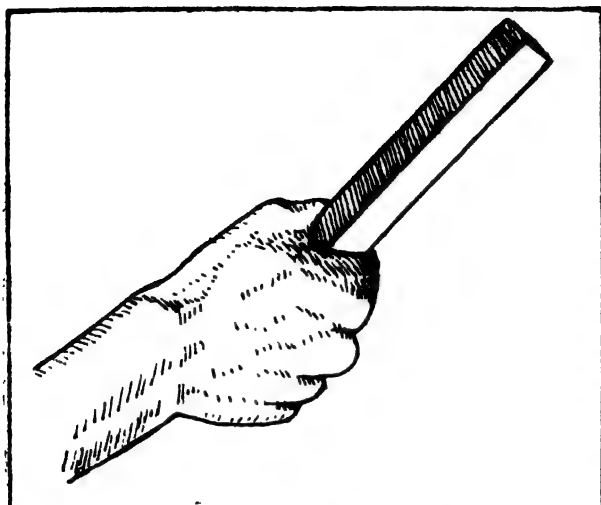
চিত্র ৩৩০। ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে মানুষের হাতের অঙ্গুষ্ঠ বা বুড়ো-আঙুল আকারে বড় হাতে লাগল, এবং অন্যান্য আঙুলের তুলনায় এর সঞ্চালন আরও অবাধ ও স্বচ্ছন্দ হ'তে লাগল।

(ক) অপর চারটি আঙুলের সঙ্গে আড়া-আড়িভাবে অবস্থিত অঙ্গুষ্ঠ বা বুড়ো'-আঙুলের সাহায্যে যে-কোন সরঞ্জাম (যেমন, লাঠি) চেপে ধরা যায়।

(খ) অপর আঙুলগুলি দ্বারা ধৃত কঠিন কোন দ্রব্যের উপরে (ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে) অঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে চাপ দেওয়া যায়।

(গ) অপর চারটি আঙুল এবং অঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে হাত মুষ্টিবদ্ধ ক'রে হাতুড়ি (বা, অন্য কোন সরঞ্জাম) অনায়াসে ধরা যায় এবং তা দিয়ে আঘাত করা যায়।

অভ্যস্ত হ'ল। এর ফল হ'ল অসাধারণ এবং সুদূরপ্রসারী। সামনের প্রত্যঙ্গগুলি এগিয়ে যাওয়ার কাজ থেকে অব্যাহতি পেল, তাই তাদের সাহায্যে মাটির ভিতর থেকে পেঁয়াজ, গাছের মূল, কন্দ প্রভৃতি খুঁড়ে বের করা সহজ হ'ল। এই প্রত্যঙ্গ দিয়ে ছোটখাট প্রাণীও ধরা যেত। এইভাবে তাদের হাত গাছের ছোট ছোট ডাল, পাথর প্রভৃতি ধরতে এবং তাদের সাহায্যে পশু-পাখি শিকার ক'রে আহার্যের সংস্থান করতে, ক্রমশঃ আরও পটু হয়ে উঠল। আবার মাটিতে চলাফেরা করার সময় কখনও কখনও হিংস্র জন্তু তাড়া ক'রত, তখন সে দৌড়ে পালাত। এর ফলে তার পা দু'টি ক্রমশঃ আরও সুগঠিত হয়ে উঠল।

(ক) মানুষ (খ) শিম্পাঞ্জী

প্রায় দেড় কোটি বছর আগে আর একপ্রকার উচ্চতর বানরের আবির্ভাব ঘটে, যার সঙ্গে আদি-মানবের সাদৃশ্য বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। কারণ, এর মস্তিষ্কের আয়তন যে-কোন বানরের তুলনায় বেশী। এর নাম রামপিতেকাস (Ramapithecus)। এরূপ প্রাণীর দেহাবশেষ সর্বপ্রথম পাওয়া গেছে ভারতের
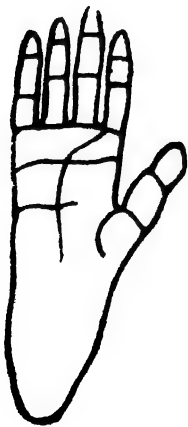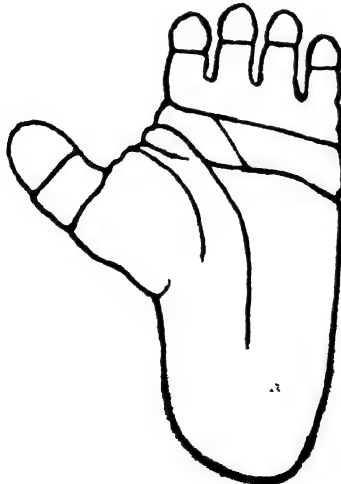
(গ) গিবন (বা, উল্লুক) (ঘ) গরিলা

চিত্র ৩৩১। মানুষের পায়ের সঙ্গে কয়েকরকম উচ্চতর বানরের পায়ের তুলনা। (স্কেলমত নহে)

শিবালিক পাহাড়ে। উল্লেখ্য যে, এই রকম প্রাণীর জীবাশ্ম আফ্রিকায়ও পাওয়া গেছে।

রামপিতেকাস সোজা হয়ে দাঁড়াত, এবং তার চোয়াল ততটা প্রকট ছিল না। উন্নততর মস্তিষ্ক এবং সংবেদনশীল হাত থাকার ফলে রামপিতেকাসও সম্ভবতঃ হাত দিয়ে পাথর বা লাঠি ধরতে এবং তা শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারত।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, আজ থেকে প্রায় ৫০ লক্ষ বছর আগে, রামপিতেকাস এর বিকাশ ঘটে প্রধানত চারটি ধারায়। এরা সকলেই মোটামুটিভাবে দু'পায়ে চলতে অভ্যস্ত ছিল। এদের মধ্যে অস্ট্রালোপিতেকাস-সহ তিনটি ধারাই একসময় লুপ্ত হয়ে যায়। চতুর্থ ধারায় দেখা দেয় হোমো ইরেক্টাস্ (*Homo erectus*), এবং কালক্রমে তা থেকেই উদ্ভব হয় হোমো স্যাপিয়েন্স (*Homo sapiens=wise man*) নামক প্রজাতির (Species)। উল্লেখ্য যে, হোমো ইরেক্টাস থেকে উদ্ভূত উপ-প্রজাতি (Sub-species) হোমো স্যাপিয়েন্স নিয়েন্ডারথালেন্সিস্ (*Homo sapiens neanderthalensis*)-ও একদিন লুপ্ত হয়ে যায়। তখন যে উপ-প্রজাতিটি টিকে থাকে, তারই নাম দেওয়া হয়েছে 'স্যাপিয়েন্স' (Sapiens)। কালক্রমে এ থেকে যে মানব-জাতির উদ্ভব হয়েছে, তাকে বলা হয় ক্রমাঙ্গ মানুষ (Cromagnon man), অর্থাৎ হোমো স্যাপিয়েন্স (*Homo sapiens*)। এদেরই উন্নত সংস্করণ হ'ল সমকালীন মানুষ (*Homo sapiens sapiens*)।

এখনকার উচ্চতর বানরের মধ্যেও সোজা হয়ে হাঁটবার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। মানবসদৃশ যে-সব বানর দেখা যায়, তাদের মধ্যে গিবন (বা, উল্লুক)-ই সবচেয়ে ছোট। এর উচ্চতা হয় সাধারণত তিন ফুট, আর ওজন ২০ থেকে ৩০ পাউণ্ড মাত্র। দেহ ঘন লোমে আবৃত। হাত-পা সরু ও লম্বা। এরা সাধারণত হাত দিয়ে উপরের ডাল ধরে নীচের ডালের উপর দিয়ে হেঁটে চলতে অভ্যস্ত। অন্যান্য বানরদের মতো এরাও উঁচু গাছে বাস করে।

শিম্পাঞ্জী আকারে গিবনের চেয়ে বড়। তবে এরাও গাছের উপরদিকে বাসা বাঁধে। ওরাং-ওটাং আকারে আরও বড় হয়। দাঁড়ালে উচ্চতা চার ফুট পর্যন্ত হতে পারে। ওজন হয় ১০০ থেকে ১৫০ পাউণ্ড পর্যন্ত। এরা সাধারণত চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে চলতে অভ্যস্ত। তবে উপরের ডাল ধরে নীচের ডালের উপর দিয়ে এরা অনায়াসে চলতে পারে।

শিম্পাঞ্জী বা গরিলা চলে সাধারণত হাত ও পায়ে ভর দিয়ে। তবে এরা অল্প

সময়ের জন্যে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, এবং দু-পায়ে ভর দিয়ে কিছু দূর চলতেও পারে। শিম্পাঞ্জী হাঁটে কতকটা কুব্জ-ভঙ্গীতে কখনও লম্বা হাতের উপর ভর করে, আবার কখনও কখনও দেহের ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্যে হাত দু'টি দুলিয়ে দুলিয়ে চলে।

মানবসদৃশ বানরদের মধ্যে গরিলাই সবচেয়ে বড়। মজবুত মাংসপেশী দিয়ে গড়া বিশাল দেহ, ঘন লোমে ঢাকা। উচ্চতা প্রায় ছয় ফুট, ওজন ৪০০ থেকে ৫০০ পাউণ্ড পর্যন্ত হয়। শত্রুকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্যে খুব জোরে জোরে বুক চাপড়ে ঢাকের মতো আওয়াজ তোলে। গরিলাই মাটির উপর চলাফেরা করতে সবচেয়ে বেশী অভ্যস্ত। এজন্যে এদের পা দু'টিই সবচেয়ে বেশী পরিমাণে মানুষের অনুরূপ। অন্যান্য বানরের তুলনায় এদেরই দু-পায়ে ভর দিয়ে খাড়া ভাবে দাঁড়াবার এবং ঋজুভাবে চলবার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী। গরিলাও সাধারণত চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে চলতেই অভ্যস্ত। তবে প্রয়োজন হলে দাঁড়ায়, হাত দিয়ে গাছের ডাল কিংবা ঐরূপ অন্য কোন অবলম্বনকে আশ্রয় করে। অবলম্বন ছাড়াও দাঁড়ায়, কিন্তু তা করে কেবলমাত্র অপর কাউকে আক্রমণ করার সময়, অন্য কোন সময় নয়। তবে খাড়াভাবে দাঁড়াবার এবং ঋজুভাবে চলবার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয়েছে একমাত্র মানুষের বেলায়।

একথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সুদূর অতীতে কোন এক সময় মানুষের পূর্ব-পুরুষগণ দ্বিপদ হয়ে উঠেছিল। এর ফলেই তাদের হাত ও পায়ের গড়নে, বিশেষ করে বুড়ো-আঙ্গুলের অবস্থানে, উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দেয়।

ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে মানুষের হাতের অঙ্গুষ্ঠ বা বুড়ো-আঙ্গুল আকারে বড় হ'তে লাগল, এবং অন্যান্য আঙ্গুলের তুলনায় এর সঞ্চালন আরও অবাধ ও স্বচ্ছন্দ হ'তে লাগল। অপর চারটি আঙ্গুলের সঙ্গে আড়াআড়ি ভাবে অবস্থিত অঙ্গুষ্ঠ বা বুড়ো-আঙ্গুলের সাহায্যে, মানুষের হাত নানাবিধ সরঞ্জাম বা হাতিয়ার প্রস্তুত করতে, এবং সেগুলি ব্যবহার করতে, ক্রমশঃ আরও অভ্যস্ত হয়ে উঠল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বানরের হাতের গড়ন অনেকটা মানুষের মতো, তাই সে গাছের ডাল বা লাঠি মুঠো ক'রে ধরতে পারে। কিন্তু বুড়ো-আঙ্গুল খাটো বলে সে একাজে মানুষের মতো পটু নয়।

বৃক্ষবাসী বানর, যেমন—শিম্পাঞ্জী, গাছের ডালে ডালে চলাফেরা করার সময় পায়ের উপর ভর দিয়ে চলে, কিন্তু দেহের ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্যে তাকে পায়ের সাহায্যেও গাছের ডাল আঁকড়ে ধরতে হয়। কাজেই তার পায়ের বুড়ো আঙ্গুল

অনেকটা হাতের বুড়ো-আঙ্গুলের মতই কাজ করে। এজন্যে দেখা যায় যে, বৃক্ষবাসী বানরের হাতের ও পায়ের বুড়ো-আঙ্গুলের অবস্থানে এবং কার্যকারিতায় মূলতঃ কোন প্রভেদ নেই। কিন্তু মানুষের হাতের ও পায়ের গড়নে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায়। কারণ, তার পায়ের বুড়ো-আঙ্গুল অন্য চারটি আঙ্গুলের সঙ্গে সংলগ্ন অবস্থায় রয়েছে। এজন্যে মানুষের পক্ষে পা দিয়ে কিছু আঁকড়ে ধরা সহজ নয়, একথা ঠিক। কিন্তু পায়ের গড়ন এরূপ হওয়ায়, মানুষের পক্ষে যে পায়ের পাতার সবটুকুর উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, ঋজুভাবে চলাফেরা করা, কিংবা দৌড়ানো, অনেক বেশী সহজ হয়েছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দু-পায়ে ভর দিয়ে চলাফেরা করতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পূর্ব-পুরুষদের স্বরতন্ত্রী আরও সহজ ও সাবলীলভাবে ব্যবহার করার সুযোগ হ'ল। মানুষের দু-চোখের সম্মিলিত দৃষ্টি (binocular vision)-ও তার ক্রমবিকাশের দিকে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলে পরিগণিত হয়। কারণ, এতে লক্ষ্য-বস্তুর দূরত্ব আরও সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। তাছাড়া দাঁড়ানো অবস্থায়, আরও উঁচু থেকে চারিদিকে ভাল ক'রে পর্যবেক্ষণ ক'রে শিকার করা, কিংবা আত্মরক্ষা করা, আরও সহজ হ'ল। এই অবস্থা তাদের বুদ্ধিবিকাশেও মৌলিকভাবে সহায়তা ক'রল। এরূপ অবস্থা যে মানব-মস্তিষ্কে চতুষ্পদ প্রাণীর তুলনায় বেশী অনুভূতি সৃষ্টি করে তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে।

1. লেমুর, 2. প্যারাপিতেক, 3. প্রপ্‌লিওপিতেক

চিত্র ৩৩২। মানুষের ক্রমবিকাশের দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রাণী—1. লেমুর (আবির্ভাবকাল (খৃষ্টপূর্ব ৫-৬ কোটি বছর), 2. প্যারাপিতেক (আবির্ভাবকাল খৃষ্টপূর্ব তিন থেকে সাড়ে তিন কোটি বছর) 3. প্রপ্‌লিওপিতেক আবির্ভাবকাল (খৃষ্টপূর্ব ১-২ কোটি বছর)।

বিজ্ঞানীদের মতে, এরূপ মানবসদৃশ বানরের প্রথম আবির্ভাব ঘটে পূর্ব ও দক্ষিণ-আফ্রিকায়, ৩০ থেকে ৫০ লক্ষ বছর আগে। এর নাম দেওয়া হয়েছে অস্ট্রালোপিতেকাস (*Australopithecus*), যার অর্থ দক্ষিণের বানর। এর মস্তিষ্কের

পরিমাপ ৪৮০ মিলিলিটার; বানরের তুলনায় কিছুটা বড়, কিন্তু আধুনিক মানুষের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। এর চোয়াল ছিল বেশ শক্তিশালী, কাঁচা মাংস চিবিয়ে খাওয়ার উপযোগী। কিন্তু এ সোজা হয়ে হাঁটতে পারত, এবং সম্ভবত ছোটখাট সরঞ্জাম (Tools) ব্যবহার ক'রত। এই সব আদিম সরঞ্জামের মধ্যে ছিল জীবজন্তুর হাড় এবং প্রকৃতির বুকে প্রাপ্ত তীক্ষ্ণ প্রস্তরখণ্ড। প্রয়োজন অনুযায়ী চলার পথে সে এগুলি কুড়িয়ে নিত, কিন্তু কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে এগুলি যেখানে-সেখানে ফেলে দিত।

১৯৫৯ সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী লিকী আফ্রিকার টাঙ্গানিকার অন্তর্গত ওল্‌ডুভাই গিরিখাতে একটি অশ্মীভূত করোটি আবিষ্কার করায় ডারউইনের অনুমান সত্য বলে প্রমাণিত হয়। লিকীর মতে, এ হ'ল অস্ট্রালোপিতেকাস-এর এক অপূর্ব নিদর্শন। মানবেতর এই প্রজাতিটির মধ্যে বানর এবং মানুষের বিশেষত্বগুলির এক অদ্ভুত সমন্বয় ঘটেছে। বিজ্ঞানীদের অনুমান, ৫ লক্ষ বছরেরও আগে এরা এই পৃথিবীতে বসবাস ক'রত। অস্ত্রাদি তৈরি করতে এবং সেগুলি ব্যবহার করতেও এরা জানত। সম্ভবত মানবেতর কোন প্রজাতি থেকে এর উদ্ভব হয়েছিল, আর যে শাখা থেকে সমকালীন মানুষের উদ্ভব হয়েছে, তার খুব নিকটেই এর অবস্থান। অনেকের মতে, এ থেকেই অতীতের বানর এবং সমকালীন মানুষের মধ্যে একটি হারানো সূত্রের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। এরা

চিত্র ৩১৩। বানর-মানুষ থেকে সমকালীন মানুষের উদ্ভব—কয়েকটি বিশেষ প্রতিনিধি (আধিপত্যকালের সম্ভাব্য সময় উল্লেখ করা হয়েছে)।

হয়তো কিছুকাল ধরে এই পৃথিবীতে বসবাস করেছিল, কিন্তু শেষে এক সময় একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে, পৃথিবীর বুকে এর কোন বংশধরই আজ আর বেঁচে নেই।

১৮৯১ সালে ওলন্দাজ বিজ্ঞানী ডুবোয়া যবদ্বীপে তদবধি অজ্ঞাত একটি প্রাণীর অশ্মীভূত কঙ্কালের অবশেষ (করোটি এবং ঊর্বস্থি) আবিষ্কার করেন (Java man)। এর মস্তিষ্কের আয়তন ছিল প্রায় ৯০০ মি. লি.। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রকট ভ্রূ-শিরা, কপাল একরূপ নেই বললেই চলে। তাছাড়া এর বৃহৎ দুই চোয়াল এবং দাঁত, বিশেষ ক'রে বৃহৎ ছেদন-দন্ত (Canine tooth), অনেকাংশে বানরের মতো। অথচ এর ঊর্বস্থি (Thigh bone) ছিল অনেকাংশে হোমো স্যাপিয়েন্‌স্‌-এর মতো। এই প্রাণীটি বানরও নয়, আবার মানুষও নয়। এর নাম দেওয়া হয়েছে পিতেকান্-

চিত্র ৩১৪। কয়েক প্রকার উচ্চতর বানরের করোটি—1. গিবন (বা, উল্লুক), 2. ওরাং-ওটাং, 3. শিম্পাঞ্জী, 4. গরিলা।
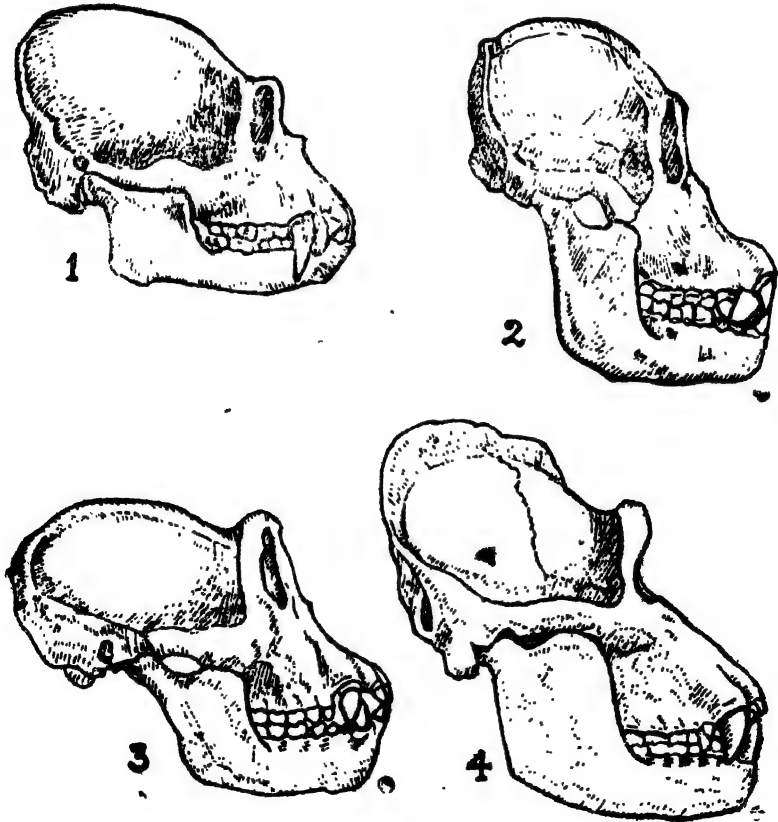
চিত্র ৩৩৫। শিম্পাঞ্জীর মুখ।

্রোপাস ইরেক্টাস (*Pithecanthropus erectus*; গ্রীক *Pitekos*—বানর, *Anthropos*—মানুষ), অর্থাৎ বানর-মানুষ (Ape-man)। মনে হয়, এরা গাছের ডাল এবং পাথর অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার ক'রত।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, মানবসদৃশ বানরের কোন একটি প্রজাতি থেকেই এক সময় বানরসদৃশ আদিম মানুষের উদ্ভব হয়েছে। সম্ভবতঃ বানর থেকে মানুষে রূপান্তরিত হওয়ার এই প্রক্রিয়াটি কোন একটি মাত্র স্থানে শুরু না হয়ে অনুরূপ প্রাকৃতিক অবস্থায় বিভিন্ন স্থানে একই সময়ে শুরু হয়েছিল। অনেকের মতে, সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মানব-প্রতিনিধির (*Genus—Homo*) আবির্ভাব ঘটে আজ থেকে অন্ততঃ ৫ লক্ষ বছর আগে। এরা এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই প্রাণীর উচ্চতা ছিল ১৭০ সেন্টিমিটার (৫ ফুট ৬·৯২ ইঞ্চি)। এ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত এবং মানুষের মতই দু-পায়ে ভর ক'রে সোজা হয়ে চলত। তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে হোমো ইরেক্টাস্ (*Homo erectus*)। এর করোটির আকার সমকালীন উচ্চতর বানর এবং মানুষের মাঝামাঝি।

চিত্র ৩৩৬। গরিলার মুখ।
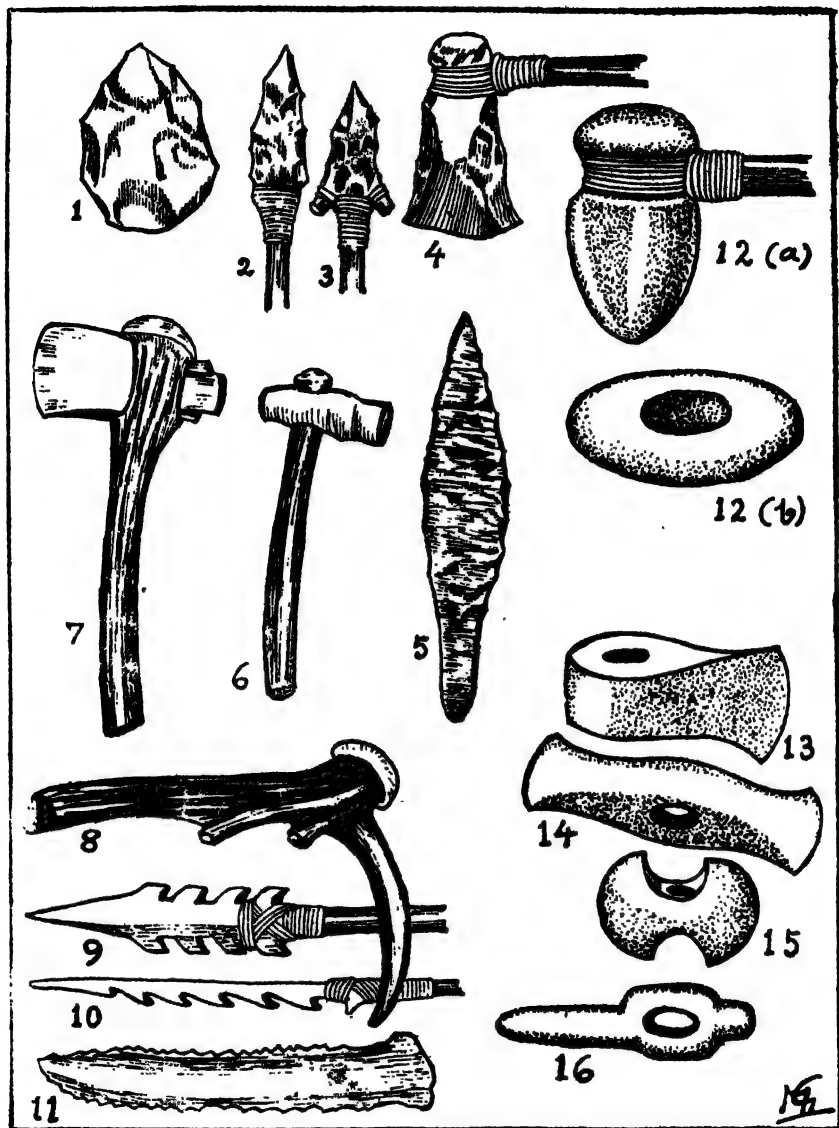
চিত্র ৩৬৯। প্রস্তর-যুগের মানুষ কর্তৃক ব্যবহৃত নানা প্রকার সরঞ্জাম (বা, অস্ত্র);—(A) চকমকি পাথরের সরঞ্জাম (বা, অস্ত্র)—1. সাধারণ সরঞ্জাম (বা, অস্ত্র), 2. বর্শা, 3. তীর, 4. কুঠার, 5. ছোরা (বা, ছুরি)। (B) পাথর এবং শিং দ্বারা নির্মিত সরঞ্জাম (বা, অস্ত্র)—6. হাতুড়ি, 7. কুঠার, 8. শুধু হরিণের শিং দ্বারা নির্মিত গাঁইতি। (C) হাড় দিয়ে তৈরি সরঞ্জাম (বা, অস্ত্র)—9. 10. হারপুন, 11. করাত। (D) পালিশ-করা পাথর দিয়ে তৈরি সরঞ্জাম (বা, অস্ত্র)—12. ডাঁটি ও থল, 13, 14, 15. নানাপ্রকার কুঠার, 16. হাতুড়ি।

গরিলার মস্তিষ্কের আয়তন ৫০০ থেকে ৬০০ মি. লি., কিন্তু এর মস্তিষ্কের আয়তন ছিল প্রায় ১০০০ মি. লি.। এজন্যে মনে হয় যে, এই প্রাণীটি বুদ্ধি-বৈশিষ্ট্যে উচ্চতর বানরকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

আফ্রিকার আদি-মানব সরল কুঠার তৈরি করে। কিন্তু এতটা কারিগরি জ্ঞান

চিত্র ৩৪১। মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশ—বিভিন্ন পর্যায় দেখানো হয়েছে। [শিল্পী—শ্রী: সুজ গুহ]

তখনও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আদি-মানবের মধ্যে সম্প্রসারিত হয় নি। তবে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছেন যে, তারাও কোন কিছু কাটার উদ্দেশ্যে অপেক্ষাকৃত সাধারণ সরঞ্জাম ব্যবহার ক'রত।

মানুষের পূর্ব-পুরুষরা এইভাবে যখন সচেতন শ্রম দ্বারা বিবিধ সরঞ্জাম প্রস্তুত করতে এবং খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, অথবা আত্মরক্ষার জন্যে, সেইসব সরঞ্জাম ব্যবহার করতে লাগল, প্রকৃতপক্ষে তখনই তারা নিজেদের পশু থেকে মানুষে রূপান্তরিত করতে আরম্ভ ক'রল।

প্রকৃত অর্থে এই ছিল প্রাচীনতম মানুষ, তবুও বানরের সঙ্গেই এর সাদৃশ্য ছিল প্রবল। বলা বাহুল্য, বিবিধ সরঞ্জাম ব্যবহার করতে করতে এর হাত দু'টি ক্রমশঃ মানুষের মতো হয়ে উঠল।

সম্প্রতি ইংল্যাণ্ডের স্বোয়ানকম্বে (১৯৩৫) এবং জার্মেনির স্টাইনহাইমে (১৯৩৩) কতকগুলি জীবাশ্ম-করোটি পাওয়া গেছে। এই মানব-প্রজাতির আবির্ভাব হয়েছিল অন্তত ২½ লক্ষ বছর আগে। এদের নাম দেওয়া হয়েছে হোমো স্যাপিয়েন্স (*Homo sapiens*=wise man)। এদের করোটি অনেকাংশে সমকালীন মানুষের মতো হয়ে উঠেছিল। এদেরও মস্তিষ্কের আয়তন ছিল প্রায় ১০০০ মি. লি.। এই মানব-প্রজাতিটিও ছড়িয়ে পড়েছিল ইউরোপ, আফ্রিকা এবং পশ্চিম এশিয়ার নানা জায়গায়। এদের ব্যবহৃত পাথরের কুঠার প্রভৃতি সরঞ্জাম ছিল আরও উন্নত ধরনের।

এদিকে ১৮৫৬ সালেই জার্মেনির অন্তর্গত নিয়ান্ডার উপত্যকায় (Neander valley) একপ্রকার প্রাচীন মানুষের করোটি ও অন্যান্য অস্থি প্রথম আবিষ্কৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে এ হ'ল হোমো স্যাপিয়েন্স-এরই একটি প্রকারণ (variant)। এর নাম দেওয়া হয়েছে হোমো স্যাপিয়েন্স নিয়ান্ডারথালেন্সিস্ (*Homo sapiens neanderthalensis*), অর্থাৎ নিয়ানডারথাল মানুষ (Neanderthal man)। সম্ভবতঃ প্রায় ২ লক্ষ বছর আগেই এদের আবির্ভাব হয়েছিল, আর এদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল সমগ্র ইউরোপে। কিন্তু শেষ হিমযুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে এরাও একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে।

নিয়ান্ডারথাল মানুষের উচ্চতা ছিল প্রায় ১৫৬ সে. মি.। এ দেখতে ছিল খর্বকায়, স্থূলদেহী এবং পেশীবহুল, গোল-কাঁধওয়ালা (বৃষস্কন্ধ)। এর মস্তিষ্কের আয়তন ছিল ১,৪০০ মি. লি., অর্থাৎ বানর-মানুষের মস্তিষ্কের আয়তনের চেয়ে অনেক

বেশী। কাজেই এর বুদ্ধি এবং বাক্‌শক্তি নিশ্চয়ই বানর-মানুষের চেয়ে উন্নত ছিল; তবুও এর মধ্যে বানর-সদৃশ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বজায় ছিল; যেমন—কপাল ছিল নিচু এবং পশ্চাৎভাগ ক্রমাবনত, উঁচু ভ্রূ-শিরা, সম্মুখে প্রসারিত হনুতে চিবুকের মতো প্রক্ষেপের অভাব ইত্যাদি। তাছাড়া এর হাঁটু ছিল একটু বাঁকা, আর পা ছিল অপেক্ষাকৃত ছোট এবং দুর্বল। এজন্যে সমকালীন মানুষের মতো এ ঠিক সোজা হয়ে হাঁটতে পারত না।

ক্রমবিকাশের দিক দিয়ে নিয়ান্‌ডারথাল মানুষ বানর-মানুষের চেয়ে অনেক বেশী এগিয়ে এসেছিল। এরা ফ্লিন্ট বা চক্‌মকি-পাথরের নানারূপ অস্ত্র এবং পশু-চর্মের স্থূল পরিচ্ছদ প্রস্তুত করতে শিখেছিল। তাই ওই সময়কে পুরনো-পাথর-যুগরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাছাড়া চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালাবার পদ্ধতিও এরাই আবিষ্কার করেছিল। আগুন ব্যবহার করতে শেখায় এরা জলবায়ুর বিভিন্ন অবস্থায় জীবন-যাপন করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া আগুনের সাহায্যে হিংস্র পশুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করা আরও সহজ হয়। এরা ক্রমশ আগুনে মাংস পুড়িয়ে খেতে অভ্যস্ত হয়। কাঁচা অপেক্ষা পোড়ানো মাংস আরও সহজে চিবানো যায়, তাই এদের দাঁত ও চোয়ালের গড়ন বদলে যাওয়ায় মুখাবয়ব ক্রমশঃ সমকালীন মানুষের মতো হয়ে উঠতে লাগল।

এরা বাস ক'রত নদীর পাড়ে, পাহাড়ের কোলে, গুহার ভিতরে। ঠিক কোথায় এবং কখন এদের প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল তা এখন নিশ্চয় করে বলা কঠিন। তবে ইউরোপ, এশিয়া এবং আফ্রিকার বহু স্থানে এই জাতীয় মানুষের দেহাবশেষ এবং সাংস্কৃতিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। এতে বোঝা যায় যে, পৃথিবীর ব্যাপক এলাকায় এদের বসতি ছিল। প্রায় চল্লিশ হাজার বছর ধরে এরা পৃথিবীতে বসবাস করেছে।

নিয়ান্‌ডারথাল মানুষই সর্বপ্রথম এক-একটি পরিবারে একত্রিত হয়ে থাকতে আরম্ভ করে। এইরূপ পরিবারে থাকত একজন কর্তা, একাধিক স্ত্রী এবং কয়েকটি পুত্র-কন্যা। পুত্র-সন্তান বড় হলে, পরিবারের কর্তা তাকে তাড়িয়ে দিত। তখন সে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াত এবং শেষে একদিন নিজের উপযুক্ত একটি সঙ্গী খুঁজে নিয়ে একটি নতুন পরিবারের পত্তন ক'রত। কিন্তু এইরূপ দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে পরিবারের কর্তাই যে সব সময় জয়লাভ ক'রত, তা নয়। কখন-কখনও সবল পুত্র, নিজের পিতাকেই হত্যা করে, সেই পরিবারের কর্তা হয়ে বসত।

আবার এইরকম কতকগুলি পরিবার সম্মিলিত হয়ে হিংস্র পশুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে, খাদ্যের জন্যে পশু শিকার করতে, এবং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে, অধিকতর সাফল্য লাভ ক'রল। তাই বিভিন্ন পরিবারে বিভক্ত থাকলেও তারা ক্রমশঃ সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল।

কিন্তু তখনও তাদের মধ্যে পূর্ণ বা অর্ধ-পাশব প্রবৃত্তিগুলি বেশ প্রবল ছিল। তাই এরা এক-একটি গোষ্ঠীতে সংবদ্ধ হয়ে বাস করলেও মাঝে মাঝে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হ'ত। এর ফলে এক-একটি গোষ্ঠীর অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ত। নিয়ান্‌ডারথাল মানুষের যে-সব করোটি আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের অনেকগুলিরই উপরের অংশ ভাঙ্গা। তারা পাথর দিয়ে যে-সব অস্ত্র তৈরি ক'রত, তার আঘাতেই যে এই সব করোটি ভেঙ্গেছিল, তা বেশ অনুমান করা যায়।

১৮৬৮ সালে ফ্রান্সের ক্রমান্‌ঁ্য গ্রামে, একটি গুহার মধ্যে আর একরকম মানুষের অশ্মীভূত কঙ্কালের অবশেষ পাওয়া গেছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে ক্রমান্‌ঁ্য মানুষ (Cromagnon man), অর্থাৎ হোমো স্যাপিয়েন্‌স (*Homo sapiens*)। সম্ভবতঃ প্রায় ৩৫ হাজার বছর আগে এদের প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল। ফ্লিণ্ট বা চকমকি পাথর দিয়ে তৈরি নানা রকম সুগঠিত অস্ত্র এরা ব্যবহার ক'রত। ক্রমবিকাশের ধারায় এই হ'ল তৃতীয় পর্যায়ের অর্থাৎ নতুন পাথর-যুগের মানুষ। বিজ্ঞানীদের অনুমান, এ থেকেই সমকালীন মানুষের (*Homo sapiens sapiens*) উদ্ভব হয়েছে, আজ থেকে প্রায় ৬০ হাজার বছর আগে।

হোমো স্যাপিয়েন্‌স থেকেই যে এদের উদ্ভব হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এর করোটির গঠনে নিয়ান্‌ডারথাল করোটির বিশেষত্ব, অর্থাৎ স্থূলতা, বজায় ছিল। তবে অন্যান্য দিক দিয়ে সমকালীন মানুষের সঙ্গেই এর সাদৃশ্য বেশী। যেমন, এরা একেবারে সোজা হয়ে হাঁটত বলে এদের উচ্চতা
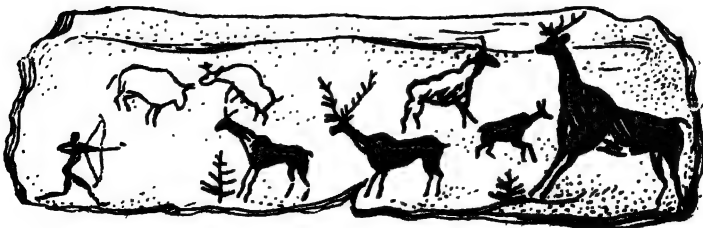
চিত্র ৩৪২। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের আঁকা শিল্পকলার নিদর্শন।

হ'ত ১৮০ সে. মি. পর্যন্ত। এর মস্তিষ্কের আয়তন ছিল প্রায় ১,৬৫০ মি. লি.। এরা ভাল ক'রে কথা বলতে পারত এবং শিকারে খুব দক্ষ ছিল। পাথর, হাড়, শিং প্রভৃতি দিয়ে নানারকম অস্ত্র, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম এরা তৈরি ক'রত। তাছাড়া প্রয়োজনের তাগিদে এরা নানারূপ জীবজন্তু, যেমন—ছাগল, ভেড়া, গরু, ঘোড়া, কুকুর প্রভৃতি, বশ করে। ফলে তাদের জীবনযাত্রা আরও সহজ হয়। প্রথম প্রথম এরা চামড়ার পোষাক প'রত, কিন্তু পরে এরাই প্রথম বস্ত্রাদি বুনতে শেখে। এরা আগুন জ্বালাতে পারত এবং ভাল রান্না করতে পারত। অযথা চিবানোর কাজ থেকে অব্যাহতি পাওয়ায় এদের দাঁত ও চোয়ালের গড়ন প্রায় সমকালীন মানুষের মতো হয়ে উঠেছিল।
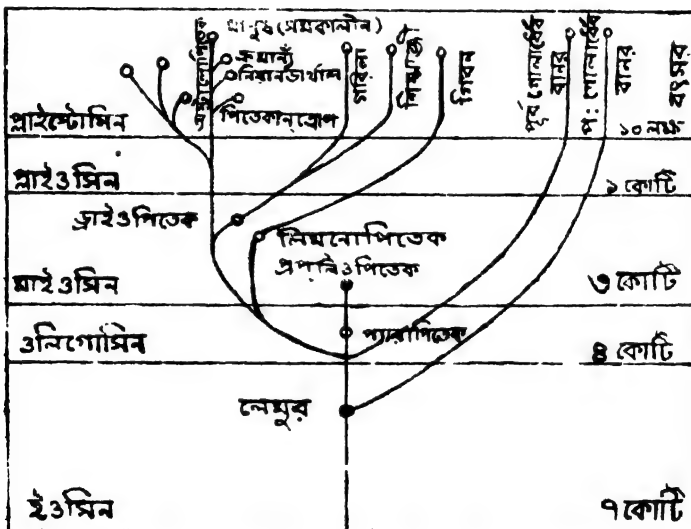
চিত্র ৩৪৩। মানুষের ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত তালিকা (Chart)।

প্রাচীন গুহাবাসী মানুষও ছবি আঁকত। বিজ্ঞানীরা এমন অনেক গুহার সন্ধান পেয়েছেন, যার দেওয়ালে নানারকম জীব-জন্তুর ছবি আঁকা; যেমন—বাইসন, ষাঁড়, হরিণ ইত্যাদি। তারা থাকত গুহার ভিতরে, আর সকাল হতেই বেরিয়ে পড়ত শিকারে। তাই হয়তো এসব ছবি তারা এঁকেছিল।

এতকাল মানুষ যাযাবর ছিল। এজন্যে খাদ্য-সমস্যার সমাধান করতেই তার অধিকাংশ সময় কেটে যেত। ক্রমে সে কৃষিকার্যের উপকারিতা উপলব্ধি ক'রল। তখন সে যাযাবর জীবন পরিত্যাগ ক'রে, ঘর-বাড়ি নির্মাণ ক'রে, এক এক জায়গায়

বসতি স্থাপন ক'রল। এই ভাবে ক্রমশঃ এক-একটি গ্রাম ও নগর গড়ে উঠল। পানের জন্যে এবং কৃষিকার্যের জন্যে জলের প্রয়োজন। তাই এরা সাধারণতঃ বড় বড় নদীর আশেপাশেই স্থায়িভাবে বসবাস করতে শুরু করেছিল। এই ভাবে গড়ে উঠল গ্রাম, গ্রাম থেকে নগর ও রাজধানী। বলবান ও বুদ্ধিমান মানুষ সাধারণ লোকদের উপর রাজা হয়ে বসল। এতে মানুষের প্রভুত্ব করার বাসনা আরও প্রবল হতে লাগল। সেই থেকে শুরু হয়েছে যুদ্ধবিগ্রহ, আজও তার শেষ নেই।

কৃষিকার্যের উন্নতির ফলে খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত হতে লাগল। মানুষ তখন গোলা ভরে খাদ্য সঞ্চয় করতে শিখল। এর ফলে তার খাদ্যের সমস্যা দূর হ'ল, তাই অবসর বাড়ল। এই অবসর সময়ে সে নানারকম চিন্তা করার সুযোগ পেল। এর ফলে সে শিল্প, দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রে দ্রুত উন্নতি লাভ করতে লাগল। এই ভাবে দেহের এবং মনের বিকাশের ফলে ধীরে ধীরে একসময় আধুনিক সভ্য মানুষের উদ্ভব সম্ভব হ'ল।

কালক্রমে মানুষ নানারকম ধাতু আবিষ্কার ক'রল। ধাতু দিয়ে বাসন তৈরি ক'রল, নানারকম গহনা বানাল। তাই দিয়ে ছুরি, তীর, বর্শার ফলা প্রভৃতি বানাল। প্রথমে এগুলি বানানো হ'ত বিশুদ্ধ তামা থেকে, পরে ব্রোঞ্জ (তামা ও দস্তার মিশ্রণ) থেকে এবং শেষে লোহা থেকে। তাই পরবর্তীকালে এই দু'টি যুগকে যথাক্রমে তাম্রযুগ (Copper-age) এবং লৌহযুগ (Iron-age) রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বানর থেকে মানুষ পর্যন্ত বিস্তৃত বংশধারায় উপরিউক্ত তিনটি জীবাশ্ম-মানব হ'ল তিনটি বিশেষ প্রতিনিধি। এদের দেখলেই বোঝা যায়, সুদীর্ঘ কাল-প্রবাহে বানর-মানুষ কিভাবে ধীরে ধীরে সমকালীন মানুষে রূপান্তরিত হয়েছিল। এদের অন্তবর্তী আরও কয়েকটি জীবাশ্ম-মানবের অস্তিত্ব প্রমাণিত হওয়ায় এই মতবাদ গ্রহণ করা আরও সহজ হয়েছে। তাদের মধ্যে সিনানথ্রোপ বা পিকিং মানুষ এবং হাইডেলবার্গ মানুষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আর একটি চমকপ্রদ ঘটনা হ'ল এই যে, বিজ্ঞানী লিকী ১৯৭২ সালে আফ্রিকার অন্তর্গত কেনিয়াতে, রুডল্ফ হ্রদ (Lake Rudolf)-এর নিকটে, ২৫ লক্ষ বছর আগেকার একটি করোটি এবং পায়ের হাড়ের জীবাশ্ম আবিষ্কার করেছেন। এর মস্তিষ্কের আয়তন ৮০০ মি. লি, অর্থাৎ শিম্পাঞ্জীর প্রায় দ্বিগুণ এবং সমকালীন মানুষের (১,৪৫০ মি. লি.) অনেকটা কাছাকাছি। প্রতিটি প্রাচীন জীবাশ্ম-করোটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল উঁচু ভ্রূ-শিরা (High eye-brow ridges), কিন্তু এর বেলায় সেই বৈশিষ্ট্য একরূপ নেই বললেই চলে। সম্ভবতঃ এ সোজা হয়ে দাঁড়াতে এবং হাঁটতে

পারত এবং নানারকম সরঞ্জাম তৈরি ক'রত। লিকীর মতে, এই হ'ল মানুষের সবচেয়ে প্রাচীন প্রতিনিধি। মানুষের ক্রমবিকাশের ধারায় এ এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তবে মানুষের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এর স্থান ঠিক কোথায় হবে, তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা আরও অনেক গবেষণার উপর নির্ভর করছে।

চিত্র ৩৪৪। কেনিয়াতে (রুডল্‌ফ হ্রদের নিকটে) প্রাপ্ত প্রাগৈতিহাসিক মানুষের অশ্মীভূত করোটি।

আর একটি কথা। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এখন বিভিন্ন জাতির মানুষ দেখা যায়। মানুষের বিভিন্ন জাতি (Race) সৃষ্টি হ'ল কেন? ডারউইন প্রমাণ করেছেন, প্রাণী-প্রজাতিগুলি যত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং তার ফলে তাদের প্রতিবেশে যত পার্থক্য হয়, তাদের পরিবর্তনশীলতাও তত বৃদ্ধি পায়। এর ফলে প্রজাতিটির মধ্যে নানারকম বাহ্যিক প্রভেদ দেখা দেয়। আদি-মানবের বিভিন্ন গোষ্ঠী যে-সব বিভিন্ন ভৌগলিক পরিবেশে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বাস করেছে, তাদের প্রভাবেই তাদের মধ্যে নানা রকম বাহ্যিক প্রভেদ দেখা দিয়েছে। মানুষের বিভিন্ন জাতি দেখা দেওয়ার সেটাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কারণ।

বিজ্ঞানীরা বলেন, ক্রমানত-মানুষদের মধ্যেই সর্বপ্রথম মৌলিক জাতি-রূপগুলি দেখা দেয়। চেহারার মৌলিক পার্থক্য অনুসারে এদের নাম দেওয়া হয়েছে—ককেসয়েড (Caucasoids), নিগ্রয়েড (Negroids) এবং মঙ্গোলয়েড (Mongoloids)।

ককেসয়েড-জাতীয় মানুষের আদি-নিবাস ইউরোপ। তবে এদের প্রাচীন প্রতিনিধিরা ছড়িয়ে পড়েছিল উত্তর-আফ্রিকা, আরব এবং পূর্বদিকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত। এদেরই সাধারণভাবে আর্য (Aryans) বলা হয়। এরা সাধারণতঃ ফর্সা এবং লম্বা হয়। এদের নাক খাড়া এবং বেশ চোখা, চোখ কটা, ঠোঁট পাতলা এবং চুল

ঢেউ-খেলানো। যারা বরাবর শীতের দেশে আছে, তাদের চুল বাদামী। কিন্তু যারা গরম দেশে চলে এসেছে, তাদের চুল প্রায়ই কালো হতে দেখা যায়।

আফ্রিকার আদিবাসীরা সাধারণভাবে নিগ্রয়েডরূপে অভিহিত। এদের বাস সাহারার দক্ষিণে। এদের রং কালো। নাক মোটা ও থ্যাবড়া, ঠোঁট পুরু, চোখ কালো, আর চুল কালো এবং খুব কোঁকড়া (Wooly hair)।

মঙ্গোলয়েডদের আদি-নিবাস মধ্য এশিয়া এবং উত্তর-চীন। এখানে উল্লেখ্য যে, সুদূর অতীতে কিছু মঙ্গোলয়েড বেরিং-প্রণালী অতিক্রম ক'রে গিয়েছিল। আমেরিকার রেড-ইণ্ডিয়ানরা এবং এস্কিমোরা হ'ল তাদেরই বংশধর। এরা

চিত্র ৩৪৫। নানা জাতের মানুষ (বাঁ দিক থেকে)—1. ককেসয়েড, 2. নিগ্রয়েড, 3. মঙ্গোলয়েড, 4. অস্ট্রেলয়েড।

সাধারণতঃ বেঁটে হয়। এদের গায়ের রং পীতাভ, অর্থাৎ হল্‌দেটে। মুখের গড়ন প্রশস্ত এবং চ্যাপ্‌টা ধরনের। এদের নাক খাঁদা। চোখ সরু ও ছোট। বরফের উপরকার চোখ-ঝল্‌সানো আলো (Snow glare) থেকে চোখকে রক্ষা করার জন্যে উপরের পাতায় এক রকম ভাঁজ পড়ে, তাই এদের চোখ এরকম দেখায়। এদের দাড়ি-গোঁফ কম এবং চুল পাতলা ও সোজা।

এই প্রসঙ্গে অস্ট্রেলয়েডদের (Australoids) কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরাই সাধারণভাবে অস্ট্রেলয়েড-রূপে পরিচিত। কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতে, এরা পৃথক জাতি নয়। সুদূর অতীতে একদল যাযাবর ককেসয়েড হয়তো ঐ দেশে উপনীত হয়ে সেখানেই বসবাস করতে থাকে এবং অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে বিকাশ লাভ করে। অস্ট্রেলয়েডরা হ'ল তাদেরই বংশধর।

দক্ষিণ ভারতেও এরকম মানুষের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। এরাও কালো। এদেরও নাক মোটা ও থ্যাবড়া, আর ঠোঁট পুরু। কিন্তু এদের চুল কালো এবং ঢেউ-খেলানো (Frizzy hair), নিগ্রয়েডদের মতো অত কোঁকড়া নয়।

জাতিগত বৈশিষ্ট্যগুলি কিন্তু অপরিবর্তনীয় নয়। অতি প্রাচীনকাল থেকেই জাতি ও উপজাতিগুলির স্থান-পরিবর্তনের ফলে তাদের মধ্যে মিশ্রণ শুরু হয়েছে। তাই বর্তমানে কোন বিশুদ্ধ জাতি আছে বলে মনে হয় না।

ভারতীয়দের মধ্যেও নানা জাতির বৈশিষ্ট্য এসে মিশেছে। তাই এখানে ফর্সা-কালো, লম্বা-বেঁটে, কটা চোখ-কালো চোখ, সোজা চুল-কোঁকড়া চুল, সব রকম মানুষই দেখা যায়।

যান্ত্রিক সভ্যতার উন্নতির ফলে ভৌগোলিক ব্যবধান ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। এর ফলে জাতিসমূহের মিশ্রণ-প্রক্রিয়া ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে, আর জাতিগত পার্থক্যগুলি ক্রমশঃ লোপ পেয়ে যাচ্ছে। এমন দিন হয়তো শীগ্‌গিরই আসবে, যখন সব দেশের মানুষ একই জাতিরূপে পরিগণিত হবে। তখন তার একমাত্র পরিচয় হবে মানব জাতি বলে। তখন মানুষে মানুষে উচ্চ-নীচ, আর্য-অনার্য প্রভৃতি ভেদাভেদ জ্ঞান আর থাকবে না।